জুআন ফালুন

轉法輪

(বাংলা - সংস্করণ)

লি হোংগ জি

李洪志

লুন্যু[1]

দাফা[2] হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার প্রজ্ঞা। এটাই সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর, যার উপরে এই স্বর্গ, মর্ত্য এবং বিশ্ব নির্মিত হয়েছে। একেবারে ক্ষুদ্রতম থেকে সবচেয়ে বৃহত্তম, সমস্ত কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত, অথচ বিভিন্ন জ্যোতিষ্কসমূহের (গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) স্তরগুলির মধ্যে এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। জ্যোতিষ্কসমূহের সবচেয়ে আণুবীক্ষণিক পর্যায় শুরু হওয়ার পরে প্রথমে সূক্ষ্মতম কণার আবির্ভাব হয়, এরপরে আছে ছোট থেকে বড়ো আকারের অসংখ্য কণার স্তরের পর স্তর, আরও বাইরের স্তরে পৌঁছে গেলে সেখানে আছে মানবজাতির অবগত পরমাণু, অণু, গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ, এরও পরে আছে আরও বিশাল, বিভিন্ন আকারের কণা দিয়ে নির্মিত বিভিন্ন আকারের জীবন এবং বিভিন্ন আকারের জগৎ যেগুলো বিশ্বের জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের কোনো একটি কণার জীবনদের কাছে পরবর্তী বৃহত্তর স্তরের কণাগুলি যেন তাদের আকাশের গ্রহ, যা প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে সত্য। বিশ্বের প্রত্যেকটি স্তরের জীবনদের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা সীমাহীনভাবে হতে থাকবে। দাফা-ই রচনা করেছে সময় ও মাত্রা (Dimension), বিপুল সংখ্যক জীবন ও প্রজাতি, এবং যাবতীয় সৃষ্টিকার্য; সমস্ত কিছুই এর অন্তর্গত, এর বাইরে কিছুই নেই। এগুলোই হচ্ছে দাফা-র প্রকৃতির, অর্থাৎ সত্য-করুণা-সহনশীলতার (জেন-শান-রেন)[3], বিভিন্ন স্তরে প্রকটিত নির্দিষ্ট রূপ।

বিশ্ব এবং জীবনের অনুসন্ধানের ব্যাপারে মানবজাতির পন্থাগুলি যত উন্নতই হোক না কেন, বিশ্বের নীচু স্তরের এই মাত্রাটার যে অংশে মানবজাতি বিরাজ করছে, তারা সেটুকুই শুধুমাত্র জানতে পেরেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবির্ভূত অনেক সভ্যতায় মানবজাতি অন্য গ্রহে অনুসন্ধান করেছিল, কিন্তু তারা যতটা উচ্চতা এবং যতটা দূরত্বই উড়ে থাকুক না কেন, মানবজাতি যে মাত্রাতে বিরাজ করছে, সেটাকে তারা কখনোই অতিক্রম করতে পারেনি। এই বিশ্বের বাস্তব ছবিটা সম্ভবত মানবজাতির কাছে আবহমানকাল ধরে সত্যি

---

[1] লুন্যু - টিপ্পনী, বক্তব্য, মন্তব্য।

[2] দাফা - মহান পথ বা মহান বিধি ; মূল নীতি।

[3] জেন-শান-রেন - জেন (সত্য, সততা); শান (করুণা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমবেদনা, দয়া); রেন (সহনশীলতা, ধৈর্য্য, সহ্যশক্তি)।

সত্যিই অজানা থেকে যাবে। কোনো মানুষ যদি এই বিশ্ব, সময়-মাত্রা এবং মানব শরীরের রহস্য সম্বন্ধে জানতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই একটা সৎপথে সাধনা করতে হবে, তাকে সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে হবে এবং তার জীবন সত্তার স্তরের উন্নতি ঘটাতে হবে। সাধনার মাধ্যমে যখন তার নৈতিক গুণের উন্নতি ঘটবে, সে সত্যি সত্যি সদাচার থেকে কদাচারকে এবং ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করতে পারবে, একই সাথে সে মানুষের স্তরের উর্ধ্বে উন্নীত হবে, একমাত্র তখনই সে সত্যিকারের বিশ্বকে ও বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জীবনদের দেখতে পারবে এবং এসবের সংস্পর্শে আসতে পারবে।

মানবজাতি প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার জন্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে যাচ্ছে এবং দাবি করছে যে তারা জীবনের গুণগত মান উন্নত করতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ঐশ্বরিকতা এবং আত্মসংযমরক্ষাকারী নৈতিকতা মূলগতভাবে বর্জন করছে, সেইজন্যে অতীতে আবির্ভূত মানবসভ্যতাগুলো অনেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অথচ মানবজাতি যা কিছু অনুসন্ধান করছে সেসব শুধুমাত্র পার্থিব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পদ্ধতিগুলো এইরকমই যে, কোনো কিছু জ্ঞাত হলে একমাত্র তখনই সেটার উপরে গবেষণা করা হবে। এছাড়া মানবজাতির এই মাত্রার মধ্যে, যেসব জিনিস ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না, কিন্তু বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এবং সত্যি সত্যি মানবজাতির বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রকটিত হচ্ছে ----- যেমন আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বরীয় বচন এবং অলৌকিকতা, লোকেরা এগুলোর সংস্পর্শে আসতেও সাহস করে না যেহেতু তারা ঐশ্বরিকতা পরিত্যাগ করেছে।

মানবজাতি যদি নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে তাদের স্বভাব, আচরণবিধি এবং চিন্তাধারার উন্নতিসাধন করতে পারে, একমাত্র তাহলেই মানবসভ্যতা স্থায়ী হবে, এমনকী মানবসমাজে আবার নতুন করে অলৌকিকতারও আবির্ভাব ঘটবে। অতীতে মানবসমাজে অনেকবারই, যতটা ঐশ্বরিক ততটাই মানবিক এইরকম সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল, এবং মানবজাতিকে জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে সত্যি সত্যি জ্ঞানের বিকাশসাধনে সাহায্য করেছিল। যখন জনগণ এই পৃথিবীতে দাফা-র প্রকটিত রূপের প্রতি যথাযথ আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, তখন সেই লোকেরা, তাদের জাতি এবং তাদের দেশ অর্জন করবে আশীর্বাদ, সম্মান ও সমৃদ্ধি। জ্যোতিষ্কসমূহ, বিশ্ব, জীবন এবং সমস্ত সৃষ্টিকার্য দাফা-র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, যে জীবন দাফা-র

থেকে দূরে চলে যাবে সে সত্যি সত্যিই নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাবে; যে ব্যক্তি দাফা-র সাথে মিলে যেতে পারবে সে সত্যি সত্যিই একজন ভালো মানুষ হয়ে যাবে, একই সাথে সে ভালো কাজের জন্য পুরষ্কৃত হবে, সে আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সুখ এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হবে। যে সাধক দাফার সাথে এক হয়ে যেতে পারবে সে হবে এক আলোকপ্রাপ্ত ------ দেবতা।

লি হোংগ জি

May 24, 2015

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

লুন্যু

বক্তৃতা - এক **1**

জনগণকে সত্যি সত্যি উঁচু স্তরে পরিচালিত করা 1

বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা 7

সত্য-করুণা-সহনশীলতা হচ্ছে ভালো এবং খারাপ মানুষ বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি 12

চিগোংগ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি 16

চিগোংগ হচ্ছে সাধনা 22

অনুশীলনের সাথে সাথে কেন গোংগ বৃদ্ধি হচ্ছে না? 25

ফালুন দাফা-র বিশেষত্ব 37

বক্তৃতা - দুই **46**

দিব্যচক্ষুর বিষয় 46

অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা 61

ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা 64

পঞ্চতত্ত্ব এবং ত্রিলোক পার করে যাওয়া.............................. 70

কিছু পাওয়ার ইচ্ছা 77

বক্তৃতা - তিন **89**

আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আমার শিষ্য হিসাবে দেখি............. 89

বুদ্ধ মতের চিগোংগ এবং বৌদ্ধধর্ম 90

সাধনায় শুধু একটা পথেই অনুশীলন করা উচিত 97

অলৌকিক ক্ষমতা এবং গোংগ সামর্থ্য 101

বিপরীত সাধনা এবং গোংগ ঋণ 102

সত্তা ভর করা 111

মহাজাগতিক ভাষা 120

মাস্টার শিক্ষার্থীদের কী দিয়েছেন ? 124

শক্তি ক্ষেত্র 134

ফালুন দাফা-র অনুশীলনকারী কীভাবে এই পদ্ধতির প্রচার করবে ? 135

বক্তৃতা - চার **140**

ত্যাগ ও প্রাপ্তি 140

কর্মের রূপান্তর 142

চরিত্রের উন্নতিসাধন 156

শক্তিপাত (গুয়ানডিংগ) 164

রহস্যময় মার্গের স্থাপনা 169

বক্তৃতা - পাঁচ **179**

ফালুন প্রতীক 179

চিমেন পদ্ধতি 182

অশুভ পদ্ধতির অনুশীলন 185

পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা 189

মন এবং শরীরের সাধনা 191

ফা-শরীর (ফাশেন) 193

মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা 195

যাদু বিদ্যার বিষয়. 205

বক্তৃতা - ছয় 207

চিগোংগ মনোবিকার 207

চিগোংগ অনুশীলনে আসুরিক বাধা 220

নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা 229

মুখ্য চেতনা শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন 236

চিন্তা সৎ হওয়া আবশ্যক 237

রণক্রীড়া (Martial Arts) চিগোংগ 246

জাহির করার মানসিকতা 253

বক্তৃতা - সাত 258

জীবহত্যার বিষয় 258

মাংস খাওয়ার বিষয় 264

ঈর্ষা 273

রোগ নিরাময়ের বিষয় 281

হাসপাতালের চিকিৎসা এবং চিগোংগ চিকিৎসা 288

বক্তৃতা - আট **296**

বিগু 296

চি চুরি করা 299

চি সংগ্রহ করা 303

যে অনুশীলন করবে সেই গোংগ প্রাপ্ত হবে 307

ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ 316

অত্যুৎসাহজনিত আসক্তি 331

বাক্ সাধনা 334

বক্তৃতা - নয় **337**

চিগোংগ এবং শারীরিক ব্যায়াম 337

মানসিক ইচ্ছা 340

পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মন 349

জন্মগত সংস্কার 357

আলোকপ্রাপ্তি 360

উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি 369

বক্তৃতা - এক

জনগণকে সত্যি সত্যি উঁচু স্তরে পরিচালিত করা

আমার ফা[1] প্রচারের এবং শারীরিক ক্রিয়া শেখানোর পুরো পর্বে, আমি সমাজের প্রতি এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলাম, ফল যা পেয়েছি তা ভালো এবং পুরো সমাজের উপর এর প্রভাবও বেশ ভালোই হয়েছে। কয়েক বছর আগে অনেক চিগোংগ[2] শেখানোর মাস্টার ছিলেন, যাঁরা শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার স্তরে শেখাতেন। অবশ্য আমি এটা বলছি না যে তাঁদের চিগোংগ পদ্ধতি ভালো ছিল না, আমি শুধু এটাই বলছি যে তাঁরা উঁচু স্তরের কোনো কিছু শেখাতেন না। সমগ্র দেশের চিগোংগ-এর পরিস্থিতি আমি সব জানি। বর্তমানে দেশের ভিতরে এবং বাইরে, আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সত্যিকারের উঁচু স্তরের চিগোংগ শেখাচ্ছি। কেন উঁচু স্তরের চিগোংগ কেউ শেখায়নি? কারণ এর সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি খুবই বিশাল, এর উৎপত্তির ইতিহাসও খুব গভীর, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দিকগুলোও খুব বিস্তৃত, এবং যেসব প্রশ্ন এর সঙ্গে উঠে আসে সেগুলিও খুব গম্ভীর। এটা সেইরকম ব্যাপার নয় যা একজন সাধারণ মানুষ শেখাতে পারবে, কারণ এতে অনেক ধরনের চিগোংগ পদ্ধতির অনুশীলনের ব্যাপার জড়িয়ে রয়েছে। বিশেষত আমাদের মধ্যে, অনেক রকম পদ্ধতির অনুশীলন করা লোক আছে, যারা আজ একরকম পদ্ধতির চর্চা করছে, আগামীকাল অন্যরকম পদ্ধতির চর্চা করবে, তারা তাদের শরীর এলোমেলো করে ফেলবে, তাদের সাধনা নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হবে। অন্যেরা যেখানে প্রধান পথ ধরে সাধনা করে উপরে উঠছে, তারা সেখানে নানান ধরনের গলি পথ ধরছে, তারা যখন একটা সাধনা করবে, তখন

---

[1]ফা - বিধি, ধর্ম, নিয়ম ; বুদ্ধ মতের মূল নীতি।

[2]চিগোংগ - চীনদেশীয় প্রথাগত শারীরিক অনুশীলন পদ্ধতি যেখানে ‘‘চি*(qi)*’’ অথবা ‘‘জীবনীশক্তির’’ সাধনা করা হয়। বর্তমানে চিগোংগ পদ্ধতি চীনে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে।

অন্যটা বাধা দেবে, আবার অন্য সাধনা করলে এটা বাধা দেবে। সবকিছু তাদের বাধা দেবে, তাদের সাধনা কখনোই সফল হবে না।

এইসব ব্যাপারকে আমরা বিশৃঙ্খলামুক্ত করব, ভালো অংশ থাকবে, আর খারাপ অংশ দূর করে দেব। এরপরে তুমি নিশ্চয়ই সাধনা করতে পারবে। কিন্তু তোমাকে অবশ্যই সত্যি সত্যি দাফা শিখতে হবে। যদি তুমি নানান ধরনের আসক্তি ধরে রাখ, অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্যে আস, রোগের নিরাময় চাও, কিছু তত্ত্ব কথা শুনতে চাও অথবা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ধরে রাখ, তাহলে এসব একেবারেই কাজ করবে না। কারণ আমি উল্লেখ করেছি যে, আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে এই কাজগুলো করছি। এই ধরনের ব্যাপার ও সুযোগ বেশী আসে না, আমিও যে সর্বদা এইরকমভাবে শেখাতে থাকব তাও নয়। আমি মনে করি যারা আমার শেখানো শারীরিক ক্রিয়া এবং ফা সরাসরি শুনতে পারছ, আমি সত্যি বলছি-----তোমরা ভবিষ্যতে অত্যন্ত আনন্দময় এই সময়কালটাকে উপলব্ধি করবে এবং অনুভব করবে। অবশ্য আমরা পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক বিশ্বাস করি, এখানে সবাই পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কের কারণেই বসে আছি।

তোমরা সবাই চিন্তা কর, উঁচুস্তরে চিগোংগ শেখানোর ক্ষেত্রে সমস্যাটা কী? এটা মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে নয় কি? মানুষের উদ্ধার কীভাবে হবে, তোমাকে সত্যিকারের সাধনা করতে হবে, শুধু মাত্র রোগ নিরাময় করা এবং শরীর সুস্থ রাখা নয়। এই জন্যে সত্যিকারের সাধনায় শিক্ষার্থীর চরিত্র (শিনশিংগ)[3] উঁচু হওয়া আবশ্যক। আমাদের এখানে যেসব লোকেরা বসে আছ, যারা দাফা শেখার জন্যে এসেছ, তারা নিজেদের সত্যিকারের সাধক হিসাবে গণ্য করবে এবং আসক্তিগুলোকে অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। তুমি যদি বিভিন্ন ধরনের জিনিস পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শারীরিক ক্রিয়া এবং দাফা শিখতে আস, তাহলে কিছুই শিখতে পারবে না। আমি একটা সত্যি কথা বলছি: একজন সাধকের কাছে তার সম্পূর্ণ সাধনার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে, প্রতিনিয়ত তার মনের আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করার প্রক্রিয়া। এই সাধারণ মানবসমাজে লোকেরা একজন আর একজনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, প্রত্যেকে প্রত্যেককে ঠকাচ্ছে, এবং সামান্য একটু লাভের জন্যে একজন আর একজনের ক্ষতি করছে, এই সব মানসিকতা

[3]শিনশিংগ*(xinxing)* - চরিত্র ; মনের অথবা হৃদয়ের প্রকৃতি; স্বভাব

অবশ্যই ছাড়তে হবে। বিশেষত আজ যারা এই পদ্ধতির অধ্যয়ন করছ, তাদের অবশ্যই আরও বেশী করে এই সব মানসিকতা ছাড়তে হবে।

আমি এখানে রোগ নিরাময়ের কথা বলছি না এবং রোগের নিরাময়ও আমরা করব না, কিন্তু একজন সত্যিকারের সাধক হিসাবে, তোমার শরীর যদি অসুস্থ থাকে, তুমি সাধনা করতেই পারবে না। আমি তোমার শরীর শোধন করব। আমি একমাত্র তাদের শরীরই শোধন করব, যারা সত্যি সত্যি এই পদ্ধতি এবং ফা শিখতে এসেছ। আমরা একটা জিনিস জোর দিয়ে বলতে চাই: তুমি যদি ওই চিন্তাগুলোকে দূর করতে না পার এবং রোগের প্রতি আসক্তি দূর করতে না পার, তাহলে এসবের কোনো কিছুই আমরা করতে পারব না অর্থাৎ তোমাকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না। এইরকম কেন? এর কারণ এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, বুদ্ধ মতে বলা হয় যে, সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের সবকিছুর মধ্যে একটা পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক আছে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এগুলো সাধারণ মানুষের জন্যে এইরকম ভাবে বিরাজ করছে। অতীতে খারাপ কাজ করার ফলে উৎপন্ন হয়েছিল কর্ম, তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে ব্যাধি অথবা দুর্ভোগ। কষ্ট সহ্য করার মধ্যে দিয়েই কর্মের ঋণ শোধ হয়, সেইজন্যে কেউই এটাকে তার ইচ্ছামতো পাল্টাতে পারে না। যদি পাল্টানো হয়, তাহলে সেটা ঋণ করার পরে ঋণ শোধ না করেও ছাড় পাওয়ার সমান, কেউই ইচ্ছামতো এটা করতে পারে না, অন্যথা সেটা খারাপ কাজ করার সমান হবে।

কিছু লোক মনে করে রোগীর চিকিৎসা করা, রোগ নিরাময় করা এবং শরীর সুস্থ করা, এগুলো ভালো কাজ। আমার মতে তারা বাস্তবে রোগ নিরাময় করেনি, তারা রোগটাকে বিলম্বিত করেছে অথবা রূপান্তরিত করেছে, রোগটাকে শরীরের বাইরে নিয়ে যেতে পারেনি। সত্যি সত্যি এই দুর্ভোগগুলোকে দূর করতে হলে, কর্মকে অবশ্যই দূর করতে হবে। যদি কেউ বাস্তবে রোগ নিরাময় করতে পারে, যদি সে সম্পূর্ণরূপে কর্ম দূর করতে পারে অর্থাৎ সত্যিই যদি সে এটুকু সম্পন্ন করতে পারে, তাহলে তার স্তর বেশ উঁচু। সে ইতিমধ্যে একটা সত্য দেখেছে যে, সাধারণ মানবসমাজের নিয়ম ইচ্ছামতো ভাঙ্গা যায় না। সাধনার সময়ে সাধকের হৃদয়ে করুণার ভাব জাগতে পারে, তার ফলে সে কিছু ভালো কাজ করতে পারে। সে রোগের চিকিৎসা করে, অথবা রোগ দূর করে এবং শরীর সুস্থ করে কাউকে সাহায্য করতে পারে, এর অনুমতি দেওয়া যেতে

পারে, কিন্তু কারোর রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় সে করতে পারে না। যদি সাধারণ মানুষের রোগের মূল কারণ সত্যিই দূর করা যায়, একজন সাধনা না করা লোক সব রোগ থেকে মুক্ত হয়ে চলে যাবে। কিন্তু এই দরজার বাইরে গেলেই, সে একজন সাধারণ মানুষই রয়ে যাবে, সে তখন ব্যক্তিগত লাভের জন্যে অন্যের সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের মতোই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকবে। তার কর্ম ইচ্ছামতো কীভাবে দূর করবে? সেটা একেবারেই করতে দেওয়া যাবে না।

একজন সাধকের ক্ষেত্রে কেন এইরকম করা যাবে? সাধক হচ্ছে সবার চেয়ে মূল্যবান, কারণ সে সাধনা করতে চায়, এই চিন্তাটা মনে উদয় হওয়াটাই সবচেয়ে দামি। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ স্বভাব সম্বন্ধে বলা আছে। যখন কারোর বুদ্ধ স্বভাবের উদয় হয়, তাকে আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা সাহায্য করতে পারেন। এর অর্থ কী? তুমি জানতে চাইলে আমি বলব, যেহেতু আমি তোমাদের উঁচু স্তরের গোংগ শেখাচ্ছি, এর মধ্যে উঁচু স্তরের নিয়মাবলি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িয়ে আছে। এই বিশ্বে, আমরা দেখেছি যে এই মানবজীবন সাধারণ মানবসমাজে উৎপন্ন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে জীবনের উৎপত্তি এই বিশ্বের মহাকাশের মধ্যে হয়েছে। কারণ এই বিশ্বের মধ্যে জীবন সৃষ্টির জন্যে নানান ধরনের প্রচুর উপাদান আছে, এবং এই উপাদানগুলি পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবন উৎপন্ন করে। অন্যভাবে বলা যায় যে মানুষের আদি জীবন এই বিশ্ব থেকেই এসেছে। বিশ্বের এই মহাকাশ প্রথমে কল্যানময় ছিল এবং এর স্বভাবে ছিল সত্য-করুণা-সহনশীলতা। যখন আদি জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল, তখন তার স্বভাব বিশ্বের স্বভাবের মতোই ছিল। কিন্তু যখনই অনেক জীবন উৎপন্ন হয়ে একটা সমষ্টিগত সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হল, তখন এদের কিছু জীবনের মধ্যে স্বার্থপরতা বাড়তে থাকল, ধীরে ধীরে তাদের স্তর নামতে লাগল, সেই স্তরে তারা আর থাকতে পারল না এবং অবশ্যই নীচে নেমে গেল। কিন্তু এই অন্য স্তরে তারা আবার খারাপ হয়ে গেল এবং এখানেও থাকতে পারল না, সেইজন্যে তারা নিরন্তর নীচে নামতে থাকল এবং নামতে নামতে সবথেকে শেষে এই মানুষের স্তরে পৌঁছাল।

সম্পূর্ণ মানবসমাজ একটা স্তরে আছে। দিব্যশক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অথবা মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই স্তরে নামার পরে মূলগতভাবে জীবনগুলির ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা তাদের পরোপকারী মানসিকতার কারণে এদের একটা

সুযোগ দিলেন, এবং এইরকম একটা বিশেষ বাতাবরণ ও একটা বিশেষ মাত্রা নির্মাণ করলেন। এই মাত্রার সব জীবন বিশ্বের অন্য সব মাত্রার জীবনদের থেকে আলাদা, এই মাত্রার জীবন অন্য মাত্রার জীবনদের দেখতে পায় না, এই বিশ্বের সত্যটাকে দেখতে পায় না, সেইজন্যে এই মানবজীবন যেন এক মায়ার জগতের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেইজন্যে রোগ নিরাময় করতে চাইলে, অথবা দুর্ভোগ এবং কর্ম দূর করতে চাইলে, মানুষকে অবশ্যই সাধনা করতে হবে, তবেই সে নিজের মূলে এবং সত্যে ফিরতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের সাধনার পথগুলি এইভাবেই ব্যাপারটাকে দেখে। মানুষকে অবশ্যই তার মূলে এবং সত্যে ফিরতে হবে, মানুষ হওয়ার এটাই আসল উদ্দেশ্য, সেইজন্যে কেউ সাধনা করতে চাইলে, ভাবা হয় যে তার বুদ্ধ স্বভাবের উদয় হয়েছে। এই চিন্তাটাই সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ সে তার মূলে এবং সত্যে ফিরতে চাইছে, সে এই সাধারণ মানুষের স্তর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের এই কথাটা সবাই শুনেছ: ‘‘যখনই কারোর বুদ্ধ স্বভাবের উদয় হয়, এই দশ দিক যুক্ত জগৎ[4] কেঁপে ওঠে।’’ যে এই বুদ্ধ স্বভাব কারোর মধ্যে দেখবে সেই তাকে বিনাশর্তে সাহায্য করবে। মানুষের উদ্ধারের ব্যাপারে বুদ্ধ মত কোনো শর্তের কথা বলে না, কোনো মূল্যও ধার্য করে না, বিনা শর্তে তাকে সাহায্য করে। সেইজন্যে আমরা শিক্ষার্থীদের জন্যে অনেক কিছু করতে পারি। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, যে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে থাকতে চায় এবং তার রোগ নিরাময় করতে চায় সেক্ষেত্রে কিছু করা যাবে না। কিছু লোক ভাবে: ‘‘আমার রোগ সেরে যাওয়ার পরে আমি সাধনা করব,’’ কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে কোনোরকম শর্ত চলে না, কেউ সাধনা করতে চাইলে তার সাধনা করা উচিত। তবে কিছু লোকের শরীরে রোগ থাকে, কিছু লোক তাদের শরীরে অনেক এলোমেলো বার্তা বহন করে, কিছু লোক কখনো চিগোংগ অনুশীলন করেনি, এবং কিছু লোক কয়েক দশক ধরে চিগোংগ অনুশীলন করে যাচ্ছে কিন্তু এখনও ‘চি’[5] -এর স্তরেই ঘোরাফেরা করছে, তাদের সাধনায় কোনো অগ্রগতি হয়নি।

---

[4]দশ দিক যুক্ত জগৎ - বৌদ্ধধর্মে বিশ্বের ধারণা।

[5]চি*(qi)* - চীনের সংস্কৃতিতে একে প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি হিসাবে ধারণা করা হয়; গোংগ-এর তুলনায় এটি নিম্নস্তরের শক্তি।

তাহলে কী করা উচিত? আমরা তাদের শরীর শোধন করব, যাতে তারা সাধনা করে উঁচু স্তরে উঠতে সক্ষম হয়। সবথেকে নীচু স্তরে সাধনা করার সময়ে একটা প্রক্রিয়া করা হয়, যার দ্বারা তোমার শরীরকে সম্পূর্ণরূপে শোধন করা হয়। তোমার মনের মধ্যে থাকা খারাপ জিনিস, তোমার শরীরকে ঘিরে থাকা কর্মক্ষেত্র, তোমার শরীরকে অসুস্থ করার কারণগুলি, এসবই তোমার শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হবে। যদি দূর না করা হয় তবে এইরকম অশুদ্ধ ও কলুষিত শরীর, এবং এইরকম নোংরা মন নিয়ে কীভাবে সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছাবে? আমরা এখানে 'চি'-এর অনুশীলন করি না, তোমার ওই নীচু স্তরের জিনিসের অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই, আমরা তোমাকে ঠেলে এর উপরে তুলে দেব, যাতে তোমার শরীর এক রোগমুক্ত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। একই সঙ্গে আমরা তোমার শরীরে পূর্বে প্রস্তুত করা কিছু জিনিসের একটা সেটও স্থাপন করব যা নীচু স্তরে ভিত নির্মাণ করতে প্রয়োজন, এইরকমভাবে তুমি খুব উঁচুস্তরে চিগোংগ-এর অনুশীলন করতে পারবে।

সাধনার ক্ষেত্রে সাধারণত, 'চি'-কে হিসাবের মধ্যে ধরলে তিনটে স্তর আছে। কিন্তু সত্যিকারের সাধনায় ('চি'-কে হিসাবের মধ্যে না ধরলে) দুটো মুখ্য স্তর আছে: একটা হচ্ছে ত্রিলোক-ফা[6] সাধনা; আর একটা হচ্ছে বহিঃ ত্রিলোক-ফা সাধনা। এই ত্রিলোক-ফা সাধনা এবং বহিঃ ত্রিলোক-ফা সাধনা, মন্দিরের ''সাংসারিক জগতের বাইরে''-র সাধনা এবং ''সাংসারিক জগতের ভিতরে''-র সাধনার থেকে আলাদা। ওগুলো তত্ত্বমূলক ব্যাপার মাত্র, আমাদের এই সাধনায় মানব শরীরের সত্যিকারের পরিবর্তন দুটো মুখ্য স্তরে ঘটে। যেহেতু এই ত্রিলোক-ফা সাধনা প্রক্রিয়ার সময়ে একজন ব্যক্তির পুরো শরীরটাকে নিরন্তর শোধন করা হতে থাকে, সেইজন্যে সে যখন এই ত্রিলোক-ফা সাধনার উচ্চতম রূপে পৌঁছাবে, তখন তার শরীর এরই মধ্যে উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে। বহিঃ ত্রিলোক-ফা সাধনা মূলত বুদ্ধ শরীরের সাধনা, ওই শরীর উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি, সেইজন্যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা নতুন করে আবার বিকশিত হবে। আমরা এই দুটো মুখ্য স্তর প্রসঙ্গেই আলোচনা করব।

---

[6]ত্রিলোক-ফা - বৌদ্ধধর্মে বলা হয় যে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সংসারচক্রের আবর্তে ঘুরতে হবে যতক্ষণ না সে সাধনার মাধ্যমে বহিঃ ত্রিলোক-ফা স্তরে পৌঁছাচ্ছে অথবা ত্রিলোক অতিক্রম করে যাচ্ছে।

আমরা পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক বিশ্বাস করি। যারা এখানে বসে আছ, তাদের সবার জন্যে আমি এই কাজ করতে পারি। এখন আমাদের এখানে শুধু দুই হাজারের বেশী লোক আছে। আমি কয়েক হাজার অথবা তার থেকে বেশী লোক, এমনকী দশ হাজারেরও বেশী লোকের জন্যে এটা করতে পারি, অর্থাৎ তোমাদের আর নীচু স্তরে অনুশীলন করতে হবে না। তোমার শরীরকে শোধন করার পরে তোমাকে ঠেলে এই স্তরের উপরে নিয়ে গিয়ে তোমার শরীরে সম্পূর্ণ সাধনা প্রণালীর একটা সেট স্থাপন করব, এক্ষুনি তুমি উঁচু স্তরে সাধনা শুরু করতে পারবে। তবে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা প্রকৃত সাধনা করতে চায়, শুধু তাদের জন্যেই এটা করা হবে। তুমি শুধু এখানে বসে থাকলেই, তোমাকে সাধক বলা যাবে না। যদি তুমি তোমার চিন্তাগুলিকে মূল থেকে বদলাতে পার, তবেই আমি তোমাকে এগুলো দিতে পারব এবং শুধু এগুলোতেই সীমিত নয়, পরবর্তীকালে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমাদের প্রত্যেককে আমি কী সব জিনিস দিয়েছি। আমরা এখানে রোগ নিরাময়ের কথা বলি না, তবে আমরা শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করি, যাতে তুমি সাধনা করতে পার। তুমি যদি একটা অসুস্থ শরীর বয়ে বেড়াও, তাহলে তোমার গোংগ[7] একেবারেই বাড়বে না। সেইজন্যে তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্যে আমার খোঁজ করবে না এবং আমিও এসব ব্যাপার করি না। জনগণের মধ্যে আমার আসার প্রধান উদ্দেশ্য, জনগণকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া, অর্থাৎ জনগণকে সত্যি সত্যি উঁচু স্তরে পরিচালিত করা।

বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা

অতীতে অনেক চিগোংগ মাস্টার বলেছে যে চিগোংগ এর মধ্যে আছে তথাকথিত প্রাথমিক স্তর, মধ্যম স্তর এবং উচ্চ স্তর। সেগুলো সবই 'চি', সবই শুধু 'চি'-এর অনুশীলনের স্তর, এমনকী সেটাকেই তারা প্রাথমিক স্তর, মধ্যম স্তর এবং উচ্চ স্তরে ভাগ করেছে। সত্যিকারের উচ্চ স্তরের বিষয় সম্বন্ধে বিপুল সংখ্যক চিগোংগ অনুশীলনকারীদের মাথার ভিতরটা একেবারে ফাঁকাই ছিল বলা যায়, মূলত এরা কিছুই জানত না। আজ থেকে আমরা যা কিছু ব্যাখ্যা করব সবই উচ্চ স্তরের ফা। এছাড়া আমি সাধনার সত্যিকারের সুনামটা পুনরুদ্ধার করতে চাই। আমার বক্তৃতায়,

[7]গোংগ - সাধনা শক্তি; এই শক্তির বিকাশের জন্যে সাধনা পদ্ধতি।

আমি সাধক সমুদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিছু খারাপ ঘটনা সম্বন্ধে বলব। আমি আরও সব জানাব যে, আমরা কীভাবে ওই সমস্ত ঘটনাগুলোর মোকাবিলা করব এবং কী চোখে সেগুলোকে দেখব। এছাড়া উচ্চ স্তরের এই সাধনা পদ্ধতি এবং ফা শেখানোর ক্ষেত্রে এবং প্রচার করার ক্ষেত্রে কতকগুলো দিক এবং কতকগুলো প্রশ্ন এসে যায়, যেগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এমনকী খুবই গম্ভীর। আমি এই ব্যাপারগুলো নিয়েও বলতে চাই। আমাদের এই মানবসমাজে বিশেষত সাধক সমুদায়ের মধ্যে কিছু বাধা অন্য মাত্রা থেকে আসে, আমি সেগুলো নিয়েও তোমাদের বলব এবং একই সাথে আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করে দেব। এই সমস্যাগুলোর সমাধান না করলে তুমি সাধনা করতে পারবে না। সমস্যাগুলোর মূলগত সমাধান করার জন্যে আমি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে সত্যিকারের সাধক হিসাবে দেখব, এভাবেই কাজটা করা যাবে। অবশ্য এক্ষুনি তোমাদের ধারণাগুলোকে পাল্টানো সহজ ব্যাপার নয়। এখন থেকে পরবর্তী বক্তৃতাগুলোর সময়ে তোমরা ধীরে ধীরে তোমাদের ধারণাগুলোর পরিবর্তন ঘটাবে এবং এটাও আশা করব যে তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আমার সাধনা পদ্ধতি শেখানোটা অন্যদের থেকে আলাদা। কিছু লোক তাদের পদ্ধতি শেখানোর সময়ে সাধনার মূলনীতিগুলি শুধু বর্ণনা করে, তারপরে তারা তাদের একটা বার্তা তোমার সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং শারীরিক ক্রিয়ার একটা সেট শেখায়, তারপরেই শেষ। লোকেরা ইতিমধ্যে এই ধরনের চিগোংগ শেখানোর প্রথাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

সত্যিকারের চিগোংগ শিক্ষার জন্যে ফা শেখানো প্রয়োজন এবং তাও[৪] সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। দশটা বক্তৃতায় আমি উচ্চস্তরের সব নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করব, তবেই তোমরা সাধনা করতে পারবে। তা নাহলে তোমরা কোনোভাবেই সাধনা করতে পারবে না। অন্যেরা যা শেখায় সেসবই রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার স্তরের জিনিস। তুমি যদি উচ্চ স্তরে সাধনা করতে চাও, তাহলে উচ্চ স্তরের ফা-এর পরিচালনা ছাড়া তুমি সাধনা করতেই পারবে না। ব্যাপারটা ঠিক যেন স্কুলে যাওয়ার মতো, যদি তুমি প্রাথমিক স্কুলের বই নিয়ে কলেজে যাও, তাহলে তুমি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রই রয়ে যাবে। কিছু লোক মনে করে যে তারা অনেক পদ্ধতি শিখে নিয়েছে, এই পদ্ধতি সেই পদ্ধতি, একগাদা প্রমাণপত্র জমিয়ে রেখেছে,

---

[৪]তাও - যা ‘‘দাও’’ নামেও পরিচিত, তাও শব্দের অর্থ ‘‘প্রকৃতি এবং বিশ্বের পথ’’; মহান আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি তাও প্রাপ্তি করেছেন।

কিন্তু তাদের গোংগ-এর বৃদ্ধি হয়নি। তাদের মতে এগুলোই চিগোংগ-এর সার কথা এবং চিগোংগ-এর সবকিছু। তা নয়, এগুলো শুধু চিগোংগ-এর ভাসা ভাসা জ্ঞানমাত্র, সবথেকে নীচু স্তরের জিনিস। চিগোংগ এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা একটা সাধনা, খুবই বিস্তৃত এবং গভীর জ্ঞানের ব্যাপার। এছাড়া আবার বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফা। এটা আমাদের এখনকার 'চি' ভিত্তিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে আমরা যা জানি, সেইরকম নয়, এগুলো যত বেশী করেই শেখো না কেন, সবই একরকম। উদাহরণস্বরূপ, তুমি ইংল্যান্ডের প্রাথমিক স্কুলের বই পড়েছ, আমেরিকার প্রাথমিক স্কুলের বই পড়েছ, জাপানের প্রাথমিক স্কুলের বই পড়েছ, এবং চীনের প্রাথমিক স্কুলের বই পড়েছ, তথাপি তুমি একজন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রই রয়ে যাবে। নিম্নস্তরের চিগোংগ তুমি যত বেশী শিখবে, নিজেকে যত বেশী তা দিয়ে পূর্ণ করবে, তত বেশী তুমি নিজের ক্ষতি করবে। তুমি ইতিমধ্যে শরীরটাকে এলোমেলো করে দিয়েছ।

আমি আরও একটা বিষয় জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের এই সাধনায়, শারীরিক ক্রিয়া এবং ফা, দুটো জিনিসই শেখানো প্রয়োজন। কোনো কোনো মঠের ভিক্ষুদের, বিশেষ করে যারা জেন বৌদ্ধধর্মের, তাদের ধারণা হয়তো অন্যরকম। যখনই শুনবে যে ফা শেখানো হচ্ছে, তারা শুনতে চাইবে না। কেন এই রকম? জেন বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করে: এই ফা শেখানো যায় না, যদি শেখানো হয় তাহলে সেটা ফা নয়, শেখানোর মতো কোনো ফা নেই, শুধু হৃদয় এবং অন্তরাত্মার মাধ্যমে একে উপলব্ধি করা যায়। সেই কারণে জেন বৌদ্ধধর্ম এখনও পর্যন্ত কোনো ফা শেখাতে পারেনি। বুদ্ধ শাক্যমুনির[9] একটা কথার উপর ভিত্তি করে, জেন ভিক্ষু ধর্মাচার্য বোধিধর্ম, এই জিনিসটা প্রচার করেছিলেন। শাক্যমুনি বলেছিলেন 'কোনো ধর্ম[10]-ই নিশ্চিত নয়'। তিনি শাক্যমুনির এই কথার উপরে ভিত্তি করেই জেন বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা বলব এই পদ্ধতিটা ঠিক যেন 'বলদের শিং-এর মধ্যে গর্ত খোঁড়ার মতো।'[11] বলদের শিং-এর মধ্যে গর্ত খোঁড়ার কথা কেন উঠছে? যখন বোধিধর্ম এর মধ্যে গর্ত খুঁড়তে আরম্ভ করেছিলেন তখন তাঁর বোধ হয়েছিল যে এটা বেশ প্রশস্ত। যখন

---

[9]শাক্যমুনি - গৌতম বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ।

[10]ধর্ম - বুদ্ধ শাক্যমুনির শিক্ষা ।

[11]বলদের শিং এর মধ্যে গর্ত খোঁড়া - চীনা ভাষায় প্রবাদবাক্য, একদিক বন্ধ কানাগলির মধ্যে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয় জেন ধর্মাচার্য খুঁড়তে শুরু করলেন তখন তাঁর খুব প্রশস্ত মনে হয়নি। তৃতীয় ধর্মাচার্য-র সময়ে সেটা কোনো ক্রমে যাওয়ার মতো ছিল। চতুর্থ ধর্মাচার্য-র সময়ে সেটা ইতিমধ্যে খুব সরু হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চম ধর্মাচার্য-র সময়ে মূলত খোঁড়ার জন্যে প্রায় কোনো জায়গাই ছিল না। ষষ্ঠ ধর্মাচার্য হুইনাঙ্গ-এর সময়ে সেটা শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল, আর খুঁড়ে এগোনোর জায়গা ছিল না। যদি আজ তুমি কোনো জেন আচার্যের কাছে ধর্ম শিখতে চাও, তুমি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। যদি তুমি প্রশ্ন কর, তাহলে সে পিছনে ঘুরে তোমার মাথায় বেত দিয়ে মারবে, যাকে বলে 'বেত হুঁশিয়ারী'। এর অর্থ তুমি কিছু জানতে চাইবে না, তুমি নিজে নিজেই আলোকপ্রাপ্ত হবে। তুমি বলবে: ''আমি কিছু জানি না সেইজন্যে শিখতে এসেছি, আমি কীসের উপরে আলোকপ্রাপ্ত হবো? তুমি বেত দিয়ে মারছ কেন?'' অর্থাৎ জেন বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যে বলদের শিং-এর শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, আর কোনো কিছু শেখানোর নেই। বোধিধর্ম নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর শিক্ষা কেবল 'ছ'টা প্রজন্ম পর্যন্ত শেখানো যেতে পারে, তারপরে এটা কোনো কাজ করবে না। কয়েকশ' বছর কেটে গেছে, কিন্তু এখনও কিছু লোক আছে, যারা জেন বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বগুলিকে আমৃত্যু আঁকড়ে থাকতে চায়, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। ''কোনো ধর্মই নিশ্চিত নয়,'' শাক্যমুনির এই কথাটার আসল অর্থটা কী? শাক্যমুনির স্তর ছিল তথাগত,[12] লোকেরা পরবর্তীকালে, এমনকী অনেক ভিক্ষুরাও, তাঁর স্তর পর্যন্ত, তাঁর চৈতন্যময় মানসিক অবস্থা পর্যন্ত, তাঁর প্রচারিত ধর্মের সত্যিকারের অর্থ পর্যন্ত, তাঁর বলা কথাগুলোর সত্যিকারের অর্থ পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত হতে পারেনি। সেইজন্যে পরবর্তীকালে লোকেরা, কেউ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছে, কেউ ওইভাবে ব্যাখ্যা করেছে, ব্যাখ্যাগুলিকে গুলিয়ে দিয়েছে, তারা ভাবল যে কোনো ধর্মই নিশ্চিত নয়, এর অর্থ হচ্ছে, তুমি ধর্ম শেখাতে পারবে না, যদি তুমি শেখাও সেটা ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থটা ঠিক নয়। শাক্যমুনি, বোধিবৃক্ষের নীচে গোংগ উন্মোচিত হয়ে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পরে, সঙ্গে সঙ্গে তথাগত স্তরে পৌঁছে যাননি। তিনি তাঁর সম্পূর্ণ উনপঞ্চাশ বছরের ধর্মপ্রচারের সময়কালে, নিরন্তর নিজেকে উন্নত করে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রত্যেকবার উচ্চ স্তরে ওঠার সময়ে পিছনে ফিরে দেখতেন যে, ঠিক আগে পর্যন্ত তাঁর শেখানো ধর্ম সবই ভুল ছিল। আবার উচ্চ স্তরে উঠে তিনি দেখতেন যে তাঁর শেখানো ধর্ম ভুল ছিল।

[12]তথাগত - একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তা, বুদ্ধ মত অনুযায়ী যাঁর সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান, অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্ব স্তরেরও উপরে।

যখন আবার উচ্চ স্তরে উঠতেন, তিনি আবিষ্কার করতেন যে, ঠিক আগে পর্যন্ত তাঁর শেখানো ধর্ম ভুল ছিল। পুরো উনপঞ্চাশ বছর ধরে নিরন্তর এইভাবে সবদিকে নিজের উন্নতি করেছিলেন। প্রত্যেকবার উচ্চ স্তরে ওঠার পরে তিনি আবিষ্কার করতেন যে ঠিক আগে পর্যন্ত তাঁর শেখানো ধর্ম উপলব্ধির ব্যাপারে বেশ নীচুস্তরের ছিল। তিনি আরও আবিষ্কার করেছিলেন যে, প্রত্যেক স্তরের ধর্মের সবই হচ্ছে সেই স্তরের ধর্মেরই অভিব্যক্তি, প্রত্যেকটা স্তরেই ধর্ম আছে, কিন্তু এসবই বিশ্বের পরম সত্য নয়। উঁচু স্তরের ধর্ম, নীচু স্তরের ধর্মের তুলনায় বিশ্বের প্রকৃতির আরও বেশী কাছাকাছি থাকে। সেইজন্যেই উনি বলেছিলেন: ‘‘কোনো ধর্মই নিশ্চিত নয়।’’

শেষে শাক্যমুনি আরও বলেছিলেন: ‘‘আমি আমার সারাজীবনে কোনো ধর্মই শেখাইনি।’’ জেন বৌদ্ধধর্ম আবারও এর এইরকম অর্থোদ্ঘাটন করল যে, কোনো ধর্মই শেখানোর মতো নেই। শাক্যমুনি তাঁর জীবনের শেষের বছরগুলোতে ইতিমধ্যে তথাগত স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি কেন বলেছিলেন যে তিনি কোনো ধর্ম শেখাননি? তিনি বস্তুত কোন্ বিষয়টা উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন: ‘‘আমি তথাগত স্তরে এসেও পরম সত্য এবং পরম ধর্ম কী সেটা দেখতে পাইনি।’’ সেইজন্যে তিনি বলেছিলেন লোকেরা যেন তাঁর কথাকেই পরম সত্য এবং অপরিবর্তনীয় সত্য হিসাবে মনে না করে। তা নাহলে লোকেরা তথাগত অথবা তার থেকে নীচু স্তরে আটকে যাবে এবং আরও উঁচু স্তর ভেদ করতে পারবে না। তাঁর উত্তরসূরি লোকেরা, এই বাক্যের বাস্তবিক অর্থ বুঝতে পারল না এবং মনে করল যে যদি ধর্ম শেখানো হয়, তাহলে সেটা ধর্ম নয়, তারা এইরকম অর্থবোধ করল। প্রকৃতপক্ষে শাক্যমুনির বক্তব্য ছিল এই যে, বিভিন্ন স্তরের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রকমের, কোনো স্তরের ধর্মই বিশ্বের পরম সত্য নয়, তবে প্রত্যেক স্তরের ধর্ম সেই স্তরের পথ প্রদর্শনের কাজ করে। বস্তুত উনি এই তত্ত্বটাই বলেছিলেন।

অতীতে অনেক লোকেরা, বিশেষ করে জেন সম্প্রদায়ের লোকেরা সবসময়েই এইরকম পক্ষপাতমূলক এবং অত্যন্ত ভ্রান্ত একটা ধারণা পোষণ করত। যদি কেউ তোমাকে না শেখায়, কীসের দ্বারা তোমার অনুশীলন পরিচালিত হবে? কীভাবে অনুশীলন করবে? কীভাবে সাধনা করবে? বৌদ্ধধর্মে অনেক বৌদ্ধ গল্পকথা আছে, কেউ কেউ হয়তো একজন লোকের কথা পড়েছ যে স্বর্গে গিয়েছিল, সে স্বর্গে গিয়ে দেখেছিল যে

ওখানকার *বজ্রসূত্রের*[13] প্রত্যেকটা শব্দ নীচের এখানকার থেকে পুরোপুরি আলাদা, তার অর্থও সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানকার *বজ্রসূত্র* কেন সাধারণ মানবজগতের *বজ্রসূত্রের* থেকে ভিন্ন? কিছু লোক এও বলে: ‘‘পরমানন্দের স্বর্গলোকের ধর্মগ্রন্থ, এখানকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, মূলত এক নয়ই। শুধু যে শব্দগুলো আলাদা তা নয়, তার তাৎপর্য, তার অর্থ সবই আলাদা, সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে।’’ বস্তুত একই ফা বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয় এবং সাধককে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত করে।

সবাই জান, বৌদ্ধধর্মে একটা পুস্তিকা আছে, নাম *পশ্চিমের পরমানন্দময় স্বর্গে ভ্রমণ,* এতে বলা আছে একজন ভিক্ষু বসে ধ্যান করছিল, তার মূল আত্মা *(য়ুয়ানশেন)* [14] পরমানন্দময় স্বর্গে পৌঁছে সেখানকার দৃশ্য দেখেছিল এবং একদিন ঘুরে বেড়িয়েছিল, তারপরে যখন পৃথিবীতে ফিরে এল, ইতিমধ্যে ‘ছ’টা বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। সে কি কিছু দেখেছিল না দেখেনি? দেখেছিল, কিন্তু সে বাস্তব অবস্থাটা দেখতে পায়নি। কেন? কারণ তার স্তর যথেষ্ট উঁচু ছিল না। তার স্তর অনুযায়ী বুদ্ধ ফা-এর প্রকাশিত রূপের যতটা তার দেখা উচিত, শুধু মাত্র ততটাই তাকে দেখানো হয়েছিল। কারণ এইরকম একটা স্বর্গ হচ্ছে ফা-এর গঠনেরই একটা প্রকাশিত রূপ, সেইজন্যে সে বাস্তব অবস্থা দেখতে পায়নি। আমি বলব এই ‘কোনো ধর্মই নিশ্চিত নয়’-এর এইরকমই অর্থ।

সত্য-করুণা-সহনশীলতা হচ্ছে ভালো এবং খারাপ মানুষ বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি

বৌদ্ধধর্মের লোকেরা সবসময়েই অনুসন্ধান করে গেছে যে বুদ্ধ ফা কী? এরকমও কিছু লোক আছে যারা মনে করে, বৌদ্ধধর্মে যা শেখানো হয়

---

[13]বজ্র সূত্র - বৌদ্ধধর্মের এক প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র।

[14]মূল আত্মা *(য়ুয়ানশেন)* - এটি মুখ্য আত্মা *(জু য়ুয়ানশেন)* এবং সহ আত্মা *(ফু য়ুয়ানশেন)* এই দুটো ভাগে বিভক্ত। চীনের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করা হয় যে মানবদেহে অনেক আত্মা থাকে, যারা কিছু বিশেষ ধরনের কার্য এবং প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকে, (উদাহরণস্বরূপ অনেকের মতে যকৃতের মধ্যে একটি আত্মা থাকে যা এর কার্য পরিচালনা করে)।

সেটাই সম্পূর্ণ বুদ্ধ ফা, বাস্তবে সেটা নয়। 2500 বছর পূর্বে যে ধর্ম শাক্যমুনি প্রচার করেছিলেন সেটা ছিল শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্যে, যারা ছিল খুবই নিম্নস্তরের, তারা সবেমাত্র আদিম সভ্যতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল এবং তাদের মনও অপেক্ষাকৃত সরল ছিল, তাদেরই এই ধর্ম শেখানো হয়েছিল। আজ হচ্ছে ‘‘ধর্মের বিনাশ কাল,’’ [15] যেটা উনি বলেছিলেন। এখনকার লোকেরা ওই ধর্ম ব্যবহার করে কোনোভাবেই সাধনা করতে পারবে না। এই ধর্মের বিনাশকালে, মন্দিরের ভিক্ষুদের নিজেদের উদ্ধার করাই কঠিন, আর অন্যদের উদ্ধার করার কথা তো ছেড়েই দাও। শাক্যমুনি যে সময়ে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেটা সেই সময়ের পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেই প্রচার করেছিলেন, তাঁর স্তর অনুযায়ী যে বুদ্ধ ফা উনি জানতেন, তার পুরোটা উনি শেখাননি, আর একে চিরকাল অপরিবর্তনীয় রাখতে চাইলেও, তা সম্ভব নয়।

সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের মন রূপান্তরিত হয়ে ক্রমাগত আরও জটিল হতে থাকল, তার ফলে এই পদ্ধতিতে লোকেদের পক্ষে সাধনা করা কঠিন হয়ে গেল। বৌদ্ধধর্ম দ্বারা সম্পূর্ণ বুদ্ধ ফা-এর পরিচয় পাওয়া যায় না, সেটা কেবল বুদ্ধ ফা-এর একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বুদ্ধ মতের আরও অনেক মহান ধর্ম সাধারণ লোকেদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে এসেছে, প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক প্রজন্মের একজন লোকের মধ্যে দিয়ে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা, এবং বিভিন্ন মাত্রায় আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা, এসবই হচ্ছে প্রত্যেকটা মাত্রায়, এবং প্রত্যেকটা স্তরে বুদ্ধ ফা-এর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। শাক্যমুনি এও বলেছিলেন যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্যে চুরাশি হাজার সাধনা পদ্ধতি আছে, আর বৌদ্ধধর্মে আছে জেন, পবিত্রভূমি, তিয়ানতাই, হুয়াইয়ান এবং তন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি দশটারও বেশী সাধনা পদ্ধতি, যেগুলো বুদ্ধ ফা-এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। শাক্যমুনি নিজেও তাঁর ধর্মের পুরোটা শেখাননি, তিনি তখনকার লোকেদের বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী শুধু সেই অংশটুকুই শিখিয়ে ছিলেন।

বুদ্ধ ফা তাহলে কী? এই বিশ্বের সবচেয়ে মূল প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা যা বুদ্ধ ফা-এর সর্বোচ্চ প্রকাশ, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল বুদ্ধ

---

[15] ধর্মের বিনাশ কাল - বুদ্ধ শাক্যমুনির মতে, তাঁর তিরোধানের পাঁচশো বৎসর পর থেকে ধর্মের বিনাশকাল শুরু হবে এবং তারপর থেকে তাঁর ধর্ম মানুষকে আর উদ্ধার করতে পারবে না।

ফা। এই বুদ্ধ ফা-এর বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশিত রূপ, যা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পথপ্রদর্শনের কাজ করে, স্তর যত নীচু হবে এর প্রকাশও তত জটিল হবে। হাওয়ার ক্ষুদ্র কণা, পাথর, কাঠ, মাটি, লোহা, মানব শরীর, পদার্থসমূহ সবকিছুর মধ্যেই এই প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা বিদ্যমান। প্রাচীনকালে বলা হতো এই বিশ্বের সমস্ত কিছুই পাঁচটি উপাদান(পঞ্চতত্ত্ব)[16] দিয়ে তৈরি এবং এগুলোর মধ্যেও এই প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা বিদ্যমান। একজন সাধক সাধনার মাধ্যমে যে স্তরে পৌঁছায়, সে শুধু সেই স্তরের বুদ্ধ ফা-এর বিশেষ প্রকাশকেই উপলব্ধি করতে পারে, এবং এটাই তার সাধনার সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান,[17] এবং স্তর। বিস্তারিতভাবে যদি বলা যায়, তাহলে এই ফা খুবই বিশাল। যখন এর উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে যাবে, তখন তুমি বলবে ফা খুবই সরল, কারণ ফা হচ্ছে পিরামিডের মতো। যখন উচ্চতম স্তরে পৌঁছে যাবে তখন একে তিনটে শব্দে সংক্ষিপ্ত করা যায়, অর্থাৎ সত্য, করুণা ও সহনশীলতা। প্রত্যেকটা স্তরে এর প্রকাশ খুবই জটিল। এখানে মানুষকে উপমা হিসাবে ধরা যেতে পারে, তাও মতে মানুষকে বিশ্বের একটা ছোট সংস্করণ ধরা হয়। মানুষের একটা বস্তুগত শরীর আছে, কিন্তু শুধু এই বস্তুগত শরীরটা দিয়েই একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি হয় না। তার মধ্যে অবশ্যই মানুষের স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল আত্মা বিদ্যমান থাকবে, তবেই একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ তার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা নিয়ে গড়ে উঠবে। আমাদের এই বিশ্বও একই রকম, এতেও আছে ছায়াপথ, অন্যান্য গ্যালাক্সি, আরও আছে জীবন এবং জল। এই বিশ্বের যাবতীয় জিনিস ও পদার্থ, এগুলো হল বস্তুগত অস্তিত্বের একটা দিক; কিন্তু একই সাথে এর মধ্যে বিদ্যমান আছে এই প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা। যে কোনো পদার্থের আণুবীক্ষণিক কণার মধ্যেও এই প্রকৃতি আছে, এমনকী অতি আণুবীক্ষণিক কণার মধ্যেও এই প্রকৃতি বিরাজমান।

সত্য-করুণা-সহনশীলতা এই প্রকৃতি হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে ভালো এবং খারাপ বিচার করার মাপকাঠি। কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ? এই

[16]পাঁচটি উপাদান(পঞ্চতত্ত্ব) - ধাতু, কাঠ, জল, আগুন আর পৃথিবী।

[17] সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান - বুদ্ধ মতে একজন ব্যক্তির সাধনায় সফলতা অর্জনের বিভিন্ন স্তর, যেমন - অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব, তথাগত ইত্যাদি।

প্রকৃতি দিয়েই সেটা বিচার করা যাবে। অতীতে আমরা যে সদ্‌গুণ *(দ্য)*[18]-এর কথা বলতাম তা একই। অবশ্য আজকের সমাজে নৈতিক আদর্শ ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে এবং বিকৃত হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ লে-ফাংগ[19]-এর থেকে শিখতে চায় লোকে তাকে মানসিক রোগী বলবে। কিন্তু পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে কে তাকে মানসিক রোগী বলতো? মানুষের নৈতিক আদর্শের ভীষণ অবনতি হয়েছে। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিদিনই নীচে নেমে যাচ্ছে। লোকেরা শুধু নিজের স্বার্থই দেখছে, এবং নিজের সামান্য লাভের জন্যে অন্যের ক্ষতি করছে, তারা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লড়াই করছে, এবং বাছ-বিচার না করে যত রকম ভাবে সম্ভব দুষ্কর্ম করছে। সবাই চিন্তা কর, এইভাবে কি চলতে দেওয়া যায়? কেউ খারাপ কাজ করলে তুমি যদি তাকে বলো যে সে খারাপ কাজ করছে, সে এসব বিশ্বাস করবে না, সে সত্যিই বিশ্বাস করবে না যে সে নিজে খারাপ কাজ করছে। কিছু লোক নিম্নমুখী নৈতিক আদর্শের দ্বারা নিজেদের বিচার করে। যেহেতু বিচারের সব মাপকাঠি পাল্টে গেছে, সে নিজেকে অন্যদের তুলনায় ভালো মনে করে। মানুষের নৈতিক আদর্শ যতই পাল্টে যাক না কেন, বিশ্বের এই প্রকৃতি কিন্তু পাল্টায়নি, সে ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ সেটা বিচারের এটাই একমাত্র মাপকাঠি। একজন সাধক হিসাবে তার নিজের প্রকৃতিও অবশ্যই বিশ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া উচিত, সাধারণ মানুষের মান অনুযায়ী চললে হবে না। তুমি যদি নিজের মূলে এবং সত্যে পৌঁছাতে চাও এবং সাধনা করে উঁচুতে উঠতে চাও তবে তোমাকে অবশ্যই এই মাপকাঠি অনুযায়ী চলতে হবে। একজন মানুষ হিসাবে তুমি যদি বিশ্বের এই প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতাকে মেনে চলতে পার, তাহলেই তুমি একজন ভালো মানুষ; যদি বিশ্বের এই প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাও, তাহলে তুমি সত্যিই একজন খারাপ মানুষ। কাজের জায়গায় বা সমাজে কিছু লোক তোমাকে হয়তো খারাপ বলতে পারে, কিন্তু তুমি হয়তো সত্যিই খারাপ নও; কিছু লোক তোমাকে ভালো বলল, কিন্তু বাস্তবে তুমি হয়তো ভালো নও। তুমি যদি একজন সাধক হিসাবে বিশ্বের এই প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করে নিতে পার, তবে তোমার তাও প্রাপ্তি হবে, এটা এইরকমই সরল তত্ত্ব।

---

[18]সদ্‌গুণ *(দ্য)* - সদাচার, সুনীতি বা শ্রেয়, এবং এটি মানুষের শরীরে অবস্থিত একটি মূল্যবান সাদা পদার্থ।

[19]লে ফাংগ - চীন দেশে 1960-র দশকে নৈতিকতার পথপ্রদর্শক।

তাও মতের সাধনায় সত্য-করুণা-সহনশীলতার মধ্যে সত্যের সাধনাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেইজন্যে তাও মতে বলা হয়, সত্যের সাধনা দ্বারা তোমার সহজাত প্রকৃতির উন্মেষ ঘটাও, সত্য কথা বলো, সৎ কার্য কর, সত্যনিষ্ঠ মানুষ হও, নিজের মূল সত্যে ফিরে যাও, সবশেষে সাধনার মাধ্যমে সত্যিকারের মানুষ হও। যদিও এর মধ্যে সহনশীলতাও আছে, করুণাও আছে, কিন্তু জোর দেওয়া হয় সত্যের সাধনার উপরে। বুদ্ধ মতে সত্য-করুণা-সহনশীলতার মধ্যে করুণার উপরে বেশী জোর দেওয়া হয়। কারণ করুণার সাধনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির মধ্যে মহৎ করুণাময় হৃদয়ের উদয় হলে সে দেখতে পায় যে, সমস্ত প্রাণসত্তারাই কষ্ট পাচ্ছে। সেইজন্যে একটা ইচ্ছা তার মধ্যে জেগে ওঠে, সে সমস্ত প্রাণসত্তাদের উদ্ধার করতে চায়। যদিও এর মধ্যে সত্যও আছে, সহনশীলতাও আছে, কিন্তু বেশী জোর দেওয়া হয় করুণার সাধনার উপরে। আমাদের ফালুন দাফা-র এই পদ্ধতিতে, বিশ্বের সর্বোচ্চ আদর্শ ----- সত্য, করুণা ও সহনশীলতার একসঙ্গে সাধনা করা হয়, সেইজন্যে আমাদের এই সাধনা খুবই বিশাল।

চিগোংগ হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি

চিগোংগ কী? অনেক চিগোংগ মাস্টার এই ব্যাপারে বললেও, আমি যা বলব সেটা তাঁদের থেকে আলাদা। অনেক চিগোংগ মাস্টার যা বলেন সেটা তাঁদের একটা স্তরের থেকেই বলেন, আমি চিগোংগ-এর তাৎপর্য আরও উঁচু স্তর থেকে বলব, যা তাঁদের ধারণার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিছু চিগোংগ মাস্টার বলেন যে আমাদের দেশে চিগোংগ-এর ইতিহাস দুই হাজার বছরের; আরও কিছু লোক বলেন যে চিগোংগ-এর ইতিহাস তিন হাজার বছরের; কেউ কেউ বলেন যে চিগোংগ-এর ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের, যা প্রায় আমাদের চীনের সভ্যতার সমসাময়িক। আবার কিছু লোক প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারকচিহ্নগুলির উপরে নির্ভর করে বলেন, এর ইতিহাস সাত হাজার বছরের, অর্থাৎ আমাদের চীনের সভ্যতার ইতিহাসের থেকে অনেক বেশী প্রাচীন। কিন্তু যে যেরকমই ধারণা করুক, চিগোংগ মানব সভ্যতার ইতিহাসের থেকে খুব বেশী পূর্বের নয়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী, মানুষের বিকাশ হয়েছে জলজ উদ্ভিদ থেকে জলজ প্রাণীর মধ্যে দিয়ে; এরপরে সে ডাঙ্গায় উঠে এল; এরপরে গাছের উপরে; আবার মাটিতে নেমে

সে বানরে পরিণত হল; সবশেষে বিবর্তিত হয়ে সে চিন্তাশীল এবং সংস্কৃতিযুক্ত আধুনিক মানুষে পরিণত হল, সেই হিসাবে মানব সভ্যতার সত্যিকারের আবির্ভাব 10000 বছরের বেশী নয়। আরও অতীতে গেলে, এমনকী গিঁট বেঁধে কোনো কিছু স্মরণে রাখার প্রচলনও ছিল না। সেই সব লোকেরা গাছের পাতা পোষাক হিসাবে পরত, কাঁচা মাংস খেত; আরও অতীতে, তারা হয়তো আগুনের ব্যবহারও জানত না, তারা একরকম সম্পূর্ণ বন্য এবং আদিম মানুষ ছিল।

কিন্তু আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি, পৃথিবীর অনেক জায়গায় প্রাচীন সভ্যতাগুলির প্রচুর অবশেষ পড়ে রয়েছে, যেগুলো আমাদের মানব সভ্যতার ইতিহাসের থেকে অনেক পূর্বের। এই প্রাগৈতিহাসিক অবশেষগুলি, কারিগরি দক্ষতার দিক দিয়ে দেখলে, খুবই উন্নত মানের; শিল্পকর্মের দিক দিয়ে দেখলে, এগুলোর শৈল্পিক মানও অনেক উন্নত; আধুনিক মানবজাতি কেবলমাত্র প্রাচীন লোকেদের শিল্পকর্মের সবকিছু নকল করে যাচ্ছে, এগুলোর সৌন্দর্যজনিত মূল্যও খুব উঁচু। কিন্তু এগুলো এক লাখেরও বেশী বছর, কয়েক লাখেরও বেশী বছর, কয়েক মিলিয়ন বছর, এমনকী একশ' কোটিরও বেশী বছর পূর্বের অবশেষ। সবাই চিন্তা কর, এগুলো কি আমাদের ইতিহাসকে নিয়ে মজা করা হচ্ছে না? এটা কিন্তু কোনো মজার ব্যাপার নয়, কারণ মানবজাতি নিরন্তর নিজের উন্নতি করে যাচ্ছে এবং নিরন্তর নিজেকে নতুনভাবে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছে, এই ভাবেই মানবসমাজ বিকশিত হচ্ছে, তার প্রথমদিকের জ্ঞান নিশ্চিতভাবে সঠিক নাও হতে পারে।

অনেকেই হয়তো ''প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি''-র কথা শুনেছ যাকে ''প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা''-ও বলা যায়, আমরা এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা নিয়ে বলব। এই পৃথিবীতে আছে এশিয়া, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ওসিয়ানীয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণমেরু, ভূতত্ত্ববিদেরা একত্রে যেগুলোর নাম দিয়েছেন ''মহাদেশীয় ভূখন্ড প্লেট।'' মহাদেশীয় ভূখন্ড প্লেটগুলো তৈরি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত, কোটি কোটি বছর ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে, অনেক ভূখন্ড সমুদ্রের তলদেশ থেকে উপরে উঠে এসেছিল, আবার অনেক ভূখন্ড সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তার পরে এগুলো এই অবস্থায় স্থিতিশীল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি বছর কেটে গেছে।

কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে অনেক জায়গায় প্রাগৈতিহাসিক কিছু উঁচু এবং বিশাল নির্মাণকার্য আবিষ্কৃত হয়েছে, এই প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলির খোদাই এবং ভাস্কর্যের কাজ অতীব সুন্দর, যা আমাদের আধুনিক মানবসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়, সেক্ষেত্রে এগুলি নিশ্চয়ই সমুদ্রতলে ডুবে যাওয়ার পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। তাহলে কোটি কোটি বছর পূর্বে এই সভ্যতা কারা নির্মাণ করেছিল? সেই সময়ে আমাদের মানবজাতি এমনকী বানরও ছিল না। কীভাবে এত উন্নত বুদ্ধিমত্তার জিনিস সৃষ্টি হয়েছিল? প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই পৃথিবীতে একরকম জীবের আবিষ্কার করেছেন, নাম ‘‘ট্রাইলোবাইট,’’ ষাট কোটি বছর পূর্ব থেকে ছাব্বিশ কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত যার অস্তিত্ব ছিল, তারপরে এই জীব ছাব্বিশ কোটি বছর পূর্বে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একজন আমেরিকার বিজ্ঞানী এই ট্রাইলোবাইটের একটা জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন, যার উপরে একজন মানুষের পায়ের ছাপও রয়েছে, ছাপটা যে ফেলেছিল সে পায়ে জুতো পরেছিল, জীবাশ্মের উপরে ছাপটা পরিষ্কার। এটা কি ঐতিহাসিকদের উপহাস করা হচ্ছে না? ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী ছাব্বিশ কোটি বছর আগে মানুষ কীভাবে এসেছিল?

পেরুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে একটা প্রস্তরখন্ড আছে যার উপরে একটা মানুষের প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে, পরীক্ষার পরে নির্ধারিত হয়েছে যে, এই মানুষের প্রতিকৃতিটা তিরিশ হাজার বছর পূর্বে খোদাই করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানুষের প্রতিকৃতিটা জামাকাপড় পরে আছে, সে টুপি-মাথায় এবং পায়ে জুতো পরা অবস্থায় হাতে একটা দূরবিন নিয়ে জোতিষ্ক নিরীক্ষণ করছে। তিরিশ হাজার বছর পূর্বে লোকেরা কীভাবে জামাকাপড় বুনে পরেছিল? আরও অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল এই যে, সে দূরবিন দিয়ে জ্যোতিষ্ক নিরীক্ষণ করছে, অর্থাৎ জ্যোর্তিবিজ্ঞান নিয়েও তার নির্দিষ্ট কিছু জ্ঞান ছিল। আমরা সবসময়েই জেনে এসেছি যে ইউরোপের বাসিন্দা, গ্যালিলীয় দূরবিন উদ্ভাবন করেছিলেন, যার ইতিহাস কেবল তিনশো বছরের বেশী। তাহলে তিরিশ হাজার বছর পূর্বে কে দূরবিন উদ্ভাবন করেছিল? এরকম আরও অনেক রহস্য আছে যেগুলির কোনো সমাধান হয়নি। যেমন ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, আল্পস-এর অনেক গুহায় পাথরের ফলকের উপরে খোদাই করা অনেক চিত্রের আবিষ্কার হয়েছে, যেগুলো খুবই প্রাণবন্ত এবং বাস্তবধর্মী, খোদাই করা মানুষের প্রতিকৃতিগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং কোনো খনিজ রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রঙ করা, কিন্তু এইসব প্রতিকৃতিতে লোকেরা আধুনিক পোষাক পরে আছে,

কিছুটা যেন পশ্চিমী স্যুট এর মতো, আর টাইট প্যান্ট পরে আছে, কেউ ধূমপানের পাইপের মতো কিছু ধরে আছে, কেউ বেড়ানোর লাঠি ধরে আছে এবং টুপি পরে আছে। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে কীভাবে বানররা এরকম উন্নত শিল্পকলার স্তরে পৌঁছেছিল?

আরও প্রাচীনকালের কথা বলা যেতে পারে, আফ্রিকাতে গাবন প্রজাতন্ত্রে ইউরেনিয়াম আকরিক পাওয়া যায়। এই দেশটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাদের ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করার ক্ষমতা নেই, তারা উন্নত দেশগুলিকে এই আকরিক রপ্তানি করে। 1972 সালে ফ্রান্সের একটা কারখানা এই আকরিক আমদানি করেছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে এই সব ইউরেনিয়াম আকরিক ইতিমধ্যে নিষ্কাশন করে ব্যবহার করা হয়ে গেছে। খুব অদ্ভুত মনে হওয়ায় তারা বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের পাঠালো অনুসন্ধান করার জন্যে, অন্যান্য অনেক দেশের বিজ্ঞানীরাও গেলেন অনুসন্ধানের জন্যে। সবশেষে এটা প্রমাণিত হল যে ইউরেনিয়াম খনিটা হচ্ছে একটা বড়ো মাপের নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর, যার পরিকল্পনাটা ছিল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, আমাদের এখনকার লোকেরা সম্ভবত এটা নির্মাণ করতে পারবে না। তাহলে কবে এটার নির্মাণ হয়েছিল? এটার নির্মাণ হয়েছিল দুশো কোটি বছর আগে এবং সক্রিয় ছিল পাঁচ লক্ষ বছর ধরে। এটা একেবারে নক্ষত্রের দূরত্বের মতো বিশাল সংখ্যা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ একেবারেই এর ব্যাখ্যা করতে পারে না, এইরকম উদাহরণ সত্যিই প্রচুর আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ সমুদায় যা যা জিনিস আবিষ্কার করেছেন তা আমাদের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে পাল্টে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একবার মানবজাতি পুরানো ধ্যানধারণা অনুযায়ী, একটা নির্দিষ্ট প্রণালীতে কাজকর্ম করাকে এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চিন্তাভাবনা করাকে, স্বভাবজাত করে ফেললে তাদের পক্ষে নতুন ধারণা গ্রহণ করা খুব কঠিন। যখন সত্যটা সামনে আসে তখন তারা সেটা গ্রহণ করতে সাহস পায় না, আর স্বভাববশত সেটাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। চিরাচরিত ধারণার প্রভাবে এখনও কেউই এই জিনিসগুলোকে সঠিক প্রণালীতে সংকলিত করেনি, সেইজন্যে মানুষের ধ্যান-ধারণাগুলো সবসময়েই তার বিকাশের থেকে পিছনে রয়ে গেছে। এই জিনিসগুলো ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি, সেইজন্যে তুমি যখনই এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে উল্লেখ করবে, তখনই কিছু লোক এগুলোকে কুসংস্কার বলবে, এবং স্বীকার করবে না।

বিদেশে অনেক সাহসী বিজ্ঞানী ইতিমধ্যে সর্বসমক্ষে স্বীকার করে বলেছেন যে এগুলো এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি এবং আমাদের এই মানব সভ্যতারও পূর্বের সভ্যতা। অর্থাৎ আমাদের এই সভ্যতার পূর্বে আরও সভ্যতার পর্ব বিদ্যমান ছিল এবং একটার বেশীই ছিল। খনন কার্যের দ্বারা প্রাপ্ত অবশেষগুলো থেকে দেখা গেছে যে এই বস্তুগুলো কোনো একটা সভ্যতার নয়। সেইজন্যে এটা বিশ্বাস করা যায় যে, মানবজাতির সভ্যতাগুলোতে প্রত্যেকবার ধ্বংসের আঘাত সহ্য করার পরে শুধু অল্পসংখ্যক লোক বেঁচে থাকত আর আদিম জীবনযাপন করত। তারপরে ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে নতুন মানবজাতির উদয় হতো এবং নতুন মানব সভ্যতা আরম্ভ হতো। পরবর্তীকালে তারা আবার ধ্বংসের সম্মুখীন হতো এবং আবার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে নতুন মানবজাতির উদয় হতো। এইভাবে মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, এক-একটা পর্যায়ের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। ভৌতবিজ্ঞানীরা বলেন যে পদার্থের গতির কিছু নিয়ম আছে, আমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বের পরিবর্তনেরও কিছু নিয়ম আছে।

এটা অসম্ভব যে আমাদের গতিশীল পৃথিবী গ্রহটি, এই বিশাল বিশ্বের আবর্তিত ছায়াপথের মধ্যে সবসময়ে মসৃণভাবে পাড়ি দিয়ে এসেছে, খুব সম্ভবত কোনো একটা গ্রহকে ধাক্কা মেরেছিল, অথবা অন্য কোনো সমস্যায় পড়েছিল, সেইসময়ে এক ঘোর প্রলয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। যদি আমরা অলৌকিক ক্ষমতার দিক দিয়ে দেখি, পরিকল্পনাটা ঠিক এইরকমই ছিল। আমি একবার সযত্নে অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম যে মানব সভ্যতার সম্পূর্ণ বিনাশকারী পরিস্থিতি একাশি বার ঘটেছে। প্রত্যেকবার শুধু অল্প কিছু লোক বেঁচে থাকত, এবং পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সামান্য কিছু অবশেষ পড়ে থাকত। এই নিয়ে পরবর্তী পর্বের সূচনা হতো এবং লোকেরা আদিম জীবনযাপন করত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হতে থাকত, সবশেষে আবার সভ্যতার উদয় হতো। এইরকম পর্যায়কালীন পরিবর্তন একাশি বার ঘটেছে, তাও আমি শেষ পর্যন্ত এর অনুসন্ধান করিনি। চীনের লোকেরা মহাজাগতিক সময়কাল, পৃথিবীর অনুকূল পরিস্থিতি, মানবজাতির সমন্বয় নিয়ে বলে থাকে। বিভিন্ন ধরনের মহাজাগতিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন মহাজাগতিক সময়কাল, সাধারণ মানবসমাজে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আসে। পদার্থ বিজ্ঞানে বলা হয় যে পদার্থের গতির নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, বিশ্বের গতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে উপরোক্ত বক্তব্যগুলির মাধ্যমে আমি সবাইকে প্রধানত এটাই বলতে চাই: আমাদের আজকের মানুষ চিগোংগ-এর উদ্ভাবন করেনি, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এটা হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে এবং এটাও এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি। বৌদ্ধশাস্ত্রে খোঁজ করলে এর কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। শাক্যমুনি তাঁর সময়ে বলেছিলেন যে তাঁর সাধনায় আলোকপ্রাপ্তি হয়েছিল কয়েকশ' মিলিয়ন কল্প[20] আগে। একটা কল্পতে কতগুলো বছর হয়? একটা কল্পতে আছে কয়েকশ' মিলিয়ন বছর, যা একটা বিশাল সংখ্যা এবং একেবারে ধারণার অতীত। যদি এটা সত্য হয় তাহলে এটা মানবজাতির ইতিহাস এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকটা একমত হচ্ছে না কি? এর উপরে, শাক্যমুনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর পূর্বে আরও ছয়জন আদিম বুদ্ধ ছিলেন, তাঁরও মাস্টার ছিলেন, ইত্যাদি। এঁরা সবাই কয়েকশ' মিলিয়ন কল্প পূর্বে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। যদি এইসব ব্যাপারগুলো সবই সত্যি হয়, তাহলে আমাদের আজকের সমাজে যেসব সত্যিকারের প্রথাসম্মত এবং সঠিকভাবে হস্তান্তরিত হওয়া চিগোংগ পদ্ধতিগুলো প্রচারিত আছে, সেগুলোর মধ্যে এইরকম সাধনা পদ্ধতি আছে কি? যদি আমাকে উত্তর দিতে বলো, তাহলে বলব অবশ্যই আছে, কিন্তু কমই দেখা যায়। আজকাল ভন্ড চিগোংগ, নকল চিগোংগ, এবং কোনো সত্তা ভর করা লোকজনেরা, ইচ্ছামতো কিছু জিনিস বানিয়ে মানুষকে ঠকাচ্ছে। এরা সত্যিকারের চিগোংগ-এর থেকে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী। নকল থেকে সত্যকে আলাদা করা কঠিন। সত্যিকারের চিগোংগ-কে পৃথক করা খুব সহজ নয় এবং খুঁজে পাওয়াও খুব সহজ নয়।

বস্তুত, শুধুমাত্র যে চিগোংগ-ই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে তা নয়, তাইজি[21], হেতু, লুয়ো শু[22], পরিবর্তনের বই[23], আট

---

[20]কল্প - দুশো কোটি বছর ব্যাপী একটা সময়কাল; এখানে এই শব্দটি সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

[21]তাইজি - তাও মতের প্রতীক যা পশ্চিমী দুনিয়াতে য়িন-য়িয়াংগ চিহ্ন হিসাবে পরিচিত।

[22]হেতু, লুয়ো শু - প্রাগৈতিহাসিক সব রেখাচিত্র যা প্রাচীন চীন দেশে আবির্ভূত হয়েছিল এবং মনে করা হতো এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতির পরিবর্তন নির্ণয় করা যায়।

তিন-আকৃতি[24], ইত্যাদি সবই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। সেইজন্যে যদি আজ আমরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে একে অধ্যয়ন করি, একে জানতে চাই, তাহলে যেভাবেই অধ্যয়ন করি না কেন, কোনোভাবেই একে বুঝতে পারব না। সাধারণ মানুষের এই স্তর, এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই মানসিকতার দ্বারা সত্যিকারের জিনিস বুঝতে পারা যাবে না।

চিগোংগ হচ্ছে সাধনা

যেহেতু চিগোংগ-এর ইতিহাস অতি প্রাচীন, এর ঠিক প্রয়োজনটা কোথায়? আমি সবাইকে বলব যে, আমরা যেহেতু এই বুদ্ধ মতের মহান সাধনা অনুশীলন করি, আমাদের সাধনা অবশ্যই বুদ্ধ হওয়ার জন্যে, সেইভাবে তাও মতের সাধনাও অবশ্যই তাও প্রাপ্তির জন্যে। আমি সবাইকে বলতে চাই যে ''বুদ্ধ'' কোনো অন্ধবিশ্বাস নয়, এই বুদ্ধ শব্দটা এসেছে সংস্কৃত থেকে, যা একটা প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। যখন এটা চীনে প্রচলন করা হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে দুটো শব্দ ছিল, বলা হতো ''ফো থুয়ো,''[25] আবার কেউ কেউ এটাকে ''ফু-থু'' হিসাবে অনুবাদ করেছিল। যত এর প্রচার হতে থাকল, আমাদের চীনের লোকেরা একটা শব্দ বাদ দিয়ে দিল, নাম দেওয়া হল ''ফো।'' যদি চীনা ভাষায় এর অনুবাদ করা হয় সেক্ষেত্রে এর অর্থটা কী? এর অর্থ হচ্ছে আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি সাধনার মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস কোথায় আছে?

সবাই চিন্তা কর, সাধনার দ্বারা একজন ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে 'ছ'টা অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকৃত আছে, কিন্তু এই কয়েকটাতেই সীমাবদ্ধ নয়। আমি বলব, সত্যিকারের অলৌকিক ক্ষমতা দশ হাজারেরও বেশী আছে। একজন ব্যক্তি এখানে বসে আছেন, তিনি হাত-পা না নাড়িয়ে যে কাজ করতে পারবেন, অন্যেরা

---

[23] পরিবর্তনের বই - প্রাচীন চীন দেশে, ঝউ রাজবংশের সময়কালে (1100 b.c.–221 b.c.) ঐশ্বরিক বিষয়ের উপরে রচিত এক প্রাচীন পুঁথি।

[24] আট তিন-আকৃতি - পরিবর্তনের বই-এর এক প্রাগৈতিহাসিক রেখাচিত্র, এটি প্রকৃতির পরিবর্তনের সময়কে প্রকাশ করে, এইরকম মনে করা হয়।

[25] ফো থুয়ো - চীনা ভাষায় বুদ্ধ শব্দটির প্রচলিত শব্দ।

হাত-পা সব নাড়িয়েও সেটা করতে পারবে না। এই বিশ্বের প্রত্যেকটা মাত্রার সত্যিকারের নিয়মগুলি তিনি দেখতে পারেন, এই বিশ্বের আসল সত্যটা তিনি দেখতে পারেন, সাধারণ মানুষ যেসব জিনিস দেখতে পারেন না, সেগুলোও তিনি দেখতে পারেন। তাহলে তিনিই কি সাধনার মাধ্যমে তাও প্রাপ্ত হলেন না? তিনি কি একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি নন? তাঁকে কি একজন সাধারণ মানুষের সমান মনে করা হবে? তিনিই কি সাধনার মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্ত হলেন না? তাঁকে কি একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলা ঠিক হবে না? প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হলে এঁকেই বলা হয় ''বুদ্ধ।'' বাস্তবে এটা এইরকমই, এই কাজের জন্যেই চিগোংগ-এর প্রয়োজন।

চিগোংগ-এর প্রসঙ্গ উঠলে কিছু লোক বলে: ''রোগ না থাকলে কে চিগোংগ অনুশীলন করবে?'' এর অর্থ চিগোংগ শুধু রোগ নিরাময়ের জন্যে, সেটা খুবই ভাসা-ভাসা এবং অগভীর ধারণা। কিন্তু এর জন্যে এই লোকগুলোকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ অনেক চিগোংগ মাস্টার শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ রাখা, এই সব ব্যাপার নিয়েই বলে থাকে, তাদের সব বক্তব্য শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, কেউই উঁচুস্তরের কোনো কিছু শেখায় না। আমি এটা বলছি না যে তাদের অনুশীলন পদ্ধতিগুলো খারাপ, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই স্তরের জিনিসগুলো শেখানো যাতে রোগ নিরাময় হয় ও শরীর সুস্থ থাকে; এবং সর্বসাধারণের মধ্যে চিগোংগ-এর প্রচার করা। অনেক লোক আছে যারা উঁচু স্তরের সাধনা করতে চায়। তাদের এইরকমের ভাবনা ও ইচ্ছা আছে, কিন্তু তারা সঠিক সাধনা পায় না, এর ফলে অনেক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয় এবং অনেক সমস্যারও উদয় হয়। অবশ্য উঁচু স্তরের চিগোংগ শেখানোর ক্ষেত্রে অনেক উচ্চতর বিষয় এসে যায়। সেইজন্যে আমরা সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছি, সামগ্রিকভাবে চিগোংগ-এর প্রচারের ফল ভালোই হয়েছে। কিছু জিনিস শেখানো হয়েছে যা সত্যিই খুব উঁচু ধরনের, যেগুলোকে আলোচনার সময় অন্ধবিশ্বাস মনে হতে পারে, তবে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে যথাসাধ্য ব্যবহার করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেছি।

কিছু জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে আমরা বললেই, কেউ কেউ বলবে এগুলো অন্ধবিশ্বাস। এটা কেন? তাদের বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে, যা বিজ্ঞান স্বীকার করেনি, যার সংস্পর্শে তারা আসেনি, অথবা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যা থাকা সম্ভব নয়, এই সবকিছুকেই তারা অন্ধবিশ্বাস এবং

কাল্পনিক মনে করে, তাদের এইরকমই চিন্তাধারা। এইরকম চিন্তাধারা কি ঠিক? যা বিজ্ঞান জানতে পারেনি, অথবা যেখানে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি, সেগুলোকে অন্ধবিশ্বাস বলা কি ঠিক? সেগুলো কি কাল্পনিক? এইসব লোকেরা নিজেরাই কি অন্ধবিশ্বাস এবং কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না? এই ধরনের মানসিকতা দিয়ে বিজ্ঞানের বিকাশ এবং অগ্রগতি হতে পারবে কি? এই মানবসমাজও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। আমাদের বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ সমুদায় যা কিছু জিনিস উদ্ভাবন করেছেন, সেসবই অতীতের লোকেদের কাছে অজানা ছিল। যদি সেগুলোকে অন্ধবিশ্বাস মনে করা হতো তাহলে অবশ্যই সেগুলোর বিকাশের প্রয়োজন হতো না। চিগোংগ কোনো কাল্পনিক জিনিস নয়, অনেক লোক আছে যারা চিগোংগকে বুঝতে না পেরে সবসময়েই এটাকে কাল্পনিক মনে করে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একজন চিগোংগ মাস্টারের শরীর পরীক্ষা করে ইনফ্রাসোনিক তরঙ্গ, আলট্রাসোনিক তরঙ্গ, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, ইনফ্রারেড রশ্মি, আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি, গামা রশ্মি, নিউট্রন, পরমাণু, কণামাত্রিক ধাতু উপাদান ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এগুলোর সবই পদার্থের অস্তিত্বের ব্যাপার নয় কি? এগুলো পদার্থই, যে কোনো জিনিসই পদার্থ দিয়েই কি তৈরি নয়? অন্য সময়-মাত্রাগুলিও কি পদার্থ দিয়েই নির্মিত নয়? এগুলোকে কীভাবে অন্ধবিশ্বাস বলা যাবে? যেহেতু চিগোংগ সাধনা দ্বারা বুদ্ধ হওয়া যায়, সেখানে অবশ্যই অনেক অতিগভীর বিষয় জড়িয়ে থাকবে, আমরা সবই ব্যাখ্যা করব।

যেহেতু চিগোংগ এই উদ্দেশ্য সাধন করে, তাহলে আমরা একে চিগোংগ বলি কেন? বস্তুত একে চিগোংগ বলা যায় না। এটাকে কী বলে? এটাকে বলে ‘‘সাধনা,’’ এটা শুধুই সাধনা। অবশ্য এর অন্য বিশেষ কিছু নামও আছে, কিন্তু সাধারণত সাধনাই বলা হয়। তাহলে চিগোংগ বলে কেন? সবাই জান যে আমাদের সমাজে জনসাধারণের মধ্যে চিগোংগ-এর প্রচারিত হওয়ার ইতিহাস কুড়ি বছরের বেশী। এটা শুরু হয়েছিল ‘‘মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব’’ [26] এর মাঝামাঝি সময় থেকে, যা পরবর্তীকালে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছিল। সবাই চিন্তা কর, বামপন্থী ভাবাদর্শ সেইসময়ে অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমরা চিগোংগ-এর প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির সময়ের নাম উল্লেখ করব না। আমাদের এই পর্যায়ের মানব

[26]মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব - এক বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন যা চীন দেশের প্রথাগত নৈতিক মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির নিন্দা করেছিল (1966–1976)।

সভ্যতার বিকাশক্রমে, একে একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল, সেইজন্যে চিগোংগ-এর নামকরণে প্রায়ই সামন্ততান্ত্রিক রঙের প্রভাব বেশী থাকত। আবার যেগুলো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেগুলোর নামকরণে প্রায়ই ধার্মিক রঙের প্রভাব বেশী থাকত। যেমন: ‘‘তাও-এর মহান সাধনা পথ,’’ ‘‘বজ্র-এর ধ্যান,’’ ‘‘অর্হৎ[27]-এর পথ,’’ ‘‘বৌদ্ধ ধর্মের মহান সাধনা পথ,’’ ‘‘নবম আবর্তনযুক্ত আভ্যন্তরীণ রসায়ন,’’ এইরকম সব নাম ছিল। যদি তুমি মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব-এর সময়ে এই সব নাম ব্যবহার করতে, তাহলে প্রকাশ্যে তোমার নিন্দা এবং সমালোচনা করা হতো না কি? যদিও চিগোংগ-কে জনপ্রিয় করার জন্যে চিগোংগ মাস্টারদের ইচ্ছাটা ভালো ছিল। তাঁরা এই বিশাল সংখ্যক জনগণের রোগ নিরাময় করে তাদের শরীর সুস্থ করতে চেয়েছিলেন এবং মানুষের শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। এটা কত ভালো ব্যাপার ছিল, কিন্তু সেটা তাঁরা করতে পারছিলেন না। লোকেদের এই ধরনের নামগুলি ব্যবহার করতে সাহস-ই হচ্ছিল না। সেইজন্যে চিগোংগ-কে জনপ্রিয় করার জন্যে অনেক চিগোংগ মাস্টার *দ্যান জিংগ* এবং *তাও জাংগ*[28] এই বইগুলোর থেকে দুটো শব্দ তুলে নিয়ে নাম দিলেন ‘চিগোংগ’। কিছু লোক এই চিগোংগ নামের ভিতরে খোঁজ করতে গিয়ে গবেষণাও করে, কিন্তু এতে গবেষণার কিছু নেই, অতীতে একে বলা হতো সাধনা। চিগোংগ শুধু আধুনিক মানুষদের ভাবাদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাখা নতুন নাম মাত্র, এর বেশী কিছু নয়।

অনুশীলনের সাথে সাথে কেন গোংগ বৃদ্ধি হচ্ছে না?

অনুশীলনের সাথে সাথে কেন গোংগ বৃদ্ধি হচ্ছে না? বেশ কিছু লোক আছে যারা এইরকম চিন্তা করে: আমি সাধনার জন্যে সত্যিকারের শিক্ষা পাইনি, যদি কোনো মাস্টার আমাকে কিছু বিশেষ কৌশল শেখান এবং বিশেষ কিছু উন্নত প্রক্রিয়া শেখান তাহলে আমার গোংগ বৃদ্ধি হবে। আজকাল পঁচানব্বই ভাগ লোক এইরকম চিন্তা করে, আমার খুব হাস্যকর মনে হয়। কেন হাস্যকর মনে হয়? কারণ চিগোংগ কোনো সাধারণ

---

[27] অর্হৎ - একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তা, বুদ্ধ মত অনুযায়ী যাঁর সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান, বোধিসত্ত্ব-এর নীচে।

[28] *দ্যান জিংগ* , *তাও জাংগ* - চীন দেশের সাধনার জন্যে সাহিত্য বা গ্রন্থ।

মানুষদের পারদর্শিতার ব্যাপার নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে একরকম অসাধারণ জিনিস। সেইজন্যে একে বিচার করতে হলে, অবশ্যই উচ্চস্তরের নিয়মাবলি প্রয়োগ করতে হবে। আমি সবাইকে বলতে চাই যে, গোংগ বৃদ্ধি না পাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ‘‘সাধনা’’ এবং ‘‘অনুশীলন’’ এই দুটো শব্দের মধ্যে, লোকেরা সাধনার দিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধু শরীরের অনুশীলনের দিকে মনোযোগ দেয়। তুমি যদি তোমার বাইরের দিকে এর খোঁজ কর, কোনোভাবেই এর নাগাল পাবে না। তোমার একটা সাধারণ মানুষের শরীর, সাধারণ মানুষের হাত, সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা, এসবের দ্বারা, তুমি কি মনে কর, উচ্চশক্তির পদার্থগুলিকে গোংগ-এ রূপান্তরিত করতে পারবে? গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে কি? এটা কি এতই সহজ ব্যাপার! আমার মতে এটা একটা তামাসা মাত্র। এটা ঠিক যেন বাইরের জগতে কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করা এবং বাইরের জগতে কোনো কিছুর খোঁজ করা, তুমি কোনোদিনই এর খোঁজ পাবে না।

এটা ঠিক সাধারণ লোকেদের কোনো পারদর্শিতার ব্যাপার নয় যে, তুমি কিছু টাকাপয়সা খরচ করে, কিছু কলাকৌশল শিখে একজন দক্ষ ব্যক্তি হয়ে গেলে, এটা কিন্তু সেইরকম ব্যাপার নয়। এটা সাধারণ লোকের স্তর ছাড়িয়ে আরও উপরের ব্যাপার। সেইজন্যে তোমার দিক দিয়ে উচ্চস্তরের নিয়মাবলি প্রয়োগ করা আবশ্যক। তোমার দিক দিয়ে কী করা প্রয়োজন? তোমাকে অবশ্যই নিজের অন্তরের দিকে সাধনা করতে হবে, বাইরের দিকে খোঁজ করলে হবে না। অনেক লোক বাইরের জগতে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে, আজ এটার পিছনে ছোটে, কাল সেটার পিছনে ছোটে, এর উপরে তারা আসক্তির সঙ্গে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে, তারা বিভিন্ন ধরনের সব উদ্দেশ্য বয়ে বেড়ায়। কিছু লোক চিগোংগ মাস্টার হতে চায় এবং লোকেদের রোগ নিরাময় করে ধনী হতে চায়! প্রকৃত সাধনার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই তোমার মনের সাধনা করতে হবে, একেই বলে চরিত্রের সাধনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের বাদ-বিবাদের সময়ে ব্যক্তিগত সব আবেগ, এবং বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কিছুটা উদাসীন ভাব রাখতে হবে। যখন তুমি ব্যক্তিগত লাভের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছ, তখন গোংগ বৃদ্ধি করতে চাইছ, এটা কি এতই সহজ! তুমি কি ঠিক সাধারণ মানুষের মতনই রয়ে গেলে না? তোমার গোংগ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে? সেইজন্যে একমাত্র চরিত্রের সাধনার উপরে জোর দিলে তবেই তোমার গোংগ বৃদ্ধি পাবে, তবেই তোমার স্তরের উত্তরণ হবে।

চরিত্র কী? চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত আছে সদ্‌গুণ (এক রকমের পদার্থ); আছে সহনশীলতা; আছে আলোকপ্রাপ্তির গুণ; আছে ত্যাগ, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের আসক্তি ত্যাগ করা; এছাড়া অবশ্যই কষ্ট সহ্য করতে পারবে ইত্যাদি, এর সঙ্গে অনেক দিকের জিনিস জড়িয়ে আছে। মানব চরিত্রের সমস্ত দিকেরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক, একমাত্র তাহলেই তোমার সত্যি সত্যি উত্তরণ হবে, তোমার গোংগ সামর্থ্য (গোংগ লি) উন্নত করার ক্ষেত্রে এটা একটা প্রধান কারণ।

কেউ কেউ ভাবে ''আপনার বলা চরিত্রের বিষয়টা একটা ভাবাদর্শগত ব্যাপার, মানুষের চিন্তার জগতের ব্যাপার। চরিত্র এবং সাধনাজাত গোংগ একই ব্যাপার নয়।'' কেন এই দুটো একই ব্যাপার নয়? পদার্থ আগে না মন আগে, এই প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিক জগতে বহুকাল ধরে সবসময়েই আলোচনা ও বাকবিতন্ডা হয়ে আসছে। বস্তুত আমি সবাইকে বলতে চাই যে পদার্থ আর মন এই দুটো একই ব্যাপার। মানব শরীরের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে এখনকার বিজ্ঞানীদের এই ধারণা হয়েছে যে মানুষের মস্তিষ্ক থেকে যে চিন্তা নির্গত হয় সেটা একটা বস্তু। সেক্ষেত্রে চিন্তা একটা অস্তিত্বশীল বস্তু, অতএব এটা মানুষের মনেরই জিনিস নয় কি? তাহলে এই দুটো জিনিস কি একই হল না? ঠিক যেন আমার বর্ণনা করা বিশ্বের মতন, এতে পদার্থের অস্তিত্ব যেমন আছে, সেইরকম একই সাথে এর প্রকৃতিরও অস্তিত্ব আছে। এই বিশ্বের প্রকৃতি হচ্ছে সত্য-করুণা-সহনশীলতা, সাধারণ মানুষ এর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না, কারণ সমস্ত সাধারণ মানুষ এই একটা স্তরে আছে। সাধারণ মানুষদের এই স্তর পেরিয়ে উপরে উঠলেই তুমি এর খোঁজ পাবে। তুমি কীভাবে এর খোঁজ করবে? এই বিশ্বের সব পদার্থ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেই সমস্ত পদার্থও, যেগুলো এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সেই বস্তুগুলো সবই জীবিত সত্তা, তাদের সবারই চিন্তাশীল মন আছে, তারা এই বিশ্বের ফা-এরই বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্বের রূপ। তারা তোমাকে উপরে উঠতে দেবে না, তুমি উপরে উঠতে চাইছ কিন্তু উপরে উঠতে পারছ না, অর্থাৎ তারা তোমাকে উপরের দিকে যেতে দেবে না। তোমাকে কেন উপরে উঠতে দেবে না? কারণ তোমার চরিত্র এখনও উন্নত হয়নি। প্রত্যেকটা স্তরের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি আছে। তুমি যদি উঁচু স্তরে উঠতে চাও, তোমাকে অবশ্যই মনের খারাপ চিন্তাগুলোকে ত্যাগ করতে হবে, তোমার মনের নোংরা জিনিসগুলোকে দূর করতে হবে, এবং নিজেকে সেই স্তরের

প্রয়োজনীয় মানের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হবে, একমাত্র এইভাবেই তুমি উপরে উঠতে পারবে।

তোমার চরিত্রের উন্নতি হলে, তোমার শরীরের বিরাট পরিবর্তন ঘটবে; তোমার চরিত্রের উন্নতি হওয়ার ফলে, তোমার শরীরের পদার্থগুলোর নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন হবে। কী পরিবর্তন হবে? তুমি আসক্তির সঙ্গে যেসব খারাপ জিনিসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছিলে, সেগুলোকে তুমি ছুঁড়ে ফেলবে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একটা বোতলে নোংরা জিনিস দিয়ে ভর্তি করে এর ছিপিটা খুব শক্ত করে পেঁচিয়ে আটকে দিয়ে, জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেল, বোতলটা একেবারে জলের নীচে ডুবে যাবে। তুমি নোংরা জিনিস বের করতে থাক, যত তুমি বের করতে থাকবে, তত বোতলটা আরও উপরে ভাসতে থাকবে, তুমি সমস্ত জিনিস বের করে দিলে বোতলটা পুরোপুরি জলের উপর ভাসতে থাকবে। আমাদের এই সাধনার পর্বে, শরীরে অবস্থিত নানা ধরনের খারাপ জিনিসগুলোকে দূর করে ফেলতে হবে, তবেই তুমি উপরে উঠতে থাকবে, এই বিশ্বের প্রকৃতি এই ভাবেই কাজ করে। যদি তুমি তোমার চরিত্রের সাধনা না কর, তোমার নৈতিক আদর্শকে উঁচু না কর, খারাপ চিন্তা আর খারাপ জিনিসগুলোকে দূর না কর, তাহলে এই প্রকৃতি তোমাকে উপরে উঠতে দেবে না। অতএব কীভাবে তুমি বলবে যে পদার্থ ও মন একই জিনিস নয়? একটা হাসির কথা বলা যাক, যদি একজন ব্যক্তিকে তার সাধারণ লোকেদের মতো সব রকমের আবেগ ও ইচ্ছা সমেত উপরে উঠতে দেওয়া হয়, আর সে একজন বুদ্ধ হয়ে যায়। তোমরা চিন্তা কর, এটা কি সম্ভব? তার হয়তো একজন মহান বোধিসত্ত্ব[29]কে দেখে খুব সুন্দর মনে হয় এবং মনে বদ্‌চিন্তা জেগে ওঠে। যেহেতু তার ঈর্ষা দূর হয়নি, সে একজন বুদ্ধের সঙ্গে বিবাদ শুরু করে দেয়। সেখানে এইরকম ব্যাপার ঘটতে দেওয়া যাবে কি? তাহলে কী করা উচিত? তুমি সাধারণ লোকেদের মধ্যে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের খারাপ চিন্তাগুলিকে অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে দূর করবে, একমাত্র তাহলেই তুমি উপরে উঠতে পারবে।

অর্থাৎ এটাই বলা যায় যে, তোমাকে চরিত্রের সাধনার উপরে জোর দিতে হবে, তোমাকে এই বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতা অনুযায়ী

---

[29] বোধিসত্ত্ব - বুদ্ধ মতের একজন আলোকপ্রাপ্তসত্তার সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান, অর্হৎ-এর থেকে উচ্চস্তরে কিন্তু একজন তথাগতর থেকে নিম্নস্তরে।

সাধনা করতে হবে, তোমাকে সাধারণ লোকেদের আকাঙ্ক্ষা, কুচিন্তা, কুকর্মের প্রবৃত্তি দূর করতে হবে। এমনকী তোমার চিন্তার স্তরের সামান্য উন্নতির সাথে সাথে তোমার নিজের শরীরের কিছুটা খারাপ জিনিস দূর হতে থাকবে। একই সাথে তুমি অবশ্যই কিছুটা কষ্ট সহ্য করবে, একটু কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করবে, এর ফলে তোমার নিজের কর্মও কিছুটা দূর হবে, তাহলে তুমিও কিছুটা উপরে উঠতে পারবে। এর অর্থ, এই বিশ্বের প্রকৃতি তোমাকে অতটা বেশী বাধা আর দেবে না। সাধনা তোমার নিজের ব্যাপার এবং গোংগ তোমার মাস্টারের ব্যাপার। মাস্টার তোমাকে গোংগ বাড়ানোর জন্যে একরকম গোংগ দিয়েছেন, এই গোংগ কাজ করতে থাকে এবং তোমার শরীরের বাইরে যে সদ্‌গুণ থাকে, যা একরকমের পদার্থ, তাকে গোংগ-এ বিবর্তিত করে। তুমি নিরন্তর নিজেকে উন্নত করতে থাকলে, নিরন্তর সাধনায় উপরে উঠতে থাকলে, তোমার গোংগ স্তম্ভও, নিরন্তর বাধা ভেঙ্গে উপরে উঠতে থাকবে। একজন সাধক হিসাবে, তুমি অবশ্যই সাধারণ লোকেদের বাতাবরণের মধ্যেই নিজের সাধনা করবে, নিজেকে দৃঢ় করবে, ধীরে ধীরে আসক্তিগুলোকে এবং নানান ধরনের ইচ্ছাগুলোকে ত্যাগ করবে। আমাদের মানবজাতি সাধারণত যে জিনিসগুলোকে ভালো মনে করে, উচ্চস্তরের দিক দিয়ে দেখলে সেগুলি সাধারণত খারাপ। সেইজন্যে লোকেদের বিবেচনায় যা ভালো সেটা হচ্ছে, একজন ব্যক্তি সাধারণ মানুষদের মধ্যে কতটা বেশী করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারছে, অথবা কতটা ভালোভাবে জীবন কাটাতে পারছে, কিন্তু মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের দিক দিয়ে দেখলে সে ততটাই খারাপ। এখানে খারাপের কী আছে? সে যত বেশী পাবে ততই সে অন্যের ক্ষতি করবে, সে সেই জিনিসটা পাবে যা তার পাওয়া উচিত নয়, সে খ্যাতি এবং লাভের দিকে নজর দেবে, সেইজন্যে তার সদ্‌গুণ খোয়া যাবে। তুমি তোমার গোংগ বৃদ্ধি করতে চাইছ, কিন্তু তুমি তোমার চরিত্রের সাধনার দিকে মনোযোগ না দিলে, তোমার গোংগ একেবারেই বৃদ্ধি পাবে না।

আমাদের সাধক সমাজে প্রচলিত আছে যে মানুষের মূল আত্মার বিনাশ নেই, কিছুদিন পূর্বেও মানুষের মূল আত্মা নিয়ে আলোচনা করাকে লোকেরা অন্ধবিশ্বাস মনে করত। সবাই জান যে মানুষের শরীরে ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা পাওয়া গেছে অণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, এবং এরও পরে গবেষণা করে পাওয়া গেছে কোয়ার্ক, নিউট্রিনো ইত্যাদি। এর পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আর কিছু দেখা যাবে না। কিন্তু এগুলো জীবনের মূল থেকে এবং পদার্থের মূল থেকে আরও অনেক দূরে। প্রত্যেকেই জান

যে নিউক্লিয়াসের বিদারণের সময়ে সংঘর্ষ ঘটানোর জন্যে প্রচন্ড পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, এবং নিউক্লিয়াসের সংযোজন ও বিদারণের জন্যে প্রচুর পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন। মানুষের মৃত্যু হলে মানুষের শরীরের পারমাণবিক নিউক্লিয়াস সমূহ কীভাবে সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হবে? সেইজন্যে আমরা দেখেছি যখন মানুষ মারা যায়, তখন কেবল এই মাত্রার শরীরের অংশগুলি যা সবচেয়ে বড়ো অণুর স্তর, সেগুলি সব খসে খসে পড়ে, অথচ অন্য মাত্রার শরীরগুলি ধ্বংস হয় না। সবাই একটু চিন্তা কর, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে আমাদের শরীরটাকে দেখতে কেমন লাগবে? মানুষের সম্পূর্ণ শরীরটা যেন গতিশীল, তুমি এখানে স্থির হয়ে বসে আছ, কিন্তু তোমার সম্পূর্ণ শরীরটা যেন গতিশীল, আণবিক কোষ সমূহও গতিশীল, সম্পূর্ণ শরীরটা শিথিল, যেন বালির দানা দিয়ে তৈরি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে মানুষের শরীরটা ঠিক এইরকম দেখতে, আমরা খালি চোখে মানুষের শরীরকে যেরকম দেখি, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ এই একজোড়া মানুষের চোখ তোমার জন্যে একটা কৃত্রিম ছবি সৃষ্টি করে এবং তোমাকে এই সব জিনিস দেখতে দেয় না। দিব্য চক্ষু *(তিয়ান মু)*[30] খুলে গেলে, জিনিসগুলো বড়ো করে দেখতে পারবে, এটা মূলত মানুষের জন্মগত ক্ষমতা, যাকে এখন বলা হয় অলৌকিক ক্ষমতা, তুমি যদি এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাও, তবে তোমাকে অবশ্যই তোমার মূলে এবং সত্যে ফিরে যেতে হবে, সাধনার মাধ্যমেই ফিরতে হবে।

এবার আমরা সদ্গুণগুলির কথা আলোচনা করব। এদের নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কটা কী? আমরা একে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করব। মানুষ হিসাবে আমাদের, এত এত মাত্রার প্রত্যেকটিতেই একটা করে শরীর আছে। এই মানব শরীরের উপাদানগুলোকে দেখলে, আমরা দেখব যে এর সবচেয়ে বড়ো উপাদান হচ্ছে কোষ, এই দিয়েই তৈরি মানুষের এই ভৌতিক দেহ। ধরা যাক, তুমি কোষ এবং অণুর মাঝে, অথবা দুটো অণুর মাঝখানে প্রবেশ করলে, তখন তোমার অভিজ্ঞতা হবে যে তুমি ইতিমধ্যে অন্য মাত্রায় প্রবেশ করে গেছ। অন্য মাত্রাতে অবস্থিত শরীরের রূপটা কী ধরনের হবে? অবশ্য এটা বোঝার জন্যে তুমি এই মাত্রার ধারণাকে প্রয়োগ করতে পারবে না। তোমার শরীরকে অবশ্যই ওই মাত্রার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপ ধারণ করতে হবে। অন্য মাত্রার মধ্যে শরীরটাকে বড়ো বা ছোট করা সম্ভব, তখন তুমি আবিষ্কার করবে যে সেই মাত্রাটাও

[30] *তিয়ান মু* - দিব্য চক্ষু, তৃতীয় নয়ন হিসাবেও পরিচিত।

অতুলনীয়ভাবে বিশাল। প্রসঙ্গত এটাই হচ্ছে অন্য মাত্রাগুলির অস্তিত্বের এক ধরনের সাধারণ রূপ, ওই অন্য মাত্রাগুলি একই সময়ে, একই স্থানে অবস্থিত। অন্য অনেক মাত্রাগুলির প্রত্যেকটাতে, সব মানুষেরই একটা করে বিশেষ শরীর আছে, এবং একটা বিশেষ মাত্রার মধ্যে, মানুষের শরীরের চারিদিকে একটা ক্ষেত্র বিদ্যমান। কীরকম ক্ষেত্র? এই ক্ষেত্রটাই হচ্ছে আমাদের পূর্বে উল্লেখিত সদ্‌গুণ, সদ্‌গুণ হচ্ছে একরকমের সাদা পদার্থ। এটা পূর্বে যেমন বিশ্বাস করা হতো, সেইরকম কোনো আধ্যাত্মিক বা ভাবাদর্শগত জিনিস নয়, এটা সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বশীল একধরনের পদার্থ। অতীতে বয়স্ক লোকেরা সদ্‌গুণ-এর সঞ্চয়ের কথা এবং সদ্‌গুণ-এর হানির কথা বলতো। তাদের কথাগুলো খুবই যুক্তিসংগত ছিল। এই সদ্‌গুণ একটা ক্ষেত্র তৈরি করে যা মানুষের শরীরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে। অতীতে তাও মতে বলা হতো যে মাস্টারই শিষ্যকে খুঁজে নেয়, শিষ্য মাস্টারকে নয়। এর অর্থ কী? মাস্টার দেখত যে শিষ্যের শরীরে সদ্‌গুণ-এর ভাগ বেশী না কম, যদি সদ্‌গুণ বেশী থাকে তাহলে সাধনা ভালো হবে; যদি সদ্‌গুণ কম থাকে তাহলে সাধনা ভালো হবে না, তার পক্ষে উপরের দিকে গোংগ বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন।

একই সাথে এক ধরনের কালো পদার্থ আছে যাকে আমরা বলি ‘‘কর্ম,’’ এবং বৌদ্ধধর্মে বলে ‘‘পাপকর্ম।’’ সাদা এবং কালো এই দুটো পদার্থ একই সাথে থাকে। এই দুই ধরনের পদার্থের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন? আমরা এই সদ্‌গুণ প্রাপ্ত হই কষ্ট সহ্য করে, আঘাত সহ্য করে এবং ভালো কাজ করে; আর কালো পদার্থ প্রাপ্ত হই দুষ্কর্ম করে, অন্যায় কাজ করে, লোকেদের উপরে জবরদস্তির মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণ করে। আজকাল কিছু লোক শুধুমাত্র যে লাভের জন্যে মুখিয়ে থাকে তা নয়, খারাপ কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাদের আটকাতে পারে না। টাকার জন্যে তারা সব ধরনের দুষ্কর্মই করতে পারে: তারা কাউকে খুন করছে, কাউকে টাকা দিয়ে হত্যা করাচ্ছে, সমকামিতার চর্চা করছে, ওষুধের অপব্যবহার করে নেশা করছে, ইত্যাদি, সব ধরনের কাজ করছে। মানুষ খারাপ কাজ করার সময়ে, তার সদ্‌গুণ-এর ক্ষতি করছে। কীভাবে ক্ষতি করছে? যখন এই ব্যক্তি অন্য কাউকে অপমান করে, তখন সে কর্তৃত্ব ফলানোর সুবিধাটা অনুভব করে, কারণ সে তার রাগটা অন্য ব্যক্তির উপরে প্রকাশ করতে পেরেছে। এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, ‘‘ক্ষতি নাহলে লাভ হবে না,’’ লাভ করতে হলে অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তুমি ক্ষতি চাও না কিন্তু তোমাকে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে, কে এই কাজ

করছে? বিশ্বের প্রকৃতিই এই কাজ করছে। সেইজন্যে তুমি শুধু পাওয়ার চিন্তা করবে এটা অসম্ভব। তাহলে কীভাবে এটা কাজ করবে? যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে অপমান করছে, কারোর সঙ্গে জবরদস্তি করছে, সেই সময়ে সে তার সদ্‌গুণ অন্য ব্যক্তিকে ছুঁড়ে দেয়। যেহেতু অন্য ব্যক্তি হচ্ছে সেই পক্ষ, যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, যার কিছু ক্ষতি হয়েছে, এবং যাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, সেই অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। যখন কেউ অন্য ব্যক্তিকে অপমান করছে, সেই সময়ে এক টুকরো সদ্‌গুণ তার নিজের মাত্রার ক্ষেত্র থেকে উড়ে গিয়ে অন্য ব্যক্তির শরীরের উপরে পড়ে। যত বেশী সে অপমান করবে তত বেশী সদ্‌গুণ সে অন্য ব্যক্তিকে দেবে। কাউকে আঘাত করলে, জবরদস্তি করে কারোর থেকে সুবিধা আদায় করলেও একই রকম ব্যাপার ঘটে। সে কাউকে ঘুষি মারলে বা পা দিয়ে লাথি মারলে, সেক্ষেত্রে সে যত বেশী আঘাত করবে তত বেশী সদ্‌গুণ অন্য ব্যক্তির উপরে গিয়ে পড়বে। সাধারণ লোকেরা এই স্তরের নিয়মটা দেখতে পারছে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপমান বোধ করল এবং ব্যাপারটা সহ্য করতে পারল না: ‘‘তুমি আমাকে আঘাত করেছ, আমিও তোমাকে আঘাতটা ফেরত দেব।’’ সে ‘‘দুম’’ করে ঘুষি মেরে প্রত্যাঘাত করল এবং সদ্‌গুণটাকে ঠেলে ফেরত পাঠিয়ে দিল। দুজনের কারোর ক্ষতিও হল না, লাভও হল না। সে হয়তো ভাবল: ‘‘তুমি আমাকে একবার আঘাত করেছ, আমি তোমাকে দুবার আঘাত করব, তা নাহলে আমার রাগটা ঠিক মিটবে না।’’ সে সঙ্গে সঙ্গে আবার আঘাত করল এবং আবার তার শরীর থেকে এক টুকরো সদ্‌গুণ উড়ে গিয়ে অন্য ব্যক্তির কাছে চলে গেল।

এই সদ্‌গুণ-এর উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয় কেন? এই সদ্‌গুণ-এর রূপান্তরের ক্ষেত্রে সম্পর্কটা কী? ধর্মগুলি এই শিক্ষা দেয়: ‘‘সদ্‌গুণ থাকলে, এই জন্মে না হোক পরের জন্মে লাভ পাবেই।’’ সে কী পাবে? প্রচুর সদ্‌গুণ থাকলে, সম্ভবত সে বড়ো আধিকারিক হতে পারবে, অথবা সে বিরাট সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে, যা চাইবে তাই পাবে, আসলে এই সদ্‌গুণ-এর পরিবর্তে সে সবকিছু পাবে। ধর্মের মধ্যে আরও বলা আছে যে, যার সদ্‌গুণ নেই তার শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তার মূল আত্মা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তার জীবন শেষ হওয়ার পরে তার সবকিছুরই সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটবে, কোনো কিছুই আর থাকবে না। যাই হোক, সাধনার ক্ষেত্রে আমরা বলি যে সদ্‌গুণ-কে সরাসরি গোংগ-এ বিবর্তন করা সম্ভব।

আমি এখন বলব যে সদ্‌গুণ কীভাবে গোংগ-এ বিবর্তিত হয়। সাধনার জগতে একটা কথা প্রচলিত আছে, ‘‘সাধনা নির্ভর করে তোমার নিজের উপরে, গোংগ নির্ভর করে মাস্টারের উপরে।’’ কিন্তু কিছু লোক বলে, ‘‘চুল্লির উপরে একটা গলনাধার স্থাপন করে, দ্যান[31] তৈরি করার জন্যে ঔষধি ও জড়িবুটি জড় কর[32] এবং চিন্তাকে চালিত কর,’’ তারা মনে করে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমাদের বলছি এটা একটুও গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটা নিয়ে বেশী চিন্তা করা বস্তুত একটা আসক্তি। তুমি যদি এর প্রতি গুরুত্ব দাও, তাহলে সেটা কি তোমার আসক্তির সঙ্গে এর পিছনে ছোটা হল না? সাধনা নির্ভর করে তোমার উপরে, গোংগ নির্ভর করে মাস্টারের উপরে, তোমার এই ইচ্ছাটা থাকলেই হবে। বাস্তবে এই কাজটা তোমার মাস্টারই সম্পন্ন করে দেবেন, তুমি মূলত কিছুই করতে পারবে না। তোমার একটা সাধারণ মানুষের শরীর, তুমি এটাকে এই ধরনের উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থ দিয়ে নির্মিত, ওই রকম উচ্চতর প্রাণসত্তার শরীরে কীভাবে বিবর্তিত করবে? এটা একেবারেই সম্ভব নয়, এসব কথা বলা মানেই হাসির ব্যাপার। অন্য মাত্রাতে এই মানব শরীরের বিবর্তন প্রক্রিয়াটা খুবই রহস্যময় এবং খুবই জটিল, তুমি এটা একেবারেই করতে পারবে না।

মাস্টার তোমাকে কী কী জিনিস দিয়েছেন? তিনি তোমাকে একটা গোংগ দিয়েছেন যা তোমার গোংগ বৃদ্ধি করবে। যেহেতু সদ্‌গুণ মানব শরীরের বাইরে থাকে, মানুষের সত্যিকারের গোংগ সদ্‌গুণ-এর থেকেই উৎপন্ন হয়। একজন ব্যক্তির স্তরের উচ্চতা, তার গোংগ-এর সামর্থ্য কতটা, সবই ওই সদ্‌গুণ-এর থেকেই উৎপন্ন হয়। মাস্টার তোমার সদ্‌গুণ-কে গোংগ-এ বিবর্তিত করেন যা পাক দিয়ে দিয়ে উপরের দিকে বাড়তে থাকে। যে গোংগ দেখে কোনো ব্যক্তির স্তরের উচ্চতা সঠিকভাবে

---

[31]দ্যান - সাধকের শরীরে বিদ্যমান শক্তিপুঞ্জ যা অন্য মাত্রা থেকে সংগৃহীত।

[31]‘‘চুল্লির উপরে একটা গলনাধার স্থাপন করে, দ্যান তৈরি করার জন্যে ঔষধি ও জড়িবুটি জড় কর’’-তাও মত অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ রসায়নের পরোক্ষ উপমা।

নির্ধারণ করা যায় সেটা শরীরের বাইরেই বৃদ্ধি পায়, এটা পাক খেয়ে বাড়তে বাড়তে সবশেষে মাথার উপরে পৌঁছানোর পরে একরকম গোংগ স্তম্ভের আকার ধারণ করে। একজন ব্যক্তির গোংগ কতটা উঁচু, সেটা তার গোংগ স্তম্ভের উচ্চতার দিকে একবার তাকিয়েই জানা সম্ভব, এটাই তার স্তর, বৌদ্ধধর্মে একেই বলে সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান। কিছু লোকের ক্ষেত্রে বসে ধ্যান করার সময়ে তাদের মূল আত্মা শরীর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে তৎক্ষণাৎ অনেক উঁচুস্তরে উঠে যেতে পারে, কিন্তু আরও উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করলেও উঠতে পারে না, এবং উপরে উঠতে সাহস পায় না। যেহেতু সে তার নিজের গোংগ স্তম্ভের উপরে বসেই উঁচুতে উঠেছিল, সেইজন্যে সে ততটা উচ্চতা পর্যন্তই উঠতে পারে। যেহেতু তার গোংগ স্তম্ভ ঠিক ততটাই উঁচু, সেইজন্যে সে তার উপরে আর উঠতে পারে না, এটাই হচ্ছে সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থানের বিষয় যা বৌদ্ধধর্মে বলা আছে।

একজন ব্যক্তির চরিত্র কতটা উঁচু সেটা মাপার জন্যে একটা গজকাঠিও আছে। এই গজকাঠি এবং গোংগ স্তম্ভ, একই মাত্রাতে থাকে না, কিন্তু একই সাথে থাকে। যখন সাধনার দ্বারা তোমার চরিত্র উন্নত হয়ে গেছে, তখন ধরা যাক, সাধারণ লোকেদের মধ্যে অন্য কেউ তোমাকে অপমান করল, তুমি উচ্চবাচ্য করলে না, তোমার মনের ভিতরটা খুব শান্ত রাখলে; তোমাকে কেউ ঘুষি মারল, তুমি কিছুই বললে না, একটু হেসে সামলে নিলে এবং ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে, অতএব তোমার চরিত্র ইতিমধ্যে খুব উঁচুতে পৌঁছে গেছে। এইরকম একজন সাধক হিসাবে তোমার কী পাওয়া উচিত? তোমার কি গোংগ পাওয়া উচিত নয়? যত তোমার চরিত্র উন্নত হতে থাকবে, তোমার গোংগ-ও তত উপরের দিকে বাড়তে থাকবে। তোমার চরিত্র যতটা উঁচু, তোমার গোংগ-ও ততটা উঁচু, এটা একটা পরম সত্য। পূর্বে কিছু লোক পার্কে অথবা বাড়িতে যেখানেই হোক না কেন, খুব মন দিয়ে, অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ হয়ে এবং সঠিকভাবে চিগোংগ অনুশীলন করত। কিন্তু যখনই অনুশীলন করে বাইরে যেত, তারা আলাদা মানুষ হয়ে যেত, যা ইচ্ছা তাই করত, সাধারণ লোকেদের মধ্যে খ্যাতি এবং লাভের জন্যে অন্যদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই শুরু করে দিত, তাদের গোংগ কীভাবে বাড়বে? তাদের গোংগ একেবারেই বাড়ত না এবং রোগও সারত না, এটাই ছিল তার কারণ। যদিও কিছু লোক অনেকদিন চিগোংগ-এর শারীরিক ক্রিয়া করেছে, তবুও কেন তাদের রোগ নিরাময় হয়নি? এর কারণ চিগোংগ হচ্ছে একটা সাধনা, একটা

মহত্তর জিনিস, এটা সাধারণ লোকেদের ব্যায়াম নয়, এক্ষেত্রে চরিত্রের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে, তবেই রোগ সারবে এবং গোংগ বৃদ্ধি পাবে।

কিছু লোক বিশ্বাস করে চুল্লির উপরে রাখা গলনাধার-এর মধ্যে ঔষধি ও জড়িবুটি জড় করে দ্যান তৈরি করা যায় এবং ভাবে সেটাই গোংগ, এটা একেবারেই ঠিক নয়। এই দ্যান-এর মধ্যে শক্তির শুধু একটা অংশ মাত্র সঞ্চিত থাকে, সম্পূর্ণ শক্তি থাকে না। দ্যান কী জিনিস? সবাই জান যে আমাদের এই পদ্ধতির একটা ভাগে জীবন সংক্রান্ত জিনিসের জন্যে সাধনা করা হয়, যার ফলে আমাদের শরীরে অনেক অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হয়, এবং আরও অনেক ধরনের দক্ষতার আবির্ভাব ঘটে। এইসব জিনিসের বেশীরভাগই তালাবন্ধ করা থাকে যাতে তুমি এগুলোকে ব্যবহার করতে না পার। অলৌকিক ক্ষমতা অনেক রকমের হতে পারে, যা সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশী, যখনই একটার উদয় হয় তখনই সেটাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। কেন এগুলোকে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি যাতে সাধারণ মানবসমাজে ইচ্ছামতো তোমার কাজের ব্যাপারে এগুলোকে ব্যবহার না করতে পার, এবং তুমি যাতে সাধারণ মানবসমাজে ইচ্ছামতো বিঘ্ন ঘটাতে না পার, এছাড়া তুমি সাধারণ মানবসমাজে তোমার ইচ্ছামতো ক্ষমতাগুলোকে প্রদর্শন করতে পার না, কারণ এর ফলে সাধারণ মানবসমাজের স্থিতিতে বিশৃঙ্খলা আসতে পারে। অনেক লোক আলোকপ্রাপ্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধনা করে, তুমি যদি সব ক্ষমতাগুলো প্রদর্শন কর, সাধারণ লোকেরা দেখবে যে এগুলি সব সত্যি, তারা সবাই সাধনা করতে চাইবে, যারা অমার্জনীয় অপরাধ করেছে তারাও সবাই সাধনা করতে চাইবে, এটা হতে দেওয়া যায় না। তোমাকে এইভাবে প্রদর্শন করতে দেওয়া যাবে না; এমনকী তুমি সহজেই অন্যায় কাজ করে ফেলতে পার, কারণ তুমি এই ব্যাপারে পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্কটাকে এবং মূল প্রকৃতিটাকে দেখতে পারছ না, তুমি ভাবছ যে ভালো কাজ করছ কিন্তু এটা হয়তো অন্যায় কাজ, সেইজন্যে তোমাকে ওসবের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ একবার তুমি অন্যায় কাজ করলে তোমার স্তর নেমে যাবে, তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে, সেইজন্যে অনেক অলৌকিক ক্ষমতাই তালাবন্ধ করে রাখা হয়। এগুলো কীভাবে কাজ করবে? একদিন সাধক সেই অবস্থায় পৌঁছাবে যখন গোংগ খুলে যাবে এবং সে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করবে, তখন এই দ্যানটা একটা বোমার মতো কাজ করবে, যা বিস্ফোরিত হয়ে খুলে দেবে সব অলৌকিক ক্ষমতা, শরীরের সব তালা, এবং শত শত আকুপাংচার বিন্দু, ‘‘দুম’’ করে একটা ঝাঁকুনির

মাধ্যমে সবকিছু খুলে যাবে, এটাই দ্যান-এর উপযোগিতা। একজন ভিক্ষুর (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) মৃত্যুর পরে শবদাহ করার পরে সাধারণত দেহাবশেষ পড়ে থাকে, কেউ কেউ বলে ওগুলো হাড় আর দাঁত। কিন্তু সাধারণ লোকেদের কেন দেহাবশেষ পড়ে থাকে না? এই দেহাবশেষ হচ্ছে বিস্ফোরিত হওয়া দ্যান যার শক্তিটা মুক্ত হয়ে গেছে, এর মধ্যে অন্য মাত্রার জিনিস প্রচুর পরিমাণে থাকে। যাই হোক, এই জিনিসগুলোও অস্তিত্বসম্পন্ন পদার্থ, যদিও কোনো কাজেই লাগে না। এখনকার লোকেরা এগুলোকে খুবই মূল্যবান জিনিস মনে করে, এতে শক্তি আছে, দেখতে উজ্জ্বল এবং খুবই শক্ত, এগুলো প্রকৃতপক্ষে এইরকমই জিনিস।

এছাড়া গোংগ বৃদ্ধি না হওয়ার আরও একটা কারণ আছে, অর্থাৎ উঁচু স্তরের ফা না জানলে সাধনায় উপরে ওঠা যাবে না। এর অর্থ কী? ঠিক যেমন কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম, কিছু লোক অনেক ধরনের চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করেছে, আমি বলতে চাই যে, তুমি যত রকম পদ্ধতিই শেখো না কেন, কোনো কাজে লাগবে না, তুমি কেবল একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রই রয়ে যাবে, সাধনার ক্ষেত্রে ঠিক যেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র, কারণ এসবই নীচু স্তরের তত্ত্ব। সাধনার উপরের স্তরে উঠতে গেলে তোমার এইরকম নীচু স্তরের তত্ত্ব কখনোই পথ প্রদর্শন করতে পারবে না। তুমি কলেজে গিয়ে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই পড়, তাহলে তুমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রই রয়ে যাবে। তুমি এগুলো যত বেশীই পড় না কেন, কোনো কাজে আসবে না, বরঞ্চ আরও খারাপই হবে। বিভিন্ন স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা। বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ফা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পথপ্রদর্শকের কাজ করে, সেইজন্যে তোমাদের নীচুস্তরের তত্ত্বগুলি কখনোই উঁচুস্তরের সাধনার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারবে না। আমরা এরপরে যা ব্যাখ্যা করব, সবই উঁচুস্তরের সাধনার তত্ত্ব। আমি তোমাদের বিভিন্ন স্তরের জিনিস একত্রিত করে শেখাব, এগুলো এখন থেকে তোমার সাধনার ক্ষেত্রে সবসময়েই পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। আমার কতকগুলো বই আছে, এছাড়া অডিও টেপ এবং ভিডিও টেপও আছে। তুমি এগুলোর থেকে একটা জিনিস আবিষ্কার করবে যে, তুমি একবার পড়ার পরে অথবা একবার শোনার পরে, একটা সময়ের ব্যবধানে, তুমি যখনই এগুলো পুনরায় পড়বে অথবা শুনবে, প্রত্যেকবার-ই এরা তোমাকে অবশ্যই পথপ্রদর্শন করে যাবে। তুমি নিরন্তর নিজের উন্নতি ঘটাতে থাকবে এবং ওগুলোও নিরন্তর তোমার পথপ্রদর্শকের কাজ করে যাবে, এটাই হচ্ছে ফা। সাধনার শারীরিক ক্রিয়াগুলি করা সত্ত্বেও গোংগ

বৃদ্ধি না হওয়ার দুটো কারণই উপরে বর্ণনা করলাম: উঁচু স্তরের ফা না জানলে সাধনা করতে পারবে না; অন্তরের সাধনা না করলে এবং চরিত্রের সাধনা না করলে গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটবে না। এই দুটোই হচ্ছে কারণ।

ফালুন দাফা-র বিশেষত্ব

আমাদের ফালুন দাফা হচ্ছে বুদ্ধ মতের চুরাশি হাজার সাধনা পদ্ধতির মধ্যে একটা পদ্ধতি, আমাদের এই পর্যায়ের মানব সভ্যতার ইতিহাসে জনসাধারণের মধ্যে কখনোই এই পদ্ধতিটাকে প্রচার করা হয়নি, তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগে একটা সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল মানুষের উদ্ধারের জন্যে। এই অন্তিম বিনাশকাল[33]-এর শেষ পর্বে, আমি পুনরায় একবার ব্যাপকভাবে এর প্রচার করছি, সেইজন্যে এটা অত্যন্ত মূল্যবান। আমি সদ্‌গুণকে সরাসরি গোংগ-এ রূপান্তরিত করার উপায় তোমাদের বলেছি। প্রকৃতপক্ষে শারীরিক ক্রিয়া করলে গোংগ প্রাপ্ত হবে না, সাধনা করলেই গোংগ প্রাপ্ত হবে। অনেক লোকই গোংগ বৃদ্ধি করার ইচ্ছা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং কীভাবে শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলন করা যায় শুধু সেটার উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছে, সাধনা কীভাবে করা যায় তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না। বস্তুত গোংগ-এর বিকাশ চরিত্রের সাধনার উপরেই পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাহলে কেন আমরা এখানে শারীরিক ক্রিয়া শেখাচ্ছি? প্রথমে আমি বলব যে একজন ভিক্ষু কেন শারীরিক ক্রিয়া করে না? সে প্রধানত বসে ধ্যান করে, স্তোত্র উচ্চারণ করে, এবং চরিত্রের সাধনা করে। এইভাবে তার গোংগ বৃদ্ধি হয়, এবং গোংগ বৃদ্ধির ফলে তার স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। যেহেতু শাক্যমুনি পার্থিব সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে শিখিয়েছিলেন, এমনকী এই মূল শরীরটাকেও, সেইজন্যে শরীর সঞ্চালন অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাও মতে সকল জীবের উদ্ধারের কথা বলা হয় না, তাদের বিভিন্ন মানসিকতার এবং বিভিন্ন স্তরের সেই সব লোকেদের সম্মুখীন হতে হয় না, যাদের মধ্যে কেউ বেশী স্বার্থপর, আবার কেউ কম স্বার্থপর। তারা শিষ্য বাছাই করে, যদি তিনজন শিষ্যকে খুঁজে পায়, তবে তাদের মধ্যে একজনই সত্যিকারের শিক্ষা পাবে, তারা নিশ্চিত হয়ে নেয় যে শিষ্যটির

[33] অন্তিম বিনাশকাল - সাধক সমাজে ধারনা আছে যে এই বিশ্বের বিবর্তনের তিনটি পর্যায় আছে, (প্রারম্ভিক বিনাশকাল, মধ্যবর্তী বিনাশকাল এবং অন্তিম বিনাশকাল), এখন হচ্ছে অন্তিম বিনাশকালের শেষ পর্ব।

সদ্‌গুণ উঁচু, শিষ্যটি ভালো, এবং সে যেন কোনো সমস্যায় না পড়ে। সেইজন্যে তারা কলাকৌশলজনিত জিনিস শেখানোর উপরে বেশী জোর দেয়, যাতে সে জীবনের সাধনা করতে পারে। সে অলৌকিক ক্ষমতা, কলাকৌশলজনিত দক্ষতা ইত্যাদি জিনিসের সাধনা করে, এর জন্যে কিছু শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন।

ফালুন দাফা হচ্ছে মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতিও, তার জন্যে কিছু শরীর সঞ্চালনের অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই শরীর সঞ্চালন একদিকে অলৌকিক ক্ষমতাগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে। শক্তিবৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? এটা হচ্ছে তোমার শক্তিশালী গোংগ সামর্থ্য দ্বারা তোমার অলৌকিক ক্ষমতাগুলির শক্তিকে দৃঢ় করা, ক্রমাগত এগুলিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা; শরীর সঞ্চালনগুলি আর এক দিকে তোমার শরীরের মধ্যে অনেক জীবনসত্তারও বিকাশ ঘটায়। উঁচু স্তরের সাধনায় তাও মতে বলা হয়, ‘‘অমর শিশুর জন্মের কথা,’’ বুদ্ধ মতে বলা হয়, ‘‘অবিনশ্বর বজ্রশরীরের কথা,’’ এছাড়া অনেক ধরনের কলাকৌশলজনিত ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। এই জিনিসগুলির বিকাশ শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমেই ঘটে থাকে, তার জন্যেই শরীর সঞ্চালনের প্রয়োজন। মন এবং শরীরের এই যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি একটা সম্পূর্ণ সাধনা প্রণালী, তার জন্যে সাধনার যেমন প্রয়োজন, সেইরকম শারীরিক ক্রিয়ারও প্রয়োজন। আমার মনে হয় সবাই এখন বুঝতে পারছ যে গোংগ-এর আবির্ভাব কীভাবে হয়, যে গোংগ দ্বারা সত্যি সত্যি তোমার স্তরের উচ্চতা নির্ধারণ করা সম্ভব, সেই গোংগ মূলত শারীরিক ক্রিয়ার থেকে আসে না, সাধনার থেকে আসে। তোমার সাধনার পর্বে, সাধারণ লোকেদের মধ্যে থেকে তোমার চরিত্রের উন্নতি হলে এবং তুমি বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হলে, বিশ্বের প্রকৃতি তখন তোমাকে আর বাধা দেবে না, তুমি তখন উপরে উঠতে পারবে। তোমার সদ্‌গুণ তখন গোংগ-এ বিবর্তিত হতে শুরু করবে, তোমার চরিত্রের মানের উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে তোমার গোংগ-ও বৃদ্ধি পেয়ে উপরে উঠতে থাকবে, এটা এইরকমই একটা সম্পর্ক।

আমাদের এই সাধনা প্রণালী হচ্ছে সত্যিকারের মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি, আমাদের সাধনার মাধ্যমে বিকশিত হওয়া গোংগ শরীরের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে, এরও পরে অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে অবস্থিত মূল পদার্থের সূক্ষ্ম কণার উপাদানগুলি পর্যন্ত

সর্বত্র উচ্চশক্তি সম্পন্ন এই গোংগ পদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে। এইভাবে তোমার গোংগ সামর্থ্য যত উঁচু হতে থাকবে, এর ঘনত্বও আরও বেশী হতে থাকবে, এবং এর শক্তিও আরও বেশী হতে থাকবে। এই ধরনের উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থের বুদ্ধিমত্তা থাকে। যেহেতু মানব শরীরের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে, এবং জীবনের মূল পর্যন্ত এটা সঞ্চিত হতে থাকে, সেইজন্যে ধীরে ধীরে তোমার শরীরের কোষের মতো একই রকম এর আকার হয়ে যায়, অণুসমূহের মতো একই রকম এর গঠন ও বিন্যাস হয়ে যায় এবং সব পারমাণবিক নিউক্লিয়াসগুলির মতো একই রকম এর আকার হয়ে যায়। কিন্তু এর মূল প্রকৃতিটা পাল্টে যায়, এখন এই শরীরটা আর পূর্বেকার রক্তমাংসের কোষ দিয়ে নির্মিত নয়, তাহলে তুমি কি পঞ্চতত্ত্ব অতিক্রম করে গেলে না? অবশ্য তোমার এখনও সাধনা শেষ হয়নি, তোমাকে এখনও, সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাধনা করে যেতে হবে, সেইজন্যে উপর থেকে তোমাকে দেখতে সাধারণ মানুষের মতোই লাগবে, শুধু একটাই তফাৎ থাকবে, তোমার সমবয়সি লোকেদের তুলনায় তোমাকে দেখতে অনেক তরুণ মনে হবে। অবশ্য, প্রথমেই তোমার শরীর থেকে অসুস্থতা সমেত, খারাপ জিনিসগুলোকে নিশ্চিতভাবে দূর করা হবে। কিন্তু আমরা এখানে রোগ নিরাময় করি না, আমরা শরীরটাকে শোধন করি, এর নামটাও ‘‘রোগ নিরাময়’’ বলব না, আমরা একে বলব ‘‘শরীরের শোধন,’’ আমরা সত্যিকারের সাধকদের শরীর শোধন করে দিই। কিছু লোক এখানে রোগ সারানোর জন্যেই আসে। খুব খারাপ রুগীদের আমাদের ক্লাসে ঢোকার অনুমতি দিই না, কারণ রোগ সারাতে হবে, এই চিন্তাটাকে তারা ত্যাগ করতে পারে না এবং তারা যে অসুস্থ, সেই চিন্তাটাকেও তারা ত্যাগ করতে পারে না। যার রোগটা গুরুতর এবং যে খুব যন্ত্রণা পাচ্ছে, সে কি এই চিন্তাটাকে ত্যাগ করতে পারবে? সে সাধনা করতে পারবে না। আমরা এই ব্যাপারে বার বার জোর দিয়েছি যে, গুরুতরভাবে অসুস্থ লোকেদের আমরা গ্রহণ করি না, এটা সাধনা করার জায়গা, তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এর বিরাট ফারাক, এটা করার জন্যে তারা অন্য চিগোংগ মাস্টারের খোঁজ করতে পারে। অবশ্য আমাদের অনেক শিক্ষার্থীর শরীরে অসুস্থতা আছে, যেহেতু তুমি একজন প্রকৃত সাধক, সেহেতু আমরা তোমার জন্যে এই ব্যাপারগুলো করব।

কিছুকাল সাধনা করার পরে আমাদের ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থীদের চেহারাটা দেখতে অনেকটা অন্যরকম হয়ে যায়, তাদের ত্বক কোমল এবং লাল আভা যুক্ত ফর্সা হয়ে যায়, বয়স্ক লোকেদের বলিরেখা কমে যায়,

এমনকী খুবই কম হয়ে যায়, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। আমি এখানে কোনো অবিশ্বাস্য কথা বলছি না, আমাদের এখানে বসা অনেক বয়স্ক শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টা জানে। এছাড়া বয়স্ক মহিলাদেরও আবার ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়ে যায়, যেহেতু এটা মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি, সেইজন্যে ঋতুস্রাব-এর প্রাণশক্তিটা শরীরের সাধনার জন্যে প্রয়োজন। যদিও ঋতুস্রাব বেশী হয় না, এখনকার পর্যায়ে ওইটুকুই যথেষ্ট, এবং এটাও একটা সাধারণ ব্যাপার। অন্যভাবে বলতে গেলে, এটা ছাড়া তুমি শরীরের সাধনা কীভাবে করবে? পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, বয়স্ক এবং যুবা সবাই পুরো শরীরটাকে হাল্কা বোধ করবে। প্রকৃত সাধক হিসাবে তুমি এই ধরনের পরিবর্তনগুলো অনুভব করতে পারবে।

আমাদের এই সাধনা পদ্ধতি খুবই বিরাট, এবং অন্য পদ্ধতিগুলোর মতো নয় যেখানে জীবজন্তুদের গতিবিধি অনুকরণ করে অনুশীলন করা হয়। এই সাধনা পদ্ধতি সত্যিই খুব বিশাল। শাক্যমুনি এবং লাও জি[34] তাঁদের সময়ে যেসব তত্ত্বের কথা বলে গেছেন, সেগুলো সবই আমাদের এই ছায়াপথের অন্তর্গত তত্ত্বগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা ফালুন দাফা-য় কীসের সাধনা করি? আমরা এই বিশ্বের বিবর্তনের মূল তত্ত্ব অনুযায়ী সাধনা করি। বিশ্বের উচ্চতম বৈশিষ্ট্য, সত্য-করুণা-সহনশীলতার আদর্শ অনুযায়ী আমাদের সাধনা পরিচালিত হয়। আমাদের এই সাধনা এতই বিশাল যে এটা বিশ্বের সাধনা করার সমান।

আমাদের ফালুন দাফাতে আরও একটা অত্যন্ত অনুপম এবং পরম বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য সব পদ্ধতিগুলোর থেকে আলাদা। এখন সমাজে যেসব চিগোংগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলো দ্যান সাধনার পথ গ্রহণ করে, এবং দ্যান-এর অনুশীলন করে। এই দ্যান সাধনার চিগোংগ পদ্ধতিগুলিতে, সাধারণ লোকেদের মধ্যে থেকে গোংগ উন্মোচন এবং আলোকপ্রাপ্তি লাভ খুবই কঠিন কাজ। আমাদের ফালুন দাফাতে দ্যান-এর পথ গ্রহণ করা হয় না, আমাদের সাধনা প্রণালীতে দেহের তলপেটে স্থাপিত একটা ফালুনের সাধনা করা হয়, আমি ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজে এটা স্থাপন করে দিই। যখন আমি ফালুন দাফা-র শিক্ষা প্রদান

---

[34]লাও জি - তাও মতের প্রতিষ্ঠাতা এবং দাও দে জিংগ (তাও তে চিংগ)-য়ের লেখক, যিনি চীন দেশে খ্রিষ্ট পূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং এই শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

করি, সেই সময়ে এক এক করে সবার মধ্যে ফালুন স্থাপন করে দিই, কেউ কেউ এটাকে অনুভব করতে পারে, কেউ কেউ পারে না, বেশির ভাগ লোক এটাকে অনুভব করতে পারে, এর কারণ লোকেদের শরীরের প্রকৃতি সবার সমান নয়। আমরা ফালুনের সাধনা করি, দ্যান-এর সাধনা করি না। ফালুন হচ্ছে এই বিশ্বেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ, যার মধ্যে বিশ্বের সব ক্ষমতাগুলিই আছে। সে নিজে নিজেই কাজ করতে পারে এবং ঘুরতে পারে। এটা তোমার তলপেটে নিরন্তর ঘুরতে থাকবে, একবার এটাকে তোমার মধ্যে স্থাপন করা হয়ে গেলে, তারপরে আর থামবে না, বছরের পর বছর এইভাবে চিরকাল এটা ঘুরতেই থাকবে। যখন এটা ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঘোরে তখন সেই পর্যায়ে এটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিশ্বের থেকে শক্তি শোষণ করে এবং নিজেই এই শক্তির রূপান্তর করে, শরীরের প্রতিটি অংশের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করে সেগুলির রূপান্তর ঘটায়। একইভাবে যখন ফালুন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে, তখন শক্তি নির্গত করে, এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বাইরে ছেড়ে দেয় যা শরীরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটা যখন শক্তিকে বাইরে নির্গত করে, সেটা অনেক দূরে চলে যায় এবং আবার নতুন শক্তিকে ভিতরে নিয়ে আসে। ওই নির্গত হওয়া শক্তির থেকে তোমার চারপাশের লোকেরা উপকার পাবে। বৌদ্ধধর্ম একজন ব্যক্তির নিজের উদ্ধারের কথা বলে, অন্যদের উদ্ধারের কথা বলে এবং জগতের সমস্ত জীবনসত্তার উদ্ধারের কথা বলে। তুমি শুধু নিজের জন্যে সাধনা করছ তা নয়, তুমি সমস্ত জীবনসত্তাকেও উদ্ধার করতে চাও, তোমার সাথে সাথে অন্য লোকেরাও উপকার পাবে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই অন্যদের শরীর সংশোধন হয়ে যাবে, তাদের রোগ নিরাময় হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য তোমার শক্তিটা হারিয়ে যাবে না, যখন ফালুন ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঘুরবে তখন সে নিজে থেকেই শক্তিটাকে ভিতরে টেনে নেবে, কারণ সে নিরন্তর ঘুরেই চলেছে।

কিছু লোক ভাবে: ‘‘ফালুন কীভাবে নিরন্তর ঘুরেই যাচ্ছে?’’ কিছু লোক আমাকে এটাও জিজ্ঞাসা করে: ‘‘এটা কীভাবে ঘোরে? কারণ কী?’’ অনেক শক্তি একত্রিত হয়ে দ্যান তৈরি হয়, এটা লোকে বুঝতে পারে, কিন্তু ফালুন ঘুরেই যাচ্ছে এটা ধারণার বাইরে। আমি সবাইকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এই বিশ্ব গতিশীল, এই বিশ্বের সমস্ত ছায়াপথগুলি গতিশীল, সমস্ত গ্যালাক্সিগুলিও গতিশীল, ‘ন’টা বড়ো গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, পৃথিবীও নিজে নিজেই ঘুরছে। সবাই চিন্তা কর কে এদের ধাক্কা দিচ্ছে? কে এদের শক্তি প্রদান করছে? তুমি সাধারণ লোকেদের ধারণা

অনুযায়ী একে বুঝতে পারবে না, এটা একধরনের ঘোরার কৌশল। আমাদের ফালুন দাফা-র ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে, এটা ঘুরতেই থাকে। এটা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে শারীরিক ক্রিয়া করার সমস্যার সমাধান করে দেয়, এটা শারীরিক ক্রিয়া করার সময়সীমা বাড়িয়ে দেয়। কীভাবে বাড়িয়ে দেয়? কারণ সে নিরন্তর ঘুরেই চলেছে এবং বিশ্বের থেকে নিরন্তর শক্তি শোষণ করে, সেই শক্তির বিবর্তন করে যাচ্ছে। তুমি কাজ করতে গেলেও সে তোমার সাধনা করে দিচ্ছে। অবশ্য শুধুমাত্র ফালুন নয়, আমরা তোমার শরীরে অনেক শক্তির কার্যপ্রণালী এবং যন্ত্রকৌশল স্থাপন করে দেব, তারা সবাই ফালুনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ঘুরতে থাকবে এবং তোমার বিবর্তন ঘটাতে থাকবে। সেইজন্যে এই গোংগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকেদের সম্পূর্ণ বিবর্তন ঘটাতে থাকবে, এটা এইরকম যেন, ''গোংগ অনুশীলনকারীর সাধনা করে দিচ্ছে,'' এটা এইভাবেও বলা যায় যে ''ফা অনুশীলনকারীর সাধনা করে দিচ্ছে।'' তুমি যখন শারীরিক ক্রিয়া করছ না তখন গোংগ তোমার সাধনা করে দিচ্ছে। আবার যখন শারীরিক ক্রিয়া করছ তখনও গোংগ তোমার সাধনা করে দিচ্ছে। তুমি যখন খাচ্ছ, ঘুমাচ্ছ, কাজ করছ সব সময়েই গোংগ তোমার বিবর্তন ঘটাচ্ছে। তুমি শারীরিক ক্রিয়া করছ কেন? তুমি শারীরিক ক্রিয়া করে ফালুনের শক্তিবৃদ্ধি করছ, এবং আমি যেসব শক্তির কার্যপ্রণালী ও যন্ত্রকৌশল তোমার শরীরে স্থাপন করেছি, সেগুলিরও শক্তিবৃদ্ধি করছ। উচ্চস্তরে সাধনার ক্ষেত্রে সবসময়ে একটা নিষ্ক্রিয়ভাব *(য়ু-য়ুই)*[35] রাখবে। শরীরের সঞ্চালনগুলো শরীরে স্থাপিত যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করে হবে। কোনো চিন্তার পরিচালনা থাকবে না, কোনো শ্বাসপ্রশ্বাসেরও ব্যাপার নেই ইত্যাদি।

আমরা শারীরিক ক্রিয়ার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা জায়গার কথা বলি না। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে: ''কোন্ সময়ে শারীরিক ক্রিয়া করা ভালো? মাঝরাতে, ভোরবেলায়, অথবা দুপুরবেলায়?'' আমরা কোনো সময়ের কথা বলি না। যখন তুমি মাঝরাতে অনুশীলন করছ না, গোংগ তোমার সাধনা করে দিচ্ছে, যখন তুমি সকালবেলায় অনুশীলন করছ না, গোংগ-ই তোমার সাধনা করে দিচ্ছে; যখন তুমি ঘুমিয়ে আছ, গোংগ-ই তোমার সাধনা করে দিচ্ছে; যখন তুমি রাস্তায় হাঁটছ, গোংগ-ই তোমার সাধনা করে দিচ্ছে; যখন কর্মস্থলে কাজ করছ, সেই সময়েও গোংগ তোমার সাধনা করে দিচ্ছে। এটা তোমার অনুশীলনের সময় অনেকটাই কমিয়ে দিল

---

[35] *য়ু-য়ুই (wuwei)* - কর্মহীন, নিষ্ক্রিয়ভাব, উদ্দেশ্যবিহীন।

না কি? আমাদের মধ্যে অনেক লোকের হৃদয়ে সত্যিকারের তাও প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, সেটাই অবশ্য সাধনার উদ্দেশ্য, সাধনার সর্বশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে তাও প্রাপ্তি এবং সাধনায় পূর্ণতা প্রাপ্তি। কিন্তু কিছু লোকের বয়স হয়ে গেছে, খুবই সীমিত কিছু বছর আর পড়ে রয়েছে, যা সাধনার জন্যে যথেষ্ট নয়। আমাদের ফালুন দাফা, সাধনার অনুশীলনের পর্বটা কমিয়ে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করে দেয়। আবার একই সাথে এটা মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি, যখন তুমি নিরন্তর সাধনা করে যাবে, তোমার জীবনও নিরন্তর বাড়তে থাকবে, অতএব নিরন্তর অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনও নিরন্তর বাড়তে থাকে। এইভাবে যেসব বয়স্ক মানুষদের জন্মগত সংস্কার ভালো তারা সাধনার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে। কিন্তু এখানে একটা শর্ত আছে, তোমার পূর্ব নির্ধারিত মূল জীবন পর্বের পরে, যতটা জীবনকাল বাড়ানো হয়েছে, সেটা পুরোটাই অনুশীলনের জন্যে দেওয়া হয়েছে। তোমার চিন্তাধারা যদি একটুও ভুল পথে যায়, তখনই তোমার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসবে, কারণ তোমার এই জীবনের পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তুমি যখনই সাধনা করে ত্রিলোক ফা সাধনা পেরিয়ে যাবে তখন এই ধরনের বিধি-নিষেধ আর থাকবে না। সেই সময়ে অন্য আর একরকম অবস্থা হবে।

আমাদের পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ দিকে তাকিয়ে অনুশীলনের প্রয়োজন নেই বা কোনো নির্দিষ্টভাবে এই অনুশীলন শেষ করারও ব্যাপার নেই। কারণ ফালুন সারাক্ষণ ঘুরেই যাচ্ছে, একে থামানো যাবে না। কোনো ফোন এলে অথবা কেউ দরজায় ঠকঠক শব্দ করলে, তুমি অনুশীলন শেষ না করে, তখনই গিয়ে অবস্থা অনুযায়ী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পার। যেই তুমি অনুশীলন থামিয়ে কোনো কিছু করবে, তৎক্ষণাৎ ফালুন ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঘুরতে থাকবে এবং মুহূর্তের মধ্যে শরীরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা শক্তিগুলোকে শোষণ করে ফিরিয়ে নেবে। তুমি যতই কৃত্রিমভাবে চি-কে দুই হাতে ধরে উপরে তুলে মাথার মধ্যে প্রবাহিত করার চেষ্টা কর না কেন, তোমার চি খোয়া যাবেই। ফালুন হচ্ছে একটা বুদ্ধিমান সত্তা, সে নিজে জানে যে কীভাবে এসব ব্যাপার করতে হয়। আমরা কোনো নির্দিষ্ট দিকের কথা বলি না, কারণ সম্পূর্ণ বিশ্বই গতিশীল, ছায়াপথ ঘুরছে, 'ন'টা বড়ো গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবীও নিজে নিজে ঘুরছে। আমরা বিশ্বের এই মহান তত্ত্ব অনুযায়ী সাধনা করি, সেখানে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর কোথায়? কোথাও নেই। যে কোনো একদিকে অনুশীলন করার অর্থ সবদিকে অনুশীলন করা; যে কোনো একদিকে অনুশীলন করলেই, সেটা

একই সাথে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে অনুশীলন করার সমান। আমাদের ফালুন দাফা-য় শিক্ষার্থীদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। কীভাবে রক্ষা করা হয়? তুমি সত্যিকারের একজন সাধক হলে আমাদের ফালুন তোমাকে রক্ষা করবে। আমার মূল এই বিশ্বে প্রোথিত, যদি কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারে, তবে সে আমারও ক্ষতি করতে পারে, পরিষ্কার করে বললে, সে এই বিশ্বেরও ক্ষতি করতে পারে। আমার কথাগুলো শুনে খুবই অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু আরও পড়তে থাকলে, পরে বুঝতে পারবে। আরও অন্য ব্যাপার আছে, সেগুলো খুবই উচ্চস্তরের, সেসব আমি বলব না। আমরা, এই উচ্চস্তরের ফা সরল থেকে প্রগাঢ়, এইরকম প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করব। যদি তোমার নিজের চরিত্র সৎ না হয় এটা কাজ করবে না, তুমি কিছু পাওয়ার প্রয়াস করলে, তাহলে হয়তো সমস্যা আসতে পারে। আমি দেখেছি পুরানো শিক্ষার্থীদের অনেকের ফালুন বিকৃত হয়ে গেছে। কেন হয়েছে? তুমি অনুশীলনের সময়ে অন্য জিনিস মিশিয়ে ফেলেছিলে, তুমি অন্যদের জিনিস রাখতে চেয়েছিলে। তাহলে ফালুন তোমাকে রক্ষা করেনি কেন? এটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে, অতএব এটা তোমার জিনিস এবং তোমার মনের নিয়ন্ত্রণে। এই বিশ্বে একটা নিয়ম হচ্ছে তুমি কোনো কিছু চাইলে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। তুমি যদি সাধনা করতে না চাও, কেউ তোমাকে দিয়ে জোর করে সাধনা করাতে পারবে না, তাহলে সেটা খারাপ কাজ করার সমান হবে। কেউ কি তোমার মনকে জোর করে পাল্টাতে পারবে? তুমি অবশ্যই, নিজেই নিজেকে সংযত রাখবে। প্রত্যেকটা পদ্ধতির ভালো জিনিস গ্রহণ করার অর্থ সবার জিনিস গ্রহণ করা। রোগ সারানোর লক্ষ্য নিয়ে, তুমি আজ এই চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করছ, কাল ওই চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করছ, তাহলে তোমার রোগ সারবে কি? সারবে না, রোগটাকে কেবলমাত্র পিছনে ঠেলে দিতে পার। উচ্চস্তরে সাধনার জন্যে একনিষ্ঠতার বিষয়টা বলতে চাই, তুমি যদি একটা পদ্ধতিতে সাধনা করতে চাও, তবে সেই পদ্ধতিতেই সাধনা করে যেতে হবে, তোমার মনকে অবশ্যই সেই পদ্ধতিতেই ধরে রাখতে হবে, যতক্ষণ না সেই পদ্ধতিতে তোমার গোংগ উন্মোচিত হয় এবং আলোকপ্রাপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র তখনই তুমি অন্য পদ্ধতিতে আবার সাধনা করতে পারবে এবং সেটা অন্য প্রণালীর জিনিস। যেহেতু সত্যিকারের একটা শিক্ষা প্রণালীর সব জিনিস সেই সুদূর অতীত কাল থেকে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, এবং তার একটা খুব জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়া আছে। কিছু লোক তাদের অনুশীলনের সময়কার অনুভূতির উপর নির্ভর করে। তোমার অনুভূতির কী মূল্য? কোনো মূল্যই নেই।

সত্যিকারের বিবর্তন প্রক্রিয়াটা অন্য মাত্রাতে হয় যা অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য, সেখানে একটুও ভুল হতে দেওয়া যায় না, ঠিক যেমন, একটা সূক্ষ্ম নির্দেশী যন্ত্রে অন্য যন্ত্রাংশ লাগালে সঙ্গে সঙ্গে সেটা খারাপ হয়ে যাবে। প্রতিটি মাত্রাতে তোমার যে শরীর আছে, সব রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য, এসবে সামান্যতম ভুল হলেও কোনো কাজ হবে না। আমি তোমাদের বলেছিলাম না যে, সাধনা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে এবং গোংগ মাস্টারের উপরে নির্ভর করে। তুমি ইচ্ছামতো অন্যদের জিনিস নিয়ে আসছ এবং নিজের অনুশীলনের সঙ্গে যোগ করছ, অন্যদের বার্তা বয়ে আনছ, যা এই পদ্ধতির জিনিসগুলোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, তুমি তখন বিপথগামী হয়ে যাবে। এছাড়া সাধারণ মানবসমাজে এর প্রতিফলন ঘটবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসবে, তোমার নিজের চাওয়ার জন্যেই এটা হচ্ছে, অন্যেরা বাধা দিতে পারবে না, এটা তোমার আলোকপ্রাপ্তির গুণ (*য়ু শিংগ* [36])-এর সমস্যা। একই সাথে তুমি যে জিনিসগুলো যোগ করেছ, সেগুলো ইতিমধ্যে তোমার গোংগ-কে এলোমেলো করে দিয়েছে, তুমি আর সাধনা করতে পারবে না, এইরকম সমস্যার উদয় হবে। অবশ্য আমি এটা বলছি না যে তোমাদের সবাইকে ফালুন দাফা-ই শিখতে হবে। ফালুন দাফা না শিখলেও, তুমি যদি অন্য কোনো চিগোংগ পদ্ধতির সত্যিকারের শিক্ষা প্রাপ্ত হও তাহলেও আমি সম্মতি দেব। কিন্তু আমি তোমাকে বলব যে সত্যিকারের উচ্চস্তরের সাধনায় একনিষ্ঠ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আর একটা ব্যাপার তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে চাই: বর্তমানে এইরকম সত্যিকারের উচ্চস্তরের সাধনার প্রচার আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি করছে না। পরবর্তীকালে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমাদের জন্যে আমি কী কাজ করছি, সেইজন্যে আশা করব তোমার আলোকপ্রাপ্তির গুণ খুব নীচু নয়। অনেক লোক উচ্চস্তরের সাধনা করতে চায়, আমি এইসব জিনিস তোমার সামনে রাখলাম, তুমি হয়তো সাড়া দিচ্ছ না, তুমি সব জায়গায় মাস্টারের জন্যে ছুটে বেড়িয়েছ, অনেক টাকাও খরচ করেছ, কিন্তু কিছুই পাওনি। আজ তোমার দরজার সামনে সব প্রদান করলাম, তুমি হয়তো বুঝতেও পারছ না! এটা হচ্ছে তুমি আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে চাও কি চাও না তার প্রশ্ন, এবং তোমাকে উদ্ধার করা যাবে কি যাবে না তার প্রশ্ন।

---

[36]আলোকপ্রাপ্তির গুণ (*য়ু শিংগ*) - বোধশক্তি

বক্তৃতা - দুই

দিব্যচক্ষুর বিষয়

অনেক চিগোংগ মাস্টার দিব্যচক্ষুর কিছু ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন স্তরে ফা-এর প্রকাশিত রূপ ভিন্ন ভিন্ন। একজন সাধক সাধনার যে স্তরে পৌঁছাবে, শুধুমাত্র সেই স্তরের দৃশ্যপটই সে দেখতে পারবে, সেই স্তরের উপরের সত্য সে দেখতে পারবে না এবং বিশ্বাসও করবে না, সেইজন্যে সে ধারণা করবে যে সে তার নিজের স্তরে যেসব জিনিস দেখছে, সেগুলোই ঠিক। সাধনার উচ্চস্তরে না ওঠা পর্যন্ত সে মনে করবে যে সেই স্তরের জিনিসগুলোর অস্তিত্ব নেই এবং সেগুলো অবিশ্বাস্য, এটা তার স্তর দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং তার চিন্তাধারা উঁচুতে উঠতে পারে না। অর্থাৎ আরও বলা যায় যে দিব্যচক্ষুর প্রশ্নে, কিছু লোক এইভাবে বলেছে তো অন্য কিছু লোক আর একভাবে বলেছে, এর ফলে তাদের কথাগুলো খুবই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, সবশেষে কেউই এই ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলতে পারেনি, প্রকৃতপক্ষে নীচু স্তরে দিব্যচক্ষু সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলা যায় না। অতীতে, দিব্যচক্ষুর গঠন প্রণালীর বিষয়টাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতম হিসাবে ধরা হতো, সাধারণ মানুষকে জানতে দেওয়া হতো না, সেইজন্যে পুরো ইতিহাসে কেউই এই ব্যাপারে কিছু বলেনি। কিন্তু আমরা এখানে অতীতের ওইসব তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে, এই ব্যাপারে বলব না, আমরা আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে, সবচেয়ে সরল এবং আধুনিক ভাষার মাধ্যমে এটার ব্যাখ্যা করব, একই সাথে এর মূল বিষয়টা নিয়ে বলব।

যে দিব্যচক্ষুর কথা আমরা বলছিলাম, সেটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের দুটো ভুরু মাঝখানে কিছুটা উপরে থাকে এবং পিনিয়াল গ্রন্থির জায়গাটার সঙ্গে যুক্ত, এটাই প্রধান পথ। মানব শরীরে আরও অনেক অনেক চোখ আছে, তাও মতে বলা হয় যে শরীরের প্রতিটি ছিদ্রের সবই হচ্ছে একটা করে চোখ, তাও মতে শরীরের আকুপাংচার বিন্দুগুলোকে ছিদ্র বলে, যেগুলোকে চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রে আকুপাংচার বিন্দু বলে। বুদ্ধ মতে বলা হয় যে প্রতিটি ঘর্মরন্ধ্র এবং লোমকূপ হচ্ছে একটা করে চোখ, সেইজন্যে কিছু ব্যক্তি কান দিয়ে পড়তে পারে, আবার কিছু লোক হাত দিয়ে এবং

মাথার পিছনটা দিয়ে দেখতে পারে, আরও কেউ কেউ পা এবং পেট দিয়ে দেখতে পারে, সবই সম্ভব।

দিব্যচক্ষুর ব্যাপারে বলতে গিয়ে, প্রথমে আমরা মানুষের এই ভৌতিক চোখ দুটোর কথা বলব। বর্তমানে, কিছু লোক মনে করে যে এই দুটো চোখ দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো পদার্থ এবং যে কোনো বস্তু দেখা সম্ভব। সেইজন্যে কিছু লোকের এরকম একগুঁয়েমী ধারণা তৈরি হয়েছে, তারা মনে করে যে এই দুটো চোখ দিয়ে যেসব জিনিস দেখা যায় একমাত্র সেগুলিই বাস্তব এবং সত্য; তারা কোনো কিছু দেখতে না পারলে, সেটাকে বিশ্বাস করে না। অতীতে এই ধরনের লোকেদের আলোকপ্রাপ্তির গুণ সবসময়েই কম মনে করা হতো, যদিও আলোকপ্রাপ্তির গুণ কেন কম সেটা কিছু লোক পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারত না। যা চোখে দেখা যায় না, তাকে বিশ্বাস করব না, এই কথাটা শুনলে বেশ যুক্তিসংগত মনে হবে। কিন্তু একটু উপরের স্তর থেকে দেখলে, এটা যুক্তিসংগত নয়। প্রতিটি সময়-মাত্রা পদার্থ দিয়ে তৈরি, অবশ্য বিভিন্ন সময়-মাত্রার পদার্থগত কাঠামোটা ভিন্ন ভিন্ন এবং এগুলোর বিভিন্ন জীবনসত্তার প্রকাশিত রূপগুলিও ভিন্ন ভিন্ন।

আমি সবাইকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বুদ্ধ মতে বলা হয় যে এই সমাজের সমস্ত ঘটনাই মায়া এবং অসত্য। কীভাবে এগুলো মায়া? বাস্তব এবং সাকার বস্তুগুলো এখানেই তোমার সামনে রয়েছে, কে এগুলোকে মিথ্যা বলবে? বস্তুর অস্তিত্বের রূপ এক রকম, কিন্তু তার প্রকাশিত যে রূপ আমরা দেখি, সেটা অন্যরকম। এছাড়া আমাদের এই চোখের একটা ক্ষমতা আছে, যা এই ভৌতিক মাত্রার বস্তুগুলোকে আমরা এখন যেরকম দেখি, সেই অবস্থায় স্থায়িত্ব প্রদান করে। বস্তুগুলো প্রকৃতপক্ষে এই অবস্থায় নেই, এমনকী আমাদের এই মাত্রাতেও এই অবস্থায় নেই। উদাহরণস্বরূপ, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে একজন মানুষকে কীরকম দেখতে লাগবে? সম্পূর্ণ শরীরটা ঢিলেঢালা এবং ছোট ছোট অণু দিয়ে তৈরি, যেগুলো বালির মতো, দানা দানা দেখতে এবং গতিশীল, ইলেকট্রন পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, সমস্ত শরীরটা যেন মোচড়াচ্ছে এবং গতিময়। শরীরের বাইরেটা মসৃণ নয় এবং সমতল নয়। এই বিশ্বের যে কোনো বস্তু - স্টীল, লোহা, পাথর সব এইরকম, এসবের ভিতরের অণুর সব উপাদানগুলিই গতিময়, তুমি সম্পূর্ণ আকারটা দেখতে পারবে না, বস্তুত এগুলোর কোনোটাই স্থির নয়, এই টেবিলটাও মোচড়াচ্ছে, কিন্তু চোখ দিয়ে সত্যটা

দেখা যাচ্ছে না, এই দুটো চোখ মানুষের সামনে একধরনের মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে।

এটা এরকম নয় যে আমরা আণুবীক্ষণিক স্তরের জিনিস দেখতে পারি না অথবা লোকেদের সেই ক্ষমতা নেই, লোকেদের জন্মগত এইরকম ক্ষমতা থাকেই এবং তারা একটা বিশেষ আণুবীক্ষণিক স্তর পর্যন্ত বস্তু দেখতে পায়। প্রকৃতপক্ষে, এই ভৌতিক মাত্রায় এই দুটো চোখ থাকার ফলে লোকেদের সামনে একটা কৃত্রিম দৃশ্যের সৃষ্টি হয় এবং তাদের আর সেসব দেখতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে অতীতে সাধনার জগতে সর্বদা মনে করা হতো যে, যেসব লোকেরা না দেখা জিনিস স্বীকার করে না, সেই ধরনের লোকেদের আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো নয়, ওইসব লোকেরা সাধারণ লোকেদের কৃত্রিম দৃশ্যের মায়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং সাধারণ লোকেদের মধ্যে হারিয়ে যায়। ধর্মগুলি চিরকাল এই কথাই বলে এসেছে, বস্তুত আমরাও দেখেছি যে ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত।

এই দুটো চোখ আমাদের এই ভৌতিক মাত্রার জিনিসগুলোকে এখনকার এইরকম অবস্থায় স্থায়িত্ব প্রদান করে, এর বাইরে এদের আর বড়ো কোনো ক্ষমতা নেই। যখন লোকেরা কোনো জিনিস দেখে, তখন প্রতিবিম্বটা সরাসরি চোখের মধ্যে তৈরি হয় না। চোখ হচ্ছে ঠিক যেন ক্যামেরার লেন্স, শুধুমাত্র একধরনের যন্ত্রের মতো কাজ করে। যখন দূরে দেখা হয় লেন্স প্রসারিত হয়ে দীর্ঘায়িত হয়, আমাদের চোখও একই ভাবে এই ধরনের কাজ করে; যখন অন্ধকার জায়গায় তাকাই আমাদের চোখের মণি বড়ো হয়ে যায়, অন্ধকার জায়গায় ছবি তোলার সময়ে, ক্যামেরার আলোকরন্ধ্রটা বড়ো হয়ে যায়, তা নাহলে কম আলো প্রবেশের জন্যে ছবিটা কালো হয়ে যাবে; বাইরে যে জায়গায় খুব আলো আছে, সেখানে গেলে তৎক্ষণাৎ তোমার মণি সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, তা নাহলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে, পরিষ্কার করে কিছু দেখতে পারবে না, একটা ক্যামেরাও একই নিয়মে কাজ করে এবং এর আলোকরন্ধ্রেরও সঙ্কুচিত হওয়া দরকার। এটা শুধু বস্তুর ছবিটাকে ধরে রাখে এবং এটা কেবল এক ধরনের যন্ত্র মাত্র। যখন আমরা সত্যি সত্যি কোনো জিনিস দেখছি অথবা একজন ব্যক্তিকে দেখছি অথবা একটা বস্তুর অস্তিত্বের রূপটাকে দেখছি, তখন প্রতিবিম্বগুলো মানুষের মস্তিষ্কে তৈরি হয়। অর্থাৎ আমরা মানুষের চোখের মধ্যে দিয়ে যা দেখছি সেটা অপটিক-নার্ভ-এর মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে, মস্তিষ্কের পিছনে পিনিয়াল গ্রন্থিতে পৌছায় এবং সেই জায়গায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ছবি তৈরি

করে। তাহলে এটা বলা যায় যে, সত্যিকারের প্রতিবিম্বিত হওয়া ছবি আমাদের মস্তিষ্কের পিনিয়াল গ্রন্থির জায়গাতেই দেখা হয়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও সেটুকু স্বীকার করা হয়েছে।

আমাদের উল্লেখিত দিব্যচক্ষু খোলার ক্ষেত্রে মানুষের অপটিক নার্ভকে এড়িয়ে যাওয়া হয়, মানুষের দুটো ভ্রুর মাঝখান দিয়ে একটা পথ খুলে যায়, যার ফলে পিনিয়াল গ্রন্থি সরাসরি বাইরেটা দেখতে পারে, একেই বলে দিব্যচক্ষুর খুলে যাওয়া। কিছু লোক ভাবে, ''এটা অবাস্তব। এই চোখ দুটো অন্তত যন্ত্রের মতো কাজ তো করতে পারে এবং বস্তুর ছবিটা ধরে রাখতে পারে, যা এই চোখ দুটো ছাড়া সম্ভবই নয়।'' আধুনিক চিকিৎসায় অধ্যয়নের সময়ে শব ব্যবচ্ছেদ করে ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে পিনিয়াল গ্রন্থির সামনের অংশটাতে মানুষের চোখের সম্পূর্ণ গঠন প্রণালী সাজানো রয়েছে। যেহেতু এটা মানুষের মাথার খুলির মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইজন্যে তারা এটাকে একটা অকেজো চোখ মনে করে। চোখটা অকেজো কি অকেজো নয়, এক্ষেত্রে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের সাধকসমাজের দ্বিধা রয়েছে। যাই হোক এটা অন্তত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে আমাদের মাথার ঠিক মাঝখানে যে জায়গা আছে সেখানে একটা চোখ আছে। আমরা যে পথ খুলে দিই সেটা প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই স্থানটাকে লক্ষ্য করেই তৈরি হয়, এবং এটা আমাদের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে ঠিকভাবে সামঞ্জস্য রেখেই ঘটে। এই চোখটা আমাদের ভৌতিক এই দুটো চোখের মতো মিথ্যা ছবি সৃষ্টি করে না এবং এটা যে কোনো জিনিসের বা পদার্থের মূল রূপটা দেখতে পারে। সেইজন্যে যে ব্যক্তির দিব্যচক্ষু খুব উচ্চস্তরের, সে আমাদের এই মাত্রা ভেদ করে অন্য সময়-মাত্রাগুলোকে দেখতে পারে, যেসব দৃশ্য সে দেখতে পারে সেটা সাধারণ মানুষ দেখতে পারে না। যাদের দিব্যচক্ষু উচ্চস্তরের নয় তাদের হয়তো কোনো কিছু ভেদ করে দেখার ক্ষমতা থাকতে পারে, তারা দেওয়াল ভেদ করে কোনো জিনিস দেখতে পারে, তারা মানুষের শরীরের ভেতরটা দেখতে পারে, তারা এইরকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে।

বুদ্ধ মতে পাঁচ রকমের দৃষ্টিশক্তির কথা বলা হয়েছে। ভৌতিক দৃষ্টি, দিব্য দৃষ্টি, জ্ঞান দৃষ্টি, ফা দৃষ্টি এবং বুদ্ধ দৃষ্টি। দিব্য চক্ষুর এই হচ্ছে পাঁচটা প্রধান স্তর, প্রত্যেকটা স্তরকে আবার উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। তাও মতে নয় গুনিত নয় অর্থাৎ একাশিটা ফা দৃষ্টির

স্তরের কথা বলা হয়েছে। আমরা এখানে সবার দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছি। কিন্তু আমরা এটা দিব্য দৃষ্টি বা তার নীচের স্তরে খুলব না। কেন খুলব না? যদিও তুমি এখানে বসে সাধনা শুরু করেছ, কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে এই সবেমাত্র অগ্রসর হতে শুরু করেছ, তোমার সাধারণ মানুষের অনেক আসক্তি এখনও দূর হয়নি। যদি তোমার দিব্য চক্ষু, দিব্য দৃষ্টি অথবা তার নীচে খোলা হয়, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলে, সেই ক্ষমতা তোমার মধ্যে আবির্ভূত হবে, তুমি দেওয়াল ভেদ করে বস্তুকে দেখতে পারবে, মানুষের শরীরের ভিতরটা দেখতে পারবে। যদি আমরা এই ক্ষমতা বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রদান করি এবং সবারই দিব্য চক্ষু এই স্তরে খুলে দিই, তাহলে সাধারণ মানবসমাজে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, সাধারণ মানবসমাজের পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটবে। দেশের সব গোপনীয়তা ধরে রাখা যাবে না; লোকেদের কাপড় পরে থাকা বা না পরে থাকা একই ব্যাপার হয়ে যাবে; লোকেরা বাড়ির মধ্যে রয়েছে, তুমি বাইরে থেকে সব দেখতে পারবে; তুমি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে যখন লটারির জায়গা দেখবে, তখন সবসময়ে হয়তো প্রথম পুরস্কার জিতে নেবে। এসব কখনোই হতে দেওয়া যায় না! তোমরা সবাই চিন্তা কর, যদি সবার দিব্যচক্ষু দিব্য দৃষ্টির স্তরে খোলা থাকে তাহলে সেটাকে কি মানবসমাজ বলা যাবে! যে ঘটনা, মানবসমাজে গুরুতর বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে, তাকে নিশ্চিতভাবে ঘটতে দেওয়া যাবে না। আমি যদি সত্যিই তোমার দিব্যচক্ষু এই স্তরে খুলে দিই, তুমি সম্ভবত এক্ষুনি চিগোংগ মাস্টার হয়ে যাবে। পূর্বে কেউ কেউ চিগোংগ মাস্টার হওয়ার কথা ভাবত, যদি তার দিব্যচক্ষু অকস্মাৎ খোলা হয়, তাহলে সে সত্যিই রোগের চিকিৎসা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে আমি কি তোমাকে খারাপ পথে নামিয়ে আনছি না?

তাহলে কোন্ স্তরে আমি তোমার দিব্যচক্ষু খুলব? আমি তোমার দিব্যচক্ষু সরাসরি জ্ঞান দৃষ্টির স্তরে খুলব। আরও উঁচু স্তরে খোলার ক্ষেত্রে তোমার চরিত্র যথেষ্ট নয়; আরও নীচে খুললে সাধারণ মানবসমাজে ভীষণ বিপর্যয় ঘটবে। জ্ঞান দৃষ্টির স্তরে খুললে দেওয়াল ভেদ করে বস্তুকে দেখা বা মানুষের শরীরের ভেতরটা দেখা, এই ধরনের ক্ষমতা থাকবে না, কিন্তু তুমি অন্য মাত্রায় বিদ্যমান দৃশ্যগুলি দেখার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। এতে কী লাভ হবে? এর ফলে তোমার সাধনার উপরে আস্থা শক্তিশালী হবে, বাস্তবে তুমি যখন কিছু জিনিস দেখতে পারছ যেটা সাধারণ মানুষ দেখতে পারছে না, তখন তোমার বোধ হবে যে সত্যিই এটার অস্তিত্ব আছে।

বর্তমানে তুমি যদি পরিষ্কার দেখতে পার তো ঠিকই আছে, যদি পরিষ্কার দেখতে নাও পার তাহলেও ঠিক আছে, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, তোমার দিব্যচক্ষু এই স্তরেই খোলা হবে, এবং তোমার অনুশীলনের পক্ষেও সেটা মঙ্গলদায়ক। একজন সত্যিকারের দাফা-র সাধক, যদি চরিত্রের আবশ্যকতার প্রতি কঠোর থেকে নিজের উন্নতি করতে পারে, তাহলে এই বই পড়ে সে একই ফল প্রাপ্ত হবে।

কোনো ব্যক্তির দিব্যচক্ষুর স্তর কীসের দ্বারা নির্ধারিত হবে? তোমার দিব্যচক্ষু খোলার পরে তখন সবকিছু দেখতে পারবে, এটা সেরকম নয়, এখানে স্তরেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহলে স্তরের নির্ধারণ কী দিয়ে হবে? এর তিনটে কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, দিব্যচক্ষুর অবশ্যই একটা ক্ষেত্র থাকবে, যেটা ভেতর থেকে বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত, যাকে আমরা বলি চি-এর সারবস্তু। এটা কী কাজ করে? এটা ঠিক যেন টেলিভিশন-এর পর্দার মতো: ফসফোর না থাকলে যদি টেলিভিশন চালানো হয়, তাহলে এটা শুধু আলোর বাল্ব মাত্র, আলো আছে, কোনো ছবি নেই। বস্তুত এই ফসফোর থাকলে তবেই তার দ্বারা ছবি প্রকাশিত হবে। অবশ্য এই উদাহরণটা ঠিক ততটা যথাযথ নয়। কারণ আমরা কোনো কিছু সরাসরি দেখি, আর টেলিভিশন ছবি প্রদর্শন করে পর্দার মাধ্যমে, সাধারণভাবে এটাই এর অর্থ। এইটুকু চি-এর সারবস্তু খুবই মূল্যবান, এটা সদ্‌গুণ-এর থেকে নিষ্কাশিত করে আনা আরও পরিশ্রুত জিনিস দিয়ে তৈরি। সাধারণত প্রত্যেকটি মানুষের চি-এর সারবস্তু আলাদা, হয়তো দশ হাজার লোকের মধ্যে দুইজন একই স্তরে।

এই দিব্যচক্ষুর স্তর হচ্ছে এই বিশ্বের ফা-এর সরাসরি প্রকাশ, এটা একটা অতিপ্রাকৃত জিনিস এবং একজন ব্যক্তির চরিত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদি কোনো ব্যক্তির চরিত্রের স্তর নীচু হয় তাহলে তার দিব্যচক্ষুর স্তরও নীচু হবে। যেহেতু সেই ব্যক্তির চরিত্র নীচু, সেইজন্যে তার চি-এর সারবস্তু অনেকটা খোয়া গেছে; আর যে ব্যক্তির চরিত্র খুব উঁচুতে, যে নিজের জীবনে ছোট থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত, এই সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে খ্যাতি, লাভ, পারস্পরিক মতভেদ, ব্যক্তিগত লাভ, নানান ধরনের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষাগুলোকে খুবই নিস্পৃহভাবে দেখেছে, সম্ভবত তার চি-এর সারবস্তু অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে, সেইজন্যে দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার পরে সে তুলনামূলকভাবে আরও পরিষ্কার করে কোনো কিছু দেখতে পারে। ছয় বছর বয়সের নীচের

বাচ্চারা, দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার পরে খুবই পরিষ্কার দেখতে পারে, এদের ক্ষেত্রে দিব্যচক্ষু খোলাটাও সহজ, আমি একটা কথা বললেই, এদের দিব্যচক্ষু খুলে যাবে।

এই মানবসমাজ যেন বিশাল এক রঙের গামলা, এর নোংরার প্রচন্ড স্রোতে লোকেরা এমন ভাবে কলুষিত হয়ে যাচ্ছে যে, তারা যা কিছু উচিত ব্যাপার মনে করছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রায় সবই ভুল। লোকেরা সবাই ভালোভাবে জীবন কাটাতে চায় না কি? কেউ ভালোভাবে জীবন কাটাতে চাইলেই, হয়তো অন্যের স্বার্থে আঘাত পড়বে, হয়তো তার নিজের স্বার্থপর মানসিকতা আরও প্ররোচিত হবে, সম্ভবত সে অন্যের লাভগুলোকে নিজে অধিকার করবে, অথবা জোর করে অন্যের থেকে সুবিধা আদায় করবে এবং অন্যের ক্ষতি করবে। লোকেরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং লড়াই করছে, এটা বিশ্বের প্রকৃতির বিপরীত দিকে যাচ্ছে না কি? সেইজন্যে লোকেরা যেটা ঠিক মনে করছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে ঠিক নয়। বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর সময়ে বড়োরা প্রায়ই শেখায়, ‘‘তোমাকে পড়াশুনা শিখে একটু চালাকচতুর হতে হবে,’’ যাতে ভবিষ্যতে সাধারণ মানবসমাজে সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো একটা জায়গা করে নিতে পারে। কিন্তু এই ‘‘চালাকচতুর’’ হওয়াটা ইতিমধ্যে আমাদের এই বিশ্বের দৃষ্টিতে ভুল। কারণ আমরা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে হতে দেওয়াকে বিশ্বাস করি এবং ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ দৃষ্টি রাখতে বলি। এইরকম চালাকচতুর হওয়ার মানে নিজের স্বার্থের পিছনে ছোটা। ‘‘কেউ তোমার সাথে জবরদস্তি করলে, তুমি তার শিক্ষকের খোঁজ করবে, তার বাবা-মার খোঁজ করবে,’’ ‘‘যদি দেখো কোথাও টাকা পড়ে আছে তাহলে সেটা তুলে নেবে,’’ বাচ্চাকে এভাবেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ছোট থেকে বড়ো হওয়ার পথে, সে এইভাবে অনেক জিনিস পেতে থাকবে, ধীরে ধীরে এই সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে তার স্বার্থপর মানসিকতা আরও প্রবল হতে থাকবে, সে অন্যের থেকে সুবিধা আদায় করতে থাকবে, তার সদ্‌গুণ খোয়া যাবে।

এই সদ্‌গুণ বস্তুটা খোয়া যাওয়ার পরে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, সেটা রূপান্তরিত হয়ে অন্যের কাছে চলে যায়, কিন্তু তার এই চি-এর সারবস্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। যদি কেউ ছোট থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত খুব ধুরন্ধর হয় ও নিজের স্বার্থের প্রতি খুব জোর দেয়, এবং শুধুমাত্র লাভের পিছনেই ছুটতে থাকে, এই ধরনের লোকেদের দিব্যচক্ষু

খুলে গেলেও তা কাজ করে না, অথবা সে পরিষ্কার দেখতে পায় না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটা আর কোনোদিনই কাজ করবে না। এর কারণ কী? কারণ সাধনার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের মূলে ফিরতে চাই এবং সত্যে ফিরতে চাই, নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে এই ক্ষতিটা বিরামহীনভাবে পূরণ হতে থাকে এবং এটার পুনঃপ্রাপ্তি হয়। সেইজন্যে আমরা চরিত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলি, আমরা সামগ্রিকভাবে উন্নতির কথা বলি এবং সামগ্রিকভাবে উঁচুতে ওঠার কথা বলি। চরিত্রের উন্নতি হলে তার সঙ্গে অন্য সবকিছুরও উন্নতি হবে; যদি চরিত্রকে উন্নত না করা যায় তাহলে ওই চি-এর সারবস্তুটুকু পুনরুদ্ধার করা যাবে না, এটাই নিয়ম।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার যদি ভালো থাকে, তাহলে নিজে নিজে শারীরিক ক্রিয়া অনুশীলন করার সময়ে, তার দিব্যচক্ষু খুলে যেতে পারে। প্রায়শ দিব্য চক্ষু খোলার মুহূর্তটাতে অনেক লোক ভয়ে চমকে ওঠে। কেন ভয়ে চমকে ওঠে.? এর কারণ, লোকেরা সাধারণত মাঝরাতে শারীরিক ক্রিয়া করে যখন সবকিছু অন্ধকার ও নিস্তব্ধ থাকে। সে শারীরিক ক্রিয়া করেই যাচ্ছে, করেই যাচ্ছে এমন সময়ে সে হঠাৎ তার নিজের চোখের সামনে একটা বড়ো চোখ দেখতে পায়, সে ভয়ে চমকে ওঠে, সে সাংঘাতিকভাবে ভয় পেয়ে যায়, এর পরে সে পুনরায় শারীরিক ক্রিয়া করতে সাহস পায় না। কত ভয়ের ব্যাপার! একটা বিরাট চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখটা একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে, একেবারে জীবন্ত ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেইজন্যে কিছু লোক একে রাক্ষসের চোখ বলে, আবার কেউ কেউ বলে বুদ্ধর চোখ, ইত্যাদি, প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার নিজেরই চোখ। অবশ্য সাধনা তোমার নিজের উপর নির্ভর করে এবং গোংগ নির্ভর করে মাস্টারের উপরে। সাধকের গোংগ-এর সম্পূর্ণ বিবর্তন প্রক্রিয়াটা অন্য মাত্রাতে ঘটে এবং এটা একটা খুবই জটিল প্রক্রিয়া, এটা শুধু যে অন্য একটা মাত্রাতেই ঘটছে তা নয়, শরীরটা সমস্ত মাত্রাগুলোর প্রত্যেকটাতেই রূপান্তরিত হচ্ছে। তোমার নিজের দ্বারা কি এটা করা সম্ভব? কখনোই করতে পারবে না। এ সমস্ত ব্যাপার মাস্টারই ব্যবস্থা করেন এবং মাস্টারই এটা করেন, এইজন্যেই বলা হয় যে সাধনা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে এবং গোংগ মাস্টারের উপরে নির্ভর করে। তোমার শুধু এই ধরনের ইচ্ছা থাকতে হবে, আর এইরকম চিন্তা থাকতে হবে। সত্যিকারের জিনিসগুলি মাস্টারই করেন।

কিছু লোক নিজেদের অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য চক্ষুর উন্মোচন ঘটাতে পারে, আমরা বলি যে এটা তোমার নিজের চোখ, কিন্তু তুমি নিজে এর বিবর্তন ঘটাতে পারবে না। কারোর কারোর মাস্টার থাকে, সেই মাস্টার যখন দেখেন যে তোমার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে, তিনি তখন একটা চোখের বিবর্তন ঘটিয়ে দেন, এটাকেই বলে সত্যিকারের চোখ। অবশ্য কিছু লোকের মাস্টার নেই, কিন্তু কোনো মাস্টার হয়তো পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বুদ্ধ মতে বলে: ''বুদ্ধ সর্বত্র বিরাজমান,'' অর্থাৎ তাঁদের সংখ্যা এতই বেশী যে তাঁরা সব জায়গায় আছেন। কিছু লোক বলে: ''মাথার তিন ফুট উপরে দেবতারা আছেন।'' অর্থাৎ তাঁদের সংখ্যা অগুনতি। পাশ দিয়ে যাওয়া কোনো মাস্টার যদি দেখেন যে তোমার সাধনা খুব ভালো হয়েছে এবং দিব্যচক্ষু খুলে গেছে, কিন্তু তোমার চোখের অভাব আছে, তিনি তখন একটা চোখ বিবর্তিত করে দেবেন, এটাকে তোমার সাধনার ফল হিসাবেই গণ্য করা হবে। কারণ লোকেদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁরা কোনো শর্ত দেন না বা কোনো পুরস্কারের বা খ্যাতির হিসাব করেন না, তাঁরা সাধারণ লোকেদের নায়কদের তুলনায় অনেক বেশী মহৎ। তাঁরা এটা পুরোপুরি করুণাভাববশতই করে থাকেন।

কোনো ব্যক্তির দিব্যচক্ষু খোলার পরে একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়: চোখ দুটো আলোতে ভীষণভাবে ধাঁধিয়ে যায়, এবং জ্বালা বোধ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তোমার নিজের চোখে জ্বালা হচ্ছে না, জ্বালা হচ্ছে পিনিয়াল গ্রন্থিতে, যদিও তোমার মনে হবে যেন তোমার নিজের চোখেই জ্বালা হচ্ছে। এর কারণ তুমি এখনও এই চোখটা পাওনি, এই চোখটা বসিয়ে দেওয়ার পরে তুমি আর চোখে জ্বালা বোধ করবে না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই চোখটাকে অনুভব করতে পারবে এবং দেখতে পারবে। যেহেতু এর প্রকৃতি বিশ্বের মতো একই, সেইজন্যে এ খুব সরল এবং ভীষণ কৌতূহলী, এ তোমার ভিতরটা দেখে, দেখে যে তোমার দিব্য চক্ষু খুলেছে কি খোলেনি এবং তুমি সেটা দিয়ে দেখতে পারছ কি পারছ না, এ তোমার ভিতরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তোমার যে সময়ে দিব্যচক্ষু খুলেছিল, তখন সত্যি সত্যি সে তোমাকে দেখছিল, সেইজন্যে হঠাৎ একে দেখে তুমি ভয়ে চমকে উঠেছিলে। প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার নিজেরই চোখ, এরপরে যে জিনিসই তুমি দেখবে সেটা এই চোখ দিয়েই দেখবে, তুমি এই চোখটা ছাড়া একেবারেই দেখতে পারবে না, এমনকী দিব্যচক্ষু খুলে গেলেও, দেখতে পারবে না।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে সাধনার স্তর ভেদ করার সময়ে প্রতিটি মাত্রায় যে পার্থক্যগুলো ফুটে ওঠে, সেই বিষয়গুলিই আসলে একজন ব্যক্তির স্তর নির্ধারণ করে। কোনো জিনিস দেখার জন্যে প্রধান পথ ছাড়াও লোকেদের অনেক উপপথ থাকতে পারে। বুদ্ধ মতে বলা হয় যে প্রতিটি ঘর্মরন্ধ্র হচ্ছে একটা করে চোখ, তাও মতে বলা হয় যে শরীরের প্রতিটি ছিদ্রপথই একটা করে চোখ অর্থাৎ সমস্ত আকুপাংচার বিন্দুগুলি একটা করে চোখ। অবশ্যই তারা যা বলছে সবই মানবশরীরে ফা-এর বিবর্তনের এক ধরনের রূপ, শরীরের যে কোনো জায়গা দিয়েই দেখা সম্ভব।

কিন্তু আমরা যে স্তরের কথা বলছি সেটা এর থেকে আলাদা। প্রধান পথ ছাড়া কয়েকটা জায়গায় কতকগুলি উপপ্রধান পথ আছে যেমন, দুটো চোখের ভ্রুতে, চোখের পাতার উপরে ও নীচে, এবং দুটো ভ্রুর মাঝখানে, *শানগেন* বিন্দু[37]। এগুলোই একজন ব্যক্তির স্তর ভেদ করার বিষয়টা নির্ধারণ করে। অবশ্য যদি একজন সাধারণ সাধক, ওই জায়গাগুলো দিয়ে দেখতে পারে, তাহলে সে ইতিমধ্যে খুব উঁচু স্তর ভেদ করে গেছে। কিছু লোক নিজের চোখ দিয়েই দেখতে পারে, তারা সাধনায় সফল হয়েই এই চোখ পেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশও এই চোখ দুটোতে থাকতে পারে। কিন্তু এই চোখ ঠিকভাবে ব্যবহার না করলে সে সবসময় একটা বস্তু দেখতে পারছে, অন্য বস্তুটা দেখতে পারছে না, এটাও ঠিক নয়। সেইজন্যে কেউ কেউ কোনো কিছু দেখার সময়ে একটা চোখে একটা দিক দেখে তো অন্য চোখে অন্য দিকটা দেখে। এই চোখ (ডান চোখ)-এর নীচে কোনো উপপ্রধান পথ নেই, কারণ এর সঙ্গে ফা-এর সরাসরি সম্পর্ক আছে, লোকেরা খারাপ কাজ করার সময়ে ডান চোখ ব্যবহার করে, সেইজন্যে ডান চোখের নীচে কোনো উপপ্রধান পথ নেই। ত্রিলোক ফা সাধনার সময়ে যে কয়েকটা উপপ্রধান পথ সৃষ্টি হয়, সেগুলির কথাই বললাম।

অত্যন্ত উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়ে এবং ত্রিলোক ফা সাধনা পেরিয়ে যাওয়ার পরে পুঞ্জাক্ষির মতো একধরনের চোখের আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ মুখমন্ডলের উপরের অর্ধে অসংখ্য ছোট ছোট চোখের সমন্বয়ে গঠিত একটা বিরাট চোখ বিকশিত হয়। খুব উঁচুস্তরের কোনো কোনো মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা সাধনার দ্বারা এতই প্রচুর চোখ সৃষ্টি করেন যা তাঁর

[37] *শানগেন* বিন্দু -দুটি ভ্রুর মাঝে অবস্থিত আকুপাংচার বিন্দু।

পুরো মুখমন্ডল জুড়ে থাকে। এই সব চোখগুলি এই বিরাট চোখের মাধ্যমেই সবকিছু দেখে, তিনি যা দেখতে চান তাই দেখতে পারেন, একবার তাকালেই তিনি সমস্ত স্তরগুলি দেখতে পারেন। বর্তমানে প্রাণীবিদ্যা বিশারদেরা এবং পতঙ্গ বিজ্ঞানীরা মাছির উপরে গবেষণা করছেন। মাছির চোখ খুব বড়ো, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট চোখ দেখা গেছে, একেই বলে পুঞ্জাক্ষি। সাধনায় খুব উঁচুস্তরে পৌঁছে গেলে, এই পরিস্থিতির উদয় হয়, তথাগতর থেকে অনেক উঁচুতে উঠতে পারলে তবেই এই পরিস্থিতির উদয় হবে। তবে সাধারণ মানুষ এসব দেখতে পারবে না, সাধারণ স্তরের লোকেরা এই চোখের অস্তিত্ব দেখতে পারবে না, যেহেতু এটা অন্য স্তরে বিদ্যমান সেইজন্যে তারা ওই ব্যক্তিকে কেবল একজন সাধারণ মানুষের মতনই দেখবে। এটাই হচ্ছে স্তর ভেদের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে নানান ধরনের মাত্রাগুলিকে ভেদ করতে পারার বিষয়।

আমি মূলগতভাবে দিব্যচক্ষুর গঠনটা বর্ণনা করলাম। আমরা বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগ করে তোমার দিব্যচক্ষু খুলে দেব, সেটা তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি এবং সহজ হবে। আমি যখন দিব্যচক্ষু নিয়ে বলছিলাম, তোমরা প্রত্যেকে কপালে একটা শক্ত ভাব অনুভব করেছিলে, যেন মাংসপেশীগুলো একসাথে জড় হয়ে তুরপুন দিয়ে ছিদ্র করার মতো ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছিল। ওই রকম হচ্ছিল কি হচ্ছিল না? ওই রকমই হচ্ছিল। যত তোমরা এখানে সত্যি সত্যি মনের আসক্তিগুলোকে পিছনে ফেলে দিয়ে ফালুন দাফা শিখতে থাকবে, তোমাদের প্রত্যেকের ওই অনুভবটা হবে যেন একটা অত্যন্ত প্রচন্ড শক্তি ভিতরের দিকে চাপ দিচ্ছে। আমি একটা বিশেষ গোংগ পাঠিয়েছি যেটা তোমার দিব্যচক্ষু খুলে দেবে, একই সাথে আমি ফালুন পাঠিয়েছি তোমার দিব্যচক্ষু সারিয়ে ঠিক করার জন্যে। আমি যখন দিব্যচক্ষু নিয়ে বলছিলাম, সেই সময়ে যারা শুধু ফালুন দাফা-র সাধনা করে, তাদের প্রত্যেকের দিব্যচক্ষু আমি খুলে দিয়েছি, তবে প্রত্যেকেই যে নিশ্চিতভাবে পরিষ্কার দেখবে তা নয়, আবার প্রত্যেকেই যে নিশ্চিতভাবে দেখতে পারবে তাও নয়, এর সঙ্গে তোমার নিজের সরাসরি সম্পর্ক আছে। চিন্তা করবে না, দেখতে না পারলেও সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, সময় নিয়ে সাধনা চালিয়ে যেতে থাক। তুমি নিরন্তর নিজের স্তরের উন্নতি করতে থাকলে, সেই সময়ে তুমি ধীরে ধীরে দেখতে সক্ষম হবে, তোমার অস্পষ্ট দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকবে। যদি তুমি সাধনা করতে পার, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধনা করতে পার, তাহলে তুমি যা কিছু হারিয়েছিলে সবই ফিরে পাবে।

নিজে নিজে দিব্যচক্ষু খোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন। নিজে নিজে দিব্যচক্ষু খোলাটা কয়েক প্রকারের হয়, সেগুলো আমি তোমাদের বলব। যেমন আমাদের কেউ কেউ বসে ধ্যান করার সময়ে যখন কপাল এবং দিব্যচক্ষুকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে, তখন কপালের মধ্যে অন্ধকার অনুভব করবে এবং দেখবে কোনো কিছুই সেখানে নেই। যত সময় কাটতে থাকবে সে দেখবে যে কপালটা ধীরে ধীরে সাদা হয়ে উঠছে। কিছু কাল সাধনার পরে সে আবিষ্কার করবে যে কপালটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, পরে উজ্জ্বলভাব কেটে গিয়ে লাল হয়ে উঠবে। এই সময়ে এটি প্রস্ফুটিত হতে থাকবে ঠিক যেরকম টিভিতে বা সিনেমাতে একটা ফুলকে কুঁড়ি থেকে এক লহমায় পাপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়, এইরকম দৃশ্যের উদয় হবে। শুরুতে লাল রঙ সমতল অবস্থায় থাকবে, তারপরে হঠাৎ মাঝখানটা ফুলে উঠবে এবং নিরন্তর প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। তুমি যদি নিজে একে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত করতে চাও, সেক্ষেত্রে আট-দশ বছরও যথেষ্ট নয়, কারণ পুরো দিব্যচক্ষুই অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

কিছু লোকের দিব্যচক্ষু অবরুদ্ধ থাকে না, তাদের একটা পথও থাকে, কিন্তু কোনো শক্তি নেই যেহেতু তারা চিগোংগ অনুশীলন করেনি, সেইজন্যে তারা যখন চিগোংগ অনুশীলন শুরু করে, হঠাৎ একটা কালো গোল বস্তু চোখের সামনে উদয় হয়। কিছুদিন চিগোংগ অনুশীলন করার পরে, সেটা ধীরে ধীরে সাদা হতে থাকে, তারপরে সাদা থেকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকে, শেষে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে, চোখ যেন কিছুটা ঝলসে গেল এইরকম অনুভব হতে থাকে। সেইজন্যে কিছু লোক বলে: ‘‘আমি সূর্য দেখেছি’’ অথবা ‘‘আমি চাঁদ দেখেছি।’’ বস্তুত তুমি সূর্যও দেখনি, চাঁদও দেখনি। তাহলে তুমি কী দেখেছিলে? এটা তোমারই ওই রন্ধ্রপথ। কিছু লোক অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি স্তরগুলিকে ভেদ করতে পারে, তারা চোখ স্থাপন করে দেওয়ার পরে সরাসরি দেখতে পারে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে এটা খুবই কঠিন, যখন সে চিগোংগ-এর অনুশীলন করে, তখন সে বোধ করে যে সে যেন দৌড়ে এই রন্ধ্রপথ দিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে, এই পথটা যেন সুড়ঙ্গের মতো বা কুয়োর মতো, এমনকী ঘুমানোর সময়েও সে অনুভব করে যেন নিজে দৌড়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে। কেউ কেউ বোধ করে যেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত যাচ্ছে, কেউ কেউ বোধ করে যেন উড়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ বোধ করে যেন দৌড়েই যাচ্ছে, কেউ কেউ বোধ করে যেন গাড়িতে বসে বেগে

বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা সর্বদা অনুভব করে যেন বেগে গিয়েও শেষপ্রান্তে কিছুতেই পৌঁছাতে পারছে না, যেহেতু নিজে নিজে দিব্যচক্ষু খোলা খুবই কঠিন। তাও মতে মানুষের শরীরকে একটা ছোট বিশ্ব মনে করা হয়, যদি এটা ছোট বিশ্ব হয়, সবাই তাহলে চিন্তা কর যে, কপাল থেকে পিনিয়াল গ্রন্থি পর্যন্ত দূরত্বটা একশ' আট হাজার *লি*[৩৮]-এরও বেশী, সেইজন্যে লোকেরা সবসময়েই বোধ করে যেন বেগে বাইরের দিকে বেরোলেও, শেষপ্রান্তে কিছুতেই পৌঁছাতে পারছে না।

তাও মতে মানুষের শরীরকে ছোট বিশ্ব হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তার অনেক কারণ আছে। কিন্তু তারা এটা বলে না যে এর গঠন প্রণালী এই বিশ্বের মতন, এছাড়া এই বস্তুগত মাত্রাতে, আমাদের শরীরের অস্তিত্বের যে রূপ তার সম্বন্ধেও তারা কিছু বলে না। আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী, বস্তুগত শরীরের কোষের নীচের স্তরের অবস্থাটা কী? সেখানে আছে নানান ধরনের আণবিক উপাদান, অণুর পরে আছে পরমাণু, প্রোটন, নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন এবং কোয়ার্ক। এখনও পর্যন্ত গবেষণা অনুযায়ী সূক্ষ্মতম কণা হচ্ছে নিউট্রিনো। তাহলে সবচেয়ে সূক্ষ্মতম কণা কী? বাস্তবে এর গবেষণা করা খুবই কঠিন। শাক্যমুনি জীবনের শেষের বছরগুলিতে এই বক্তব্য করেছিলেন: ''এটা এতই বিশাল যে এর বাহির বলে কিছু নেই, আবার এতই সূক্ষ্ম যে এর ভিতর বলে কিছু নেই।'' এর অর্থটা কী? এই তথাগত স্তরেও, বিশ্ব এত বিশাল যে, এর সীমারেখা দেখা যায় না, আবার এতই ক্ষুদ্র যে, এর পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্মতম কণাও দেখা যায় না। সেইজন্যেই উনি বলেছিলেন: ''এটা এতই বিশাল যে এর বাহির বলে কিছু নেই এবং এতই সূক্ষ্ম যে এর ভিতর বলে কিছু নেই।''

শাক্যমুনি তিন হাজার সীমাহীন বিশ্বের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের বিশ্বের মধ্যে এবং এই ছায়াপথের মধ্যে তিন হাজার গ্রহ আছে যেখানে আমাদের মানবজাতির মতোই এইরকম শরীরসম্পন্ন জীবন সত্তা আছে। তিনি এও বলেছিলেন যে একটা বালির দানার মধ্যে এইরকম তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব আছে। তাহলে একটা

---

[38] *লি* - চীন দেশের দূরত্ব মাপার একক(=0.5km)। চীনা ভাষায় ''108 হাজার লি'' শব্দটি বা কথাটি বিশাল কোনো দূরত্ব বর্ণনা করার সময়ে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বালির দানা একটা বিশ্বের মতোই, যার ভিতরে আছে, আমাদের মতনই জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, এইরকমই গ্রহ, পাহাড় এবং নদী। শুনে খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়! যদি এটা এইরকমই হয়, তাহলে সবাই চিন্তা কর ওই বিশ্বগুলির মধ্যেও কি বালি নেই? সেক্ষেত্রে ওই বালির প্রত্যেকটা দানার মধ্যেও কি তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব নেই? তাহলে ওই তিন হাজার সীমাহীন বিশ্বের মধ্যে কি বালি নেই? আবার ওই বালির প্রত্যেকটা দানার মধ্যেও কি তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব নেই? অতএব এই তথাগত বুদ্ধের স্তরে থেকেও এর শেষ দেখতে পারবে না।

একই কথা মানুষের আণবিক কোষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লোকেদের প্রশ্ন হচ্ছে এই বিশ্ব কত বড়ো, আমি তোমাদের বলব যে, এরও সীমা আছে, এমনকী তথাগত স্তরেও একে দেখে কিন্তু সীমাহীন এবং অন্তহীন ভাবে বিশাল মনে হবে। আবার মানুষের শরীরের ভিতরটা, অণু থেকে শুরু করে, পরের দিকে আরও আণুবীক্ষণিক স্তরের আণুবীক্ষণিক কণা পর্যন্ত, এই বিশ্বেরই মতন বিশাল, শুনে খুব অবিশ্বাস্য মনে হয়। যখন একজন মানুষ বা একটা জীবন তৈরি হয়, সেই জীবনের অনুপম উপাদান সমূহ এবং তার প্রকৃতি ইতিমধ্যে অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে তৈরি হয়ে থাকে। অতএব এই জিনিসের উপরে গবেষণার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান অনেক পিছিয়ে আছে। সমগ্র বিশ্বের অন্যান্য গ্রহের উচ্চতর জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন জীবনদের তুলনায় আমাদের মানবজাতির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মান খুবই নীচুতে। এমনকী একই সময়ে একই স্থানে অবস্থিত অন্য মাত্রাগুলিকে আমরা ভেদ করতে পারি না, অথচ অন্য গ্রহের উড়ন্ত চাকিগুলো অন্য মাত্রাগুলিকে সোজাসুজি ভেদ করে যাতায়াত করতে পারে, এমনকী ওই সময়-মাত্রার ধারণাতেও পরিবর্তন ঘটে যায়। এইপ্রকারে ওগুলো যখন খুশি যেতে আসতে পারে, এবং এত দ্রুত যায় যে মানুষের মন এটাকে মেনে নিতে পারে না।

দিব্যচক্ষু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা ওই বিষয়টা আলোচনা করলাম কারণ তুমি রন্ধ্রপথ দিয়ে দৌড়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে, তোমার বোধ হবে এটা সীমাহীন এবং অন্তহীন। কেউ হয়তো অন্যরকম পরিস্থিতি দেখতে পারে: তার অনুভব হবে সে যেন কোনো সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে দৌড়াচ্ছে না, বরঞ্চ সে যেন একটা চওড়া, সীমাহীন ও অন্তহীন রাস্তা দিয়ে দৌড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই রাস্তার দুই দিকে আছে পাহাড়, জল এবং শহর, সে সর্বদা বাইরের দিকে দৌড়েই যাচ্ছে, এটা শুনে আরও অবিশ্বাস্য মনে হতে

পারে। আমার একজন চিগোংগ মাস্টার-এর কথা মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন: ‘‘মানুষের শরীরের একটা ঘর্মরন্ধ্রের মধ্যেও একটা শহর আছে, যেখানে ট্রেন এবং গাড়ি চলছে।’’ এটা শুনে অন্য লোকেরা বিস্ময় বোধ করবে এবং ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই অকল্পনীয় মনে হবে। সবাই জান যে পদার্থের আণুবীক্ষণিক কণাগুলি হচ্ছে অণু, পরমাণু, প্রোটন, সবশেষে আরও নীচের দিকে অনুসন্ধান করে যেতে থাকলে, যদি প্রত্যেকটা স্তরের কোনো একটা বিন্দুকে না দেখে, যদি সেই স্তরের উপরিতলটাকে দেখতে পার, অর্থাৎ তুমি যদি দেখতে পার অণুর উপরিতল, পরমাণুর উপরিতল, প্রোটনের উপরিতল, নিউক্লিয়াসের উপরিতল, সেক্ষেত্রে তুমি বিভিন্ন মাত্রার অস্তিত্বের রূপকে দেখতে পারবে। মানুষের শরীর সমেত, সমস্ত পদার্থ ও এই বিশ্বের মাত্রাগুলোর সমস্ত স্তর, সবকিছুই একই সাথে বিদ্যমান এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানে পদার্থের আণুবীক্ষণিক কণাগুলির উপরে গবেষণা করার সময়ে, শুধু একটা আণুবীক্ষণিক কণাকে বিশ্লেষণ ও বিদারণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়, এবং এর নিউক্লিয়াসের বিদারণের পরে বিদারণ-পরবর্তী উপাদানগুলিকে পরীক্ষা করা হয়। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে কোনো স্তরের অণুর ও পরমাণুর উপাদানগুলির সম্পূর্ণ প্রকাশটা প্রসারিত করে দেখতে পারা যায় এবং যদি এই দৃশ্য দেখা যায়, তাহলে তুমি এই মাত্রা অতিক্রম করে যাবে এবং অন্য মাত্রায় বিদ্যমান সত্যটা দেখতে পারবে। মানুষের শরীর বাইরের মাত্রাগুলোর অনুরূপ, এদের সবারই এইরকম অস্তিত্বের রূপ রয়েছে।

কেউ নিজে দিব্যচক্ষু খুললে সেক্ষেত্রে আরও নানান রকমের পরিস্থিতি হতে পারে, আমরা প্রধানত কিছু ঘটনা সম্বন্ধে বলেছি যেগুলি তুলনামূলকভাবে হামেশাই দেখা যায়। কিছু লোক দেখতে পায় যে তার দিব্যচক্ষু ঘুরছে, যারা তাও মতে সাধনা করে তারা প্রায়ই দেখতে পায় যে তাদের দিব্যচক্ষুর ভিতরের দিকটা ঘুরছে, এরপরে তাইজি প্লেটটা ‘‘ফট’’ করে খুলে যাওয়ার পরে, তারা ছবিগুলো দেখতে পারে। তবে তাইজি প্লেট তোমার মাথার মধ্যে ছিল না। মাস্টার একদম শুরুর দিকে কতকগুলো জিনিসের একটা সেট তোমার মধ্যে স্থাপন করেছিলেন, তার মধ্যে একটা ছিল তাইজি যা দিয়ে তিনি তোমার দিব্যচক্ষু বন্ধ করে রেখেছিলেন, দিব্যচক্ষু খোলার সময় হলে তাইজি প্লেট ফেটে খুলে যায়। মাস্টারই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এই ব্যবস্থাটা করেছিলেন, তোমার মাথার মধ্যে প্রথমে এটা ছিল না।

আবার কিছু লোক দিব্যচক্ষু খোলার জন্যে খুব প্রয়াস করে, কিন্তু যত সে এর জন্যে অনুশীলন করবে ততই এটা খুলবে না। এর কারণ কী? তার নিজের কাছেও ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে দিব্যচক্ষু খোলার জন্যে চেষ্টা করলে হবে না, যত এর পিছনে ছুটবে ততই এটা পাবে না। যত এটা পাওয়ার চেষ্টা করবে, এটা তো খুলবেই না, তার উপরে কালোও নয়, সাদাও নয়, এইরকম একটা পদার্থ দিব্যচক্ষুর ভিতর থেকে নিঃসৃত হয়ে দিব্যচক্ষুকে ঢেকে ফেলবে। যত সময় পার হতে থাকবে, এটা একটা খুব বড়ো ক্ষেত্র তৈরি করবে, এবং আরও বেশী করে নিঃসৃত হতে থাকবে। দিব্যচক্ষু আরও খোলা যাবে না, যত বেশী এই দিব্যচক্ষু পাওয়ার চেষ্টা করবে, ততই পদার্থটা বেশী করে নিঃসৃত হয়ে উপচে বাইরে পড়তে থাকবে, এর ফলে এটা তার পুরো শরীরকে ঘিরে ফেলবে, এমনকী জিনিসটা খুব বেশী পুরু হয়ে যাবে এবং খুব বড়ো একটা ক্ষেত্র তৈরি করবে। যদি তার দিব্যচক্ষু সত্যিই খোলা থাকে তবুও সে দেখতে পারবে না, কারণ তার নিজের আসক্তির জন্যে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু যদি সে এটা নিয়ে ভবিষ্যতে আবার চিন্তা না করে এবং এই আসক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে, তবেই ওই পদার্থটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হবে। কিন্তু এর জন্যে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে বেশ কষ্টকর সাধনা পর্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তবেই এটা দূর হবে, যার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। কিছু লোক এটা জানেই না যে তাদের মাস্টার বলেছিলেন: ‘‘এটার পিছনে ছুটবে না, এটার পিছনে ছুটবে না,’’ কিন্তু তারা বিশ্বাস করেনি, তারা সবসময়েই এটা পাওয়ার চেষ্টা করে গেছে, ফলে তারা যা চেয়েছে, তার ঠিক বিপরীত ঘটেছে।

অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা

দিব্যচক্ষুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক আছে এইরকম একটা অলৌকিক ক্ষমতার নাম অলোকদৃষ্টি। কেউ কেউ বলে: ‘‘আমি এখানে বসে বেজিং-য়ের দৃশ্য দেখতে পারি, আমেরিকার দৃশ্য দেখতে পারি, পৃথিবীর অন্য দিকটাও দেখতে পারি।’’ কিছু লোক এটা বুঝতে পারে না, এবং বিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করেও এই ব্যাপারটাকে ঠিক বোঝানো যায় না। এটা কীভাবে সম্ভব? অনেকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে, সেইভাবে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তবুও তারা ভালো করে বোঝাতে পারে না। তারা ভাবে যে মানুষের এত বিরাট ক্ষমতা কীভাবে সম্ভব। ব্যাপারটা এইরকম নয়। যে সাধক ত্রিলোক ফা-এর

স্তরে সাধনা করছে, তার এই ক্ষমতা থাকে না। সে অলোকদৃষ্টি এবং অনেকগুলো অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে যেসব জিনিস দেখে সেগুলো সবই একটা বিশেষ মাত্রার মধ্যেই কার্যকারী, খুব বেশী হলেও সেটা এই ভৌতিক মাত্রার বাইরে যায় না, যার মধ্যে আমাদের এই মানবজাতি জীবনযাপন করে। এমনকী এগুলো সবই সাধারণত তার নিজের শরীরের মাত্রার যে ক্ষেত্র তার বাইরে নয়।

একটা বিশেষ মাত্রার মধ্যে আমাদের মানব শরীরের একটা ক্ষেত্র আছে যা সদ্‌গুণ-এর ক্ষেত্রর থেকে আলাদা এবং এই দুটো ক্ষেত্র এক মাত্রাতেও থাকে না, কিন্তু আয়তন এদের একই। এই ক্ষেত্রটার সঙ্গে বিশ্বের অনুরূপ সম্পর্ক আছে, সেইজন্যে এই বিশ্বে যা কিছু আছে সবই এই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে, সবকিছুই এই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে পারে। এটা একরকম প্রতিফলিত ছবি মাত্র, এটা সত্যি নয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের এই পৃথিবীতে আছে আমেরিকা এবং ওয়াশিংটন; একজন ব্যক্তির এই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে আমেরিকা এবং ওয়াশিংটন, কিন্তু এটা ছবি মাত্র। যদিও এই ছবিরও বস্তুগত অস্তিত্ব আছে, এটা অনুরূপভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, ওখানকার পরিবর্তনের সঙ্গে এখানেও পরিবর্তন হচ্ছে, সেইজন্যে লোকেরা যে অলোকদৃষ্টির ক্ষমতার কথা বলে সেটা হচ্ছে, একজন ব্যক্তি নিজস্ব মাত্রার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত জিনিস দেখতে পারে। যখন সেই ব্যক্তি বহিঃ ত্রিলোক ফা-এর সাধনা করবে, তখন সে এইভাবে জিনিস দেখবে না, সে সরাসরি দেখবে, তাকে বলে বুদ্ধ ফা-এর দিব্যশক্তি, সেটা এক অতুলনীয় শক্তি।

এই ত্রিলোক ফা সাধনায় অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা কীভাবে কাজ করে? আমি সবাইকে এটা বিশ্লেষণ করে বলব। এই ক্ষেত্রটার জায়গার মধ্যে, মানুষের কপালে একটা আয়না থাকে। যারা সাধনা করে না, তাদের ক্ষেত্রে আয়নাটা তার নিজের দিকে মুখ করে থাকে; আর যারা সাধক তাদের ক্ষেত্রে আয়নাটা উল্টো করে ঘোরানো অবস্থায় থাকে। কোনো ব্যক্তির অলোকদৃষ্টির ক্ষমতার উদয় হওয়ার সময়ে এটা সামনে-পিছনে ঘুরতে শুরু করে। সবাই জান যে সিনেমার ছবিতে চব্বিশটা ফ্রেম প্রতি সেকেন্ডে দেখালে তবেই সেটা একটানা চলতে থাকা জীবন্ত ছবি তৈরি করবে, চব্বিশটা ছবির কম হলে মনে হবে ছবি লাফাচ্ছে। এই আয়নাটার ঘোরার গতি প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশবারের বেশী, আয়নাটা প্রতিফলিত হওয়া জিনিসের ছবি তুলে তার ছাপটা ধরে রাখে, এরপর আয়নাটা তোমার দিকে

ঘুরে যায় যাতে তুমি দেখতে পার, আবার উল্টোদিকে ঘুরলে ছবিটা মুছে যায়। এরপরে আবার ছবি ধরে, আবার তোমার দিকে ঘোরে, আবার উল্টোদিকে ঘুরলে ছবিটা মুছে যায়, এইভাবে নিরন্তর ঘুরতে থাকে, সেইজন্যে তুমি জিনিসগুলোকে গতিশীল অবস্থায় দেখতে পাও, এইভাবে তুমি তোমার নিজের মাত্রার ক্ষেত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া জিনিসগুলো দেখতে পার, আর মাত্রার ক্ষেত্রের মধ্যেকার জিনিসগুলো এই বিশাল বিশ্বেরই অনুরূপ।

তখন মানুষ তার শরীরের পিছনটা কীভাবে দেখবে? এইরকম ছোট্ট একটা আয়না দিয়ে শরীরের চারিদিকের সমস্ত কিছুর ছবি তুলতে পারবে কি? সবাই জান যে কোনো ব্যক্তির দিব্যচক্ষুর স্তর যখন দিব্যদৃষ্টির স্তর পেরিয়ে গিয়ে খোলে এবং প্রায় জ্ঞানদৃষ্টির স্তরে পৌঁছে যায়, সেই সময়ে আমাদের এই মাত্রাটা ভেদ হবে। যখন ভেদ হবে কিন্তু তখনও পুরোপুরি ভেদ হয়নি, ঠিক সেই মুহূর্তে দিব্যচক্ষুর একটা পরিবর্তন ঘটে: বস্তুগুলোকে দেখতে চাইলে বস্তুগুলোর অস্তিত্ব দেখতে পায় না, কোনো মানুষকে দেখতে পায় না, দেওয়াল দেখতে পায় না, কোনো কিছুই দেখতে পায় না, পদার্থের অস্তিত্বই থাকে না। অন্যভাবে বলা যায় যে এই বিশেষ মাত্রাতে, গভীরভাবে তাকালে, দেখবে কোনো মানুষই নেই, শুধু ওই একটা আয়না তোমার এই মাত্রার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই আয়নাটা যা তোমার মাত্রার ক্ষেত্রতে আছে সেটা এই মাত্রার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটার মতোই বিরাট, সেইজন্যে এটা যখন একবার সামনে একবার পিছনে ঘুরতে থাকে, তখন এটা সব জায়গার সবকিছুকেই প্রতিফলিত করতে থাকে। এটা তোমার মাত্রার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির সবকিছুই দেখাতে পারে, যদি সেগুলো এই বিশ্বের জিনিসগুলোর অনুরূপ হয়, এটাই হচ্ছে আমাদের উল্লেখিত অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা।

যারা মানবশরীরের বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে, তারা যখন এই অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতাটা পরীক্ষা করে, তখন সহজেই এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। অগ্রাহ্য করার কারণ হচ্ছে এইরকম। উদাহরণস্বরূপ তারা কোনো একজন ব্যক্তির আত্মীয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে: ‘‘আত্মীয় বেজিংয়ে তার বাড়িতে কী করছে?’’ যখন আত্মীয়-র নাম এবং সাধারণ তথ্যগুলো জানানো হয়, তখন এই অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সবকিছু দেখতে পারে। সে বর্ণনা করে: বাড়িটা কীরকম দেখতে, দরজা দিয়ে কীভাবে প্রবেশ করা যায়, এবং ঘরের মধ্যে ঢুকলে জিনিসপত্রের সাজানোটা

কীরকম। সে সবকিছুই ঠিক বলে। ‘‘আত্মীয় কী করছে?’’ এর উত্তরে সে বলে যে, আত্মীয় এখন লিখছে। এই ঘটনাটাকে যাচাই করার জন্যে এই পরীক্ষা করার লোকেরা সেই আত্মীয়কে ফোন করে জিজ্ঞাসা করে: ‘‘তুমি এখন কী করছ?’’ ‘‘আমি খাবার খাচ্ছি।’’ তাহলে সে যা দেখেছিল তার থেকে এটা কি আলাদা হল না? অতীতে এই কারণে এই অলৌকিক ক্ষমতাটাকে স্বীকার করা হতো না, কিন্তু যে বাতাবরণটা সে দেখেছিল সেটা ঠিক ছিল। কারণ আমাদের এই মাত্রা ও সময়, যাকে আমরা বলি সময়-মাত্রা, এবং যে মাত্রাতে ওই অলৌকিক ক্ষমতাটা আছে তার যে সময়-মাত্রা, এই দুটোর মধ্যে একটা সময়ের ব্যবধান আছে, এর ফলে এই দুটো দিকের সময়ের ধারণাটাও আলাদা। ওই আত্মীয়টি ঠিক আগে লিখছিল, এখন খাবার খাচ্ছে, এটাই হচ্ছে সময়ের ব্যবধান। সুতরাং মানুষের শরীর বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যয়নরত ব্যক্তিরা যদি প্রচলিত তত্ত্বগুলির উপরে ভিত্তি করে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত তৈরি করে এবং গবেষণা করে যায়, এমনকী আরও দশ হাজার বছর কেটে গেলেও এদের প্রচেষ্টা ব্যর্থই হবে। এর কারণ এগুলো প্রথমত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস, সেইজন্যে মানবজাতির চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তারা যেন পুনরায় এই জিনিসগুলোকে এইভাবে বোঝার চেষ্টা না করে।

ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা

আর এক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা আছে যার সঙ্গে দিব্যচক্ষুর সরাসরি সম্পর্ক আছে, তাকে বলে ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা। বর্তমানে এই পৃথিবীতে জনসাধারণের মধ্যে ছয় ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করা হয়েছে, যার মধ্যে আছে দিব্যচক্ষু, অলোকদৃষ্টি, এবং ভাগ্যকে জানার ক্ষমতা। ভাগ্যকে জানাটা কী? এটা হচ্ছে যখন কেউ অন্য ব্যক্তির ভবিষ্যৎ এবং অতীত জানতে পারে; ক্ষমতা বেশী হলে সমাজের উত্থান বা পতন নিয়ে জানতে পারে; ক্ষমতা আরও বেশী হলে মহাজাগতিক পরিবর্তনের নিয়ম জানতে পারে, এটাই হচ্ছে ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা। যেহেতু পদার্থ গতিশীল এবং একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, একটা বিশেষ মাত্রার যে কোনো বস্তুর অন্য অনেক মাত্রাতেও অস্তিত্বের রূপ থাকে। উদাহরণস্বরূপ যখন আমাদের শরীর একটু নড়ে, তখন মানুষের শরীরের ভিতরের কোষগুলোও একই সাথে নড়বে এবং আণুবীক্ষণিক স্তরে সমস্ত উপাদানগুলি, যেমন অণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, সবচেয়ে সূক্ষ্ম কণা

একই সাথে নড়বে। অথচ শরীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের রূপও রয়েছে, অতএব মানুষের শরীরের অন্যান্য মাত্রার রূপগুলিতেও একধরনের পরিবর্তন ঘটবে।

আমরা কি বলিনি যে পদার্থ বিলুপ্ত হয় না? একটা বিশেষ মাত্রায় যখন লোকেরা কোনো কাজ সম্পন্ন করে, যেমন কোনো ব্যক্তি হাত নাড়িয়ে কোনো কাজ করল, এসবেরই বস্তুগত অস্তিত্ব রয়ে যাবে, যে কোনো কাজই করা হোক না কেন, সেটারই ছবি এবং বার্তা রয়ে যাবে। অন্য মাত্রায় এটা কখনোও লুপ্ত হবে না, চিরকাল ওখানে রয়ে যাবে, একজন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি একবার ওখানে তাকিয়ে অতীতের ছবিগুলো দেখে সবকিছু জানতে পারবে। ভবিষ্যতে তোমার ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা এসে যাওয়ার পরে, তুমি একবার তাকিয়ে দেখতে পারবে যে আমাদের আজকের এখানকার বক্তৃতার রূপটা ওখানেই বিরাজ করছে, এটা ইতিমধ্যে ওখানে একই সাথে বিরাজ করছে। যখন কোনো ব্যক্তির জন্ম হয়, তার সম্পূর্ণ জীবনকাল ইতিমধ্যে একটা বিশেষ মাত্রায় বিরাজমান থাকে, যেখানে সময়ের কোনো ধারণা নেই। কিছু লোকের একটার বেশী জীবনকাল বিরাজমান থাকে।

সম্ভবত কিছু লোক চিন্তা করছ: ‘‘নিজেকে পরিবর্তন করার জন্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কি কোনো প্রয়োজন নেই?’’ তারা এটা মেনে নিতে পারে না। বস্তুত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা কোনো ব্যক্তির জীবনের সামান্য কিছু জিনিসের পরিবর্তন করা সম্ভব, সে নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামান্য কিছু জিনিসের অল্প পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু ঠিক এই কারণে অর্থাৎ পরিবর্তন করার জন্যে প্রচন্ড চেষ্টার ফলে তোমার কর্ম প্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপারটা এইরকম নাহলে কর্ম সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নটাও থাকত না এবং ভালো কাজ করা অথবা খারাপ কাজ করার প্রশ্নটাও থাকত না। কেউ জোর করে এইভাবে কাজ করলে সে অন্যের থেকে সুবিধা আদায় করবে, এতে তার খারাপ কাজ করা হয়ে যাবে। সেইজন্যে সাধনার সময়ে আমরা বার বার বলি যে প্রকৃতিকে অনুসরণ করে চলো এবং এটাই সত্য, কারণ তুমি প্রচন্ড চেষ্টা করার সময়ে অন্য লোকের ক্ষতি করতে পার। তোমার জীবনের আদিতে একটা জিনিস ছিল না কিন্তু তুমি সেই জিনিসটা প্রাপ্ত হলে, যেটা মূলত সমাজের অন্তর্গত অন্য লোকের জিনিস, সেক্ষেত্রে তুমি ওই লোকটির কাছে ঋণী হয়ে গেলে।

যদি কেউ বিরাট কোনো ঘটনার পরিবর্তন করার কথা ভাবে, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে পরিবর্তন করা একেবারেই সম্ভব নয়। তার জন্যে একটাই উপায় আছে, যদি সে শুধু খারাপ কাজই করে যায়, খারাপ কাজ করা ছাড়া অন্য কাজ করেই না, তাহলে সে তার জীবনের পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। আমরা যখন উচ্চস্তর থেকে দেখি, কারোর মৃত্যু হলেও, তার মূল আত্মা বিলুপ্ত হয় না। মূল আত্মা কেন বিলুপ্ত হয় না? বস্তুত আমরা দেখেছি যে মানুষের মৃত্যুর পরে তার যে শবটা মর্গে রাখা থাকে সেটা শুধু আমাদের এই মাত্রার মানুষের শরীরের কোষসমূহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই মাত্রাতে তার শরীরের অঙ্গগুলি, শরীরের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ধরনের কলাসমূহ, পুরো মানব শরীরটা অর্থাৎ এই মাত্রার শরীরের কোষসমূহ খসে খসে পড়তে থাকে। অথচ অণু, পরমাণু, প্রোটন ইত্যাদির তুলনায় আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি অন্য মাত্রার শরীরগুলির বাস্তবে মৃত্যু হয়নি। অন্য মাত্রাগুলির মধ্যে এবং আণুবীক্ষণিক স্তরেরও নীচের মাত্রাগুলিতে সেগুলোর অস্তিত্ব থেকে যাবে। আর যে সমস্ত লোক শুধু খারাপ কাজ করা ছাড়া কিছু বোঝে না, তাদের সমস্ত কোষসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, যাকে বুদ্ধ মতে বলে শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণ বিনাশ।

কোনো ব্যক্তির জীবনকে পরিবর্তন করার জন্যে আরও একটা উপায় আছে, এই একটাই মাত্র উপায় আছে, অর্থাৎ এর পরে সেই ব্যক্তি সাধনার পথে চলবে। সাধনার পথে চললে কেন ব্যক্তির জীবন পাল্টে যাবে? কে এই জিনিসটা সহজেই পাল্টাতে পারে? যেহেতু এই ব্যক্তি সাধনার পথে চলতে চাইছে, এই চিন্তাটা জাগ্রত হলেই তা সোনার মতো ঝকমক করতে থাকে এবং দশদিক সম্পন্ন জগৎ কেঁপে ওঠে। বুদ্ধ মতে দশদিক সম্পন্ন জগতের তত্ত্ব দ্বারা, এই বিশ্বের ধারণা করা হয়। কারণ উচ্চস্তরের জীবনদের দৃষ্টিতে মানুষের এই জীবন শুধু মানুষ হয়ে থাকার জন্যে নয়। এঁরা ভাবেন যে মানুষের জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল এই বিশ্বের মহাকাশে, তার প্রকৃতি বিশ্বের মতন একইরকম ছিল, যা ছিল মঙ্গলময় ও দয়াময়, এবং সত্য, করুণা ও সহনশীলতা এই পদার্থগুলি দিয়ে তৈরি। যাই হোক এই জীবনগুলোর মধ্যে গোষ্ঠীগত একটা সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল, এই গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের আদান-প্রদানের সময়ে কেউ কেউ খারাপ হয়ে গেল এবং নীচে নেমে গেল; এই স্তরে সে আর থাকতে পারল না এবং আরও খারাপ হয়ে গেল, সে আবার একটা স্তর

নীচে নেমে গেল; সে নামতেই থাকল, নামতেই থাকল, শেষে এই সাধারণ মানুষের স্তরে এসে পৌঁছাল।

এই স্তরে লোকেদের ধ্বংস হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা তাদের মহৎ পরোপকারী হৃদয়ের বশবর্তী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের মানবসমাজের এইরকম একটা মাত্রা সৃষ্টি করলেন। এই মাত্রাতে মানুষকে দেওয়া হল অতিরিক্ত এই ভৌতিক মানব শরীর, এবং অতিরিক্ত একজোড়া চোখ যার দৃষ্টিটা আমাদের এই ভৌতিক মাত্রার বস্তুগুলোর মধ্যেই সীমিত অর্থাৎ সে মায়ার মধ্যে হারিয়ে যায় এবং তাকে এই বিশ্বের সত্য দেখতে দেওয়া হয় না, যা অন্য সব মাত্রাতে দেখা সম্ভব। এই মায়ার মধ্যে এবং এই পরিস্থিতিতে তার জন্যে এই ধরনের সুযোগ পড়ে রয়েছে। যেহেতু সে মায়ার মধ্যে পড়ে আছে, সেইজন্যে এটা সবচেয়ে কষ্টকরও, এই শরীরটা দেওয়া হয়েছে যাতে সে কষ্ট সহ্য করতে পারে। যদি একজন ব্যক্তি এই মাত্রা থেকে তার মূলে ফিরে যেতে চায়, যাকে তাও মতে বলা হয় সাধনার মাধ্যমে মূলে এবং সত্যে ফিরে যাওয়া, তাহলে সেই ব্যক্তিকে তার হৃদয় দিয়ে সাধনা করতে হবে অর্থাৎ তার বুদ্ধ স্বভাবের প্রকাশ ঘটবে, এই ইচ্ছাটা সবচেয়ে মূল্যবান, মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা তাকে সাহায্য করবেন। এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতেও সেই ব্যক্তি মায়ার মধ্যে হারিয়ে যায়নি, এবং ফিরে যেতে চায়, সেইজন্যে তাঁরা তাকে কোনো শর্ত ছাড়াই সাহায্য করবেন, সবকিছু দিয়ে তাকে সাহায্য করবেন। কেন আমরা সাধকদের জন্যে এইরকম কাজ করি, অথচ সাধারণ লোকেদের জন্যে করি না? এটাই তার কারণ।

তুমি যদি সাধারণ মানুষ হিসাবে তোমার রোগ নিরাময় করতে চাও, আমরা কোনোভাবেই তোমাকে সাহায্য করতে পারব না, একজন সাধারণ মানুষ ঠিক একজন সাধারণ মানুষ-ই, একজন সাধারণ মানুষের অবস্থা, এই সাধারণ মানবসমাজের অবস্থা অনুযায়ীই হওয়া উচিত। অনেক লোক বলে, বুদ্ধ সর্ব জীবের উদ্ধারের কথা বলেছেন, এবং বুদ্ধ মতেও সর্ব জীবের উদ্ধারের কথা বলা হয়। আমি তোমাদের বলছি, তোমরা বৌদ্ধধর্মের সমস্ত শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে পার, কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে রোগ নিরাময় ব্যাপারটাকে সর্ব জীবের উদ্ধার হিসাবে গণ্য করা হবে। এই কয়েক বছরে কিছু নকল চিগোংগ মাস্টার এই ব্যাপারটাকে নিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রকৃত চিগোংগ মাস্টাররা যারা রাস্তাটা প্রশস্ত

করেছিলেন, তাঁরা তোমাকে অন্য লোকের রোগ নিরাময় করার কথা কখনোই বলেননি। তাঁরা শুধু তোমাকে শারীরিক ক্রিয়া নিজে নিজে করতে শিখিয়েছিলেন যাতে তোমার রোগ নিরাময় হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে। তুমি একজন সাধারণ মানুষ, তুমি কয়েকদিন শিখে কীভাবে অন্যের রোগ নিরাময় করবে। এটা লোকেদের ঠকানো হচ্ছে না কি? তোমার আসক্তিগুলোকে প্ররোচিত করা হচ্ছে না কি? এটা হচ্ছে খ্যাতি এবং লাভের পিছনে ছুটে বেড়ানো, তুমি অতিপ্রাকৃত জিনিসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছ যা সাধারণ লোকেদের প্রদর্শন করতে চাও! এটাতে একেবারেই সম্মতি দেওয়া যাবে না। সেইজন্যে লোকেরা যত এর পিছনে ছুটবে, ততই এটা পাবে না, তোমাকে এই কাজে সম্মতি দেওয়া যাবে না, সাধারণ মানবসমাজ যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে ইচ্ছামতো তার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সম্মতি দেওয়া যাবে না।

এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে যে তুমি যদি তোমার মূলে ও সত্যে ফিরতে চাও, সবাই তোমাকে সাহায্য করবে। তাঁরা মনে করেন যে মানুষের আদিতে ফিরে যাওয়া উচিত এবং সাধারণ লোকেদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। যদি মানবজাতির কোনো রোগ না থাকে, এবং তারা আরামে জীবনযাপন করতে থাকে, সেক্ষেত্রে তোমাকে অমরত্ব প্রদান করলেও তুমি তা গ্রহণ করবে না। কোনো ব্যাধি নেই, কোনো কষ্ট নেই, যা চাইছ তাই পেয়ে যাচ্ছ, কত ভালো ব্যাপার, এটা সত্যিই অমর লোকেদের পৃথিবী হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি খারাপ হয়েছিলে বলেই এই স্তরে নেমে এসেছিলে, অতএব তুমি আরামে থাকতে পারবে না। এই মায়ার মধ্যে লোকেরা সহজেই খারাপ কাজ করতে পারে, বৌদ্ধধর্মে একেই বলে কর্মফল ভোগ। সেইজন্যে সাধারণত যখন কিছু লোক নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়ে অথবা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, সেসবই হচ্ছে কর্মফল ভোগের মাধ্যমে কর্মের ঋণ শোধ। বৌদ্ধধর্মে এটাও বলা হয় যে বুদ্ধ সর্বত্র বিরাজমান। একজন বুদ্ধ হাত নাড়লেই, সম্পূর্ণ মানবজাতির সব রোগ দূর হয়ে যাবে, এটা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। তাহলে এত বুদ্ধ থাকতে তাদের কেউ এই কাজটা কেন করছেন না, কারণ কোনো ব্যক্তি অতীতে খারাপ কাজ করে ঋণী হয়ে থাকলে, তাকে তার দুষ্কর্মের জন্যে কষ্টভোগ করতেই হবে। তুমি যদি তার রোগ সারিয়ে দাও, তাহলে সেটা এই বিশ্বের নিয়ম ভঙ্গ করার সমান হবে, এটা তাকে খারাপ কাজ করতে অনুমতি দেওয়ার সমান, অর্থাৎ ঋণ করেও তা শোধ করতে হবে না, এর অনুমতি দেওয়া যায় না। সেইজন্যে সবাই সাধারণ মানবসমাজের এই স্থিতিকে ধরে রাখতে

চায়, কেউ এতে বিঘ্ন ঘটাতে চায় না। তুমি যদি সত্যিই রোগ মুক্ত হয়ে আরামের খোঁজ পেতে চাও এবং নিজেও সত্যিকারের মুক্তির লক্ষ্য অর্জন করতে চাও, তাহলে সাধনাই একমাত্র পথ! লোকেদের দিয়ে সৎপথে সাধনা করাতে পারলে, তবেই হবে সত্যিকারের সর্ব জীবের উদ্ধার।

তাহলে চিগোংগ মাস্টাররা কীভাবে রোগ নিরাময় করে? কেন তারা রোগ নিরাময়ের কথা বলে? কিছু লোক সম্ভবত এই প্রশ্নগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছ। বেশীর ভাগ চিগোংগ মাস্টারই সৎপথে চলে না। প্রকৃত চিগোংগ মাস্টার সাধনার সময় দেখতে পায় যে সমস্ত জীব কষ্ট পাচ্ছে, তার হৃদয়ে মমত্ববোধ এবং সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ার ফলে, সে লোকেদের সাহায্য করে, এর সম্মতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে রোগ নিরাময় করতে পারে না। সে শুধু সাময়িক ভাবে তোমার রোগটাকে চেপে রেখে দিতে পারে অথবা তোমার রোগটাকে একটু পিছনে ঠেলে দিতে পারে, এখন রোগটা নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হবে, সে রোগটাকে পরবর্তী সময়ের জন্যে পিছিয়ে দেয়; সে রোগটাকে একটু রূপান্তরিত করে তোমাকে দিতে পারে অথবা সে রোগটাকে রূপান্তরিত করে তোমার আত্মীয়ের শরীরে দিতে পারে। কিন্তু সে সত্যি সত্যি তোমার কর্মকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে না। সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে ইচ্ছামতো এইরকম কাজ করতে সম্মতি দেওয়া যায় না, কিন্তু শুধু সাধকদের ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব, এটাই নিয়ম।

বুদ্ধ মতে বলা হয় ‘‘সর্ব জীবের উদ্ধার,’’ এই কথার অর্থ হচ্ছে: তোমাকে, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি থেকে তুলে উচ্চস্তরে নিয়ে আসা হবে, আর কোনো দিন কষ্ট পাবে না, তুমি মুক্ত হয়ে যাবে, তাদের কথার এটাই অর্থ। শাক্যমুনি কি নির্বাণের অন্য দিকের কথা বলেননি? এটাই ‘‘সর্ব জীবের উদ্ধার’’ কথার প্রকৃত অর্থ। তুমি যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে আরামে থাক, তোমার কাছে প্রচুর টাকা থাকে, তোমার বিছানা টাকা দিয়ে ভরাট করা থাকে, কোনো কষ্ট নেই, সেক্ষেত্রে তোমাকে অমরত্ব প্রদান করতে চাইলেও তুমি তা গ্রহণ করবে না। তুমি একজন সাধক, সেই হিসাবে তোমার জীবনের পথ পাল্টানো সম্ভব, একমাত্র সাধনা করলে তবেই তোমার জীবন পাল্টানো যাবে।

ভাগ্যকে জানার অলৌকিক ক্ষমতা যেরকম ভাবে কাজ করে তা হচ্ছে, মানুষের কপালে ঠিক যেন একটা টিভির ছোট পর্দা রাখা আছে।

কিছু লোকের ক্ষেত্রে এটা কপালের জায়গায় থাকে; কিছু লোকের কপালের খুব কাছাকাছি থাকে; কিছু লোকের কপালের মধ্যে থাকে। কিছু লোক চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পারে; যদি ক্ষমতা খুব বেশী হয়, তাহলে চোখ খোলা থাকলেও সে দেখতে পারবে। কিন্তু অন্য লোকেরা দেখতে পারবে না, কারণ এটা একজন ব্যক্তির নিজের মাত্রার ক্ষেত্রের যে চৌহদ্দি তার মধ্যেকার জিনিস। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হওয়ার পরে, আরও একটা ক্ষমতা অবশ্যই থাকবে যা বাহক হিসাবে কাজ করে, সেটা অন্য মাত্রা থেকে দৃশ্যাবলিকে প্রতিফলিত করে, সেইজন্যে তখন এই দিব্যচক্ষুর মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে। তখন সে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ দেখতে পারবে, অতীত দেখতে পারবে, খুবই নিখুঁতভাবে দেখতে পারবে। ভাগ্যগণনাকারীরা যত ভালোভাবেই গণনা করুক না কেন, ছোট ছোট ঘটনার কথা এবং সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা তারা করতে পারে না। এই ব্যক্তি কিন্তু খুবই পরিষ্কার ভাবে সব দেখতে পারে, এমনকী বছরের সময়টা পর্যন্ত সবকিছু সে দেখতে পারে। সে একটা ঘটনার পরিবর্তন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পারে, এর কারণ সে বিভিন্ন মাত্রা থেকে হওয়া মানুষের ও বস্তুর সত্যিকারের প্রতিফলনটা দেখতে পারছে।

যত তোমরা ফালুন দাফা-র সাধনা করবে, তোমাদের সবারই দিব্যচক্ষু খুলে যাবে। কিন্তু যে অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কথা আমি পরে উল্লেখ করব, সেগুলো প্রদান করা হবে না। তোমার স্তর নিরন্তর উঁচুতে উঠতে থাকার সময়ে ভাগ্যকে জানার ক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই আবির্ভূত হবে, ভবিষ্যতে তুমি সাধনার মধ্যে এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। এই ক্ষমতা বিকশিত হলে, তুমি জানতে পারবে যে কীভাবে এটা ঘটছে, সেইজন্যে আমি এইসব ফা এবং তত্ত্বের উল্লেখ করলাম।

পঞ্চতত্ত্ব এবং ত্রিলোক পার করে যাওয়া

‘‘পঞ্চতত্ত্ব এবং ত্রিলোক পার করে যাওয়া’’ বলতে কী বোঝায়? এই বিষয়টা উত্থাপন করা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। পূর্বে অনেক চিগোংগ মাস্টার এই বিষয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু যারা চিগোংগ বিশ্বাস করে না তারা এদের প্রশ্ন করে বাক্‌রুদ্ধ করে দিত। ‘‘তোমাদের চিগোংগ অনুশীলনকারীদের মধ্যে কে পঞ্চতত্ত্ব পার করেছ এবং কে ত্রিলোক-এর মধ্যে নেই?’’ কিছু লোক আছে যারা চিগোংগ মাস্টার নয় কিন্তু নিজেরাই

নিজেদের চিগোংগ মাস্টার উপাধি দিয়েছে। কোনো কিছু পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে না পারলে কথা না বলাই ভালো, কিন্তু তারা সাহস করে বলতে যেত, তখন অন্যেরা এদের মুখ বন্ধ করে দিত। এতে সাধক সমুদায়ের মধ্যে খুব বড়ো ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু লোক এই সুযোগে চিগোংগ-এর উপরে আঘাত হেনেছিল। ''পঞ্চতত্ত্ব এবং ত্রিলোক পার করে যাওয়া'' সাধক সমুদায়ের মধ্যে প্রচলিত কথা, ধর্মের গভীরে এর মূল এবং ধর্ম থেকেই এর উৎপত্তি। সুতরাং এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সেই সময়কার পরিস্থিতির বিচার না করে এই বিষয়টাকে উত্থাপন করা সম্ভব নয়।

পঞ্চতত্ত্ব পার করে যাওয়া বলতে কী বোঝায়? চীনের প্রাচীনকালের এবং আধুনিককালের ভৌতবিজ্ঞানীরা সবাই মনে করেন যে পঞ্চতত্ত্বের সিদ্ধান্তটা সঠিক। এটা সত্যি যে ধাতু, কাঠ, জল, আগুন এবং মাটি এই পাঁচটি তত্ত্বের বা উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তৈরি হয়েছে, সেইজন্যে আমরা পঞ্চতত্ত্বের কথা বলব। যদি কোনো ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব অতিক্রম করে থাকেন, তাহলে আধুনিক ভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে সেই ব্যক্তি এই পার্থিব জগৎ পার করে গেছেন, শুনে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তোমরা সবাই বিষয়টা এইভাবে চিন্তা কর যে, চিগোংগ মাস্টারদের শরীরে গোংগ বিদ্যমান। আমাকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, এবং অনেক চিগোংগ মাস্টারকেও এইরকম পরীক্ষা করা হয়েছিল তাদের শক্তি পরিমাপ করার জন্যে। বর্তমানে আমাদের অনেক রকমের যন্ত্র আছে যা দিয়ে গোংগ-এর বস্তুগত উপাদানগুলিকে পরিমাপ করা যায়, অর্থাৎ চিগোংগ মাস্টারের শরীর থেকে যেসব বস্তুগত উপাদানগুলি নির্গত হচ্ছে, সেগুলিকে মাপার জন্যে যদি কোনো যন্ত্র থাকে তাহলে গোংগ-এর অস্তিত্বও নির্ধারণ করা যাবে। আধুনিক যন্ত্রগুলির সাহায্যে ইনফ্রারেড রশ্মি, অতিবেগুনি রশ্মি, আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ, ইনফ্রাসোনিক তরঙ্গ, বিদ্যুৎ শক্তি, চুম্বক শক্তি, গামা রশ্মি, পরমাণু এবং নিউট্রনের পরিমাপ করা সম্ভব। একজন চিগোংগ মাস্টারের শরীরে এই সব পদার্থ থাকে, আরও কিছু পদার্থ চিগোংগ মাস্টার নির্গত করেন, যেগুলোকে পরীক্ষা করা যায় না, কারণ সেরকম কোনো যন্ত্র নেই। যতক্ষণ সঠিক যন্ত্র পাওয়া যাবে, সবকিছুই পরিমাপ করা সম্ভব। এটা দেখা গেছে যে একজন চিগোংগ মাস্টার যে সমস্ত পদার্থ নির্গত করেন সেগুলির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী।

একটা বিশেষ তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাবে একজন চিগোংগ মাস্টার শক্তিশালী আলোকপ্রভা বিকিরণ করেন যা দেখতে খুবই সুন্দর। গোংগ সামর্থ্য যত বেশী হবে, নির্গত হওয়া শক্তির ক্ষেত্রও তত বড়ো হবে। সাধারণ মানুষদেরও এই আলোকপ্রভা থাকে, কিন্তু সেটা খুবই কম এবং দুর্বল। উচ্চশক্তির পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে লোকেরা মনে করে যে, শক্তি হচ্ছে নিউট্রন, পরমাণু এই ধরনের জিনিস। অনেক চিগোংগ মাস্টারকে পরীক্ষা করা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত নাম করা চিগোংগ মাস্টারদেরও পরীক্ষা করা হয়েছে। আমাকেও পরীক্ষা করে দেখেছে যে আমার শরীর থেকে নির্গত হওয়া গামা রশ্মির বিচ্ছুরণের পরিমাণ এবং তপ্ত নিউট্রন-এর পরিমাণ সাধারণ পদার্থের থেকে আশি থেকে একশ' সত্তর গুণ বেশী। এই সময়ে পরীক্ষা করার যন্ত্রটার নির্দেশক শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। যেহেতু যন্ত্রটার নির্দেশক উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল, অবশেষে, আমার শক্তি আরও কত বেশী ছিল, সেটা যন্ত্রটা বলতে পারেনি। এতটা বেশী শক্তিশালী নিউট্রন একজন মানুষের কাছে রয়েছে, এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য! একজন মানুষ কীভাবে এত শক্তিশালী নিউট্রন নির্গত করতে পারে? এটা প্রমাণ করে যে, আমাদের চিগোংগ মাস্টারদের শরীরে গোংগ আছে, এবং শক্তিও আছে। বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ সমুদায়ও এটাকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন।

পঞ্চতত্ত্ব পার করতে হলে, অবশ্যই মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা করা প্রয়োজন। যদি মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা না করা হয়, তাহলে তাদের শুধু গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটে যা তাদের স্তরের উচ্চতা নির্ণয় করে। অর্থাৎ শরীরের সাধনা যেখানে নেই, সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটাও ওঠে না, এবং তারা পঞ্চতত্ত্ব পার করার কথা উল্লেখও করবে না। মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনার সময়ে, শক্তিটা মানব শরীরের সব কোষের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে। আমাদের সাধারণ অনুশীলনকারীদের, যাদের সবে গোংগ বৃদ্ধি হচ্ছে, তারা যে শক্তি নির্গত করে, তার কণাগুলো খুব বড়ো বড়ো, সেগুলোর মধ্যে ফাঁক থাকে এবং ঘনত্বটা কম, সেইজন্যে ক্ষমতা খুব কম। যত তার স্তর উঁচু হতে থাকবে, তার শক্তির ঘনত্ব একটি জলের অণুর তুলনায়, একশ' গুণ, হাজার গুণ, দশ কোটি গুণ বেশী হতে থাকবে, এসবই সম্ভব। কারণ স্তর উচ্চতর হতে থাকলে, শক্তির ঘনত্ব বাড়তে থাকবে, দানাগুলি সূক্ষ্মতর হতে থাকবে, ক্ষমতাও আরও বেশী হতে থাকবে। এইরকম পরিস্থিতিতে শক্তিটা শরীরের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকবে, এই শক্তি শুধু যে এই বস্তুগত মাত্রার প্রতিটি কোষের মধ্যে

সঞ্চিত হতে থাকবে তা নয়, অন্য মাত্রাগুলির সব শরীরের অণু, পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, এবং এরও পরে অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক কোষ পর্যন্ত, সবই এই শক্তি দিয়ে পূর্ণ হতে থাকবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মানব শরীরটা সম্পূর্ণরূপে ওই ধরনের উচ্চশক্তি সম্পন্ন পদার্থ দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে।

এই উচ্চশক্তি সম্পন্ন পদার্থটা একটা বুদ্ধিমান সত্তা বিশেষ, এর ক্ষমতাও আছে। যখন এটা বেশী হবে, এর ঘনত্ব বেড়ে যাবে এবং এটা দিয়ে শরীরের সমস্ত কোষ ভর্তি হয়ে যাবে, তখন এটা মানুষের রক্তমাংসের শরীরের কোষগুলিকে, অর্থাৎ সবচাইতে অক্ষম এই কোষগুলোকে দমিয়ে রাখতে পারবে। একবার দমিয়ে রাখতে পারলে আর বিপাক প্রক্রিয়া হবে না। সবশেষে এটা দিয়ে রক্তমাংসের এই শরীরের সমস্ত কোষ প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে। অবশ্য এটা আমার পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু সাধনার দ্বারা এই ধাপে পৌঁছানোর পর্বটা ধীরে ধীরে হতে থাকে। তোমার সাধনা যখন এই ধাপে পৌঁছাবে, তখন তোমার শরীরের সমস্ত কোষ, উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে। সবাই চিন্তা কর, তখনো তোমার এই শরীরটা পঞ্চতত্ত্ব দিয়ে নির্মিত কি? এটা কি তখনো এই মাত্রার পদার্থ? এই পুরো শরীরটা ইতিমধ্যে অন্য মাত্রা থেকে সংগৃহীত, উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দিয়ে গঠিত হয়ে গেছে। এখানে সদ্‌গুণ-এর উপাদানগুলিও অন্য মাত্রায় বিদ্যমান পদার্থ, এটা আমাদের এই মাত্রার সময়ক্ষেত্র দ্বারা আর নিয়ন্ত্রিত নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে সময়েরও একটা ক্ষেত্র আছে, যদি কোনো পদার্থ এই সময় ক্ষেত্রের সীমার অন্তর্গত না হয়, তাহলে সেটা এই সময় ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। অন্য মাত্রাতে সময়-মাত্রার ধারণাটা আমাদের এখানকার থেকে পুরো আলাদা। এখানকার সময় কীভাবে অন্য মাত্রার পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করবে? বস্তুত কোনো কিছুই করতে পারবে না। তাহলে তোমরা চিন্তা কর, এই সময়ে তুমি কি পঞ্চতত্ত্ব পার করে যাওনি? তোমার শরীরটা কি এখনও একজন সাধারণ মানুষের মতোই? সেটা কখনোই নয়। কিন্তু একটা ব্যাপার আছে, সাধারণ মানুষ এই তফাৎটা বুঝতে পারবে না। যদিও একজন ব্যক্তির শরীর এতটা পাল্টে গেছে, তৎসত্ত্বেও এটাকেই তার সাধনার শেষ হিসাবে ধরা যাবে না, সেইজন্যে নিরন্তর আরও সাধনার মাধ্যমে উচ্চতর স্তরগুলো ভেদ করে উপরের দিকে ওঠাটা তার পক্ষে প্রয়োজন, সেইজন্যে তাকে অবশ্যই সাধারণ লোকেদের

মধ্যে থেকেই আরও সাধনা করে যেতে হবে, সাধারণ লোকেরা তাকে দেখতে না পারলে, কোনো কাজ হবে না।

তাহলে এর পরে কী ঘটবে? ওই ব্যক্তির সাধনার পর্বে যদিও আণবিক স্তরে তার সমস্ত কোষ উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেছে, কিন্তু পরমাণুর গঠন এবং বিন্যাস ঠিকই থাকে, অণুর এবং নিউক্লিয়াসের গঠন এবং বিন্যাসেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কোষের অণুর গঠন এবং বিন্যাস এইরকম অবস্থায় থাকে যে, কোষগুলিকে স্পর্শ করলে নরম বোধ হয়। আবার হাড়ের ক্ষেত্রে অণুর গঠন এবং বিন্যাসের ঘনত্ব এত বেশী হয় যে, স্পর্শ করলে শক্ত বোধ হয়। রক্তের ক্ষেত্রে অণুর ঘনত্ব খুবই কম হয়, সেইজন্যে এটা তরল। সাধারণ মানুষরা তোমার চেহারায় ওপর থেকে কোনো পরিবর্তন দেখতে পারবে না। যেহেতু তোমার কোষের অণুর মৌলিক গঠনপ্রণালী এবং বিন্যাস একইরকম বজায় থাকে, এর গঠনপ্রণালীর পরিবর্তন ঘটে না; কিন্তু এর ভিতরের শক্তির পরিবর্তন ঘটে যায়। অতএব তখন থেকে তোমার স্বাভাবিক যে বার্ধক্য সেটা আর আসবে না, কোষগুলিরও বিনাশ হবে না। সেই অনুযায়ী তুমি চিরকাল তরুণই রয়ে যাবে, এই সাধনার পর্বে তোমাকে দেখতে অল্পবয়সি মনে হবে এবং শেষে তুমি এইভাবেই থেকে যাবে।

অবশ্য কোনো গাড়ি যদি তার শরীরে ধাক্কা মারে সেক্ষেত্রে তার হাড় হয়তো তৎসত্ত্বেও ভাঙতে পারে, এবং যদি ছুরির দ্বারা শরীরের কোথাও কেটে যায় তবে রক্তও বেরোবে। কারণ তার আণবিক গঠন প্রণালী পাল্টায়নি। শুধু এটাই হবে যে, তার কোষগুলির স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না এবং স্বাভাবিক বার্ধক্যও আর আসবে না, বিপাক প্রক্রিয়াও আর হবে না, একেই আমরা ‘‘পঞ্চতত্ত্ব পার করে যাওয়া’’ বলে থাকি। এর মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের কী আছে? বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির দ্বারাও এর ব্যাখ্যা করা যায়। কিছু লোক পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে না পেরে অসতর্কভাবে মন্তব্য করে ফেলে, অন্য লোকেরা তখন বলে যে তোমরা অন্ধভাবে বিশ্বাস করছ। এই কথাটা ধর্মগুলির থেকে উঠে এসেছে, এখনকার চিগোংগ থেকে এর উৎপত্তি হয়নি।

‘‘ত্রিলোক পার করে যাওয়ার অর্থ কী?’’ সেদিন আমি বলেছিলাম যে গোংগ বৃদ্ধি করার চাবিকাঠি হচ্ছে আমাদের চরিত্রের সাধনা করা এবং এই বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া, বিশ্বের প্রকৃতি তখন

তোমার উন্নতির ক্ষেত্রে আর বাধা হয়ে উঠবে না, তোমার চরিত্রের উন্নতি হতে থাকলে, সদ্‌গুণ-এর উপাদানগুলি তখন গোংগ-এ বিবর্তিত হতে থাকবে। তোমার গোংগ নিরন্তর উপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং উপরে উঠতে থাকবে, উঁচু স্তরে যাওয়ার ফলে একটা গোংগ স্তম্ভ তৈরি হবে। এই গোংগ স্তম্ভের উচ্চতা যতটা, তোমার গোংগ-এর উচ্চতাও ততটা। একটা কথা প্রচলিত আছে: ‘‘দাফা সীমাহীন,’’ সাধনা সম্পূর্ণরূপে তোমার মনের উপরে নির্ভরশীল। তুমি কতটা উঁচু পর্যন্ত সাধনা করতে পারবে, সেটা নির্ভর করে তোমার সহ্যশক্তির উপরে, তোমার কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার উপরে। তোমার নিজের শরীরের সাদা পদার্থ পুরোটাই যদি ব্যবহার করা হয়ে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে তোমার কালো পদার্থগুলিকে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত করতে পার। যদি এখনও যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন, যারা সাধনা করে না, তাদের পাপকর্মের দুর্ভোগ সহ্য করতে পার, এইভাবেও তোমার গোংগ বৃদ্ধি করতে পার, তবে এটা তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যারা সাধনার মাধ্যমে অত্যন্ত উঁচুস্তরে পৌঁছে গেছে। একজন সাধারণ সাধক হিসাবে তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের পাপকর্মের দুর্ভোগ সহ্য করার কথা চিন্তাও করবে না, অতটা বিরাট পরিমাণ কর্ম নিয়ে একজন সাধারণ ব্যক্তি সাধনায় সফল হতে পারবে না। আমি এখানে বিভিন্নস্তরের নিয়ম ব্যাখ্যা করলাম।

ধর্মগুলিতে যে ত্রিলোকের কথা বলা হয়ে থাকে তা ইঙ্গিত করে স্বর্গের ‘ন’টা স্তরকে অথবা স্বর্গের তেত্রিশটা স্তরকে, অর্থাৎ, স্বর্গ, মর্ত্য, এবং পাতাল নিয়ে গঠিত এই ত্রিলোকের সমস্ত জীবনকে। ধর্ম বলে যে এই স্বর্গের তেত্রিশটা স্তরের সমস্ত জীবনকেই এই সংসারের পুনর্জন্মরূপ চক্রের ছয় ধরনের পথ ধরে যেতে হয়। এর অর্থ এই জন্মে সে মানুষ হিসাবে আছে, পরের জন্মে হয়তো পশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করবে। বৌদ্ধধর্মে বলা হয়ে থাকে: ‘‘এই জীবনের সীমিত সময়ের ঠিকভাবে উপযোগ করা উচিত, এখন সাধনা না করলে, কবে আর সাধনা করবে?’’ এর কারণ পশুদের সাধনার অনুমতি নেই এবং তাদের ফা শোনার-ও অনুমতি দেওয়া হয় না, তারা সাধনা করলেও সঠিক ফল[39] (সিদ্ধিলাভ) প্রাপ্ত করতে পারবে না, গোংগ উঁচু হলে স্বর্গের দ্বারা তাদের বিনাশ ঘটবে। তুমি কয়েকশ’ বছরেও একটা মানব দেহ পাবে কি না সন্দেহ,

[39]সঠিক ফল - বুদ্ধ মতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান প্রাপ্ত হওয়া।

হয়তো হাজার বছরেরও পরে এই মানব দেহটা পেয়েছ, একটা মানব দেহ পেয়েও তার মূল্যটা বুঝতে পারছ না। যদি প্রস্তরখন্ড হিসাবে তোমার পুনর্জন্ম হয়, তাহলে দশ হাজার বছরেও তুমি এর থেকে বের হতে পারবে না, এই প্রস্তরখন্ডটা ভেঙ্গে চূর্ণ নাহলে অথবা আবহাওয়ার কারণে এটা শিলাচূর্ণে রূপান্তরিত নাহলে, তুমি কোনোদিনই এর থেকে বের হতে পারবে না। এই মানবদেহ প্রাপ্ত হওয়া কি এতই সহজ! যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তবিক দাফা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে সত্যিই সে খুব ভাগ্যবান। মানবশরীর প্রাপ্ত হওয়া কঠিন, এই নিয়মটাই বললাম।

আমরা সাধনার ক্ষেত্রে স্তরের বিষয়ে কথা বলে থাকি, এই স্তরের ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের সাধনার উপরে নির্ভর করে। যদি তুমি এই ত্রিলোক পার করে যেতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমার সাধনার ফলে উদ্ভুত গোংগ স্তম্ভ যদি খুব উচ্চস্তরে চলে যায়, তাহলে তুমি কি ত্রিলোক ভেদ করে গেলে না? বসে ধ্যান করার সময়ে যখন কারোর মূল আত্মা শরীর ছেড়ে বাইরে আসে, সে সঙ্গে সঙ্গে খুব উঁচুতে উঠে যায়। একজন শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে লিখে জানিয়েছিল: ‘‘মাস্টার, আমি স্বর্গের অনেক অনেক স্তরের উপরে পৌঁছে গেছি, কিছু কিছু দৃশ্যও দেখেছি।’’ আমি তাকে বললাম আরও উঁচুতে ওঠো। সে বলল ‘‘আমি উপরে উঠতে পারব না, উপরে উঠতে সাহস হচ্ছে না। আরও ওপরে আমি আর উঠতে পারব না।’’ কেন? এর কারণ তার গোংগ স্তম্ভ অতটাই উঁচু, সে তার গোংগ স্তম্ভের উপরে বসেই অতটা উঁচুতে উঠেছে। একেই বৌদ্ধধর্মে বলে সাধনায় সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান, সে সাধনা করে ওই অবস্থানে পৌঁছেছে। কিন্তু একজন সাধকের ক্ষেত্রে এটাকেই তার সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থানের চূড়ায় পৌঁছানো বলা যায় না। তাকে নিরন্তর উপরের দিকে উঠতে হবে, সে যেন নিরন্তর উঠতেই থাকে, এবং নিরন্তর নিজেকে উন্নত করতে থাকে। তোমার গোংগ স্তম্ভ যখন এই ত্রিলোকের সীমানা ভেদ করে যাবে, তখন তুমি কি ত্রিলোক পার করে গেলে না? আমরা একবার পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছি যে, ত্রিলোক বলে ধর্মে যার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটা শুধুমাত্র আমাদের এই ‘ন’টা বড়ো গ্রহের পরিধির মধ্যেই সীমিত। কেউ কেউ দশটা বড়ো গ্রহের কথা বলে, আমি বলব এটা একেবারেই সত্যি নয়। অতীতে কিছু চিগোংগ মাস্টারকে আমি দেখেছি যাঁদের গোংগ স্তম্ভ খুবই উঁচু ছিল, এবং ছায়াপথ পার করে গিয়েছিল, তাঁরা অনেক আগেই ত্রিলোক অতিক্রম করেছিলেন। আমি

এইমাত্র ত্রিলোক পার করে যাওয়ার কথা বললাম, এটা প্রকৃতপক্ষে স্তরের বিষয়।

কিছু পাওয়ার ইচ্ছা

অনেক লোক মনের মধ্যে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে আমাদের সাধনার জায়গায় আসে। কিছু লোক আসে অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে, কিছু লোক তত্ত্ব কথা শোনার ইচ্ছা নিয়ে আসে, কিছু লোক রোগ নিরাময় করার ইচ্ছা নিয়ে আসে, কিছু লোক ফালুন পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে আসে, কত রকমের সব মানসিকতা। এরকমও কিছু লোক আছে, যারা আমাকে বলে: ''আমার পরিবারের একজন ক্লাসে আসতে পারেনি, পড়ানোর পারিশ্রমিকটা দিয়ে দিচ্ছি, আমাকে তার জন্যে একটা ফালুন দিন।'' এর জন্যে আমাদের লেগেছে অনেকগুলো প্রজন্ম, খুব দীর্ঘ একটা সময়কাল, সেই বৎসরগুলোর সংখ্যাটা বললে অনেক লোকই চমকে উঠবে, এইরকম দূর অতীতে নির্মিত হওয়া একটা জিনিস, সেই ফালুন তুমি কয়েক ডজন *য়ুয়ান*[40] দিয়ে কিনতে চাইছ? তাহলে এখানে আমরা বিনা শর্তে সবাইকে এটা কীভাবে দিচ্ছি? কারণ তুমি একজন সাধক হতে চাও, এই হৃদয়টাকে কোনো টাকার পরিমাণ দিয়ে কেনা যায় না, কেবলমাত্র বুদ্ধ স্বভাবের উদয় হলে, তবেই আমরা এরকম করতে পারি।

তুমি কিছু পাওয়ার আসক্তি ধরে রেখেছ, তুমি কি এই জিনিসটার জন্যেই এসেছ? তুমি মনে মনে কী চাইছ, অন্য মাত্রাতে বিরাজমান আমার ফা-শরীর *(ফাশেন)*[41] সবকিছুই জানতে পারছে। যেহেতু দুটো জায়গায় সময়-মাত্রার ধারণা আলাদা, সেক্ষেত্রে অন্য মাত্রার ভিতরে দেখা যাবে যে তোমার চিন্তা তৈরি হওয়াটা অত্যন্ত ধীর গতির একটা প্রক্রিয়া। তুমি চিন্তা করার পূর্বেই এই ফা-শরীর সবকিছু জানতে পারে, সেইজন্যে তোমার সমস্ত অসৎ চিন্তাগুলিকে ত্যাগ করতে হবে। বুদ্ধ মতে পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্কের কথা বলা হয়, তোমরা সবাই পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কের কারণেই এখানে এসেছ, যদি তুমি এটা প্রাপ্ত হও, তাহলে তোমার হয়তো এটা প্রাপ্য

[40] *য়ুয়ান* - চীনা মুদ্রা (প্রায় 0.12 আমেরিকান ডলারের সমান)।
[41] *ফাশেন* - ফা-শরীর; ধর্ম শরীর; ধর্ম-কায়া; গোংগ এবং ফা দিয়ে তৈরি শরীর।

ছিলই, এই মূল্যবান সম্পদ চাইতে হলে, তুমি অন্য কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ধরে রেখো না।

অতীতে ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে, বুদ্ধ মতে শূন্যতার কথা বলা হতো, অর্থাৎ কোনো কিছুই চিন্তা করবে না, এবং শূন্যতার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। তাও মতে অনস্তিত্বতার কথা বলা হতো, অর্থাৎ কোনো কিছুই নেই, কোনো কিছুই চাইবে না, এবং কোনো কিছুর পিছনে ছুটবে না। সাধকরা বলেন: ‘‘সাধনার অনুশীলনে মন দাও, গোংগ পাওয়ার দিকে মন দিও না।’’ এক ধরনের নিষ্ক্রিয়ভাব নিয়ে সাধনা করতে হবে, যত তুমি চরিত্রের সাধনা করে যাবে, ততই তুমি তোমার স্তর ভেদ করে এগোতে পারবে, যেসব জিনিস তোমার প্রাপ্য, তুমি সেগুলো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। তুমি যদি কিছু ত্যাগ করতে না পার, সেটা কি একটা আসক্তি নয়? আমরা এখানে একেবারে শুরুতেই এই উচ্চস্তরের ফা শেখাচ্ছি, অতএব তোমার চরিত্রও উঁচু হওয়া আবশ্যক, সেইজন্যে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে, ফা শিখতে আসবে না।

তোমাদের প্রতি আমরা দায়িত্বশীল, সেইজন্যে আমরা তোমাদের সবাইকে সৎপথে চালিত করব এবং আমরা তোমাদের কাছে ফা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করব। যখন কেউ দিব্যচক্ষু পাওয়ার চেষ্টা করবে, তখন সেটা নিজে নিজেই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং বন্ধ হয়ে যাবে। এর উপরে আমরা সবাইকে বলব যে ত্রিলোক ফা সাধনার সময়ে তোমার এই ভৌতিক শরীরে যে সমস্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে এসবই তোমার জন্মগত, আমরা এখন এগুলোকেই অলৌকিক ক্ষমতা নাম দিয়েছি। এগুলো এখন এই মাত্রাতেই শুধু থাকবে, আর এই মাত্রার চৌহদ্দির মধ্যেই কাজ করবে, এবং সাধারণ লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তুমি এই সামান্য ক্ষমতা এবং দক্ষতা কেন পেতে চাও? তুমি এটা পেতে চাও, ওটা পেতে চাও, কিন্তু বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনায় পৌঁছে যাওয়ার পরে, এগুলো অন্য মাত্রাতে আর কাজ করবে না। বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনা করার সময়ে এই সমস্ত ক্ষমতাগুলোকে অবশ্যই ফেলে দিতে হবে, এগুলোকে চাপ দিয়ে খুব গভীর মাত্রার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং সেখানেই রাখা থাকবে। ভবিষ্যতে এগুলো তোমার সাধনা পর্বের নথি হিসাবে কাজ করবে, শুধু এইটুকুই এগুলোর কার্যকারিতা।

বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনায় পৌঁছানোর পরে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নতুন করে আবার সাধনা শুরু করতে হবে। ওই ব্যক্তির শরীরটা হচ্ছে, এইমাত্র আমার বলা পঞ্চতত্ত্ব পার করে আসা শরীর, এটাই হচ্ছে একটা বুদ্ধ শরীর। এইধরনের শরীরকেই কি বুদ্ধ শরীর বলা হবে না? এই বুদ্ধ শরীরকে অবশ্যই আবার নতুন করে সাধনা শুরু করতে হবে, আবার নতুন করে অলৌকিক ক্ষমতাগুলি বিকশিত হবে, তখন সেগুলোকে আর অলৌকিক ক্ষমতা বলা হবে না, বলা হবে বুদ্ধ ফা-এর ঐশ্বরিক ক্ষমতা। এদের ক্ষমতা অসীম, বিভিন্ন মাত্রাকে এরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এগুলো সত্যিই উন্নত এবং কার্যকারী জিনিস। তুমিই বলো যে ওই অলৌকিক ক্ষমতার পিছনে ছোটার প্রয়োজনটা কী? তোমরা সবাই যারা অলৌকিক ক্ষমতার পিছনে ছুটছো, তারা কি এর প্রয়োগ করার কথা চিন্তা করছ না এবং সাধারণ লোকেদের দেখাতে চাইছ না? তা নাহলে তোমরা এটা চাইছ কেন.? একে দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না, এমনকী সাজিয়ে রাখার জন্যেও লোকে সেইরকম জিনিস খোঁজে যেটা দেখতে ভালো! এটা নিশ্চিত যে, তোমাদের অবচেতন মনে এগুলোকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ মানুষদের দক্ষতা যেভাবে চেষ্টা করে পাওয়া যায়, সেইভাবে এগুলোকে পেতে পার না, এগুলো সম্পূর্ণরূপে একধরনের অতিপ্রাকৃত জিনিস, এগুলোকে সাধারণ লোকেদের মধ্যে প্রদর্শন করার কোনো অনুমতি নেই, এই প্রদর্শন করার ব্যাপারটাই একটা প্রচন্ড আসক্তি, যেটা ভীষণ খারাপ আসক্তি এবং সাধকদের অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। তুমি যদি এগুলো ব্যবহার করে টাকা রোজগার করতে চাও, সৌভাগ্য প্রাপ্ত করতে চাও, এবং ব্যক্তিগত সংগ্রামের সময়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকা তোমার নিজের লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে চাও, তাহলে সেটা আরও খারাপ। কারণ সেটা হচ্ছে উচ্চস্তরের জিনিস দিয়ে সাধারণ মানবসমাজে বিঘ্ন ঘটানো এবং সাধারণ মানবসমাজের ক্ষতি করা, এমনকী এটা চিন্তা করাও ক্ষতিকর, সেইজন্যে এগুলোর ইচ্ছামতো ব্যবহারের অনুমতি নেই।

সাধারণত বাচ্চা এবং বয়স্ক, আমাদের এই দুই প্রান্তের লোকেদের ক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব তুলনামূলকভাবে বেশী দেখা যায়, বিশেষত বয়স্ক মহিলারা, সাধারণত চরিত্রকে ভালোই বজায় রাখতে পারে এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে এদের কোনো আসক্তিও থাকে না। এদের অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হওয়ার পরে, এরা নিজেদের সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সেগুলোকে প্রদর্শন করার মানসিকতাও এদের থাকে না। অল্পবয়সিদের ক্ষেত্রে কেন এগুলোর উদয় হওয়া সহজ নয়? বিশেষত

তরুণ যুবকরা আরও বেশী করে সাধারণ মানবসমাজে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে চায় এবং আরও বেশী করে তাদের সব লক্ষ্য পূরণ করতে চায়! একবার তাদের অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হলেই সেটাকে ব্যবহার করে তারা লক্ষ্য আদায় করতে চাইবে, এইভাবে লক্ষ্য আদায় করাকে তারা এক ধরনের দক্ষতা হিসাবে দেখবে, সেটা করা নিশ্চিতভাবেই নিষেধ আছে, সেইজন্যে তাদের অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব হয় না।

সাধনার বিষয়টা কিন্তু কোনো বাচ্চার খেলা নয়, এটা সাধারণ লোকেদের দক্ষতার ব্যাপারও নয়, এটা অত্যন্ত গম্ভীর ব্যাপার। তুমি সাধনা করতে চাও বা না চাও এবং তুমি সাধনা করতে পারবে কি পারবে না, এসবই তোমার নিজের চরিত্রের উন্নতি কতটা করতে পারবে তার উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল। যদি কেউ চেষ্টার মাধ্যমে সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতাগুলো অর্জন করতে পারে, সেটা ভয়ংকর ব্যাপার। তুমি দেখবে যে সে কোনো সাধনাই করবে না, সে এ ব্যাপারে একেবারেই চিন্তা করবে না। যেহেতু তার চরিত্রের ভিতটা সাধারণ মানুষের মতো, এবং অলৌকিক ক্ষমতাগুলো চেষ্টার মাধ্যমে পেয়েছে, সেইজন্যে সে সম্ভবত সব ধরনের খারাপ কাজই করতে পারে। ব্যাংকে অনেক টাকা আছে, সে কিছুটা সরিয়ে নিল; বড়ো রাস্তায় প্রচুর লটারির টিকিট বিক্রি হয়, সে প্রথম পুরষ্কার জিতে নিল। এইরকম ব্যাপার ঘটে না কেন? কিছু চিগোংগ মাস্টার বলে যে সদ্‌গুন-এর উপর মনোযোগ না দিলে, অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হওয়ার পরে একজন ব্যক্তি সহজেই খারাপ কাজ করতে পারে। আমি বলব এটা ভুল কথা, বস্তুত ব্যাপারটা এইরকম নয়। তুমি সদ্‌গুন-এর উপরে মনোযোগ না দিলে, চরিত্রের সাধনা না করলে অলৌকিক ক্ষমতার একেবারেই উদয় হবে না। কিছু লোকের চরিত্র ভালো থাকে, তাদের স্তর অনুযায়ী অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব হয়, পরে সে আত্মসংযম বজায় রাখতে পারে না এবং যে কাজ করা উচিত নয় সেই কাজ করে, এই ধরনের ঘটনারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু একবার সে খারাপ কাজ করলে অলৌকিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় অথবা অন্তর্হিত হয়ে যায়। একবার হারিয়ে গেলে সেটা চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়, এর উপরে সবথেকে গম্ভীর ব্যাপার হচ্ছে যে, এটা তার আসক্তিগুলোকে জাগ্রত করে দেয়।

কিছু চিগোংগ মাস্টার বলে যে, তুমি তাদের চিগোংগ পদ্ধতি শিখলে তিনদিনে অথবা পাঁচদিনে রোগ সারাতে পারবে, এটা ঠিক যেন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো, এদের চিগোংগ ব্যবসায়ী বলা উচিত। সবাই চিন্তা

কর, তুমি একজন সাধারণ মানুষ, তুমি সামান্য চি নির্গত করে অন্য লোকের রোগ নিরাময় করতে পারবে কি? সাধারণ লোকের শরীরে চি আছে, তোমারও চি আছে, তুমি সবেমাত্র চিগোংগ অনুশীলন শুরু করেছ, তোমার হাতের তালুর *লাওগোংগ* বিন্দু[42] শুধু মাত্র খুলেছে, সেইজন্যে তুমি চি গ্রহণ করতে পারছ এবং নির্গত করতে পারছ। তুমি যখন অন্য লোকের রোগ নিরাময় করছ, তার শরীরেও চি আছে, সম্ভবত তার চি তোমার রোগ নিরাময় করতে পারে! একজনের চি আর একজনের চি কে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। বস্তুত চি রোগ নিরাময় করতেই পারে না। এর উপরে তুমি যখন কারোর রোগ নিরাময় করবে, সেই সময়ে তুমি এবং সেই রোগী একত্রে একটা ক্ষেত্র তৈরি করবে, যার মাধ্যমে সেই ব্যক্তির সমস্ত রোগগ্রস্ত চি তোমার শরীরে চলে আসবে, এর পরিমাণটা তোমার এবং রোগীর শরীরে একই রকম হয়ে যাবে, যদিও এর মূলটা রোগীর শরীরেই থাকবে, রোগগ্রস্ত চি বেশী হয়ে গেলে তুমিই অসুস্থ হয়ে পড়বে। একবার যখন মনে হবে যে তুমি রোগ নিরাময় করতে পারবে, তখন দোকান খুলে লোকেদের রোগ নিরাময় করতে থাকবে, তুমি কাউকেই ফেরাবে না, তোমার একটা আসক্তি সৃষ্টি হবে। যখন তুমি লোকেদের রোগ নিরাময় করতে পারবে, এত আনন্দ হবে! রোগটা কীভাবে নিরাময় করবে? তুমি এটা চিন্তা করনি? সব নকল চিগোংগ মাস্টারদের শরীরে কোনো সত্তা ভর করে থাকে, তুমি যাতে বিশ্বাস কর, সেইজন্যে এরা কিছু শক্তি সম্পন্ন বার্তা তোমাকে দেবে। তুমি তিন জন, পাঁচ জন, আট জন অথবা দশ জন রোগীকে সারিয়ে তোলার পরে ওই শক্তি শেষ হয়ে যাবে। এটা একধরনের শক্তি যা ব্যবহারের ফলে ফুরিয়ে যাবে, পরে এইটুকু শক্তির আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তোমার নিজের কোনো গোংগ নেই, কোথা থেকে গোংগ পাবে? আমরা চিগোংগ মাস্টাররা কয়েক দশক ধরে সাধনা করে এসেছি, অতীতে সাধনা করা খুবই কঠিন ছিল। যদি কেউ সৎপথে সাধনায় লেগে না থাকে, যদি সে বিপথে বা ছোট পথে সাধনা করে, তাহলে সাধনা করা বেশ কঠিন।

তুমি কিছু বিশিষ্ট চিগোংগ মাস্টারকে দেখেছ যারা বেশ বিখ্যাত ছিল, তারা কয়েক দশক সাধনা করে তবেই এই এতটুকু গোংগ পেয়েছে। তুমি কখনো সাধনা করনি, একটা ক্লাস করেই কীভাবে তোমার গোংগ আসবে? কীভাবে এটা সম্ভব? ওই সময়ের পর থেকে তোমার মধ্যে

[42] *লাওগোংগ* বিন্দু - হাতের তালুর মাঝখানে অবস্থিত আকুপাংচার বিন্দু।

আসক্তির সৃষ্টি হবে। একবার আসক্তির সৃষ্টি হলে তুমি লোকেদের রোগ নিরাময় করতে না পারলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে। কেউ কেউ খ্যাতিটাকে বজায় রাখার জন্যে, এমনকী যখন রোগের উপচার করছে, তখন সে কোন্ চিন্তাটা করছে? ‘‘আমি যেন রোগটা প্রাপ্ত হই এবং রোগী যেন ভালো হয়ে যায়।’’ এটা করুণাপূর্ণ হৃদয় থেকে আসেনি। এটা হচ্ছে তার খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তি যা সে একেবারেই ত্যাগ করেনি, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে এতটুকু সহানুভূতিরও উদ্রেক হয়নি। সে নিজের খ্যাতি হারানোর ভয়টা পাচ্ছে, খ্যাতি চলে যাবে এই ভয়ে এমনকী সে নিজেই রোগটা ভীষণভাবে পেতে চাইছে। অতএব তার এই খ্যাতির প্রতি আসক্তি কতটা প্রবল! তার এই ইচ্ছা যেই প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে, সেই রোগটা রূপান্তরিত হয়ে তার শরীরে স্থানান্তরিত হল, এটা সত্যিই ঘটবে। সে রোগ প্রাপ্ত হয়ে বাড়ি গেল, রোগী ভালো হয়ে গেল, এবং অন্য লোকের রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করে সে নিজে বাড়িতে কষ্ট সহ্য করতে থাকল। তুমি ভাববে যে তুমি রোগ নিরাময় করেছ, অন্য লোকেরা তোমাকে যখন চিগোংগ মাস্টার বলে সম্বোধন করে, তুমি খুব খুশি হয়ে আত্মপ্রসাদে ভুগতে থাক, অত্যন্ত আনন্দ বোধ কর। এটা কি একটা আসক্তি নয়? যখন তুমি রোগ সারাতে পার না তখন মাথা নীচু করে, ব্যর্থতা অনুভব করতে থাক, এটা তোমার খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তির জন্যেই হচ্ছে না কি? এর উপরে তোমার দেখা রোগীর রোগগ্রস্ত সব ‘‘চি’’ তোমার শরীরে চলে আসবে। যদিও নকল চিগোংগ মাস্টার তোমায় শিখিয়েছে যে এটাকে কী করে দূর করতে হয়, কিন্তু আমি তোমাকে বলছি, তুমি এটাকে একেবারেই দূর করতে পারবে না, এতটুকুও দূর করতে পারবে না, কারণ ভালো চি থেকে খারাপ চি-কে পৃথক করার কোনো ক্ষমতাই তোমার নেই। ধীরে ধীরে তোমার শরীর ভিতর থেকে সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে এবং এটাই কর্ম।

যখন তুমি সত্যিকারের সাধনা করবে সেটা খুবই কঠিন মনে হবে, তখন তুমি কী করবে? কতটা কষ্ট সহ্য করতে হবে সেই কর্মকে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত করার জন্যে? এটা বলা খুবই কঠিন। বিশেষত জন্মগত সংস্কার যার যত ভালো হবে ততই তার পক্ষে এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সহজতর হবে। কিছু লোক শুধু লোকেদের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে প্রয়াস করতেই থাকে। তুমি যখন এসব চাইছ, একটা পশু সেটা দেখবে, এটা তোমার উপরে চড়ে বসবে এবং এটাই হচ্ছে পশু বা সত্তা ভর করা। ‘‘তুমি লোকেদের রোগ নিরাময় করতে চাও

না কি? আমি তোমাকে সাহায্য করব।'' কিন্তু সে তোমাকে কোনো কারণ ছাড়া রোগ নিরাময় করতে সাহায্য করবে না। ক্ষতি নাহলে লাভ হবে না, খুবই বিপজ্জনক, শেষে তুমি একে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলে। এরপরে কীভাবে আর সাধনা করবে? সব শেষ হয়ে যাবে।

কিছু লোকের জন্মগত সংস্কার বেশ ভালো থাকে, তারা সেটাকে অন্য লোকের কর্মের সঙ্গে বিনিময় করে। সেই ব্যক্তি অসুস্থ এবং তার কর্মের পরিমাণও বিরাট, তুমি যদি কোনো ব্যক্তির গুরুতর রোগ নিরাময় কর, সেক্ষেত্রে রোগ নিরাময় করার পরে তুমি বাড়িতে খুব দুর্ভোগ সহ্য করবে! অতীতে আমাদের অনেক লোকই অন্যদের রোগ নিরাময় করার সময়ে এইরকম অনুভব করেছে। অসুস্থ লোক সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি বাড়িতে খুব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছ। যত সময় পার হবে, আরও কর্ম রূপান্তরিত হয়ে তোমার কাছে আসবে, আর তুমি অন্যদের কর্মের বিনিময়ে তোমার সদ্‌গুণ দেবে, ক্ষতি নেই তো লাভও নেই। যদিও তুমি অসুখটা চাইছ কিন্তু তোমাকে কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই সদ্‌গুণ দিতে হবে। এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, তুমি নিজে কিছু চাইলে কেউ তোমাকে থামাবে না, আবার এটাও কেউ বলতে পারবে না যে তুমি ভালো। এই বিশ্বে আরও একটা বিশেষ নিয়ম আছে, যার কর্ম অনেক বেশী আছে, সে খারাপ মানুষ। তুমি কর্মের বিনিময়ে, অন্যকে তোমার নিজস্ব জন্মগত সংস্কার দিয়ে দিচ্ছ, অনেক বেশী কর্ম হয়ে গেলে, তুমি কীভাবে সাধনা করবে? তোমার সম্পূর্ণ জন্মগত সংস্কার সেই ব্যক্তির দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা ভয়ের ব্যাপার নয় কি? অন্য লোকের অসুখ ঠিক হয়ে গেল, সে এখন আরাম বোধ করছে, কিন্তু তুমি বাড়িতে কষ্ট সহ্য করছ। তুমি যদি কয়েকটা ক্যান্সারের রোগীকে ভালো কর, তাহলে তাদের জায়গায় তুমি চলে যাবে, এটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার নয়? ঠিক এরকমই ঘটে, অনেক লোকই এই সত্যটা জানে না।

কিছু নকল চিগোংগ মাস্টারের ক্ষেত্রে, তারা কত বেশী বিখ্যাত, তুমি সেটার প্রতি লক্ষ্য রাখবে না, বিখ্যাত হওয়া মানে এটা নয় যে তারা বেশী জানে। সাধারণ লোকেরা কী বোঝে? কোনো কিছু লোকেদের মধ্যে ভীষণভাবে প্রচারিত হলে লোকেরা সেটা বিশ্বাস করে। যদিও তারা এখন এসব জিনিস করছে, তারা শুধু যে অন্যদের ক্ষতি করছে তা নয়, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে, একটা দুটো বছর পেরোতে দাও, দেখবে তাদের কী অবস্থা হয়, এইভাবে সাধনার ক্ষতি করার অনুমতি নেই। সাধনার

মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা সম্ভব, কিন্তু একে রোগ নিরাময় করার জন্যে ব্যবহার করা যাবে না। এটা এক ধরনের অতিপ্রাকৃত জিনিস, সাধারণ মানুষদের কলাকৌশলের ব্যাপার নয়। তোমাকে ইচ্ছামতো এর ক্ষতি করতে একেবারেই অনুমতি দেওয়া যাবে না। বর্তমানে কিছু নকল চিগোংগ মাস্টার সত্যিই একটা বিকৃত বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে, তারা চিগোংগ-কে খ্যাতি অর্জনের এবং সৌভাগ্য প্রাপ্তির একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করছে, তারা অশুভ দল তৈরি করে খারাপ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে এবং এদের সংখ্যা প্রকৃত চিগোংগ মাস্টারদের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। সাধারণ লোকেরা সবাই এইরকমই বলে এবং এইরকমই করে, তুমিও কি সেসব বিশ্বাস করবে? তুমি মনে করবে চিগোংগ এইরকমই, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমি তোমাদের প্রকৃত তত্ত্বটা বলব।

লোকেরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের আদান-প্রদানের সময়ে, নিজেদের লাভের জন্যে খারাপ কাজ করে, অথবা কিছু জিনিসের জন্যে ঋণী হয়ে যায়, তাদের অবশ্যই কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে এই ঋণ শোধ করতে হবে। ধরা যাক, তুমি ইচ্ছামতো কোনো ব্যক্তির রোগ নিরাময় করতে চাও, কিন্তু সত্যি সত্যি রোগ নিরাময় করার জন্যে তোমাকে অনুমতি দেওয়া যাবে কি? বুদ্ধরা সর্বত্র বিরাজমান, এত বুদ্ধ আছেন অথচ তাঁরা কেন এই কাজটা করছেন না? এটা কত ভালো হবে যদি তাঁদের কেউ সমস্ত মানবজাতির জীবন আরামদায়ক করে দেন! তাঁরা কেন এটা করছেন না? তোমার নিজের কর্ম, তোমাকেই শোধ করতে হবে। এই নিয়ম কেউই ভাঙ্গতে সাহস করে না। কোনো ব্যক্তির সাধনার পর্বে, করুণা বোধের উদয় হওয়ায়, সে কোনো কোনো সময়ে কাউকে সামান্য সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সেটা শুধু রোগীর রোগটাকে কিছুটা বিলম্বিত করবে মাত্র। তুমি এখন কষ্ট সহ্য করছ না, কিন্তু পরে কষ্টটা সহ্য করবে, অথবা সে এটাকে রূপান্তরিত করে দেবে, রোগ না হয়ে তার পরিবর্তে তোমার টাকা খোয়া যেতে পারে, দুঃখদুর্দশা ঘটতে পারে, হয়তো এরকমই কিছু ঘটবে। সত্যি সত্যি কর্ম একবারে দূর করা যাবে শুধুমাত্র সাধকের ক্ষেত্রে, সাধারণ লোকের জন্যে করা যাবে না। আমি এখানে শুধু আমার সাধনার নীতিগুলো বলছি না, আমি আমাদের এই সম্পূর্ণ বিশ্বের নীতিগুলো নিয়ে বলছি এবং আমি সাধনার জগতের সত্যিকারের পরিস্থিতি নিয়ে বলছি।

এখানে আমরা তোমাকে রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে শেখাবো না, আমরা তোমাকে মহান পথে এবং সৎপথে পরিচালিত করব, তোমাকে

উপরের দিকে নিয়ে যাব। সেইজন্যে আমি বক্তৃতাগুলোতে সব সময়েই বলি যে ফালুন দাফা-র শিষ্যদের অন্যের রোগের চিকিৎসা করার অনুমতি নেই। তুমি যদি রোগের চিকিৎসা কর, তাহলে তুমি ফালুন দাফা-র শিষ্য নও। যেহেতু আমরা তোমাকে সৎপথে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, এই ত্রিলোক ফা সাধনার পর্বে, তোমার শরীরকে সর্বদা শোধন করতেই থাকব। শরীরটা সম্পূর্ণরূপে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এইরকম শরীরের শোধন চলতেই থাকবে। কিন্তু তুমি এখনও তোমার শরীরে কালো জিনিস নিয়ে আসছ, তুমি কীভাবে সাধনা করবে? ওইসব জিনিসগুলো হচ্ছে কর্ম! তুমি বস্তুত সাধনা করতেই পারবে না। বেশী কর্ম হয়ে গেলে তুমি সেটা সহ্য করতে পারবে না, খুব বেশী কষ্ট সহ্য করতে হলে তুমি সাধনা করতেই পারবে না, এটাই হচ্ছে কারণ। আমি তোমাদের মধ্যে এই দাফা প্রচার করছি, সম্ভবত তোমার ধারণা নেই যে আমি কী শেখাচ্ছি। যখন থেকে এই দাফা-কে প্রচার করা হচ্ছে, তখন থেকে তাকে রক্ষা করার উপায়ও ঠিক করা আছে। তুমি যদি কারোর রোগের চিকিৎসা কর, সেক্ষেত্রে আমার ফা-শরীর, তোমার শরীর থেকে সমস্ত সাধনার জিনিসগুলো ফিরিয়ে নেবে। খ্যাতি এবং লাভের জন্যে তোমাকে ইচ্ছামতো এইরকম একটা মূল্যবান জিনিস নষ্ট করতে দেওয়া যাবে না। যদি তুমি ফালুন দাফা-র আবশ্যকতা পালন না কর তাহলে তুমি ফালুন দাফা-র সাধক নও। সেইজন্যে তোমার শরীরকে সাধারণ মানুষের স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং খারাপ জিনিসগুলোও তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, যেহেতু তুমি একজন সাধারণ মানুষ হতে চাও।

গতকাল বক্তৃতা শেষ করার পর থেকে তোমাদের অনেকেই পুরো শরীরটাকে হাল্কা বোধ করছ। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক গুরুতর অসুস্থ লোকের ক্ষেত্রে যারা অন্যদের থেকে এগিয়ে গিয়েছিল, গতকাল থেকে তাদের অস্বস্তি বোধ করা আরম্ভ হয়েছে। গতকাল আমি সবার শরীর থেকে খারাপ জিনিস দূর করে দেওয়ার পর থেকে আমাদের অধিকাংশ লোক পুরো শরীরটাকে হাল্কা বোধ করছে এবং ভীষণ আরাম অনুভব করছে। কিন্তু এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, ক্ষতি নাহলে লাভ হবে না। সমস্ত খারাপ জিনিস তোমার শরীর থেকে দূর করা যাবে না। তুমি সামান্য কষ্ট সহ্য করবে না, এর অনুমতি নিশ্চিতভাবেই দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ এটাই বলা যায় যে, তোমার রোগের মূল কারণ এবং শরীর ভাল না থাকার মূল কারণ আমরা দূর করে দিয়েছি, কিন্তু তোমার রোগের একটা ক্ষেত্র এখনও রয়ে গেছে। যাদের দিব্যচক্ষু খুব নীচুস্তরে খুলেছে, তারা

তোমার শরীরের মধ্যে কালো কালো চি-এর সমষ্টি এবং কাদার মতো অসুস্থ চি দেখতে পারবে, যেটা একটা ঘন জিনিস এবং অত্যন্ত ঘন কালো চি-এর সমষ্টি, একবার এগুলো ছড়িয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ শরীরকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলবে।

আজকের পর থেকে কিছু লোক সারা শরীরে শীত শীত বোধ করবে, যেন খুব সর্দি জ্বর হয়েছে, তাদের হাড়গুলোতে ব্যথা হতে পারে। তোমাদের বেশীরভাগ লোকের শরীরে কোনো কোনো জায়গায় অস্বস্তি বোধ হতে পারে, পায়ে ব্যথা অনুভব হতে পারে, মাথায় ঝিমঝিম বোধ হতে পারে। তোমার শরীরে পূর্বে যে অংশে রোগ ছিল, যেটা তুমি ভেবেছিলে যে চিগোংগ অনুশীলনের মাধ্যমে বা কোনো চিগোংগ মাস্টারের দ্বারা হয়তো ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেখানে পুনরায় রোগের উদয় হতে পারে। কারণ সেই চিগোংগ মাস্টার তোমার রোগটাকে নিরাময় করেনি, বিলম্বিত করেছিল মাত্র, রোগটা ঠিক সেই জায়গাতেই তখনও রয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তখন রোগের পুনরাক্রমণ না হলেও, ভবিষ্যতে হতো। আমরা অবশ্যই ভিতর থেকে সবকিছু বের করে এনে, তোমার শরীরের বাইরে তাড়িয়ে দেব এবং মূল থেকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেব। এইভাবে তোমার হয়তো বোধ হবে যে রোগটা আবার ফিরে এল, এটা হবে তোমার কর্মকে মূল থেকে দূর করার জন্যে, সেইজন্যে তোমার শরীরে প্রতিক্রিয়া ঘটবে। কিছু লোকের শরীরে, কোনো কোনো অংশে প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এখানে কষ্ট হতে পারে, ওখানে কষ্ট হতে পারে, নানান ধরনের সব কষ্ট হতে পারে, এগুলো সবই স্বাভাবিক। আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের যত কষ্টই হোক না কেন, তোমরা অবশ্যই অধ্যবসায়ী হয়ে ক্লাসে আসতে থাকবে, যখনই তুমি হেঁটে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করবে, তোমার শরীরের সব উপসর্গগুলো চলে যাবে, কোনো বিপদ আর ঘটবে না। একটা বিষয় সবাইকে বলতে চাই, তুমি ওই ‘‘রোগ’’ এর কারণে যেমন কষ্টই বোধ কর না কেন, আমি আশা করব তুমি অধ্যবসায়ী হয়ে এখানে আসতে থাকবে, কারণ ‘‘ফা’’ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। তুমি যখন খুব কষ্ট সহ্য করছ সেটা ইঙ্গিত করছে যে ব্যাপারটা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে এবং পরিস্থিতি এবার পাল্টাবে, তোমার পুরো শরীর শোধন করা হবে, এবং অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে শোধন করা হবে। তোমার রোগের মূল ইতিমধ্যে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে, কালো চি-এর সামান্য কিছু অবশেষ পড়ে রয়েছে, যেগুলো নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে, যাতে তোমাকে কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং

কিছুটা অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তুমি এইটুকু কষ্টও সহ্য করবে না এটা হতে দেওয়া যাবে না।

সাধারণ মানবসমাজে খ্যাতির জন্যে, লাভের জন্যে, এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে, তুমি ভালো করে ঘুমাতে পার না, ভালো করে খেতে পার না, তুমি ইতিমধ্যে শরীরটাকে এত খারাপ করে দিয়েছ যে দেখে আর চেনা যাচ্ছে না। অন্য মাত্রা থেকে যদি তোমার শরীরটাকে দেখো তাহলে দেখা যাবে যে, তোমার শরীরের হাড়গুলো সব কালো হয়ে গেছে। তোমার এইরকম শরীরকে যদি একবারে শোধন করা হয়, তাহলে এটা অসম্ভব যে তোমার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, সুতরাং তোমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবেই। কিছু লোকের বমি এবং উদরাময় হতে পারে। পূর্বেও অনেক জায়গায় শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতার প্রতিবেদনে এই বিষয়টা উত্থাপন করে বলেছে: ‘‘মাস্টার, আপনার ক্লাস শেষ হওয়ার পরে বাড়িতে ফেরার সময়ে পুরো রাস্তাটাতে সারাক্ষণ আমি শৌচালয়ের খোঁজ করেছি।’’ কারণ তোমার সমস্ত আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে শোধন করা আবশ্যক। আরও কেউ কেউ আছে যারা ঘুমিয়ে পড়ে এবং আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে জেগে ওঠে। কেন এটা হয়? যেহেতু তার মস্তিষ্কের মধ্যে রোগটা রয়েছে, সেইজন্যে সেটার সামঞ্জস্যবিধান করা প্রয়োজন। মস্তিস্কের সামঞ্জস্যবিধান করার সময়ে সেই ব্যক্তি সেটা একেবারেই সহ্য করতে পারবে না, সেইজন্যে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা হয়, সে জানতেও পারে না। কিন্তু কিছু লোকের শোনার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না, তাদের ঘুমটাও খুব গাঢ় হয়, কিন্তু একটা শব্দও বাদ যায় না, তারা সবকিছু শুনতে পারে, এর পরে তারা প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং দুই দিন না ঘুমালেও তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। লোকেরা নানান ধরনের অবস্থার মধ্যে আছে, এসবেরই সামঞ্জস্যবিধান করা প্রয়োজন, তোমার পুরো শরীরকে সম্পূর্ণরূপে শোধন করা হবে।

যদি তুমি সত্যিকারের ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থী হিসাবে, তোমার আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে থাক, তাহলে এখন থেকেই সব প্রতিক্রিয়াগুলো শুরু হয়ে যাবে। কিছু লোক আসক্তি ত্যাগ না করা সত্ত্বেও মুখে বলবে আসক্তি ত্যাগ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা একেবারেই ত্যাগ করেনি, সেইজন্যে এদের শরীর শোধন করা খুব কঠিন। আরও কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা, আমার বক্তৃতার মূল বিষয়টা পরে বুঝতে পারে, তখন তারা আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে থাকে এবং তাদের

শরীরও শোধন করা হতে থাকে। যখন অন্য লোকেরা তাদের পুরো শরীরটাকে হাল্কা বোধ করছে তখন এই লোকেদের রোগ দূর করা শুরু হয় এবং শরীরে অস্বস্তি বোধ করা আরম্ভ হয়। প্রত্যেক ক্লাসেই এইরকম কিছু লোক আছে যারা পিছিয়ে থাকে, এদের আলোকপ্রাপ্তির গুণ কিছুটা কম, সুতরাং যাই হোক না কেন, তুমি যে কোনো পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হও না কেন সবই স্বাভাবিক। অন্য জায়গায় ক্লাস নেওয়ার সময়ে, সর্বদাই এইরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যেখানে কিছু লোক খুব কষ্টের মধ্যে থাকে, তারা তাদের চেয়ারে সামনে ঝুঁকে বসে থাকে, সেখান থেকে ওঠে না, অপেক্ষা করে কখন আমি মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এসে তাদের রোগটা নিরাময় করে দেব। আমি তাদের রোগ নিরাময় করি না, এমনকী এই বাধাটাও তুমি যদি অতিক্রম করতে না পার, তাহলে পরবর্তীকালে তুমি যখন নিজে নিজে সাধনা করবে, তখন অনেক বড়ো বড়ো দুর্ভোগের আবির্ভাব হবে, অথচ এখনকার এই বাধাটাও যদি পেরোতে না পার, তাহলে কীভাবেই বা সাধনা করবে? এই সামান্য বাধাটুকুও কি তুমি অতিক্রম করতে পারবে না? সবই তুমি অতিক্রম করতে পারবে। অতএব তোমরা রোগ নিরাময় করার জন্যে আর আমার খোঁজ করবে না, তুমি যেই ‘‘রোগ’’ শব্দটা উল্লেখ করবে, আমি আর শুনতে চাইব না।

লোকেদের উদ্ধার করা খুবই কঠিন। প্রত্যেক ক্লাসে সবসময়েই এইরকম পাঁচ থেকে দশভাগ লোক থাকে যারা অন্যদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না। এটা অসম্ভব যে সবাই তাও প্রাপ্ত হবে, এমনকী তুমি অধ্যবসায়ের সাথে সাধনা করে গেলেও, এখনো এটা দেখার আছে যে, তুমি সাধনায় সফল হতে পারবে কি পারবে না, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধনা করতে পারবে কি পারবে না। প্রত্যেকেই বুদ্ধ হয়ে যাবে, সেটা অসম্ভব। এই বইটা পড়লে, সত্যিকারের দাফা সাধকের একই অভিজ্ঞতা হবে এবং তার যা কিছু পাওয়া উচিত সবই সে প্রাপ্ত হবে।

বক্তৃতা - তিন

আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আমার শিষ্য হিসাবে দেখি

তোমরা সবাই জান যে, আমি কী কাজ করছি? আমি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাকে পরিচালিত করছি, যে সমস্ত লোকেরা নিজেরাই অধ্যয়নের মাধ্যমে সত্যিকারের সাধনা করছে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। উঁচুস্তরে সাধনার ক্ষেত্রে আমি এইভাবে পরিচালিত না করলে ঠিক হবে না, সেটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সমান হবে, এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আমি তোমাদের এত জিনিস দিয়েছি এবং এত সত্য জানিয়েছি, যা সাধারণ মানুষদের জানা উচিত নয়। আমি তোমাদের দাফা শেখাচ্ছি এবং আমি আরও অনেক জিনিস প্রদান করব। তোমাদের প্রত্যেকের শরীর শোধন করা হচ্ছে, এছাড়াও অন্য কিছু বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেইজন্যে তোমাদের শিষ্য হিসাবে পরিচালিত না করলে সেটা একেবারেই ঠিক হবে না। ইচ্ছামতো এত স্বর্গীয় গোপন তথ্য একজন সাধারণ মানুষকে জানানোর অনুমতি নেই। কিন্তু একটা ব্যাপার তোমাদের জানাতে চাই, এখন সময় পাল্টে গেছে, প্রণাম করা বা সামনে ঝুঁকে সম্মান জানানোর রীতিগুলো আমরা ব্যবহার করি না। ওই রকম রীতির কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই, এগুলো ধর্মীয় রীতির মতো, আমরা এসব পালন করি না। এর কারণ, তুমি যদিও মাস্টারকে প্রণাম করছ এবং পূজা করছ, কিন্তু দরজার বাইরে গেলেই আগের মতোই যা খুশি তাই করতে থাকবে, সাধারণ মানুষদের মধ্যে যা উচিত মনে করবে সেটাই করতে থাকবে, নিজের খ্যাতি ও স্বার্থের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই করতে থাকবে, তাহলে এসবের কী প্রয়োজন? তুমি হয়তো আমার ছত্রছায়ায় থাকা ফালুন দাফা-র সুনামও নষ্ট করে দেবে!

সত্যিকারের সাধনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তোমার মনের সাধনার উপরে নির্ভর করে, যতক্ষণ তুমি নিশ্চয়তার সঙ্গে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধনা করে যাবে, ততক্ষণ আমরা তোমাকে শিষ্য হিসাবে পরিচালিত করে যাব, তোমাকে এইভাবে চালনা না করলে সেটা একেবারেই ঠিক হবে না। তবে কিছু লোক আছে, যারা সম্ভবত নিজেদের সত্যিকারের সাধক মনে না

করেও সাধনা করতে থাকে, কিছু লোকের পক্ষে এটা অসম্ভব। কিন্তু অনেক লোকই সত্যিকারের সাধনা চালিয়ে যায়। যতক্ষণ তুমি সাধনা করে যাবে ততক্ষণ আমরা তোমাকে শিষ্য হিসাবে পরিচালিত করে যাব।

যদি কেউ প্রত্যেকদিন কয়েকটা শারীরিক ক্রিয়া অনুশীলন করতে থাকে, তাকে কি ফালুন দাফা-র শিষ্য হিসাবে পরিগণিত করা যাবে? সম্ভবত নয়। যেহেতু সত্যিকারের সাধনায় আমাদের উল্লেখিত চরিত্রের মান বজায় রাখার আবশ্যকতাগুলোকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে, তোমাকে অবশ্যই নিজের চরিত্রের সত্যিকারের উন্নতি ঘটাতে হবে, একমাত্র তাহলেই সেটা হবে প্রকৃত সাধনা। তুমি শুধু কয়েকটা শারীরিক ক্রিয়া করলে, কিন্তু চরিত্রের উন্নতি ঘটালে না, তাহলে তোমার প্রবল শক্তি থাকবে না যার দ্বারা সাধনায় প্রাপ্ত সবকিছুর শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে, এটাকে সাধনা বলা যায় না, এবং আমরাও তোমাকে ফালুন দাফা-র শিষ্য হিসাবে পরিগণিত করব না। তুমি যদি দিনের পর দিন এইরকমই করতে থাক, হয়তো শারীরিক ক্রিয়া করে যাচ্ছ, কিন্তু ফালুন দাফা-র আবশ্যকতাগুলো পালন করছ না, তুমি চরিত্রের উন্নতি করছ না, সাধারণ লোকেদের মধ্যে যা খুশি তাই করে যাচ্ছ, সেইজন্যে তুমি হয়তো অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে পার; ব্যাপারটাকে ঠিকভাবে সামলাতে না পেরে, তুমি এমনকী এরকমও বলতে পার যে, আমাদের এই ফালুন দাফা-ই তোমাকে বিপথগামী করে দিয়েছে, এসবই সম্ভব। সেইজন্যে তোমাকে অবশ্যই আমাদের চরিত্রের মান বজায় রাখার আবশ্যকতাগুলোকে পালন করে যেতে হবে, একমাত্র তাহলেই তুমি একজন প্রকৃত সাধক হতে পারবে। আমি সবাইকে পরিষ্কার করে জানাতে চাই যে তোমরা দীক্ষা নেওয়ার আচার অনুষ্ঠানের জন্যে আমার খোঁজ করবে না, যতক্ষণ তুমি সত্যিকারের সাধনা করে যাবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে এইভাবে চালনা করে যাব। ইতিমধ্যে আমার ফা-শরীরের সংখ্যা এত বেশী যে গুনে শেষ করা যাবে না, এখানকার এই শিক্ষার্থীদের কথা না হয় ছেড়েই দাও, আরও যত লোকই আসুক না কেন আমি তবুও তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারব।

বুদ্ধ মতের চিগোংগ এবং বৌদ্ধধর্ম

বুদ্ধ মতের চিগোংগ বৌদ্ধধর্ম নয়, আমি এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলতে চাই, বস্তুত তাও মতের চিগোংগ-ও তাও ধর্ম নয়। আমাদের

অনেকের কাছেই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। কিছু লোক আছে যারা মন্দিরের ভিক্ষু এবং আরও কিছু লোক আছে যারা গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তারা ভাবে যে তারা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিছুটা বেশী জানে, সেইজন্যে তারা অতি উৎসাহের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের জিনিসগুলি প্রচার করছে। আমি তোমাদের বলছি, এই ধরনের কাজ করবে না, কারণ সেগুলো অন্য সাধনা পদ্ধতির জিনিস। ধর্মের একরকম ধর্মীয় রীতিনীতি থাকে, আর আমরা এখানে আমাদের সাধনা পদ্ধতির অংশটা শেখাচ্ছি। ফালুন দাফা-র কিছু বিশেষ শিষ্য ছাড়া বাকি সবাই ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাপারে চিন্তা করবে না, সুতরাং আমাদের এই সাধনা প্রণালী, ধর্মের বিনাশকালের বৌদ্ধধর্ম নয়।

বৌদ্ধধর্মের যে ধর্ম সেটা বুদ্ধ ফা-এর ছোট্ট একটা অংশমাত্র, আরও অনেক উচ্চস্তরের মহান ফা আছে, প্রত্যেক স্তরে আছে ভিন্ন ভিন্ন ফা। শাক্যমুনি চুরাশীহাজার সাধনা পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কয়েকটাই মাত্র সাধনা পদ্ধতি আছে, এতে শুধু আছে, তিয়ানতাই, হুয়ায়িয়ান, জেন, পবিত্রভূমি, তান্ত্রিক সাধনা ইত্যাদি, এইরকম কয়েকটা পদ্ধতি, যেগুলো মিলে এমনকী সেটার ভগ্নাংশও হয় না! সেইজন্যে বৌদ্ধধর্ম কখনোই সম্পূর্ণ বুদ্ধ ফা ব্যাখ্যা করতে পারবে না, এটা শুধু বুদ্ধ ফা-এর একটা ছোট্ট অংশ মাত্র। আমাদের এই ফালুন দাফাও এই চুরাশীহাজার পদ্ধতির মধ্যে একটা পদ্ধতি, এর সঙ্গে মূল বৌদ্ধধর্মের এবং ধর্মের বিনাশকালের বৌদ্ধধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং বর্তমানকালের ধর্মগুলির সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 2500 বছর আগে শাক্যমুনি বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেছিলেন। যখন শাক্যমুনির গোংগ উন্মোচিত হয়েছিল এবং আলোকপ্রাপ্তি লাভ হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর নিজের পূর্বের সাধনার জিনিসগুলি স্মরণ করেছিলেন এবং লোকেদের উদ্ধার করার জন্যে জনসাধারণের মধ্যে সেগুলো প্রচার করেছিলেন। যদিও ওই সাধনার পথে হাজার হাজার সূত্রখন্ড প্রকাশিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এতে তিনটে শব্দ আছে, ‘‘অনুশাসন, সমাধি এবং প্রজ্ঞা,’’ এবং এগুলিই বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য। অনুশাসনগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা দূর করা হবে, তোমার স্বার্থের পিছনে ছুটে যাওয়াকে ছাড়তে বাধ্য করা হবে, পার্থিব সমস্ত জিনিসের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে, ইত্যাদি

ইত্যাদি। এইভাবে তোমার মনে শূন্যতা আসবে, কোনো চিন্তাও থাকবে না, তাহলেই স্থিরভাব আসবে, এগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। স্থিরভাব আসার পরে তুমি ধ্যানে বসে প্রকৃত সাধনা করতে পারবে এবং সমাধির ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে সাধনায় উঁচুতে উঠতে পারবে, এটাই হচ্ছে এই মতের সত্যিকারের সাধনার অংশ। তারা কলাকৌশলজনিত কোনো কিছুর শিক্ষা দেয় না, তারা তাদের মূল শরীর[43] -এর রূপান্তর করে না। তারা শুধু গোংগ-এর সাধনা করে, যা তাদের স্তর নির্দেশ করে, সেইজন্যে তারা কেবল চরিত্রের সাধনা করে, তারা শরীরের সাধনা করে না, এবং গোংগ-এর বিবর্তনের কথাও বলে না। একই সাথে তারা ধ্যানের মাধ্যমে সমাধিতে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে, এবং ধ্যানে বসে কষ্ট সহ্য করে, কর্ম দূর করে। প্রজ্ঞা ইঙ্গিত করে তার আলোকপ্রাপ্তি লাভ করাকে এবং মহৎ জ্ঞানের দ্বারা মহান প্রজ্ঞায় পৌঁছে যাওয়াকে। সে এই বিশ্বের সত্যকে দেখতে পারে, এবং এই বিশ্বের প্রত্যেকটি মাত্রার সত্যগুলিকে দেখতে পারে, তার মধ্যে মহান দিব্যক্ষমতাগুলোর প্রকাশ ঘটে। প্রজ্ঞার উন্মোচন হওয়া এবং আলোকপ্রাপ্তি লাভ করাকে গোংগ-এর উন্মোচন বলে।

যখন শাক্যমুনি এই সাধনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষে আটটা ধর্ম প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে একটা ধর্ম খুব গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যার নাম ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। শাক্যমুনি তাঁর সারা জীবন ধরে অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে মতাদর্শগতভাবে লড়াই করে গেছেন। শাক্যমুনি যা শেখাচ্ছিলেন সেটা ছিল একটা সৎ সাধনা পদ্ধতি, সেইজন্যে তাঁর শেখানো বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর্বে ক্রমে ক্রমে আরও বেশী করে জনপ্রিয় হয়েছিল। যার ফলে অন্য ধর্মগুলি ক্রমে ক্রমে আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, এমনকী গভীরভাবে প্রোথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বিলুপ্তির অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু শাক্যমুনির নির্বাণ[44] -এর পরে অন্য ধর্মগুলি বিশেষত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরায় জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তখন বৌদ্ধধর্মে কোন্ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল? কিছু ভিক্ষুর বিভিন্ন স্তরে গোংগ উন্মোচন হয়েছিল এবং আলোকপ্রাপ্তি হয়েছিল, কিন্তু খুব নীচুস্তরে উন্মোচন

---

[43]মূল শরীর - একজন ব্যক্তির ভৌতিক শরীর অথবা অন্য মাত্রাগুলির শরীর।
[44]নির্বাণ -- ভৌতিক শরীরকে ত্যাগ করে পার্থিব জগত থেকে মুক্ত হওয়া, বুদ্ধ শাক্যমুনির মত অনুযায়ী সাধনা সম্পূর্ণ করার পদ্ধতি।

হয়েছিল। শাক্যমুনি তথাগত স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, অনেক ভিক্ষুই এই স্তরে পৌঁছাতে পারেননি।

বিভিন্ন স্তরে বুদ্ধ মতের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু স্তর যত উঁচু হবে, ততই এটা সত্যের আরও কাছে থাকবে, এবং স্তর যত নীচু হবে ততই এটা সত্যের থেকে আরও দূরে থাকবে। ওই ভিক্ষুদের গোংগ উন্মোচন এবং আলোকপ্রাপ্তি খুব নীচুস্তরে ঘটেছিল, তাঁদের স্তর অনুযায়ী এই বিশ্বের প্রকাশিত যে রূপ তাঁরা দেখেছিলেন, পরিস্থিতিগুলো সম্বন্ধে তাঁরা যা শিখেছিলেন এবং সত্য সম্বন্ধে তাঁরা যা উপলব্ধি করেছিলেন, সেসবের উপরে ভিত্তি করে, তাঁরা শাক্যমুনির বলা কথাগুলির মর্মোদ্ধার করেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, ভিক্ষুরা শাক্যমুনির শেখানো ধর্মকে এক একজন এক একভাবে বুঝেছিলেন। আবার কিছু ভিক্ষু শাক্যমুনির মূল কথাগুলি বলার পরিবর্তে তাঁদের নিজেদের উপলব্ধির জিনিসগুলিকে শাক্যমুনির মূলকথা হিসাবে প্রচার করেছিলেন। এর ফলে বুদ্ধ ফা-এর আমূল বিকৃতি ঘটেছিল এবং বস্তুত সেটা আর শাক্যমুনি প্রচারিত ধর্ম ছিল না। শেষে বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত বুদ্ধ ফা ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এটা ইতিহাসের থেকে একটা বিরাট শিক্ষা, সুতরাং পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম আর রইল না। বিলুপ্তির আগে বৌদ্ধধর্ম কতকগুলি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, শেষে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জিনিস এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, এবং আধুনিক যুগের ধর্ম তৈরি হয়েছিল, যাকে বলে হিন্দু ধর্ম। এতে কোনো বুদ্ধের উপাসনা করা হয় না, এরা অন্য কিছুর পূজা করে, এবং এরা শাক্যমুনিকে আর বিশ্বাস করে না, এটা এইরকমই একটা পরিস্থিতি।

বৌদ্ধধর্মের বিকাশের প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত বড়ো কতকগুলো পরিবর্তন ঘটেছিল। এর একটা ঘটেছিল শাক্যমুনি চলে যাওয়ার অল্প সময় পরে, কিছু লোক শাক্যমুনির শেখানো উচ্চস্তরের নীতিগুলোর উপরে ভিত্তি করে মহাযান বৌদ্ধধর্ম স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে শাক্যমুনি যে ধর্ম জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন, সেটা সাধারণ লোকেদের শেখানোর জন্যে, যাতে তারা নিজেরাই মোক্ষলাভ করতে পারে এবং অর্হৎ অবস্থা অর্জন করতে পারে। যে ধর্মে সর্ব জীবের মোক্ষলাভের কথা বলা হয় না সেটা হচ্ছে হীনযান বৌদ্ধধর্ম। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভিক্ষুরা শাক্যমুনির সময়ের মূল সাধনা পথটা বজায় রেখেছেন এবং আমাদের হান অঞ্চলের অধিবাসীরা একে হীনযান বৌদ্ধধর্ম বলে। অবশ্য তাঁরা নিজেরা

এটা স্বীকার করেন না, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, তাঁরাই শাক্যমুনির মূল জিনিসগুলোর উত্তরাধিকারী। প্রকৃতপক্ষে এইরকমই হয়েছে, তাঁরাই মূলগতভাবে শাক্যমুনির সময়কার সাধনা পদ্ধতির উত্তরাধিকারী হয়েছেন।

পরিবর্তিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম আমাদের এই চীনদেশে প্রচলিত হওয়ার পরে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করে, সেটাই হচ্ছে বর্তমান কালে আমাদের দেশের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম, কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে শাক্যমুনির সময়কালের বৌদ্ধধর্মের থেকে পুরোপুরি পাল্টে গিয়েছিল। বেশভূষা থেকে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্তির অবস্থা এবং সাধনার প্রক্রিয়া সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটেছিল। মূল বৌদ্ধধর্মে শুধুমাত্র শাক্যমুনিকেই শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উপাসনা করা হতো, কিন্তু এখনকার বৌদ্ধধর্মে অনেক বুদ্ধ এবং মহান বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে, এছাড়া অনেক বুদ্ধের উপরে বিশ্বাস জন্মেছে। অনেক তথাগত বুদ্ধের উপরে বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার ফলে একরকম অনেক বুদ্ধ সমন্বিত বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছে, যেমন বুদ্ধ অমিতাভ, ভেষজ বুদ্ধ, মহান সূর্য তথাগত ইত্যাদি, এছাড়া অনেক মহান বোধিসত্ত্বেরও আবির্ভাব ঘটেছে। অতএব, এইভাবে বৌদ্ধধর্মের পুরোটা এখন যা হয়েছে সেটা শাক্যমুনির স্থাপন করার সময়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সেই সময়ে আর একধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল, বোধিসত্ত্ব নাগার্জুন একটা গোপন সাধনা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, সেটা ভারতবর্ষ থেকে আফগানিস্তান হয়ে তারপরে আমাদের শিনজিয়াংগ[45] প্রদেশে প্রবেশ করে হান অঞ্চলে প্রচারিত হয়েছিল। সেটা তাংগ[46] রাজবংশের শাসনকালে ঘটেছিল সেইজন্যে একে বলা হতো তাংগ তন্ত্রবিদ্যা। কনফুসিয়াস মতের অত্যধিক প্রভাবের ফলে চীন দেশের নৈতিক মূল্যবোধ সাধারণভাবে অন্যান্য জাতিসত্তাদের তুলনায় আলাদা ছিল। এই গোপন সাধনা পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনার ব্যাপার ছিল, সেই সময়কার সমাজ সেটা গ্রহণ করতে পারেনি। তাংগ রাজবংশের হুইছাংগ সময়কালে বৌদ্ধধর্মকে দমন করার সময়ে এটাকে নির্মূল করা হয়েছিল, সেইজন্যে তাংগ তন্ত্রবিদ্যা চীন দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে জাপানে একটা তন্ত্রবিদ্যা চালু আছে যাকে বলে পূর্বের তন্ত্রবিদ্যা, সেটা তারা সেই সময়ে চীন দেশ

---

[45]শিনজিয়াংগ-- চীনের উত্তর পশ্চিমের একটি রাজ্য।

[46]তাংগ রাজবংশ - চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী একটা সময়কাল (618 A.D.-907 A.D.)।

থেকে শিখেছিল, কিন্তু এটা শক্তিপাত*(গুয়ানডিংগ)*[47] প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়নি। তান্ত্রিক মত অনুযায়ী যদি কেউ শক্তিপাত ছাড়াই তন্ত্রবিদ্যা শেখে তাহলে বলা হবে যে সে ধর্মকে চুরি করেছে এবং এটা স্বীকার করা যাবে না যে সে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর একটা সাধনা পদ্ধতি ভারতবর্ষ থেকে নেপাল হয়ে তিব্বতে পৌঁছেছিল, একে বলা হতো ‘‘তিব্বতের তন্ত্রবিদ্যা,’’ যা আজ পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতিটা মূলত এইরকম, আমি এখানে এর বিকাশ এবং বিবর্তনের পর্বটা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম। বৌদ্ধধর্মের বিকাশের পুরো পর্বে আরও কিছু পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল যেমন, বোধিধর্ম প্রতিষ্ঠিত জেন সম্প্রদায়, পবিত্রভূমি সম্প্রদায়, হুয়াইয়ান সম্প্রদায় ইত্যাদি। শাক্যমুনি তাঁর সময়ে যেসব কথা বলেছিলেন, সে সবের ব্যাখ্যা এবং উপলব্ধি অনুযায়ী এগুলোর আবির্ভাব হয়েছিল, এগুলো সবই পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এইরকম দশটার বেশী সাধনা পথ আছে এবং এরা সবাই ধর্মের রূপটাই পরিগ্রহ করেছে, সেইজন্যে এরা সবাই বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

এই শতাব্দীতে যেসব ধর্ম স্থাপিত হয়েছিল, অথবা শুধুমাত্র এই শতাব্দীতেই নয়, বিগত কয়েক শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতে নানান জায়গায় যেসব নতুন ধর্ম স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই নকল। মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বর্গলোক আছে যেখানে তাঁরা লোকেদের উদ্ধার করেন, যেমন শাক্যমুনি, অমিতাভ বুদ্ধ, মহান সূর্য তথাগত, এই তথাগত বুদ্ধদের প্রত্যেকের নিজের পরিচালিত একটা করে জগৎ রয়েছে লোকেদের উদ্ধার করার জন্যে। আমাদের এই ছায়াপথে একশ’রও বেশী এইরকম জগৎ রয়েছে, আমাদের ফালুন দাফা-রও একটা ফালুন জগৎ আছে।

এই সব নকল সাধনা পদ্ধতিগুলো লোকেদের উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে যাবে? তারা লোকেদের উদ্ধার করতে পারে না। তারা লোকেদের যা শিক্ষা দেয়, সেটা ফা নয়। অবশ্য কিছু ব্যক্তি যখন তাদের ধর্ম স্থাপন করেছিল, প্রথমে তাদের এই অভিপ্রায় ছিল না যে তারা অসুর হয়ে প্রথাগত ধর্মগুলির ক্ষতি করবে। তাদের গোংগ উন্মোচন এবং

[47] *গুয়ানডিংগ* -- শক্তিপাত, উপর থেকে ব্যক্তির মাথার ভিতরে শক্তি পাঠানো; দীক্ষার অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম।

আলোকপ্রাপ্তি বিভিন্ন স্তরে ঘটেছিল, তারা কিছু সত্য দেখেছিল, কিন্তু যে সমস্ত আলোকপ্রাপ্তসত্তা লোকেদের উদ্ধার করতে পারে, সেই সমস্ত আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের তুলনায় এরা বহুদূরে ছিল এবং খুব নীচে ছিল। তারা কিছু সত্য আবিষ্কার করেছিল, তারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে কিছু ভুল জিনিস লক্ষ্য করেছিল, তখন তারা লোকেদের বলল যে কীভাবে ভালো কাজ করতে হবে, প্রথম দিকে তারা অন্য ধর্মগুলির বিরোধিতা করত না। শেষে লোকেরা তাদের বিশ্বাস করতে শুরু করল, তাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ল, লোকেরা ভাবত যে তাদের কথাগুলো যুক্তিসংগত, পরে লোকেরা আরও বেশী করে তাদের বিশ্বাস করতে থাকল, ফলে লোকেরা তাদের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে পড়ল এবং ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা চলে গেল। একবার যখন তাদের মধ্যে খ্যাতি এবং লাভের আসক্তি জেগে উঠল, তারা জনগণকে বলল কোনো উপাধি দিয়ে সম্মানিত করার জন্যে, এরপরে তারা নতুন ধর্ম স্থাপন করল। আমি তোমাদের বলছি, এগুলো সবই অশুভ ধর্ম, এমনকী তারা যদি লোকেদের ক্ষতি নাও করে তথাপি সেগুলো সবই অশুভ ধর্ম। এর কারণ তারা লোকেদের প্রথাগত ধর্মের প্রতি যে বিশ্বাস তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল, প্রথাগত ধর্ম লোকেদের উদ্ধার করতে পারে, কিন্তু তারা পারে না। যত সময় পার হতে থাকল, তারা গোপনে খারাপ কাজ করতে থাকল। সাম্প্রতিককালে এইরকম অনেক পদ্ধতি আমাদের এই চীন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন তথাকথিত গুয়ানয়িন সম্প্রদায়[48] এদের মধ্যে একটি। অতএব তোমরা এগুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে, এটা বলা হয় যে, পূর্ব এশিয়ার একটা দেশে দুই হাজারেরও বেশী এইরকম পদ্ধতি চালু আছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে এবং কিছু পশ্চিমের দেশে, লোকেদের সব কিছুতেই বিশ্বাস আছে, একটা দেশে খোলাখুলি শয়তানের পূজারও প্রচলন রয়েছে। এই সব জিনিস ধর্মের বিনাশকালে অসুর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ধর্মের বিনাশকাল বলতে শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মকেই ইঙ্গিত করে না, একটা অত্যন্ত উঁচু স্তরের নীচে অবস্থিত অনেকগুলো মাত্রা কলুষিত হয়ে গেছে। ধর্মের বিনাশকাল বলতে যেমন বৌদ্ধধর্মের বিনাশ ইঙ্গিত করে না, এর এটাও অর্থ যে মানুষের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো ফা আর নেই, যার দ্বারা মানবসমাজে নৈতিকতা বজায় রাখা সম্ভব।

---

[48]গুয়ানয়িন সম্প্রদায় --‘‘দয়াময়ী দেবী’’ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের নামে ধর্মীয় পূজাপদ্ধতি।

সাধনায় শুধু একটা পথেই অনুশীলন করা উচিত

আমরা শিক্ষা দিই যে সাধনায় শুধু একটা পথেই অনুশীলন করা উচিত। তুমি যেভাবেই সাধনা কর না কেন, অন্যদের জিনিস মিশিয়ে তোমার সাধনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। কিছু গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্মের জিনিস এবং আমাদের ফালুন দাফা-র জিনিস দুটোরই সাধনা করে। আমি বলছি যে শেষে তোমরা কোনো কিছুই পাবে না, কেউই তোমাদের কিছু দেবে না। কারণ আমরা সবাই বুদ্ধ মতের হলেও, তথাপি এখানে চরিত্রের প্রশ্ন রয়েছে, একই সাথে একটা সাধনা পথে একনিষ্ঠতারও প্রশ্ন রয়েছে। তোমার শুধু একটাই শরীর আছে। তোমার শরীরে কোন্ সাধনা পদ্ধতির গোংগ বিকশিত হবে? তোমার জন্যে সেটার বিবর্তন কীভাবে হবে? তুমি কোথায় যেতে চাও? তুমি যে পদ্ধতিতে সাধনা করবে, সেখানেই তুমি যাবে। যদি তুমি পবিত্রভূমির পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা কর, তাহলে তুমি বুদ্ধ অমিতাভর পশ্চিমের পরমানন্দের স্বর্গে পৌঁছে যাবে। যদি তুমি ভেষজ বুদ্ধকে অনুসরণ করে সাধনা কর, তাহলে পান্নার স্বর্গে পৌঁছে যাবে। সব ধর্মের মধ্যে এইরকমই বলা আছে, ''সাধনায় দ্বিতীয় পথ বলে কিছু নেই।''

আমরা যে শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলনের শিক্ষা দিচ্ছি, সেটা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ গোংগ-এর বিবর্তন প্রক্রিয়া, এবং এসবই একজন ব্যক্তির নিজস্ব সাধনা পথ অনুযায়ী এগোতে থাকে। তুমিই বলো যে তুমি কোন্ দিকে যাবে? তুমি একই সাথে দুটো নৌকায় পা দিলে, কোনো কিছুই পাবে না। শুধু যে চিগোংগ পদ্ধতির সঙ্গে মঠের বুদ্ধের সাধনাকে মেশানো যাবে না তা নয়, এমনকী বিভিন্ন সাধনা পদ্ধতির মধ্যে, বিভিন্ন চিগোংগ পদ্ধতির মধ্যে, অথবা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেও কোনোরকম মিশ্রণ চলবে না। এমনকী একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও মিশ্রণ চলবে না, তোমাকে একটা সাধনা পদ্ধতিকেই বেছে নিতে হবে। তুমি যদি পবিত্রভূমি সম্প্রদায়ের সাধনা কর তাহলে তোমাকে পবিত্রভূমির সাধনা করে যেতে হবে; তুমি যদি তন্ত্রবিদ্যার সাধনা কর তাহলে তন্ত্র সাধনাই করে যেতে হবে; তুমি যদি জেন সম্প্রদায়ের সাধনা কর তাহলে তোমাকে জেন সাধনাই করে যেতে হবে। তুমি যদি একই সাথে দুই নৌকায় পা রাখ অর্থাৎ তুমি এই পথের সাধনা করছ, আবার ওই পথেরও সাধনা করছ, তাহলে তুমি কোনো কিছুই প্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে

এমনকী বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও তাদের শিক্ষা হচ্ছে, ‘‘কোনো দ্বিতীয় সাধনা পথ নয়,’’ তোমার সাধনার মধ্যে অন্য কিছু মেশানোর অনুমতি দেওয়া হয় না। বৌদ্ধধর্মেও গোংগ-এর অনুশীলন আছে এবং সাধনাও আছে, এখানে একজন ব্যক্তির গোংগ-এর বিকাশের প্রক্রিয়া, তার নিজের অনুসৃত পথের সাধনা এবং বিবর্তনের প্রক্রিয়া অনুযায়ী এগোতে থাকে। গোংগ-এর এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা অন্য একটা মাত্রাতে আছে, যেটা অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময় একটা প্রক্রিয়া, তোমার সাধনার সময়ে ইচ্ছামতো এর মধ্যে অন্য জিনিস মেশাতে পার না।

কিছু গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী যখনই শোনে যে আমরা বুদ্ধ মতের চিগোংগ অনুশীলন করি, তারা আমাদের শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে মন্দিরে টেনে নিয়ে যায়। আমি তোমাদের বলছি, আমাদের যেসব শিক্ষার্থী এখানে বসে আছ, তোমরা কেউই এই কাজটা করবে না। তোমরা আমাদের দাফা-র ক্ষতি করছ, বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনও লঙ্ঘন করছ, একই সাথে তোমরা শিক্ষার্থীদের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছ, তারা কোনো কিছুই পাবে না, এটা করা ঠিক নয়। সাধনা একটা গম্ভীর বিষয়, সাধনায় অবশ্যই একটা পদ্ধতিতে একাগ্র থাকবে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাধনার যে অংশটা আমরা শেখাই, সেটা যদিও ধর্ম নয়, কিন্তু সাধনার লক্ষ্য দুটো ক্ষেত্রেই এক অর্থাৎ গোংগ-এর উন্মোচন, আলোকপ্রাপ্তি এবং সাধনায় সফলতা লাভ করে পূর্ণতা প্রাপ্তি করা। এটাই হচ্ছে সাধনার উদ্দেশ্য।

শাক্যমুনি বলেছিলেন যে ধর্মের বিনাশকালে, মঠের বৌদ্ধভিক্ষুদের পক্ষে নিজেদের উদ্ধার করাই খুব কঠিন, আর গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কথা তো ছেড়েই দাও, কারণ তাদের প্রতি কেউ-ই লক্ষ্য রাখে না। যদিও তোমার একজন মাস্টার আছে কিন্তু সেই তথাকথিত মাস্টারও সাধনা করছে, সে যদি প্রকৃত সাধনা না করে তাহলে কোনো লাভ হবে না, এই মনের সাধনা না করলে কেউই উপরে উঠতে পারবে না। দীক্ষা সাধারণ মানুষদের আচার-অনুষ্ঠান মাত্র, দীক্ষা নিলে তুমি কি বুদ্ধ মতের লোক হয়ে গেলে? কোনো বুদ্ধ তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন কি? ব্যাপারটা সেইরকম নয়। এমনকী রোজ রোজ তুমি যদি মাথা ঠুকে প্রণাম করে যাও যতক্ষণ না রক্ত বের হয়, অথবা বান্ডিলের পর বান্ডিল ধূপকাঠি জ্বালাও, তাহলেও কোনো কাজ হবে না। এটা একমাত্র তখনই কাজ করবে যখন তুমি সত্যি সত্যি তোমার মনের সাধনা করবে। ধর্মের বিনাশকালে ইতিমধ্যে

এই বিশ্বে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এমনকী ধর্মের স্থানগুলি যেখানে আমরা বিশ্বাসের সাথে উপাসনা করি সেগুলোও আর ভালো নেই। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাও (বৌদ্ধভিক্ষু সমেত) এই পরিস্থিতিটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমানে এই সমগ্র পৃথিবীতে আমিই একমাত্র লোক যে জনসাধারণের মধ্যে এই সৎ সাধনা পদ্ধতি প্রচার করছি, আমি যেটা করছি, পূর্বে কেউ কখনোও করেনি, এছাড়া ধর্মের বিনাশকালে আমি সবার জন্যে এত বড়ো একটা দরজা খুলে দিয়েছি। বস্তুত এইরকম সুযোগ এক হাজার বছরে আসে না, এমনকী দশ হাজার বছরেও আসে না। কিন্তু তোমাকে উদ্ধার করা যাবে কি যাবে না, অর্থাৎ তুমি সাধনা করতে পারবে কি পারবে না সেটা তোমার নিজের উপরেই নির্ভরশীল, আমি যা বললাম সেটা এই বিশাল বিশ্বের মূল নীতি।

আমি এটা বলছি না যে তোমাকে আমার এই ফালুন দাফা-ই অধ্যয়ন করতে হবে, আমি যা বলছি সেটা একটা মূল নীতি। তুমি যদি সাধনা করতে চাও, তোমাকে একটা পদ্ধতিতেই একনিষ্ঠ হতে হবে, তা নাহলে তুমি একেবারেই সাধনা করতে পারবে না। অবশ্য তুমি যদি সাধনা না করতে চাও, তাহলে আমরাও তোমাকে একলা ছেড়ে দেব। এই ফা তাদেরই শেখানো হবে, যারা প্রকৃত সাধনা করবে, সেইজন্যে তুমি অবশ্যই একটা সাধনা পথেই একনিষ্ঠ থাকবে, এমনকী অন্য পদ্ধতির চিন্তাও মেশাবে না। আমি এখানে মানসিক ক্রিয়া শেখাই না, আমাদের ফালুন দাফাতে কোনো মানসিক ক্রিয়ার ব্যাপার নেই, সেইজন্যে তোমরাও কোনো চিন্তা জাতীয় জিনিস এর মধ্যে যুক্ত করবে না। এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যে আমাদের পদ্ধতিতে মূলগতভাবে কোনো মানসিক ক্রিয়া নেই, বুদ্ধ মতে শূন্যতার কথা বলা হয় এবং তাও মতে বলা হয় অনস্তিত্বতার কথা।

একবার আমার মন অত্যন্ত উচ্চস্তরের চারজন বা পাঁচজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা এবং মহান তাও-এর সাথে যুক্ত করেছিলাম। তাঁদের স্তরের কথা যদি বলি, সেক্ষেত্রে তাঁদের স্তর এত উঁচু ছিল যে সাধারণ মানুষের কাছে সেটা একেবারে অকল্পনীয় মনে হবে। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন যে আমি কী চিন্তা করছি। আমি কত বছর ধরে সাধনা করে আসছি, অন্য লোকের পক্ষে আমার চিন্তাকে জানতে পারা একেবারেই সম্ভব নয়, অন্য লোকের অলৌকিক ক্ষমতা আমার মধ্যে একটুও প্রবেশ করতে পারে না। কেউই আমাকে জানতে পারে না, আমি কী চিন্তা করছি সেটাও কেউ জানতে পারে না। আমার মনের মধ্যে কোন্ চিন্তা কাজ

করছে সেটা তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, সেইজন্যে আমার সম্মতি নিয়ে তাঁরা আমার মনের সাথে তাঁদের মন কিছু সময়ের জন্যে যুক্ত করেছিলেন। যুক্ত হওয়ার পরে আমার কিছুটা অসহ্য বোধ হয়েছিল, আমার মন কতটা উঁচু অথবা আমার মন কতটা নীচু, সেটা যাই হোক না কেন, যেহেতু সাধারণ লোকেদের মধ্যেই আমার স্থিতি, আমি তখনো একধরনের উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছিলাম অর্থাৎ লোকেদের উদ্ধার করার কাজ, আমার মন লোকেদের উদ্ধারের জন্যে সমর্পিত। কিন্তু তাঁদের মন কতটা স্থির? তাঁদের মন এতটাই স্থির যে আঁতকে ওঠার মতো। শুধু একজন ব্যক্তি ওই রকম স্থির অবস্থায় থাকলে অসুবিধা হতো না, কিন্তু চারজন বা পাঁচজন ব্যক্তি ওখানে বসে আছেন এবং সবাই ওই রকম স্থির অবস্থায় রয়েছেন, ঠিক যেন একটা পুকুরের স্থির জলের মতো, যার মধ্যে কোনো কিছুই নেই, আমি তাঁদের অনুভব করার চেষ্টা করেও অনুভব করতে পারিনি। সেই সময়ে কয়েকদিন আমি মনের মধ্যে সত্যিই খুব অস্বস্তি বোধ করেছিলাম, একধরনের অতুলনীয় অনুভূতি হয়েছিল। একজন সাধারণ লোকের পক্ষে সেটা কল্পনা করা বা অনুভব করা সম্ভব নয়, সেটা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় *(wuwei)* এবং শূন্য অবস্থা।

খুব উঁচুস্তরের সাধনায় মানসিক ক্রিয়া একেবারেই নেই, যেহেতু তোমার সাধনায় সাধারণ মানুষের ভিত্তি প্রস্তুত করার স্তরে, সেই ভিত্তির প্রণালীটা ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়ে গেছে। তোমার সাধনা উঁচুস্তরে পৌঁছে গেলে, বিশেষত আমাদের পদ্ধতিটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকে, সাধনা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হতে থাকে। যত তুমি তোমার চরিত্রের উন্নতি করতে থাকবে, ততই তোমার গোংগ-ও বাড়তে থাকবে, এমনকী তোমার শরীর সঞ্চালন করারও কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের শারীরিক ক্রিয়াগুলি এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলের শক্তিবৃদ্ধির জন্যেই, একজন ব্যক্তি বসে ধ্যান করার সময়ে স্থির থাকে কেন? এটা একেবারে নিষ্ক্রিয় অবস্থা। তুমি হয়তো দেখেছ যে তাও মতে শারীরিক ক্রিয়ার এই কৌশল, সেই কৌশল, কিছু মানসিক ক্রিয়া এবং চিন্তার পরিচালনা শেখায়। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, একবার তাও সাধনায় চি-স্তরের সামান্য উপরে উঠে গেলেই, তখন আর কোনো কিছুই নেই, তখন তারা এই চিন্তা বা সেই চিন্তার কথা আর একেবারেই বলে না। সেইজন্যে কিছু লোক যারা অন্য চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করেছে তারা শ্বাসের পদ্ধতি, মানসিক ক্রিয়া, ইত্যাদি কখনোই ছাড়তে পারে না। আমি তাদের কলেজের জিনিস শেখাচ্ছি, আর তারা আমাকে সর্বদা প্রাথমিক স্কুলের জিনিস জিজ্ঞাসা করে,

যেমন কীভাবে চিন্তার পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে মানসিক ক্রিয়া করতে হয়। তারা ইতিমধ্যে এই ধরনের জিনিসেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তারা মনে করে চিগোংগ এইরকমই, অথচ বাস্তবিক এইরকম নয়।

অলৌকিক ক্ষমতা এবং গোংগ সামর্থ্য

আমাদের অনেক লোকেরই চিগোংগ-এর নামকরণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই এবং কিছু লোক সর্বদাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তারা অলৌকিক ক্ষমতাকে বলে গোংগ সামর্থ্য, গোংগ সামর্থ্যকে বলে অলৌকিক ক্ষমতা। আমরা নিজেদের চরিত্রের সাধনার মাধ্যমে যখন এই বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যাই, তখন গোংগ বিকশিত হয়, এটার সৃষ্টি হয় আমাদেরই সদ্‌গুণ-এর বিবর্তনের মাধ্যমে। এটাই নির্ধারণ করে একজন ব্যক্তির স্তরের উচ্চতা, গোংগ সামর্থ্য বেশী না কম, এবং সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থানের উচ্চতা, অর্থাৎ এই গোংগ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি যখন সাধনা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে, তখন কোন্ ধরনের সাধনাজনিত পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটবে? তখন তার মধ্যে কিছু বিশেষ ধরনের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার উদয় হতে পারে, যাকে আমরা সংক্ষেপে বলি অলৌকিক ক্ষমতা। এইমাত্র আমি যে গোংগ-এর কথা বলেছি যা তোমার স্তর উন্নত করে, তাকে বলে গোংগ সামর্থ্য। একজন ব্যক্তির স্তর যত উঁচু হয় তার গোংগ সামর্থ্যও তত বেশী হয়, তার অলৌকিক ক্ষমতাও আরও শক্তিশালী হয়।

সাধনা প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলো শুধু উপজাত পদার্থ মাত্র। এগুলো কোনো ব্যক্তির স্তরের নিদর্শন নয়, স্তরের উচ্চতারও নিদর্শন নয়, এবং গোংগ সামর্থ্যের শক্তিও নয়, এগুলো কিছু লোকের ক্ষেত্রে বেশী করে বিকশিত হতে পারে, আবার কিছু লোকের ক্ষেত্রে কম বিকশিত হতে পারে। এছাড়া অলৌকিক ক্ষমতাগুলোকে সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে, এগুলোর পিছনে ছুটে প্রাপ্ত করা যায় না। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সত্যিকারের সাধনা করতে হবে, একমাত্র তখনই অলৌকিক ক্ষমতাগুলো বিকশিত হবে, এগুলোকে প্রধান লক্ষ্য মনে করে সাধনা করা যাবে না। তুমি এগুলোর জন্যে কেন সাধনা করতে চাও? তুমি কি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এগুলোকে ব্যবহার করতে চাও? এগুলোকে ইচ্ছামতো সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যবহার করার উপরে

নিশ্চিতভাবে নিষেধ আছে, সেইজন্যে এগুলোকে পাওয়ার জন্যে যত বেশী প্রয়াস করবে ততই তুমি কম পাবে। এর কারণ তুমি কোনো কিছুর পিছনে ছুটছ, কোনো কিছুর পিছনে ছোটার ব্যাপারটা নিজেই একটা আসক্তি এবং সাধনায় আসক্তি দূর করা আবশ্যক।

অনেক লোক আছে যারা সাধনায় খুব উঁচু জগতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু কোনো অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়নি। এর কারণ তাদের মাস্টার ওগুলোকে তালাবন্ধ করে রেখেছেন, এই ভয়ে যে ওই লোকেরা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পেরে দুষ্কর্ম করে ফেলে। সেইজন্যে তাদের এই পুরো সময়টাতে অতিপ্রাকৃত শক্তি ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এইরকম লোক বেশ অনেক আছে। অলৌকিক ক্ষমতাগুলো মানুষের মনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যখন একজন ব্যক্তি ঘুমাচ্ছে, সে হয়তো নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, সে হয়তো একটা স্বপ্ন দেখল এবং পরের দিন সকালে দেখল যে স্বর্গ মর্ত্য সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে, এর অনুমতি দেওয়া যায় না। যেহেতু সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করা হচ্ছে, সেইজন্যে যেসব লোকেদের মহান অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাদের সেগুলো ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয় না, বেশীরভাগই তালাবন্ধ করে রাখা হয়, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত নয়। অনেক লোক আছে যারা ভালোভাবে সাধনা করছে এবং নিজেদের সংযত রাখতে পারে, তাদের অলৌকিক ক্ষমতার একটা অংশ ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের লোকেদের তুমি যদি ইচ্ছামতো তাদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে বলো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই সেটা করবে না, তারা নিজেদের সংযত রাখতে পারে।

বিপরীত সাধনা এবং গোংগ ঋণ

কিছু লোক কখনোই চিগোংগ অনুশীলন করেনি, অথবা তারা হয়তো কোনো চিগোংগ ক্লাসে কিছু কৌশল শিখেছে মাত্র, কিন্তু সেগুলো সবই রোগ নিরাময় ও শরীর সুস্থ করার জন্যে, সেগুলো কোনো সাধনা নয়। অর্থাৎ অন্য ভাবে বলা যায় যে এইসব লোকেরা প্রকৃত শিক্ষা কোনোদিনই প্রাপ্ত হয়নি, অথচ এরা হঠাৎ একরাতেই গোংগ প্রাপ্ত হয়। আমি এবার বলব যে তারা কীভাবে সেই গোংগ প্রাপ্ত হয়, ব্যাপারটা কয়েক প্রকারের হয়।

এদের মধ্যে একটা হচ্ছে বিপরীত সাধনা। বিপরীত সাধনা কী? আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কিছু লোক সাধনা করতে চায়, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে একেবারে গোড়া থেকে সাধনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় নেই। যখন চিগোংগ-এর উত্থান ঘটেছিল, তখন তারাও সাধনা করতে চেয়েছিল, তারা জানত যে চিগোংগ-এর দ্বারা অন্য লোকেদের ভালো করতে পারবে, একই সাথে তাদের নিজেদেরও উন্নতি হবে। তাদের এইরকম একটা ইচ্ছা ছিল, তারা উন্নতি করতে চেয়েছিল এবং সাধনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে চিগোংগ-এর উত্থানের সময়ে ওইসব চিগোংগ মাস্টাররা শুধু চিগোংগ-কে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সত্যিকারের উঁচুস্তরের জিনিস কেউই শেখায়নি। এমনকী আজ পর্যন্ত, জনসাধারণের মধ্যে সত্যিকারের উঁচুস্তরের চিগোংগ শিক্ষা প্রদান, আমিই একমাত্র লোক যে এটা করছি, দ্বিতীয় আর কোনো ব্যক্তি এটা করছে না। যেসব লোকেরা বিপরীত সাধনা করত তাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে ছিল এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। তাদের জন্মগত সংস্কার খুব ভালো ছিল, তাদের শরীরে ভালো ভালো জিনিস থাকত, তাদের প্রায় সকলেই কোনো মাস্টারের শিষ্য অথবা উত্তরসূরি হওয়ার যোগ্য ছিল। কিন্তু এইসব লোকেদের বয়স খুবই বেশী ছিল, তাদের সাধনা করতে ইচ্ছা হতো, কিন্তু বলা সহজ করা কঠিন! তারা কোথায় একজন মাস্টার পাবে? কিন্তু যখন তারা সাধনা করার কথা চিন্তা করত, তখন তাদের মনের মধ্যে এই ইচ্ছাটা হওয়া মাত্র সেটা সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত এবং দশদিক সম্পন্ন জগৎ কেঁপে উঠত। লোকেরা বুদ্ধ স্বভাবের কথা বলে, এটাই সেই বুদ্ধ স্বভাব যা আবির্ভূত হতো।

উঁচু স্তর থেকে দেখলে একজন ব্যক্তির জীবন মানুষ হওয়ার জন্যে নয়। মানুষের এই জীবন বিশ্বের মহাকাশে সৃষ্টি হওয়ার কারণে বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, আদিতে তার প্রকৃতি ভালো এবং দয়ালু থাকে। কিন্তু অনেক জীবনের জন্ম হওয়ার পরে তাদের মধ্যে একধরনের সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, এদের মধ্যে কয়েকজন স্বার্থপর এবং খারাপ হয়ে যায়, তারা খুব উচ্চস্তরে আর থাকতে পারে না, নীচে নেমে যায়, একটা নীচের স্তরে নেমে যায়। এই স্তরে তারা আবার খারাপ হয়ে যায়, আবার নীচে নেমে যায়, এইভাবে নামতে নামতে, শেষে তারা এই সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে যায়। এই স্তরে নেমে গেলে মানুষের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের মধ্যে সহানুভূতি জাগ্রত হওয়ায় তাঁরা চরম যন্ত্রণাময় এই

বাতাবরণে মানবজাতিকে আর একটা সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং এই মাত্রাটা সৃষ্টি করলেন।

অন্য মাত্রাতে মানুষের এইরকম শরীর নেই, তারা শূন্যে ভাসতে পারে, আকারে বড়ো হয়ে যেতে পারে বা ছোট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই মাত্রাতে মানুষকে এইরকম একটা শরীর দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের এই পার্থিব শরীর। এই শরীরটা থাকার ফলে মানুষ ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, গরম সহ্য করতে পারে না, ক্লান্তি সহ্য করতে পারে না এবং ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না, যাই হোক তাকে কষ্ট সহ্য করতে হবে। তুমি অসুস্থ হলে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, তোমাকে জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যাতে তুমি এই কষ্ট সহ্য করার মধ্যে দিয়ে কর্মের ঋণ শোধ করতে পার। তুমি তোমার মূলে ফিরে যেতে পার কিনা সেটা দেখা হবে, এর জন্যে তোমাকে আরও একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেইজন্যে মানুষ এই মায়ার জগতে নেমে গেছে। তুমি এখানে নেমে যাওয়ার পরে একজোড়া চোখ সৃষ্টি করে তোমাকে দেওয়া হয়েছে যাতে তুমি অন্য মাত্রাকে দেখতে না পার এবং বস্তুর সত্যটা দেখতে না পার। তুমি যদি মূলে ফিরে যেতে পার, তাহলে চরম কষ্টও পরম মূল্যবান, এই মায়ার মধ্যে উপলব্ধির উপরে নির্ভর করে সাধনা করার সময়ে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে, তাহলেই তুমি তাড়াতাড়ি তোমার মূলে ফিরতে পারবে। তুমি যদি আবারও খারাপ হয়ে যাও, তাহলে তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, অতএব তাঁদের দৃষ্টিতে, মানুষের এই জীবনে মানুষ হয়ে থাকাটাই লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যটা হচ্ছে তুমি যাতে তোমার মূলে এবং সত্যে ফিরে যেতে পার। সাধারণ মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারে না, সাধারণ মানুষ এই সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে শুধু একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, সে ভাবে যে কেমন করে জীবনে উন্নতি করতে পারবে এবং কীভাবে ভালো করে জীবনযাপন করতে পারবে। যত সে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে থাকে, ততই সে আরও স্বার্থপর হয়ে ওঠে, সে আরও বেশী করে অধিকার করতে চায়, সে এই বিশ্বের প্রকৃতি থেকে আরও দূরে সরে যেতে থাকে, সে ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে।

উঁচু স্তর থেকে এইরকম দেখা যায় যে, যখন তুমি ভাবছ যে তুমি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, তখন তুমি আসলে পিছনের দিকে যাচ্ছ। মানবজাতি মনে করে যে, বিজ্ঞানের বিকাশের দ্বারা তাদের উন্নতিসাধন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা শুধু এই বিশ্বের নিয়মাবলিকে অনুসরণ করে

যাচ্ছে। তাও মতের আটজন দেবতাদের[49] মধ্যে একজন ঝাংগ গুয়ো লাও, গাধার পিঠে চেপে পিছনদিকে গিয়েছিলেন, খুব কম লোকই এটা জানে যে কেন তিনি গাধার পিঠে চেপে পিছনদিকে গিয়েছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার অর্থ পিছনের দিকে যাওয়া, সেইজন্যে উনি গাধার পিঠে উল্টো করে বসেছিলেন। সেইজন্যে লোকেরা যখনই সাধনা করতে চায় মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা এই ইচ্ছাটাকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন, তাঁরা কোনো শর্ত ছাড়াই লোকেদের সাহায্য করতে চান। ঠিক যেমন আজ আমাদের এখানে শিক্ষার্থীরা বসে আছ, তোমরা সাধনা করতে চাইলে আমি তোমাদের বিনাশর্তে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে করে, রোগ নিরাময় করার কথা চিন্তা কর এবং এটার পিছনে বা সেটার পিছনে ছুটে বেড়াও, তাহলে ঠিক হবে না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। কেন? কারণ তুমি একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে থাকতে চাইছ, একজন সাধারণ মানুষকে অবশ্যই জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, এটা এইরকমই হওয়া উচিত, সমস্ত কিছুরই পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক রয়েছে, এগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে না। তোমার জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাধনা ব্যাপারটা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এখন তুমি সাধনা করতে চাইছ, সেইজন্যে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পথকে নতুনভাবে সাজানো হবে এবং তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা হবে।

অতএব একজন ব্যক্তি সাধনা করতে চাইলে, এই ইচ্ছাটা যখনই উদয় হয়, সেটা মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁরা সেটাকে সত্যিই খুব মূল্যবান বিবেচনা করেন। কিন্তু কীভাবে সাহায্য করবেন? এই পৃথিবীতে ওই ব্যক্তি, একজন মাস্টারকে কোথায় খুঁজে পাবে? আবার তার বয়সও পঞ্চাশের উপরে, মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা ওই ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে পারবেন না। কারণ তাঁরা নিজেদের প্রকটিত করে তবেই তোমাকে শিক্ষা দিতে পারবেন, ফা শেখাতে পারবেন এবং শারীরিক ক্রিয়া শেখাতে পারবেন, সেটা স্বর্গীয় গোপন তথ্য ফাঁস করা হয়ে যাবে, ফলে তাঁদেরও নীচে নেমে যেতে হবে। মানুষ নিজে দুষ্কর্ম করার ফলেই নীচে নেমে এই মায়ার মধ্যে পড়েছে, অতএব তাকে অবশ্যই এই মায়ার মধ্যে উপলব্ধির ক্ষমতার দ্বারা সাধনা করে যেতে হবে, সুতরাং আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা তাকে শিক্ষা দিতে পারবেন না। যদি তুমি সত্যিকারের একজন জীবিত বুদ্ধকে

[49]আটজন দেবতা - চীনের ইতিহাসের বিখ্যাত সব তাও।

দেখো যে তিনি ফা এবং শারীরিক ক্রিয়ার শিক্ষা প্রদান করছেন, তাহলে ক্ষমার অযোগ্য পাপী লোকেরাও শিখতে আসবে, সবাই এটা বিশ্বাস করবে। তাহলে লোকেদের উপলব্ধির জন্যে কী থাকবে? উপলব্ধির প্রশ্নটাই আর থাকবে না। যেহেতু লোকেরা নিজেরাই মায়ার মধ্যে এসে পড়েছে, সুতরাং তাদের বিনাশ হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তোমাকে আরও একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যাতে তুমি এই মায়ার মধ্যে থেকে নিজের মূলে ফিরে যেতে পার। যদি তোমার ফিরে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তুমি ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু তুমি যদি ফিরে যেতে না পার তাহলে নিরন্তর এই সংসার চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকবে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

একজন ব্যক্তি নিজেই নিজের পথ তৈরি করে। অতএব তুমি সাধনা করতে চাইলে, সেটা কীভাবে হবে? তাঁরা একটা উপায় চিন্তা করেছিলেন, সেই সময়ে চিগোংগ-এর উত্থান হয়েছিল এবং সেটা ছিল মহাজাগতিক বাতাবরণের পরিবর্তনের একটা পরিণাম, সুতরাং সেই মহাজাগতিক বাতাবরণের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করার জন্যে, আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা এই ব্যক্তিকে তার চরিত্রের স্তরের অনুপাতে গোংগ সরবরাহ করে দিতেন। তাঁরা ওই ব্যক্তির শরীরে একটা নরম নল লাগিয়ে দিতেন যেটা জলের কলের মতো কাজ করত, সেটা খুলে দিলেই গোংগ চলে আসত। সে যখন কিছু গোংগ নির্গত করতে চাইত তখন গোংগ চলে আসত, কিন্তু সে নিজের থেকে গোংগ নির্গত করতে পারত না, যেহেতু তার নিজস্ব কোনো গোংগ ছিল না, অতএব এইরকম একটা অবস্থা হতো, এটাকে বলা হতো বিপরীত সাধনা, এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি উপর থেকে শুরু করে নীচের দিকে গিয়ে সাধনা সম্পুর্ণ করত।

আমরা সাধারণভাবে সাধনার সময়ে নীচ থেকে উপরের দিকে অগ্রসর হই যতক্ষণ না গোংগ উন্মোচন হয় এবং সাধনা সম্পূর্ণ হয়। এই বিপরীত সাধনাক্রম হচ্ছে বয়স্ক লোকেদের জন্যে, যাদের নীচ থেকে সাধনা শুরু করে উপরে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সময় আর হাতে নেই। সেইজন্যে তারা উপর থেকে শুরু করে নীচের দিকে সাধনা করে গেলে সেটা তাড়াতাড়ি হতো, সেইসময়ে এই ধরনের ঘটনাক্রম সৃষ্টি হয়েছিল। এইরকম ব্যক্তির চরিত্র অবশ্যই খুব উঁচু হতো, তার চরিত্রের স্তর অনুযায়ী তাকে শক্তি সরবরাহ করা হতো। এর উদ্দেশ্যটা কী ছিল? একটা কারণ ছিল সেইসময়ের মহাজাগতিক বাতাবরণের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা, এই ব্যক্তি যখন কোনো ভালো কাজ করছিল, তখন একই সাথে সে কষ্টও সহ্য

করেছিল। এর কারণ তুমি যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা কর, তখন বিভিন্ন ধরনের সাধারণ মানুষের আসক্তি তোমার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তুমি কোনো রোগীর রোগ নিরাময় করলেও, সে এমনকী তোমাকে নাও বুঝতে পারে, তুমি রোগীর রোগ নিরাময়ের সময়ে তার শরীর থেকে অনেক খারাপ জিনিস দূর করে দিয়েছ, তার রোগ অনেকটাই নিরাময় করেছ, কিন্তু সেই পরিবর্তনটা হয়তো তখনও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি। যাই হোক রোগী মনে মনে অখুশি হয়, সে এমনকী কৃতজ্ঞতাও জানায় না, উল্টে হয়তো অভিযোগ করে বলে যে তুমি তাকে ঠকিয়েছ! এই সব সমস্যাগুলির মোকাবিলার মধ্যে দিয়ে এবং এই পরিবেশের মধ্যে তোমার মন দৃঢ় হয়। এই ব্যক্তিকে গোংগ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে সে সাধনা করতে পারে এবং উন্নতিসাধন করে উপরে উঠতে পারে। ভালো কাজ করার মাধ্যমে তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হতো এবং তার গোংগ বাড়তে থাকত, কিন্তু কিছু লোক এই নিয়মগুলো বুঝতে পারত না। আমি কি এটা বলেছিলাম না যে এই ব্যক্তিকে কেউ ফা শেখাতে পারত না? যদি সে বুঝতে পারত তাহলে উপলব্ধি করতে পারত, এটা ছিল উপলব্ধি হওয়ার প্রশ্ন, যদি সে এটা উপলব্ধি করতে না পারত তাহলে আর কোনো উপায় ছিল না।

যখন কোনো লোক গোংগ প্রাপ্ত হতো, সে হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে থাকার সময়ে অসহ্য গরম অনুভব করত এবং চাদরটাকেও রাখতে পারত না, পরের দিন সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পরে সে যেখানেই স্পর্শ করত, সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতো। তখন সে বুঝতে পারত যে তার গোংগ প্রাপ্তি হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি শরীরের কোনো জায়গায় ব্যথা অনুভব করত, তখন সে একবার সেই জায়গায় হাত বুলিয়ে দিলে সেই ব্যক্তি ভালো বোধ করত এবং বেশ ভালো কাজ হতো। তখন সে জেনে যেত যে তার গোংগ প্রাপ্তি হয়েছে। সে নিজেকে চিগোংগ মাস্টার মনে করত এবং সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিত, সে নিজেই নিজেকে চিগোংগ মাস্টার ‘‘উপাধি’’ প্রদান করত। প্রথমদিকে যেহেতু এই ব্যক্তি বেশ ভালো থাকত, সেইজন্যে সে কোনো রোগীর রোগ নিরাময় করার পরে, রোগী যদি তাকে টাকা বা উপহার প্রদান করত, তখন হয়তো সে প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু সে সাধারণ মানুষের ভ্রষ্টাচারপূর্ণ পরিবেশের কলুষিতকরণের ঢেউকে প্রতিহত করতে পারত না, যেহেতু এই ধরনের বিপরীত সাধনা করা ব্যক্তি সত্যিকারের চরিত্রের সাধনা কোনোদিন করেনি, সেইজন্যে তার পক্ষে নিজের চরিত্রকে ঠিকভাবে বজায় রাখা খুবই কঠিন

হতো। ক্রমে ক্রমে সে কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে ছোট ছোট উপহার গ্রহণ করত, ধীরে ধীরে সে বড়ো বড়ো জিনিস গ্রহণ করত, শেষে উপহার কম হলে সে অসন্তুষ্ট হতো। সবশেষে সে বলতো: ‘‘আমাকে এত জিনিস দিচ্ছ কেন? আমাকে টাকা দাও!’’ আবার অল্প টাকা দিলে সে সন্তুষ্ট হতো না। সে প্রকৃত চিগোংগ মাস্টারদেরও সম্মান করত না, সে শুধু অন্য লোকের মুখে সে নিজে কত পারদর্শী সেই সম্বন্ধে প্রশংসা শুনতে চাইত। কেউ তার সম্বন্ধে খারাপ কিছু বললে, সে বিরক্ত হতো, তার খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তি সবই বেড়ে যেত, সে নিজেকে অন্যদের থেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করত এবং অসাধারণ মনে করত। সে মনে করত যে তাকে এই গোংগ দেওয়া হয়েছে যাতে সে চিগোংগ মাস্টার হতে পারে এবং সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে, প্রকৃতপক্ষে এটা দেওয়া হয়েছিল যাতে সে সাধনা করতে পারে। যখন তার খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তি জেগে উঠত তখন তার চরিত্র বস্তুত নীচে নেমে যেত।

আমি বলেছি যে চরিত্র যত উঁচু হবে, গোংগ-ও তত উঁচু হবে। অতএব সেই ব্যক্তির চরিত্র নীচে নেমে গেলে তাকে আর অত গোংগ প্রদান করা হতো না, কারণ এটা তাকে তার চরিত্রের অনুপাতেই দেওয়া হতো, একজন ব্যক্তির চরিত্রের উচ্চতা যতটা, তার গোংগ-এর উচ্চতাও ততটা। তার খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তি যত বেশী হতো, সাধারণ মানুষদের মধ্যে সে আরও খারাপের দিকে নেমে যেত, একই সাথে তার গোংগ-ও নেমে যেত। সবশেষে সে একেবারে তলায় নেমে যেত, তাকে আর গোংগ প্রদান করা হতো না, তার কাছে কোনো গোংগ আর থাকত না। কয়েক বৎসর পূর্বে এই ধরনের বেশ কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছিল, যাদের মধ্যে পঞ্চাশোর্ধ বয়সি মহিলারাই অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। তুমি হয়তো কোনো বয়স্ক মহিলাকে চিগোংগ অনুশীলন করতে দেখেছ, কিন্তু সে কোনো প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হয়নি, হয়তো সে কোনো চিগোংগ ক্লাসে কিছু শারীরিক ক্রিয়া শিখেছিল রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, একদিন সে হঠাৎ গোংগ প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যখনই তার চরিত্র নীচু মানের হয়ে গেল, তার মধ্যে খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তি জেগে উঠল, তখনই তার স্তর নীচে নেমে গেল, ফলে এখন সে একজন তুচ্ছ লোক, তার গোংগ-ও আর নেই। বর্তমানে এইধরনের বিপরীত সাধনার লোক বেশ অনেক দেখা যায়, যাদের স্তর নীচে নেমে গেছে, আর যারা এখনো টিকে রয়েছে তারা সংখ্যায় খুবই কম। কেন এইরকম হল? এর কারণ তারা জানত না যে এটা তাদের প্রদান করা হয়েছিল সাধনা করার

জন্যে, তারা ভাবত এটা তাদের দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ধনী হওয়ার জন্যে, বিখ্যাত হওয়ার জন্যে, এবং চিগোংগ মাস্টার হওয়ার জন্যে, বস্তুত এটা তাদের দেওয়া হয়েছিল সাধনা করার জন্যে।

“গোংগ ঋণ কী?” এর কোনো বয়ঃসীমা ছিল না। কিন্তু এর একটা আবশ্যকতা ছিল, এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির চরিত্র বিশেষভাবে ভালো হওয়া আবশ্যক ছিল। এই ব্যক্তি জানত যে চিগোংগ-এর মাধ্যমে সাধনা করা সম্ভব এবং সেও সাধনা করতে চাইত। তার সাধনা করতে ইচ্ছাও হতো, কিন্তু সে একজন মাস্টারের খোঁজ কোথায় পাবে? বস্তুত কয়েক বৎসর পূর্বেও প্রকৃত চিগোংগ মাস্টাররা চিগোংগ শিক্ষা প্রদান করত। কিন্তু তারা যা শেখাতো, সবই রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, উঁচুস্তরের জিনিস কেউই প্রচার করত না, শেখানোর মতো কোনো লোকও ছিল না।

গোংগ ঋণের ব্যাপারে আমি আরও একটা বিষয়ের অবতারনা করব। একজন ব্যক্তির মুখ্য আত্মা (মুখ্য চেতনা) ছাড়াও তার সঙ্গে সহ আত্মা(সহ চেতনা) থাকে। কিছু লোকের সহ আত্মা একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এমনকী পাঁচটাও থাকতে পারে। সহ আত্মা এবং ওই ব্যক্তির লিঙ্গ হয়তো এক নাও হতে পারে, কোনোটা পুরুষ হতে পারে, কোনোটা মহিলা হতে পারে, এগুলো সবই আলাদা আলাদা। প্রকৃতপক্ষে মুখ্য আত্মা এবং ভৌতিক শরীরের লিঙ্গ এক নাও হতে পারে, কারণ আমরা দেখেছি যে বর্তমানে অনেক পুরুষের মুখ্য আত্মা হচ্ছে মহিলা এবং অনেক মহিলার মুখ্য আত্মা হচ্ছে পুরুষ, যা বর্তমানের মহাজাগতিক বাতাবরণ, যেখানে তাও মতে বর্ণিত য়িন এবং য়িয়াংগ উল্টে গেছে, অর্থাৎ সমৃদ্ধশালী য়িন এবং পতনশীল য়িয়াংগ, তার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

একজন মানুষের সহ আত্মা সাধারণত মুখ্য আত্মার তুলনায় উচ্চতর স্তর থেকে আসে, বিশেষত কিছু লোকের ক্ষেত্রে, তাদের সহ আত্মা বেশ উঁচু স্তর থেকে আসে। সহ আত্মা ভর করা আত্মা নয়, সহ আত্মা এবং তুমি তোমার মায়ের গর্ভ থেকে একই সাথে জন্মগ্রহণ করেছ, তার নামও তোমারই মতো, সে তোমার শরীরেরই অংশ। সাধারণত লোকেরা যখন কোনো বিষয়ে চিন্তা করে অথবা কোনো কাজ করে, তখন মুখ্য আত্মাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সহ আত্মা সাধারণত মুখ্য আত্মাকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু যখন মুখ্য আত্মা জেদ করে কোনো কিছু করতে চায় তখন সহ

আত্মা কোনো কিছু করতে পারে না। সহ আত্মাকে সাধারণ মানবসমাজ বিভ্রান্ত করতে পারে না, কিন্তু মুখ্য আত্মা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

কিছু সহ আত্মা খুব উঁচু স্তর থেকে আসে, হয়তো সিদ্ধিলাভ করার থেকে সামান্য দূরে রয়েছে। সহ আত্মা সাধনা করতে চাইত কিন্তু মুখ্য আত্মা সাধনা করতে না চাইলে, সে কোনো কিছু করতে পারত না। চিগোংগ-এর উত্থানের সময়ে, একদিন মুখ্য আত্মা চিগোংগ শিখতে চাইল এবং সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরে পৌঁছাতে চাইল। অবশ্য তার চিন্তাটা খুব সরল ছিল, এবং সে খ্যাতি, লাভ এই সব জিনিসের পিছনে ছুটতে চায়নি। যাই হোক সহ আত্মা আনন্দিত হল: ''আমি সাধনা করতে চাই, কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। এখন তুমি সাধনা করতে চাইছ, আমিও ঠিক এটাই চাই।'' কিন্তু মাস্টারের খোঁজ সে কোথায় করবে? সহ আত্মা বেশ পারদর্শী ছিল। সে শরীর ছেড়ে বাইরে গিয়ে তার পূর্বজন্মের পরিচিত এক মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাকে খুঁজে নিত। যেহেতু সহ আত্মা খুব উঁচু স্তর থেকে এসেছিল সেইজন্যে সে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারত। সে মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাকে তার সাধনা করার ইচ্ছার কথা বলে, গোংগ ঋণ করতে চাইত। তিনি দেখতেন যে সে ভালো লোক, সেইজন্যে সাহায্য করতেন, এইভাবে সহ আত্মা গোংগ ঋণ নিত। সাধারণত এই গোংগ এক প্রকারের বিচ্ছুরিত শক্তি, এটাকে নলের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হতো, এই ঋণ করা শক্তির মধ্যে পূর্বে প্রস্তুত করা কিছু জিনিসও সরবরাহ করা হতো, যেগুলোর মধ্যে সাধারণত অলৌকিক ক্ষমতা থাকত।

এইভাবে এই ব্যক্তি হয়তো একই সাথে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতো। এই ব্যক্তিও, ঠিক এক্ষুনি আমি যেরকম বলেছি, একদিন রাত্রে ঘুমের সময়ে অসহ্য গরম বোধ করত, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখত যে সে গোংগ প্রাপ্ত হয়েছে, সে যেখানেই স্পর্শ করত, সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতো। সে তখন অন্য লোকেদের রোগ নিরাময় করতে পারত, এবং জেনে যেত যে তার গোংগ প্রাপ্তি হয়েছে। এটা কোথা থেকে এসেছে? এই ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। তার একটা মোটামুটি ধারণা হতো যে এটা বিশ্বের মহাকাশ থেকে এসেছে, কিন্তু সে নির্দিষ্টভাবে জানত না যে এটা কীভাবে এসেছে, তার সহ আত্মাও তাকে কিছু বলতো না, যেহেতু সে নিজে সাধনা করত, ওই ব্যক্তি শুধু এটাই জানত যে সে গোংগ প্রাপ্ত হয়েছে।

সাধারণত যেসব লোকেরা গোংগ ঋণ করত তাদের বয়সের কোনো সীমা ছিল না, কম বয়সের লোক অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যেত, সেইজন্যে কয়েক বৎসর পূর্বে যাদের বয়স কুড়ির কোঠায়, ত্রিশের কোঠায়, চল্লিশের কোঠায়, এইরকম কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছিল, কিছু বয়স্ক লোকও এসেছিল। অল্পবয়সি লোকেদের পক্ষে নিজেদের সংযত রাখা আরও কঠিন। তুমি হয়তো দেখেছ যে এই ব্যক্তি সাধারণভাবে মানবসমাজে খুবই ভালো লোক, যখন সাধারণ মানবসমাজে তার মধ্যে বিশেষ কোনো দক্ষতা প্রকাশিত হয়নি, তখন সে খ্যাতি এবং লাভ-এর প্রতি নিস্পৃহভাব প্রদর্শন করত। কিন্তু একবার সে অন্যদের ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেলেই খ্যাতি এবং লাভ তার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করত, সে মনে করত যে তাকে এই জীবনে আরও অনেকটা পথ যেতে হবে, সে তখন লক্ষ্যগুলির দিকে সোজা এগিয়ে যেতে চাইত এবং সংগ্রাম করতে চাইত যাতে সে সাধারণ মানুষদের কিছু লক্ষ্য পূরণ করতে পারে। সেইজন্যে একবার অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হলে এবং কিছু দক্ষতার অধিকারী হলেই, সে সেগুলিকেই উপায় হিসাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানবসমাজে নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলির পিছনে ছুটতে চাইত। তখন এইসব ক্ষমতা কাজ করত না, এগুলোকে এইভাবে প্রয়োগ করতে সম্মতি দেওয়া হতো না, সে যত এই গোংগ ব্যবহার করত ততই সেটা কমে যেত, শেষে কোনো কিছুই আর থাকত না। আরও অনেক লোক এইভাবে নীচে নেমে গেছে, আমি দেখেছি যে এখন এমনকী একজনও আর পড়ে নেই।

আমি এইমাত্র দুই ধরনের পরিস্থিতির কথা আলোচনা করলাম যেখানে অপেক্ষাকৃত ভালো চরিত্রের লোকেরাই গোংগ প্রাপ্ত হতো, এই গোংগ তারা নিজেদের সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হতো না, এটা আসত আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের কাছ থেকে, অতএব এই গোংগ সহজাত রূপে ভালোই হতো।

সত্তা ভর করা

সাধক সমাজে আমরা অনেকেই হয়তো শুনেছি যে জীবজন্তুরা, যেমন শেয়াল, নেউল, সজারু এবং সাপ ইত্যাদি মানব দেহের উপরে ভর করতে পারে। আসলে এসব কী ব্যাপার? কিছু লোক বলে যে চিগোংগ অনুশীলনের ফলে অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক

ক্ষমতাগুলো বিকশিত হয় না, ওগুলো মানুষের সহজাত ক্ষমতা। তবে এটা বলতেই হবে যে এই মানবসমাজ যত সামনে অগ্রসর হয়েছে, লোকেরা এই বস্তুগত মাত্রার স্পর্শগ্রাহ্য জিনিসের প্রতি আরও বেশী করে মনোযোগী হয়েছে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির উপরে আরও বেশী করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সেইজন্যে আমাদের মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলো আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং শেষে এগুলো পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কেউ যদি এই অলৌকিক ক্ষমতা পেতে চায়, তাহলে সাধনার মধ্যে দিয়েই পেতে হবে, তাকে তার মূলে এবং সত্যে ফিরে যেতে হবে, তাহলেই সেগুলো সাধনার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হবে। পশুদের মানুষের মতো এইরকম জটিল চিন্তাধারা নেই, সেইজন্যে তারা এই বিশ্বের প্রকৃতির সাথে যুক্ত থাকে এবং তাদের জন্মগত ক্ষমতাগুলোও থাকে। কিছু লোক বলে যে, পশুরা সাধনা করতে জানে, শেয়াল অনুশীলনের মাধ্যমে দ্যান বিকশিত করতে পারে, সাপ ও অন্যান্য পশুরা সাধনা করতে পারে। এটা ঠিক নয় যে তারা সাধনা করতে পারে, শুরুতে তারা একেবারেই জানত না যে সাধনা কীভাবে করে, তাদের শুধু জন্মগত দক্ষতা থাকে। সেইজন্যে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে এবং বিশেষ পরিবেশের মধ্যে, এবং একটা লম্বা সময়ের পরে তাদের জন্মগত দক্ষতা হয়তো বিকশিত হয়ে কার্যকরী হতে পারে, তখন তাদের গোংগ প্রাপ্তি হতে পারে এবং তাদের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাও বিকশিত হতে পারে।

এইভাবে পশুরা কিছু ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। অতীতে আমরা আলোচনা করতাম যে পশুদের অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে এবং কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে পশুরা ভয়ংকর এবং তারা সহজেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বস্তুত আমি বলব যে তারা ভয়ংকর নয়, একজন প্রকৃত সাধকের সামনে তারা কিছুই নয়, এমনকী একটা পশু প্রায় এক হাজার বছরও যদি সাধনা করে তাহলেও সেটাকে পিষে মেরে ফেলার জন্যে একটা ছোট আঙ্গুলের ডগাটুকুও বেশী হয়ে যাবে। আমরা বলেছি যে পশুদের জন্মগত দক্ষতা থাকে এবং কিছু বিশেষ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বে আরও একটা নিয়ম আছে, পশুদের সাধনায় সফল হতে দেওয়া হয় না। তোমরা সবাই প্রাচীন বইগুলোতে পড়েছ যে পশুরা কয়েকশ' বছর পর পর বিরাট প্রলয় অথবা ছোট-খাট বিপর্যয়ের মাধ্যমে মারা পড়ে। যখন কোনো পশুর গোংগ কিছু সময়ের পরে একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখনই সেটা ধ্বংস

হয়ে যায়, বজ্রবিদ্যুতের আঘাতপ্রাপ্ত হয় কারণ এর সাধনা করার অনুমতি নেই। যেহেতু এরা মানবীয় প্রকৃতির অধিকারী নয় সেহেতু এরা মানুষের মতো সাধনা করতে পারে না, মানবীয় গুণাবলি না থাকার কারণে, পশুরা যদি সাধনায় সফলতা লাভ করে, তাহলে অবধারিতভাবে অসুর হবে। সেইজন্যে এদের সাধনায় সাফল্যলাভ করার অনুমতি দেওয়াই হয় না, সেই কারণে স্বর্গ দ্বারা এরা মারা পড়ে, এরাও এটা জানে। কিন্তু আমি বলেছি যে বর্তমানে মানবজাতির বিরাট অধঃপতন ঘটেছে, কিছু লোক যে কোনোরকম খারাপ কাজই হোক না কেন সেটা করতে পিছপা হয় না, এই ধরনের পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর পরে মানবসমাজ কি বিপদে পড়েনি?

কোনো কিছু চরম সীমায় পৌঁছে গেলে বিপরীতমুখী পরিবর্তন হতে থাকে! আমরা দেখেছি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বে পৃথিবী যতবারই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেগুলো সর্বদা সেই সময়েই ঘটেছিল, যখন মানবজাতির নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। বর্তমানে মানবজাতি যে মাত্রার বাসিন্দা, সেটা এবং অন্য অনেক মাত্রা সবই ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছে, এই স্তরের অন্য মাত্রাগুলিতেও একই অবস্থা। সেইজন্যে পশুরাও দ্রুত এখান থেকে পলায়ন করতে উদগ্রীব, তারা উঁচুস্তরে উঠতে চাইছে, তারা মনে করে উঁচুস্তরে উঠতে পারলে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু সেটা কি এতই সহজ? সাধনার জন্যে তাকে অবশ্যই মানব শরীর পেতে হবে, কিছু চিগোংগ অনুশীলনকারীর শরীরে সত্তা ভর করার এটা একটা কারণ।

তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ভাবছ: ‘‘এইরকম এত মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা এবং এত উচ্চস্তরের মাস্টাররা এটার প্রতি কেন নজর দিচ্ছেন না?’’ এই বিশ্বে আরও একটা নিয়ম আছে: তুমি যদি নিজে কোনো কিছুর পিছনে ছোট অথবা কোনো কিছু চাও সেক্ষেত্রে অন্য লোকেরা তোমাকে বাধা দেবে না। আমরা এখানে তোমাকে সৎ পথ অনুসরণ করার জন্যে শিক্ষা দিচ্ছি, একই সাথে আমরা এই ফা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করছি, যাতে তোমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পার, কিন্তু তুমি এটা শিখবে কি শিখবে না সেটা তোমার নিজের ব্যাপার। মাস্টার তোমাকে প্রবেশদ্বারের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাবেন কিন্তু সাধনা করা তোমার নিজের উপর নির্ভর করে। কেউই তোমাকে জোর করবে না অথবা সাধনা করতে বাধ্য করবে না, সাধনা করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যক্তিগত বিষয়, অর্থাৎ এইভাবে বলা যায় যে, তুমি যে পথে যেতে চাও, তুমি যা চাও, তুমি যা পেতে চাও,----কেউই তোমাকে বাধা

দেবে না, আমরা কেবল তোমাকে ভালো হওয়ার জন্যে উপদেশ দিতে পারি মাত্র।

তুমি দেখেছ কিছু লোক চিগোংগ-এর শারীরিক ক্রিয়া করছে, বস্তুত ভর করা সত্তাই সবকিছু প্রাপ্ত হচ্ছে। সত্তা কীভাবে একজন ব্যক্তিকে ভর করে? সারা দেশে যত লোক চিগোংগ অনুশীলন করছে, তাদের মধ্যে কত জনের শরীরের পিছনে সত্তা ভর করে আছে? আমি যদি সংখ্যাটা বলি তাহলে প্রচুর লোক চিগোংগ অনুশীলন করতে সাহস করবে না, সংখ্যাটা বিরাট এবং বেশ ভয় পাওয়ার মতো! এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হল কেন? এই সব জিনিস সাধারণ মানবসমাজের সর্বনাশ করছে, এতটা ভয়ংকর ব্যাপার কীভাবে সংঘটিত হল? লোকেরা নিজেরাই এগুলোকে ডেকে নিয়ে এসেছে, কারণ মানবজাতির অধঃপতন হয়েছে এবং অসুরের উপস্থিতি সর্বত্র। বিশেষ করে সমস্ত নকল চিগোংগ মাস্টার তাদের শরীরে ভর করা সত্তা বয়ে বেড়াচ্ছে, তারা তাদের শিক্ষা প্রদান করার সময়ে এই জিনিসই প্রেরণ করে। মানুষের ইতিহাসে, পশুদের কখনই মানব শরীরের উপরে ভর করতে অনুমতি দেওয়া হয়নি, যদি কখনোও করে থাকে, তাহলে মেরে ফেলা হয়েছে, এবং যে কেউ এটা দেখবে সেই এটা হতে দেবে না। কিন্তু আমাদের আজকের এই সমাজে কিছু লোক এদের কাছে প্রার্থনা করে, এদের কাছে চায় এবং এদের পূজা করে। কিছু লোক ভাবে: ‘‘আমি নির্দিষ্ট করে এর কাছে চাই নি!’’ তুমি এর কাছে চাওনি, কিন্তু তুমি অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে প্রয়াস করেছিলে, সৎ সাধনা পদ্ধতির কোনো আলোকপ্রাপ্ত সত্তা তোমাকে এগুলো প্রদান করবে কি? কোনো কিছুর পিছনে ছোটা সাধারণ মানুষের আসক্তি, এই আসক্তিকে অবশ্যই দূর করতে হবে। তাহলে কে তোমাকে ওগুলো প্রদান করতে পারবে? শুধু অন্য মাত্রার অসুর এবং নানারকমের পশুই তোমাকে ওগুলো প্রদান করতে পারবে, তাহলে তুমি যা চেয়েছিলে সেটা কি ঠিক এদের কাছেই চাওয়া হল না? সেইজন্যেই তারা তখন এসে পড়ল।

কতজন লোক সৎ চিন্তা নিয়ে চিগোংগ-এর শারীরিক ক্রিয়া করে? চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে সদ্‌গুণ-এর প্রতি জোর দেওয়া প্রয়োজন, ভালো কাজ করা প্রয়োজন এবং সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেকটা কাজে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তোমার নিজের আচরণ এইরকম হওয়া উচিত। চিগোংগ-এর শারীরিক ক্রিয়া যারা পার্কে করছ অথবা বাড়িতে করছ, তাদের মধ্যে কতজন এইভাবে চিন্তা করছ? কেউ জানে না কিছু

লোক কী ধরনের চিগোংগ অনুশীলন করে, তারা একদিকে যখন ক্রিয়া করছে, তখন শরীরটাকে দোলাতে থাকে, একই সাথে মুখে বলতে থাকে: ‘‘ওঃ! আমার পুত্রবধু আমাকে সম্মান করে না,’’ ‘‘আমার শাশুড়ি এত জঘন্য!’’ কিছু লোক এমনকী কর্মস্থল থেকে শুরু করে দেশের পরিস্থিতি সবকিছু নিয়েই অনর্থক বকবক করতেই থাকে, এমন কিছু বিষয় নেই যা নিয়ে তারা কথা বলে না, এই সময়ে কোনো কিছুর সঙ্গে যদি তাদের চিন্তাধারা না মেলে, তাহলে তারা ক্রুদ্ধ হয়। তুমিই বলো এটা কি চিগোংগ? আবার কিছু লোক আছে যখন তারা দন্ডায়মান ক্রিয়া করছে তাদের পা দুটো ক্লান্ত হয়ে কাঁপতে থাকে, অথচ মন বিশ্রামে নেই: ‘‘আজকাল সব জিনিসপত্র এত দুর্মূল্য হয়ে গেছে, দাম বেড়েই যাচ্ছে, কর্মস্থলে আমার বেতন দিতে পারছে না। আমি চিগোংগ অনুশীলন করে কেন অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত করতে পারছি না? আমি অনুশীলন করে অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত করতে পারলে, আমিও একজন চিগোংগ মাস্টার হয়ে যেতে পারব এবং আমিও লোকেদের রোগের চিকিৎসা করে টাকা পয়সা রোজগার করতে পারব।’’ সে যদি একবার দেখে যে অন্য কোনো লোকের অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে, সে আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে তখন অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে, দিব্যচক্ষু পাওয়ার জন্যে, এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে, নাছোড়বান্দা হয়ে প্রয়াস করতে থাকে। সবাই চিন্তা কর, এটা বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতা থেকে কত দূরে! এটা পুরোপুরি বিপরীত দিকে যাচ্ছে। একটু গম্ভীরভাবে বিচার করে যদি বলা হয়, তাহলে সে অশুভ সাধনা করছে! কিন্তু সে নিজে না জেনেই এটা করছে। সে যত এইরকম ভাবতে থাকবে ততই আরও খারাপ চিন্তা উৎপন্ন হতে থাকবে। এই ব্যক্তি ফা প্রাপ্ত হয়নি, এবং সদ্‌গুণ-কে গুরুত্ব দিতে জানে না, সে মনে করে যে, শুধুমাত্র শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলন করেই সে গোংগ বিকশিত করতে পারবে, সে ভাবে যে সে যা চায়, সেসবই প্রয়াস করে পেতে পারবে, সে এইরকমই মনে করে।

যেহেতু সে নিজে অসৎ চিন্তা করছে, ঠিক সেই কারণে সে খারাপ জিনিস আকর্ষণ করে। একটা পশু সেটা দেখতে পারছে: ‘‘এই ব্যক্তি চিগোংগ অনুশীলন করে ধনী হতে চাইছে; ওই ব্যক্তি বিখ্যাত হতে চাইছে এবং অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত করতে চাইছে। কী আশ্চর্য! তার শরীরটা বেশ ভালো, সে তার শরীরে বেশ ভালো জিনিসই বয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার চিন্তাগুলো সত্যিই খারাপ, সে অলৌকিক ক্ষমতার পিছনে ছুটছে!

হয়তো তার কোনো মাস্টার আছে, এমনকী তার মাস্টার থাকলেও আমি ভয় পাই না।'' পশুটা জানে যে, একজন সৎ সাধনা পদ্ধতির মাস্টার দেখতে পারবেন যে সে এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার পিছনে ছুটছে এবং ওই ব্যক্তি যত এগুলোর পিছনে ছুটবে, ততই মাস্টার তাকে এগুলো প্রদান করবেন না, বাস্তবিকপক্ষে এটা একটা আসক্তি যা ত্যাগ করা উচিত। সে যত এইভাবে চিন্তা করবে, ততই তাকে অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হবে না, যত সে উপলব্ধি করতে না পারবে, ততই সে এগুলোর পিছনে ছুটবে এবং ততই তার চিন্তাগুলো আরও খারাপ হতে থাকবে। শেষে মাস্টার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, যখন দেখবেন যে এই ব্যক্তির সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তখন আর ওই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না। কিছু লোকের মাস্টার নেই, হয়তো পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া কোনো মাস্টার তার প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। যেহেতু প্রত্যেকটা মাত্রায় আলোকপ্রাপ্ত সত্তা প্রচুর আছেন। হয়তো কোনো আলোকপ্রাপ্ত সত্তা তাকে দেখলেন এবং চোখে চোখে রাখলেন, একদিন পরে যখন দেখলেন যে লোকটি ভালো নয় তখন তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। পরের দিন আরও একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তা এলেন, যখন দেখলেন লোকটি ভালো নয়, তখন তিনিও আবার লোকটিকে ছেড়ে চলে গেলেন।

পশুটা জানে যে, যদি এই ব্যক্তির বিধিসম্মত অথবা পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়া কোনো মাস্টার থাকেনও, সে ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি যেসব জিনিসের পিছনে ছুটছে, সেগুলো সেই মাস্টার তাকে প্রদান করবেন না, যেহেতু পশুটা আলোকপ্রাপ্ত সত্তার মাত্রাটা দেখতে পারছে না, সেইজন্যে সে ভয়ও পায় না, সে সুযোগটা গ্রহণ করার জন্যে একটা উপায় বের করে। আমাদের এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, যদি কেউ নিজে কোনো কিছুর পিছনে ছোটে এবং নিজে কোনো কিছু চায় তাহলে সাধারণ পরিস্থিতিতে অন্যেরা তাকে বাধা দেবে না, পশুটা নিয়মের এই ফাঁক থেকে সুযোগ গ্রহণ করে: ''সে ওগুলো চাইছে, আমি তাকে প্রদান করব, আমি তাকে সাহায্য করলে সেটা নিশ্চয়ই ভুল নয়?'' অতএব পশুটা তাকে ওগুলো দেয়। পশুটা প্রথমে তার শরীরে ভর করতে সাহস করে না, শুরুতে অল্প গোংগ প্রদান করে চেষ্টা করল। একদিন এই ব্যক্তি অকস্মাৎ সত্যিই গোংগ প্রাপ্ত হল যার পিছনে সে ছুটছিল, সে লোকেদের রোগও নিরাময় করতে পারল। পশুটা দেখল যে এটা বেশ ভালোই কাজ করল, এটা ঠিক যেন মূল সংগীতানুষ্ঠানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা শোনানোর মতো হল: ''সে চাইছে, অতএব আমি তার শরীরের উপরে ভর করব,

একবার ওখানে গেলে আমি তাকে বেশী জিনিস দিতে পারব এবং সরাসরি দিতে পারব।’’ ‘‘তুমি কি দিব্যচক্ষু চাও না? এবার আমি তোমাকে সবকিছু দেব।’’ অতএব পশুটা তাকে ভর করে।

যখন ওই ব্যক্তি জিনিসগুলোর পিছনে ছোটার কথা চিন্তা করছিল, ঠিক তখনই তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল, সে গোংগ প্রেরণ করতেও সক্ষম হল, সে অল্পস্বল্প অলৌকিক ক্ষমতাও প্রাপ্ত হল। সে ভীষণ খুশি হল, সে ভাবে যে, যেসব জিনিসের পিছনে সে ছুটছিল সেসব শেষমেষ অনুশীলনের মাধ্যমেই এসে গেল, প্রকৃতপক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে তার কাছে কোনো কিছুই আসেনি। সে ভাবে যে সে মানব শরীরের ভিতরটা দেখতে পারছে এবং রোগীর শরীরের ভিতরে রোগটা কোথায় আছে, সেটাও সে দেখতে পারছে। প্রকৃতপক্ষে তার দিব্যচক্ষু একেবারেই খোলেনি, ওই পশুটা তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে, পশুটা নিজের চোখ দিয়ে যা দেখছে, সেটাকে ওই ব্যক্তির মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিফলিত করছে, আর সে ভাবে যে তার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। ‘‘তুমি গোংগ প্রেরণ করতে চাও, প্রেরণ কর,’’ যে মুহূর্তে ওই ব্যক্তি হাত দুটো প্রসারিত করে গোংগ প্রেরণ করতে চায়, পশুটাও তার ছোট্ট থাবা দুটো ওই ব্যক্তির শরীরের পিছনে প্রসারিত করে দেয়। যখনই ওই ব্যক্তি গোংগ প্রেরণ করে, একটা ছোট সাপের মাথা থেকে চেরা জিভ বেরিয়ে এসে রোগীর শরীরের রোগগ্রস্ত জায়গাটা অথবা ফোলা জায়গাটা চেটে দেয়। এরকম জিনিস বেশ অনেক আছে, নিজেদের চাওয়ার কারণেই এই সব ব্যক্তিদের শরীরে সত্তা ভর করে।

যেহেতু ওই ব্যক্তি এসবের পিছনে ছুটছিল, সে ধনী হতে চাইছিল, সে বিখ্যাত হতে চাইছিল। বেশ, সে এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল, সে রোগও নিরাময় করতে পারছে, সে দিব্যচক্ষু দিয়ে জিনিসগুলো দেখতেও পারছে, এসব তাকে খুব খুশি করল। পশুটা এসব দেখছে, ‘‘তুমি ধনী হতে চাও না কি? বেশ, আমি তোমাকে ধনী বানিয়ে দেব।’’ একজন সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই সহজ কাজ। পশুটা অনেক মানুষকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে তারা ওই ব্যক্তির কাছে রোগের চিকিৎসা করাতে যায়, প্রচুর লোক তার কাছে চিকিৎসার জন্যে যায়। কী আশ্চর্য, সে এখানে লোকেদের চিকিৎসা করছে, আর অন্যদিকে পশুটা খবরের কাগজের সাংবাদিককে প্ররোচিত করে খবরের কাগজে তার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে। পশুটা সাধারণ মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করে এই সব জিনিস করে। যদি কোনো রোগী

চিকিৎসার পরে ওই ব্যক্তিকে যথেষ্ট টাকা প্রদান না করে, সেটা হবে না, রোগীর মাথায় ব্যথা উৎপন্ন করে দেবে, যাই হোক তাকে অনেক টাকা দিতে হবে। ওই ব্যক্তি এইভাবে খ্যাতি এবং ধন দুটোই প্রাপ্ত হয়, সে ধনীও হয়ে যায়, খ্যাতিও অর্জন করে এবং চিগোংগ মাস্টারও হয়ে যায়। এই ধরনের ব্যক্তি সাধারণত চরিত্রের উপরে গুরুত্ব দেয় না এবং যা কিছু বলতে সাহস করে, সে স্বর্গের পরেই নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করে। সে নিজেকে মহান রানী মাতা[50] অথবা মহান ত্রিলোকপতি[51]-র নব অবতার বলতে সাহস করে, সে এমনকী নিজেকে বুদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করতেও সাহস করে। যেহেতু সে সত্যিকারের চরিত্রের সাধনা করেনি, এবং শারীরিক ক্রিয়ার সময়ে অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে প্রয়াস করে, পরিণামে পশুর সত্তা তার উপরে ভর করে।

কিছু লোক হয়তো ভাবে: ‘‘এর মধ্যে খারাপ কী আছে? যাই হোক টাকা উপার্জন করে ধনী হতে পারলে ভালোই তো, এছাড়া খ্যাতিও লাভ হবে।’’ অনেক লোকই এই ধরনের চিন্তা করে। আমি তোমাদের সবাইকে এটাই বলতে চাই যে, বস্তুত পশুটারও নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, বিনা কারণে এটা তোমাকে কোনো কিছু দিচ্ছে না। এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, ‘‘ক্ষতি নাহলে লাভ নেই,’’ পশুটা কী পাচ্ছে? আমি সবেমাত্র এই বিষয়টার আলোচনা করছিলাম না কি? এটা তোমার শরীরের নির্যাসটা প্রাপ্ত করতে চায় যাতে সাধনার দ্বারা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে, সেইজন্যে এটা মানুষের দেহ থেকে মানবীয় নির্যাসটা সংগ্রহ করতে চায়। মানুষের শরীরে শুধুমাত্র এক ভাগই নির্যাস থাকে, তুমি যদি সাধনা করতে চাও, এই জিনিস এক ভাগই আছে। তুমি যদি পশুটাকে এটা নিয়ে নিতে দাও, তাহলে তুমি সাধনা করার কথা ভুলে যাও, সেক্ষেত্রে তুমি কীভাবেই বা সাধনা করবে? তোমার কাছে কিছুই আর থাকবে না, তুমি আর একেবারেই সাধনা করতে পারবে না। কিছু লোক সম্ভবত বলবে: ‘‘আমি সাধনা করতেই চাই না, আমি শুধু ধনী হতে চাই, যদি আমার কাছে টাকা থাকে, তাহলে ঠিকই আছে, অন্য কিছুকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে কি!’’ আমি তোমাদের বলতে চাই: তুমি ধনী হতে চাইছ, কিন্তু

---

[50]মহান রানী মাতা - চীনের পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ত্রিলোকের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চস্তরের দেবী।

[51]মহান ত্রিলোকপতি - চীনের পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, যে দেবতা ত্রিলোক পরিচালনা করেন।

এটা কীভাবে কাজ করছে সেই কারণটা আমি যদি বলি তাহলে তুমি আর এইভাবে চিন্তা করবে না। কেন এইরকম? এটা যদি তাড়াতাড়ি তোমার শরীর ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাহলে তোমার চার হাত-পায়ে দুর্বল বোধ করবে। এরপরে তোমার বাকি জীবন এইভাবেই চলবে, কারণ এটা তোমার শরীরের নির্যাস খুব বেশী নিয়েছে; কিন্তু এটা যদি দেরিতে তোমার শরীর ছেড়ে যায়, তাহলে তুমি জড় পদার্থ হয়ে যাবে, বাকি জীবন বিছানায় শুয়ে কাটাবে, আর শ্বাসটুকু পড়ে থাকবে। যদিও তোমার টাকা আছে, তুমি খরচ করতে পারবে কি? যদিও তোমার খ্যাতি আছে, কিন্তু তুমি সেটা উপভোগ করতে পারবে কি? ব্যাপারটা ভয়ংকর নয় কি?

আজকালকার অনুশীলনকারীদের মধ্যে এই ধরনের ব্যাপার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এদের সংখ্যাটাও বেশ অনেক। পশুটা শুধু যে একজন ব্যক্তির শরীরের উপরে ভর করে তা নয়, এটা ওই ব্যক্তির মুখ্য আত্মাকেও মেরে ফেলে, এটা গর্ত খুঁড়ে যাওয়ার মতো করে ওই ব্যক্তির নিওয়ান মহল[52]-এ যায় এবং সেখানে বসে থাকে। যদিও ওই ব্যক্তিকে মানুষের মতনই দেখতে কিন্তু সে মানুষ নয়, বর্তমানে এমনকী এইরকম জিনিসও সংঘটিত হচ্ছে। মানবজাতির নৈতিক আদর্শ পাল্টে গেছে, যখন কেউ খারাপ কাজ করছে, তুমি যদি তাকে বলো যে সে খারাপ কাজ করছে, সে সেটা বিশ্বাসই করবে না। সে মনে করে টাকা বানানো, টাকার পিছনে ছোটা, এবং ধনী হওয়া ন্যায়সংগত ও যথার্থ, এবং এগুলো সবই সঠিক কাজ। সেইজন্যে সে অন্য লোকেদের ক্ষতি করে এবং আঘাত করে, সে টাকা বানানোর জন্যে যে কোনো খারাপ কাজ করতে রাজি এবং সবকিছু করতে সাহস পায়। পশুটা কোনো কিছু ত্যাগ না করলে কিছু লাভ করতে পারবে না, ওই পশুটা কোনো কারণ ছাড়া তোমাকে কোনো জিনিস দেবে কি? এটা তোমার শরীরের জিনিসগুলো প্রাপ্ত করতে চায়। অবশ্য আমরা বলেছি যে যেহেতু লোকেদের ধারণাগুলো সঠিক নয় এবং চিন্তা সৎ নয়, সেই কারণে তারা সব ধরনের সমস্যা ডেকে আনছে।

আমরা ফালুন দাফা-র শিক্ষা প্রদান করছি। আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে যতক্ষণ তুমি তোমার চরিত্রকে বজায় রাখতে পারবে, ‘‘একটা সৎ মন একশ’টা অশুভকে দমন করতে সক্ষম,’’ তোমার কোনো সমস্যা

[52]নিওয়ান মহল -- তাও মত অনুযায়ী পিনিয়াল গ্রন্থির জন্যে ব্যবহৃত শব্দ।

আসবে না। তুমি যদি তোমার চরিত্রকে বজায় রাখতে না পার, একবার এটার পিছনে এবং আর একবার ওটার পিছনে ছুটে বেড়াও, তুমি অনিবার্যভাবে সমস্যা ডেকে নিয়ে আসবে। কিছু লোক পূর্বের জিনিস কোনোভাবেই ঠিক পরিত্যাগ করতে পারে না। আমরা চিগোংগ-এর ক্ষেত্রে একটা পদ্ধতিতে অনুশীলন করতে বলি, সত্যিকারের সাধনায় একনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। যদিও কিছু চিগোংগ মাস্টার বই লিখেছে, আমি তোমাদের বলছি, এই বইগুলোর মধ্যে নানান ধরনের সব জিনিস আছে, সেগুলো ঠিক যেন তাদের অনুশীলন করা সব জিনিসের মতো----যেমন তার মধ্যে সাপ আছে, শেয়াল আছে, এবং নেউলও আছে। তুমি যখন ওই বইগুলো পড়বে তখন ওই জিনিসগুলো শব্দগুলো থেকে লাফ দিয়ে আসবে। আমি তোমাদের বলছি, নকল চিগোংগ মাস্টারদের সংখ্যা প্রকৃত চিগোংগ মাস্টারদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী, তুমি এদের আলাদা করতে পারবে না, সেইজন্যে তুমি অবশ্যই নিজেকে সংযত রাখবে। আমি এখানে এটা বলছি না যে তোমাদের ফালুন দাফা-র সাধনাই করা উচিত, তুমি যে কোনো পদ্ধতিতেই সাধনা করতে পার। তবে অতীতে একটা কথা প্রচলিত ছিল: ‘‘একজন ব্যক্তি যদি একহাজার বছরেও কোনো সৎ সাধনা পদ্ধতি প্রাপ্ত না হয়, তবুও প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী এলোমেলো কোনো সাধনা পদ্ধতি যেন একদিনের জন্যেও অনুশীলন না করে।’’ সেইজন্যে নিজেকে অবশ্যই সংযত রাখবে এবং সৎপথে প্রকৃত সাধনা করবে, সাধনার সময়ে অন্য কোনো জিনিস মেশাবে না, এমনকী কোনো চিন্তাও যুক্ত করবে না। কিছু লোকের ফালুন বিকৃত হয়ে গেছে, কেন বিকৃত হয়ে গেছে? তারা দাবি করে: ‘‘আমি অন্য চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করিনি।’’ কিন্তু তারা যখনই শারীরিক ক্রিয়া করে, তারা চিন্তার দ্বারা পূর্বের পদ্ধতির জিনিসগুলো যুক্ত করতে থাকে, অতএব ওই জিনিসগুলো অনুশীলনের মধ্যে যুক্ত হয়ে গেল না কি? সত্তা ভর করার বিষয়ে আমার এতটাই বলার ছিল।

মহাজাগতিক ভাষা

মহাজাগতিক ভাষা কাকে বলে? অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি হঠাৎ অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে থাকে, সে অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কিছু বলতে থাকে, সে নিজেও জানে না যে সে কী বলছে। যেসব লোকেদের ইন্দ্রিয়োত্তর ভাব-সংযোগের (টেলিপ্যাথির) ক্ষমতা আছে তারা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারে না যে ওই

ব্যক্তি ঠিক কী বলছে। এছাড়া কিছু লোক অনেক ধরনের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে। কিছু লোক এটাকে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে করে এবং এটাকে একটা দক্ষতা অথবা অলৌকিক ক্ষমতাও মনে করে। কিন্তু এটা কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নয়, অথবা একজন সাধকের দক্ষতাও নয়, এটা তোমার স্তরকেও নির্দেশ করে না। তাহলে, এটা কী? বাস্তবিকপক্ষে তোমার মন বাইরের কোনো সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তুমি তবুও এটাকে খুব ভালো মনে করেছ, তুমি আনন্দের সঙ্গে এটা পেতে চেয়েছ এবং তুমি খুশি হয়েছ, তুমি যত বেশী খুশি হবে ততই এ তোমাকে দৃঢ়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। একজন প্রকৃত সাধক হিসাবে তুমি কীভাবে এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছ? এছাড়া এরা অত্যন্ত নীচু স্তর থেকে আসে, সুতরাং প্রকৃত সাধক হিসাবে আমাদের এই সমস্ত সমস্যাকে ডেকে আনা উচিত নয়।

মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান কারণ মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান, তুমি কেন এইসব জিনিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে? তুমি এমনকী নিজের শরীরটাকেও আর চাইছ না, কত দুঃখজনক! কিছু জিনিস মানুষের শরীরের সঙ্গে সেঁটে থাকে, আবার কিছু জিনিস সেঁটে থাকে না এবং মানুষের থেকে কিছুটা দূরে থাকে কিন্তু তবুও এরা তোমাকে চালনা করতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তুমি যখন কথা বলতে চাইবে, এরা তোমাকে বলতে দেবে, তুমি বিড়বিড় করে বলতে থাকবে। এটাকে অন্য লোকের কাছেও হস্তান্তরিত করা যেতে পারে, যদি সেই লোকটি শিখতে চায়, যদি সে সাহস করে মুখ খুলে চেষ্টা করে, সেও বলতে পারবে। বস্তুত এই জিনিসগুলো দলবদ্ধভাবে আসে, তুমি বলতে চাইলে এদের একটা তোমার কাছে আসবে এবং তোমাকে বলতে সাহায্য করবে।

কেন এই পরিস্থিতির উদয় হয়? আমি যেরকম বলেছি, এরা নিজেদের স্তরের উন্নতি করতে চায়, কিন্তু ওখানে কোনো কষ্ট নেই, সেইজন্যে এরা সাধনা করতে পারে না এবং নিজেদের উন্নতিও করতে পারে না। তারা একটা উপায় চিন্তা করে, তারা ভালো কাজ করে লোকেদের উপকার করতে চায়, কিন্তু তারা জানে না যে সেটা কীভাবে করবে। তবে তারা এটা জানে যে তাদের প্রেরণ করা শক্তি লোকেদের ব্যাধিটাকে কিছুটা দমন করতে পারে এবং তখনকার মতো ব্যাধির যন্ত্রণার উপশম করতে পারে, যদিও ব্যাধিটাকে সারাতে পারে না, তারা জানে যে লোকেদের মুখের মাধ্যমে শক্তিটা প্রেরণ করে এইরকম কাজটা সম্পাদন

করা যাবে, অতএব এইভাবেই ব্যাপারটা ঘটে। কিছু লোক এটাকে স্বর্গীয় ভাষাও বলে, আবার কিছু লোক এটাকে বুদ্ধের ভাষাও বলে, সেটা হচ্ছে বুদ্ধের নামে অপবাদ দেওয়া। আমি বলব এসব নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত মন্তব্য!

তোমরা সবাই জান যে একজন বুদ্ধ সহজে কথা বলার জন্যে মুখ খোলেন না। যদি তিনি আমাদের এই মাত্রায় মুখ খোলেন এবং কথা বলেন, তাহলে মানবজাতির ক্ষেত্রে একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি হবে, কী ভয়ংকর হবে! শুধু সেই বজ্রগম্ভীর শব্দটার কথা ভাব। কিছু লোক বলে: ‘‘আমি আমার দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখেছি যে বুদ্ধ আমার সঙ্গে কথা বলছেন।’’ তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছিলেন না। কিছু লোক আবার আমার ফা শরীরকেও একই রকম করতে দেখেছে, সেও তোমার সঙ্গে কথা বলছিল না। তিনি যে চিন্তাটা প্রেরণ করছিলেন তার মধ্যে স্টিরিও (ত্রিমাত্রিক) ধ্বনি ছিল, সেইজন্যে তুমি যখন শুনছিলে, তখন মনে হচ্ছিল যেন তিনি কথা বলছেন। সাধারণভাবে তিনি তাঁর মাত্রার মধ্যে কথা বলতে পারেন, কিন্তু সেটা এখানে সঞ্চারিত হয়ে আসার পরে, তিনি কী বলছেন, সেটা তুমি পরিষ্কারভাবে শুনতে পারবে না। এর কারণ দুটো মাত্রাতে সময়-মাত্রার ধারণাটা ভিন্ন। আমাদের এই মাত্রাতে এক *শিছেন*[53] দুই ঘন্টার সমান, আমাদের এই এক শিছেন ওই বড়ো মাত্রায় এক বৎসরের সমান, অর্থাৎ ওখানকার তুলনায় আমাদের এখানে সময় ধীরগামী।

অতীতে একটা কথা প্রচলিত ছিল, ‘‘স্বর্গের একদিন, পৃথিবীতে এক হাজার বছরের সমান।’’ এটা ইঙ্গিত করছে একক জগৎকে, যেখানে মাত্রার কোনো ধারণা নেই এবং সময়েরও কোনো ধারণা নেই, অর্থাৎ মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা যেসব জগতে থাকেন। যেমন পরমানন্দের স্বর্গলোক, পান্নাসবুজ স্বর্গলোক, ফালুন স্বর্গলোক, কমল স্বর্গলোক, ইত্যাদি। যাই হোক, ওই বড়ো মাত্রায় সময় আমাদের এখানকার সময়ের তুলনায় দ্রুতগামী, যা আমাদের ধারণার বিপরীত। তুমি যদি তাদের বলা কথাগুলো ধরতে পার বা শুনতে পার, কারণ কিছু লোকের দূরের কথা শ্রবণের দিব্য ক্ষমতা থাকে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় খোলা থাকে, এইরকম ক্ষেত্রে তুমি তাদের বলা কথাগুলো শোনার সময়ে, সেগুলো পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে না। তুমি যা কিছু শুনবে সব একই রকম শুনতে লাগবে, ঠিক পাখির

---

[53] *শিছেন* - চীন দেশে দুই ঘন্টা সময় পরিমাপের একক।

কিচিরমিচির আওয়াজের মতো অথবা দ্রুতগতিতে গ্রামোফোন চালিয়ে শোনার মতো, শুনে একটা কথাও বুঝতে পারবে না। অবশ্য কিছু লোক সংগীত শুনতে পারে, এবং কথাবার্তা শুনতে পারে। কিন্তু তার জন্যে অবশ্যই একটা অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে যেটা সংবাহক হিসাবে কাজ করে, সময়ের ব্যবধানটা দূর করবে, তারপরে শব্দটা তোমার কানে পৌঁছালে, একমাত্র তখনই তুমি সেটা পরিষ্কারভাবে শুনতে পারবে, অর্থাৎ অবস্থাটা এইরকমই হয়ে থাকে। কিছু লোক বলে যে এটা বুদ্ধের ভাষা, সেটা একেবারেই ঠিক নয়।

যখন দুজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা একটা হাসির মাধ্যমেই সমস্ত কিছু বুঝতে পারেন, এটা শব্দহীন টেলিপ্যাথির দ্বারা নিস্পন্ন হয় এবং ত্রিমাত্রিক ধ্বনি হিসাবে কানের মধ্যে গৃহীত হয়। যখনই তাঁরা হাসেন, এরমধ্যেই তাঁদের ভাবের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তাঁরা শুধু যে এই একরকম পদ্ধতির ব্যবহার করেন তা নয়, কোনো কোনো সময়ে অন্য উপায়ও প্রয়োগ করেন। তোমরা সবাই জান যে, তন্ত্রবিদ্যায় তিব্বতের লামারা হস্ত মুদ্রার উপর গুরুত্ব দেয়। কিন্তু তুমি যদি কোনো লামাকে জিজ্ঞাসা কর যে হস্ত মুদ্রা কী? সে বলবে এটা পরম যোগ। সুনির্দিষ্টভাবে এটা কী? সেও এটা জানে না। বস্তুত এটা হচ্ছে মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের ভাষা। যখন অনেক লোক থাকে তখন বৃহৎ হস্ত মুদ্রা প্রয়োগ করা হয়, বৃহৎ হস্ত মুদ্রা অত্যন্ত চমৎকার দেখতে এবং বিভিন্ন ধরনের হয়। যখন কম লোক থাকে তখন ছোট হস্ত মুদ্রা প্রয়োগ করা হয়, ছোট হস্ত মুদ্রাও খুব সুন্দর দেখতে, এতে বিভিন্ন ধরনের হস্তভঙ্গিমা আছে, যা অত্যন্ত জটিল এবং বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধ, কারণ এগুলো একটা ভাষা। অতীতে এসবই ছিল স্বর্গীয় গোপন ব্যাপার, আমরা সবই প্রকাশ করছি। তিব্বতে যা ব্যবহার করা হয়, তা শুধু কয়েকটা হস্তসঞ্চালন মাত্র, যা কেবল অনুশীলনেরই জন্যে, তারা এগুলোকেই শ্রেণীবিভাগ করে প্রণালীবদ্ধ করেছে। এগুলো কেবল অনুশীলনের জন্যে একরকম ভাষা মাত্র, এছাড়া এগুলোর কয়েকটা প্রকার আছে চিগোংগ অনুশীলনের জন্যে, সত্যিকারের হস্ত মুদ্রা খুবই জটিল।

মাস্টার শিক্ষার্থীদের কী দিয়েছেন?

কিছু লোক আমাকে দেখার পরে আমার হাত চেপে ধরে থাকে, আর ছাড়তে চায় না। যখন অন্য লোকেরা এই লোকেদের আমার সাথে করমর্দন করতে দেখে, তখন তারাও আমার সাথে করমর্দন করবে। আমি জানি তারা মনে মনে কী চাইছে। কিছু লোক মাস্টারের সাথে করমর্দন করতে চায় কারণ তারা খুব খুশি হয়; কোনো কোনো লোক কিছু বার্তা পেতে চায় এবং আমার হাত আর ছাড়তেই চায় না। আমরা তোমাদের বলছি, প্রকৃত সাধনা তোমার নিজের ব্যাপার, আমরা এখানে রোগ নিরাময়ের জন্যে এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে কিছু করব না, অথবা বার্তা পাঠিয়ে তোমার রোগ নিরাময় করব না, আমরা এসব নিয়ে কিছু বলিও না। তোমার রোগ সরাসরি আমিই নিরাময় করব, অনুশীলনের জায়গায় আমার ফা-শরীর অনুশীলনকারীর রোগ নিরাময় করে দেবে, যারা নিজে নিজে বই পড়ে ফালুন দাফা সম্বন্ধে শিখবে তাদের অসুখও আমার ফা-শরীর নিরাময় করে দেবে। তুমি কী ভাবছ যে আমার হাত স্পর্শ করেই তোমার গোংগ বৃদ্ধি পাবে? সেটা হাসির কথা হল না কি?

গোংগ নির্ভর করে একজন ব্যক্তির নিজের চরিত্রের সাধনার উপরে। তুমি যদি প্রকৃত সাধনা না কর, তাহলে তোমার গোংগ উপরের দিকে বৃদ্ধি পাবে না, কারণ সেখানে চরিত্রের একটা মান আছে। যখন তোমার গোংগ বাড়ছে, সেই সময়ে উঁচু স্তর থেকে দেখা যাবে যে তোমার আসক্তি যা একটা পদার্থ, সেটা দূর হয়েছে এবং একটা গজকাঠি তোমার মাথার উপরে বিকশিত হয়েছে। এছাড়া এই গজকাঠিটা গোংগ স্তম্ভের মতো আকার নিয়ে বিদ্যমান থাকে, গজকাঠি যত উঁচু হয় গোংগ স্তম্ভও তত উঁচু হয়, এটা হচ্ছে তোমার নিজের সাধনার দ্বারা বিকশিত গোংগ-এরই প্রতিরূপ, এটা তোমার চরিত্রের উচ্চতারও প্রতিরূপ। অন্য কেউ তোমার সাথে এটা যতটাই যোগ করুক না কেন কোনো কাজ হবে না, এমনকী সামান্য একটু অংশ যোগ করলেও সেটা থাকবে না, সবই অবশ্যই চলে যাবে। আমি মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে ‘‘মাথার উপরে তিনটে ফুল একত্রিত হওয়া’’ অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু যেই তুমি ঘরের বাইরে পা ফেলবে তখনই গোংগ নীচে নেমে যাবে। ওই গোংগ তোমার নয়, তোমার সাধনার দ্বারা বিকশিত হয়নি, অতএব ওটা থাকতে পারবে না, যেহেতু তোমার চরিত্রের মান ওখানে নেই, অন্য কেউ তোমার সাথে গোংগ যোগ

করতে চাইলেও যোগ করতে পারবে না, এর বিকাশ পুরোপুরি নির্ভর করে তোমার নিজের সাধনার উপরে এবং নিজের মনের সাধনার উপরে। দৃঢ়তার সঙ্গে গোংগ বৃদ্ধি করতে হলে, নিরন্তর নিজেকে উন্নত করে যেতে হবে, এবং বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যেতে হবে, একমাত্র তাহলেই তুমি উপরে উঠতে পারবে। কিছু লোক আমার হস্তাক্ষর চায়, আমি তাদের এটা দিতে চাই না। কিছু লোক বলে বেড়ায় যে তাদের কাছে মাস্টারের হস্তাক্ষর আছে, তারা এটা জাহির করতে চায়, এবং মাস্টারের বার্তার দ্বারা সুরক্ষিত থাকতে চায়। এটা কি আর একটা আসক্তি নয়? তোমার সাধনা তোমার নিজের উপরেই নির্ভর করে, তুমি কোন্ বার্তার কথা বলছ? উচ্চস্তরের সাধনায় তুমি কি এই জিনিসগুলির কথা বলবে? এসবের কী মূল্য আছে? এসব শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে।

তুমি নিজে সাধনার দ্বারা যে গোংগ বিকশিত করেছ, অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে তার প্রতিটি কণা দেখতে একেবারে ঠিক তোমারই মতন। যখন তুমি ত্রিলোক ফা সাধনা অতিক্রম করে যাবে, তখন তুমি বুদ্ধ শরীরের সাধনা করবে। তোমার গোংগ বুদ্ধশরীরের রূপ গ্রহণ করবে, যা অতীব সুন্দর এবং পদ্মফুলের উপর বসে আছে, তখন তোমার গোংগ-এর প্রতিটি আণুবীক্ষণিক কণা এইরকমই দেখতে হবে। কিন্তু একটা পশুর গোংগ সবই যেন ছোট ছোট শেয়াল, ছোট ছোট সাপ এই ধরনের জিনিস, এমনকী অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরেও প্রতিটি কণার সবই এই সব জিনিস। তথাকথিত বার্তা বলে আরও একরকমের জিনিস আছে, লোকেরা চায়ের পাতা জলের সঙ্গে মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়ানোর পরে, তোমাকে পান করতে বলবে, তারা এটাকেই গোংগ মনে করে। সাধারণ লোকেরা ব্যাধিটাকে বিলম্বিত করে এবং দমন করে সাময়িকভাবে যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পায়, যত যাই হোক সাধারণ মানুষ হচ্ছে সাধারণ মানুষই, একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে তার শরীরের ক্ষতি করছে, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা অনুশীলনকারী, সেইজন্যে আমি তোমাদের এই সব কথা বললাম। এখন থেকে তোমরা আর এই সব জিনিস করবে না, তথাকথিত এই বার্তা, সেই বার্তা, এই সব জিনিস কখনোই চাইবে না। কিছু চিগোংগ মাস্টার দাবি করে: ‘‘আমি তোমাদের বার্তা পাঠাব, তোমরা দেশের সব জায়গায় সেটা গ্রহণ করতে পারবে।’’ তুমি কী প্রাপ্ত হবে? আমি তোমাদের বলছি, এই জিনিসগুলোর খুব বেশী প্রয়োজন নেই। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এগুলো ভালো, তাহলেও এগুলো কেবল রোগ

নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে। আর আমরা অনুশীলনকারী হিসাবে আমাদের গোংগ আমাদের সাধনার দ্বারাই বিকশিত করব, অন্য লোকের পাঠানো বার্তার দ্বারা আমাদের গোংগ-এর স্তর উন্নত হবে না, শুধু সাধারণ মানুষের রোগ দূর হতে পারে। তুমি অবশ্যই সৎ মানসিকতা বজায় রাখবে, তোমার হয়ে অন্য কেউ সাধনা করতে পারবে না, শুধু তুমি নিজে যদি সত্যিকারের সাধনা কর, একমাত্র তাহলেই তোমার স্তরের উন্নতি ঘটবে।

সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের কী প্রদান করলাম? তোমরা সবাই জান যে আমাদের মধ্যে অনেকেই কোনোদিন চিগোংগ অনুশীলন করেনি এবং আমাদের শরীরে ব্যাধি রয়েছে; আমাদের মধ্যে অনেকেই যদিও বহু বছর ধরে চিগোংগ অনুশীলন করেছে, তারা এখনও চি-এর স্তরেই ঘোরাফেরা করছে, এখনও গোংগ প্রাপ্ত হয়নি। অবশ্যই কিছু লোক অন্যদের রোগের চিকিৎসা করেছে, তুমি জান না যে তারা কীভাবে রোগ নিরাময় করেছে? আমি যখন সত্তা ভর করার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন এরই মধ্যে আমি ফালুন দাফা-র প্রকৃত সাধকদের শরীর থেকে ভর করা সমস্ত সত্তা দূর করে দিয়েছি, সেগুলো যে জিনিসই হোক না কেন, তাদের শরীরের ভিতর থেকে বাইরে পর্যন্ত সমস্ত খারাপ জিনিস পুরোপুরি দূর করে দিয়েছি। যদি তুমি নিজে নিজে দাফা পড়ে সত্যিকারের সাধনা কর, তাহলেও আমি তোমার শরীরটাকে পরিষ্কার করব, এছাড়া তোমার বাড়ির পরিবেশও অবশ্যই পরিষ্কার করব। পূর্বে তুমি শেয়াল, নেউল অধিষ্ঠিত যেসব স্মরণফলক[54] - এর পূজা করতে, সেগুলো শীঘ্রই ছুঁড়ে ফেলে দাও, তোমার সবকিছু পরিষ্কার করা হয়েছে, ওগুলোর অস্তিত্ব আর নেই। তুমি সাধনা করতে চাও, সেইজন্যে আমরা তোমার সাধনার জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক দ্বার খুলে দিতে পারি, এবং তোমার জন্যে এইসব জিনিস করতে পারি, কিন্তু এটা শুধু প্রকৃত সাধকদের জন্যেই করা হবে। অবশ্য কিছু লোক সাধনা করতে চায় না, তারা এখনো পর্যন্ত এটা বুঝতেও পারছে না, অতএব আমরাও তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারব না, আমরা প্রকৃত সাধকদেরই তত্ত্বাবধান করতে পারি।

---

[54]স্মরণফলক - পূর্বপুরুষদের এবং অন্য আত্মাদের পূজা করার জন্যে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত একরকমের কাঠের ফলক।

আরও এক ধরনের লোক আছে, পূর্বে কেউ তাকে বলেছিল যে তার শরীরে সত্তা ভর করে আছে, সে নিজেও সেটা অনুভব করেছে। কিন্তু একবার সেসব দূর করে দেওয়ার পরেও, সেটা নিয়ে তার দুশ্চিন্তা দূর হয় না, সে সবসময়ে ভাবে যে সেই অবস্থাটা এখনও বিদ্যমান রয়েছে, সে মনে করে যে এখনও সেটা রয়েছে, এটাও একধরনের আসক্তি এবং এটাকে বলে সন্দেহবাতিক মন। যত সময় পার হতে থাকবে, সে সতর্ক নাহলে আবার হয়তো সেটাকে ডেকে আনবে। সে নিজে এই আসক্তিকে অবশ্যই দূর করবে, বস্তুত তার শরীরে এখন আর কোনো সত্তা নেই। কিছু লোকের ক্ষেত্রে আগের ক্লাসগুলোতেই এই সব জিনিসের মোকাবিলা করা হয়েছে, আমি ইতিমধ্যে এই জিনিসগুলো করেছি এবং সমস্ত ভর করা সত্তা দূর করে দিয়েছি।

তাও মতের প্রাথমিক স্তরের সাধনায় কিছু জিনিসের ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন, ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ এবং দ্যান ক্ষেত্রের[55] বিকশিত হওয়া আবশ্যক, এছাড়া অন্য আরও কিছু জিনিসেরও বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এখানে ফালুন, শক্তির যন্ত্রকৌশল, সাধনার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকমের যন্ত্রকৌশল এবং অন্য অনেক জিনিস, দশ হাজারেরও বেশী জিনিস স্থাপন করব। এগুলো সবই তোমাকে প্রদান করা হবে, এগুলোকে ঠিক বীজের মতো তোমার শরীরের মধ্যে রোপণ করা হবে। তোমার ব্যাধিগুলো দূর করার পরে, আমি তোমার জন্যে যা যা করা উচিত সবই করব এবং তোমাকে যা যা প্রদান করা উচিত সবই প্রদান করব, একমাত্র তখনই তুমি আমাদের এই পদ্ধতিতে প্রকৃত সাধনা করে সফল হবে। অন্যথায়, তোমাকে যদি কোনো কিছু প্রদান না করা হয়, তাহলে সেটা শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার মতো হবে। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু লোক চরিত্রের দিকে লক্ষ্যই রাখে না, তাদের পক্ষে বরঞ্চ শারীরিক ব্যায়াম করা ভালো।

তুমি যদি সত্যিকারের সাধনা কর তাহলে আমরা তোমার প্রতি অবশ্যই দায়িত্বশীল থাকব, যেসব লোকেরা নিজে নিজে সাধনা করবে তারাও একই জিনিস প্রাপ্ত হবে, কিন্তু তাদের অবশ্যই সত্যিকারের সাধনা করতে হবে, আমরা সত্যিকারের সাধককে এই জিনিসগুলোর সবই প্রদান করব। আমি বলেছি যে আমি অবশ্যই তোমাকে সত্যিকারের শিষ্য

[55]দ্যান ক্ষেত্র - উদরের নীচের অংশ, তলপেটে অবস্থিত।

হিসাবেই পরিচালিত করব। এছাড়া তুমি অবশ্যই উচ্চস্তরের ফা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করবে এবং কীভাবে সাধনা করতে হয় জানবে। তোমাকে শারীরিক ক্রিয়ার পাঁচটা সেট, সবই একবারে শেখানো হবে এবং তুমি সবই শিখতে পারবে। ভবিষ্যতে তুমি যথেষ্ট উঁচু একটা স্তর প্রাপ্ত হবে, সেটা এতই উঁচু স্তর যে তোমার কল্পনার বাইরে, সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে কোনো সমস্যা হবে না। আমি যে ফা শেখাচ্ছি, তার মধ্যে বিভিন্ন স্তর সম্মিলিত করা আছে, সেইজন্যে এখন থেকে বিভিন্ন স্তরের সাধনার সময়ে, তুমি আবিষ্কার করবে যে এটা সর্বদাই তোমার জন্যে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

একজন সাধক হিসাবে এখন থেকে তোমার জীবনের পথ পাল্টে যাবে, আমার ফা-শরীর তোমার জন্যে এটা নতুন করে সাজাবে। কীভাবে সাজাবে? কিছু লোকের জীবনের এই পর্বটা শেষ হতে আর কত বছর আছে? তারা নিজেরাও সেটা জানে না; কিছু লোক হয়তো এক-আধ বছর পরে গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হতে পারে, এবং অসুখটা হয়তো কয়েক বছর ধরে থাকতে পারে; কিছু লোকের মস্তিষ্কের রক্তনালী অবরুদ্ধ হতে পারে অথবা অন্য কোনো রোগ হতে পারে এবং একেবারেই চলাফেরা করতে পারবে না। তাহলে বাকি জীবনে তুমি সাধনা কীভাবে করবে? আমরা অবশ্যই এগুলোকে তোমার জীবন থেকে দূর করে দেব এবং ওইসব জিনিস ঘটতে দেব না। কিন্তু আমরা আগে থেকেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখছি যে আমরা কেবল প্রকৃত সাধকদের জন্যেই এসব জিনিস করতে পারব, সাধারণ মানুষদের জন্যে ইচ্ছামতো এটা করা যাবে না, অন্যথায় এটা খারাপ কাজ করার সমান হবে। সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যু এই সবকিছুরই পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক রয়েছে, ইচ্ছামতো আমরা এগুলোকে ভাঙতে পারি না।

আমাদের চোখে সাধক হচ্ছে সবার চেয়ে মূল্যবান। সেইজন্যে আমরা শুধু সাধকদের জন্যেই এই জিনিসগুলো করতে পারি। আমরা কীভাবে করব? যদি মাস্টারের সদ্‌গুণ-এর শক্তি অত্যন্ত উঁচু থাকে, অর্থাৎ মাস্টারের গোংগ সামর্থ্য যদি খুব উঁচু থাকে, তাহলে তিনি তোমার কর্ম দূর করতে পারবেন। মাস্টারের গোংগ বেশী থাকলে তিনি তোমার অনেকটা কর্ম দূর করতে পারবেন এবং মাস্টারের গোংগ কম থাকলে তিনি তোমার সামান্য কর্ম দূর করতে পারবেন। আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব, আমরা তোমার বাকি জীবনের বিভিন্ন ধরনের

কর্মগুলোকে একত্রিত করব এবং তার থেকে একটা অংশ বা অর্ধেকটা অংশ দূর করে দেব। বাকি অর্ধেকটা অংশ পড়ে থাকলেও তুমি তবুও সেটা অতিক্রম করতে পারবে না, কারণ সেটাও একটা পর্বতের থেকে উঁচু, অতএব কীভাবে আমরা এর মোকাবিলা করব? তুমি তাও প্রাপ্ত হওয়ার পরে হয়তো ভবিষ্যতে অনেক লোক উপকৃত হবে, এইভাবে অনেক লোক তোমার জন্যে একটা ভাগ বহন করবে। অবশ্য তাদের ক্ষেত্রে সেটা কোনো হিসাবের মধ্যে আসবে না। তোমার নিজের সাধনার মাধ্যমে প্রচুর জীবনসত্তা তোমার শরীরের মধ্যে বিকশিত হবে, তোমার নিজের মুখ্য আত্মা এবং সহ আত্মা ছাড়াও, তোমার মধ্যে অনেক তুমি আছে, এরা সবাই তোমার জন্যে একটা ভাগ বহন করবে। অতএব তুমি যখন দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাবে, তখন তোমার জন্যে বেশী কিছু পড়ে থাকবে না। যদিও বলা হচ্ছে যে বেশী কিছু পড়ে থাকবে না, কিন্তু সেটাও বেশ বিশাল, তুমি এখনো এটাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। তাহলে কী করা হবে? এটাকে অসংখ্য ভাগে ভাগ করে, সাধনার বিভিন্ন স্তরে রাখা হবে, এগুলোকে তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্যে, তোমার কর্মের রূপান্তরের জন্যে এবং তোমার গোংগ-এর বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করা হবে।

এছাড়া, একজন লোক সাধনা করতে চাইলে, সেটা কিন্তু কোনো সহজ ব্যাপার নয়। আমি বলেছি যে এটা অত্যন্ত গম্ভীর একটা ব্যাপার, এর উপরে এটা সাধারণ মানুষের থেকেও উচ্চতর একটা ব্যাপার, এটা সাধারণ মানুষের যে কোনো কাজের থেকে কঠিন। এটা একটা অতি-প্রাকৃত ব্যাপার নয় কি? সুতরাং তোমার জন্যে এর আবশ্যকতাও সাধারণ মানুষের যে কোনো কিছুর থেকে উঁচু হওয়া চাই। মানুষের মধ্যে মুখ্য আত্মা আছে, মুখ্য আত্মার বিনাশ নেই। যদি মুখ্য আত্মার বিনাশ না হয়, তোমরা সবাই চিন্তা কর: আগের জীবনে সামাজিক কাজকর্মের সময়ে তোমার মুখ্য আত্মা কি কোনো খারাপ কাজ করেনি? খুব সম্ভবত করেছিল। তুমি সম্ভবত এই সব কাজ করেছিলে, যেমন -- জীব হত্যা করেছিলে, কারোর থেকে কিছু ঋণ নিয়েছিলে, কারোর থেকে সুবিধা আদায় করেছিলে এবং কারোর ক্ষতি করেছিলে। এই কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তুমি যখন এখানে সাধনা করছ, তারা সেখান থেকে এটা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পারছে। তুমি রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে কোনো কিছু করলে তারা তোমাকে বাধা দেবে না, কারণ তারা জানে যে তুমি কেবল তোমার ঋণ শোধ করার ব্যাপারটাকে বিলম্বিত করছ মাত্র, অর্থাৎ এখন তুমি শোধ না করলেও পরে তোমাকে শোধ করতে

হবেই এবং পরবর্তীকালে তোমাকে আরও বেশী ঋণ শোধ করতে হবে। সেইজন্যে তুমি আপাততঃ ঋণ শোধ না করলেও, তারা সেটাকে গুরুত্ব দেবে না।

যখন তুমি বলছ যে তুমি সাধনা করতে চাও, তারা সেটা হতে দেবে না: ‘‘তুমি সাধনা করতে চাও এবং চলে যেতে চাও, তোমার গোংগ বিকশিত হয়ে গেলে আমি এমনকী তোমার কাছেও পৌঁছাতে পারব না, আমি তোমাকে ছুঁতেও পারব না।’’ তারা এটা ঘটতে দেবে না। তারা তোমাকে সর্বতোভাবে বাধা দেবে, তারা তোমাকে সাধনা করতেই দেবে না, সেইজন্যে তারা নানান ধরনের উপায় প্রয়োগ করে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, এমনকী তারা তোমাকে সত্যিই মেরে ফেলতে পারে। অবশ্য এটা এইরকম ঘটবে না যে, যখন তুমি বসে ধ্যান করছ তখন তোমার মাথাটা কেটে ফেলবে, এটা অসম্ভব কারণ এটা অবশ্যই সাধারণ মানবসমাজের পরিস্থিতি অনুসারে ঘটবে। হয়তো তুমি যেই বাড়ির দরজার বাইরে যাবে, একটা গাড়ি এসে তোমাকে ধাক্কা মারবে, অথবা হয়তো একটা অট্টালিকার উপর থেকে নীচে পড়ে যাবে, অথবা অন্য কোনো বিপদ ঘটবে, সম্ভবত এইসব ঘটনা ঘটবে এবং এগুলো যথেষ্ট বিপজ্জনক। প্রকৃত সাধনা কিন্তু তুমি যেরকম কল্পনা কর সেইরকম সহজ নয়, তুমি সাধনা করতে চাইছ, সেইজন্যে তুমি কি ভাবছ যে তুমি সাধনায় উপরে উঠতে পারবে? তুমি যখনই প্রকৃত সাধনা শুরু করবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবন সংকটের মুখোমুখি হবে, সেই মুহূর্তেই তুমি এইরকম সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে। অনেক চিগোংগ মাস্টার আছে যারা শিক্ষার্থীদের উচ্চস্তরের সাধনায় পরিচালিত করতে সাহস পায় না। কেন? প্রকৃতপক্ষে তারা এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না----তারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

অতীতে অনেক মাস্টার তাও-এর শিক্ষা প্রদান করতেন, তাঁরা শুধু একজন শিষ্যকেই শিক্ষা প্রদান করতেন, তাঁরা মোটামুটি এই একজন শিষ্যকেই সুরক্ষা প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু এটাকে এইরকম বিরাট আকারে করতে একজন সাধারণ ব্যক্তি একেবারেই সাহস করবে না। কিন্তু আমরা এখানে তোমাদের সবাইকে বলতে চাই যে আমি এটা করতে সক্ষম। কারণ আমার অসংখ্য ফা-শরীর আছে, যারা আমার ফা-এর অত্যন্ত শক্তিশালী ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী, তারা মহান ঐশ্বরিক ক্ষমতা এবং মহান ফা-এর প্রচন্ড ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে। এছাড়া আজ আমরা যে ব্যাপারটা করছি সেটা উপর থেকে যেরকম মনে হচ্ছে,

সেইরকম সহজ নয় এবং আমিও কেবলমাত্র আবেগের ঝোঁকে এই কাজটা করতে আসিনি। আমি তোমাদের বলতে চাই যে, অনেক মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা এই ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছেন, ধর্মের বিনাশকালে এই শেষবারের মতো আমরা একটা সৎপথের শিক্ষা প্রদান করছি। এই কাজটা করার সময় আমরা এটাকে অবশ্যই বিপথগামী হতে দেব না, তুমি যদি সত্যিই সৎপথে সাধনা কর কেউই তোমাকে ইচ্ছামতো কোনো কিছু করতে পারবে না, এছাড়া তুমি আমার ফা-শরীর দ্বারা সুরক্ষিত, তুমি কোনো বিপদের মধ্যে পড়বে না।

তোমার যা ঋণ রয়েছে সেটাকে অবশ্যই শোধ করতে হবে, সেইজন্যে তোমার সাধনার পথে কিছু বিপজ্জনক ঘটনা হয়তো ঘটতে পারে। কিন্তু এই জিনিসগুলো যখন ঘটবে তখন তুমি আতঙ্কিত হবে না এবং আমরাও কোনো সত্যিকারের বিপদ ঘটতে দেব না। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিতে পারি। আমি যখন বেজিংয়ে ক্লাস নিচ্ছিলাম, সেই সময়ে একজন শিক্ষার্থী সাইকেলে করে রাস্তা পার হচ্ছিল, সে যখন রাস্তার একটা মোড় দিয়ে যাচ্ছিল, তখন রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, সেই জায়গায় একটা দামি গাড়ি এসে আমাদের এই শিক্ষার্থীকে ধাক্কা মেরেছিল, শিক্ষার্থী ছিল পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সি একজন মহিলা। গাড়িটা তাকে অকস্মাৎ এবং খুব জোরে ধাক্কা মেরেছিল, গাড়িটা তার মাথায় আঘাত করার সময়ে ‘‘ঠন’’ করে আওয়াজ হয়েছিল, তার মাথাটা সোজা গাড়ির ছাদের সঙ্গে ঠুকে গিয়েছিল। শিক্ষার্থীর পা দুটো তখনও সাইকেলের প্যাডেলের উপরে ছিল, যদিও তার মাথায় আঘাত লেগেছিল, সে কোনো ব্যথা অনুভব করেনি। শুধু যে ব্যথা লাগেনি তা নয়, তার মাথা থেকে রক্তও বের হয়নি, এমনকী মাথায় কোথাও ফোলেওনি। চালক খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল, সে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বাইরে এল এবং তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: ‘‘আপনার আঘাত লেগেছে কি?’’ ‘‘আমরা কি হাসপাতালে যাব?’’ সে উত্তর দিয়েছিল যে, সে ভালো আছে। অবশ্যই আমাদের এই শিক্ষার্থীর চরিত্র খুব উঁচু ছিল, সে চালককে সমস্যার মধ্যে ফেলতে চায়নি। সে বলেছিল যে, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু ধাক্কার ফলে দামি গাড়ির ওই জায়গাটা অনেকটা তুবড়ে গিয়েছিল।

এই জিনিসগুলো, সবই আসে তোমার জীবনকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু তুমি সংকটে পড়বে না। গতবার যখন জিলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল, একজন শিক্ষার্থী জিলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে তার সাইকেলটাকে ঠেলে নিয়ে হেঁটে বাইরের দিকে যাচ্ছিল, সে রাস্তার মাঝখানে আসা মাত্রই হঠাৎ তার দুইদিক থেকে দুটো দামি গাড়ি এসে তাকে চেপে দিচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল গাড়ি দুটো তাকে ধাক্কা মারবে, কিন্তু সে একেবারেই ভয় পায়নি। আমরা সাধারণত এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আতঙ্কিত হই না, গাড়ি দুটো সেই মুহূর্তেই থেমে গিয়েছিল এবং কোনো বিপদ ঘটেনি।

এইরকম আর একটা ঘটনা বেজিংয়ে ঘটেছিল। শীতকালে অন্ধকার অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসে, এবং লোকেরাও অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চলে যায়। রাস্তায় কোনো লোক ছিল না, সবকিছু একেবারে শান্ত ছিল। আমাদের একজন শিক্ষার্থী দ্রুত সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল, তার সামনে শুধু একটা জিপগাড়ি যাচ্ছিল, জিপগাড়িটা একভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ জিপগাড়িটা ব্রেক কষল, শিক্ষার্থী সেটা খেয়াল করেনি, সে মাথা নীচু করে সাইকেল চালিয়ে সামনে এগোচ্ছিল। কিন্তু জিপগাড়িটা হঠাৎ পিছনের দিকে চলতে শুরু করল, দ্রুত পিছনে আসতে থাকল এবং বেশ তীব্র গতিতে পিছনদিকে আসতে থাকল, এই দুটো শক্তি একত্রিত হয়ে তার জীবনকে ছিনিয়ে নিতে পারত। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটবে, ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ একটা শক্তি সাইকেলটাকে টেনে ধরে আধ মিটারেরও বেশী পিছনদিকে নিয়ে গেল এবং জিপগাড়িটাও সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের চাকায় এসে থেমে গেল, সম্ভবত চালক বুঝতে পেরেছিল যে পিছনে কোনো লোক রয়েছে। এই শিক্ষার্থী সেই সময়ে কোনো ভয় পায়নি, প্রত্যেকটা লোক যারা এইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় কেউই সেই সময়ে আতঙ্কিত হয় না, যদিও পরে হয়তো আতঙ্কিত হয়। শিক্ষার্থীর মনে হল: ‘‘এই! কে আমাকে পিছনদিকে টানল, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।’’ সে যখন পিছনদিকে ঘুরে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইল, সে রাস্তায় কোনো লোককেই দেখতে পেল না, সবকিছু শান্ত ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারল: ‘‘মাস্টারই আমাকে রক্ষা করেছেন!’’

আরও একটা ঘটনা ছ্যাংগছুন[56]-এ ঘটেছিল। একজন শিক্ষার্থীর বাড়ির কাছে একটা বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার নির্মাণের কাজ হচ্ছিল, বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট এই অট্টালিকাগুলি খুব উঁচু হয়, দুই ইঞ্চি মোটা এবং চার মিটার লম্বা লোহার পাইপ দিয়ে কাঠামো তৈরি হয়। আমাদের

---

[56]ছ্যাংগ ছুন - জিলিন প্রদেশের রাজধানী।

এই শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে বেশী দূরে যেতে না যেতেই ওই উঁচু বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার উপর থেকে একটা লোহার পাইপ খাড়া অবস্থায় নীচের দিকে সোজাসুজি তার মাথার ওপর পড়েছিল, রাস্তার লোকেরা সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে শুধু বলেছিল, ‘‘কে আমাকে চাপড়ে দিল?’’ সে ভেবেছিল কেউ একজন তার মাথা চাপড়ে দিয়েছে। সেই মুহূর্তে সে পিছন ফিরে দেখেছিল যে একটা বড়ো ফালুন তার মাথার উপরে ঘুরছে, এই লোহার পাইপটা তার মাথার পাশ-টাকে নামমাত্র ছুঁয়ে নীচে পড়েছে এবং মাটির ভিতরে গেঁথে গিয়ে আর পড়ে যাচ্ছে না। যদি ওটা সত্যিই কারোর শরীরে আঘাত করত, সবাই চিন্তা কর: অত ভারী এই লোহার পাইপটা পুরো শরীরটাকে ভেদ করে যেত ঠিক যেন চিনি মাখানো নরম ফলের ভিতর দিয়ে কাঠি ভেদ করার মতো। সেটা খুবই বিপজ্জনক ছিল!

এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটেছে, গুনে শেষ করা যাবে না, কিন্তু কারোর কোনো বিপদ ঘটেনি। এটা অবধারিত নয় যে আমাদের সবাইকেই এইরকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু কোনো কোনো লোককে সম্মুখীন হতে হবে। তুমি এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হও বা না হও, আমি তোমাদের নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে তোমরা কোনো বিপদে পড়বে না, এটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। কিছু শিক্ষার্থী চরিত্রের আবশ্যকতা অনুযায়ী কাজ করে না, তারা শুধু শারীরিক ক্রিয়া করতে থাকে এবং চরিত্রের সাধনা করে না, তাদের অনুশীলনকারী হিসাবে গণ্য করা যায় না।

মাস্টার তোমাদের কী কী জিনিস প্রদান করেছেন এসব নিয়ে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহলে এগুলিই আমি প্রদান করেছি। আমার ফা-শরীর সর্বদা তোমাকে রক্ষা করে যাবে, যতক্ষণ না তুমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারছ, সেই সময়ে তুমি ত্রিলোক-ফা সাধনা পার করে যাবে এবং এরই মধ্যে তাও প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে অবশ্যই একজন সত্যিকারের সাধকের মতো আচরণ করবে, একমাত্র তাহলেই তুমি এটা করতে পারবে। একটা লোক ছিল যে আমার বই হাতে নিয়ে রাস্তায় হাঁটছিল এবং চিৎকার করছিল: ‘‘আমি মাস্টার লি-র দ্বারা সুরক্ষিত, আমি গাড়ির ধাক্কাকে ভয় পাই না।’’ এটা হচ্ছে দাফা-র ক্ষতি করা, এই ধরনের লোকেদের রক্ষা করা হয় না, বস্তুত সত্যিকারের শিষ্য এইরকম কাজ করবে না।

শক্তি ক্ষেত্র

যখন আমরা শারীরিক ক্রিয়া করি, আমাদের চারিদিকে একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়। এটা কী ধরনের ক্ষেত্র? কিছু লোক বলে এটা চি-এর ক্ষেত্র, অথবা চৌম্বক ক্ষেত্র, অথবা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। বস্তুত তুমি এই ক্ষেত্রকে যে নামেই ডাক না কেন, সেটাই ভুল, কারণ এই ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব পদার্থ থাকে, তা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমাদের এই বিশ্বের মাত্রাগুলি যে সমস্ত পদার্থ দিয়ে নির্মিত, সেগুলোর প্রায় সবই এই গোংগ-এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং আমাদের পক্ষে একে শক্তি ক্ষেত্র বলা আরও বেশী মানানসই এবং সেই কারণেই আমরা এটাকে সাধারণত শক্তি ক্ষেত্র বলি।

তাহলে এই ক্ষেত্রটার প্রভাব কী? তোমরা জান যে, আমাদের এই সৎপথে সাধনা করা লোকেদের এইরকম উপলব্ধি হয়েছে: যেহেতু এটা সৎপথে সাধনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে, এটা সহানুভূতিপূর্ণ এবং এই বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে সম্মিলিত, সেইজন্যে আমাদের শিক্ষার্থীরা এই ক্ষেত্রে বসে থাকার সময়ে সবাই অনুভব করেছে যে তাদের মনের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তার উদয় হয় না, এছাড়া এখানে বসে থাকার সময়ে আমাদের প্রচুর শিক্ষার্থীর মনে এমনকী ধূমপানের চিন্তাও আসে না, সবাই অনুভব করতে পারে যে এটা অত্যন্ত পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ, আর খুবই আরামদায়ক। অর্থাৎ একজন সৎপথের সাধক এই ধরনের শক্তি বহন করে, তার শক্তি ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে এই প্রভাবটা থাকে। এই ক্লাসের পরে আমাদের অধিকাংশ অনুশীলনকারী গোংগ-এর অধিকারী হবে, যা সত্যিকারের বিকশিত গোংগ, কারণ আমি তোমাদের সৎপথে সাধনার জিনিসের শিক্ষা প্রদান করেছি এবং তোমরা নিজেরাও চরিত্রের মান অনুযায়ী আবশ্যকতাগুলি পালন করে চলবে। যত তুমি ধারাবাহিকভাবে শারীরিক ক্রিয়া করতে থাকবে এবং আমাদের চরিত্রের আবশ্যকতা অনুযায়ী সাধনা চালিয়ে যেতে থাকবে, ততই তোমার শক্তি ধীরে ধীরে আরও ক্ষমতাশালী হতে থাকবে।

আমরা নিজেদের উদ্ধার, অন্যদের উদ্ধার এবং সর্বজীবের উদ্ধারের শিক্ষা প্রদান করি, সেইজন্যে ফালুন ভিতরের দিকে ঘোরার দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করে এবং বাইরের দিকে ঘোরার দ্বারা অন্যদের উদ্ধার করে। এটা বাইরের দিকে ঘোরার সময়ে বাইরের দিকে শক্তি নির্গত করে এবং

অন্যদের উপকার করে, এইভাবে তোমার শক্তি ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে অবস্থিত লোকেরা সবাই উপকৃত হয় এবং তারা সম্ভবত খুব স্বস্তি অনুভব করবে। তুমি রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছ, কর্মস্থলে রয়েছ অথবা বাড়িতে রয়েছ, তুমি যেখানেই থাক না কেন, সম্ভবত এইরকম একধরনের প্রভাব অন্যদের উপরে পড়তে পারে। তোমার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত লোকেদের শরীর অনিচ্ছাকৃতভাবে ঠিক হয়ে যেতে পারে, কারণ এই ক্ষেত্রটা সমস্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ঠিক করতে পারে। মানব শরীরে ব্যাধি হওয়া উচিত নয়, ব্যাধি হওয়া একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, অতএব এটা এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ঠিক করতে পারে। যখন একজন বদ মতলব-যুক্ত লোক খারাপ চিন্তা করছে, তোমার ক্ষেত্রের প্রবল প্রভাবে তার চিন্তাধারা পাল্টেও যেতে পারে, সে হয়তো সেই সময়ে খারাপ চিন্তাটা আর করবে না। হয়তো একটা লোক কাউকে খারাপ কথা বলতে চাইছে, কিন্তু হঠাৎ তার মন পাল্টে যেতে পারে এবং তখন সে আর খারাপ কথা বলতে চাইবে না। একমাত্র সৎ সাধনা পদ্ধতির শক্তি ক্ষেত্র দ্বারাই এই ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। সেইজন্যে বৌদ্ধধর্মে অতীতে এইরকম একটা কথা প্রচলিত ছিল, ‘‘বুদ্ধ জ্যোতি সর্বত্র আলোকিত করে, যুক্তিযুক্ততা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা সবকিছুর সামঞ্জস্যবিধান করে,’’ এটাই এর অর্থ।

ফালুন দাফা-র অনুশীলনকারী কীভাবে এই পদ্ধতির প্রচার করবে?

আমাদের অনেক শিক্ষার্থী বাড়িতে ফিরে গিয়ে, মনে করে যে এই পদ্ধতিটা খুব ভালো, তারা এটাকে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচার করতে চায়। হ্যাঁ, তোমরা সবাই এটা প্রচার করতে পার এবং যে কোনো লোকের কাছে প্রচার করতে পার। কিন্তু একটা ব্যাপার, যা আমরা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলব, আমরা তোমাদের এত জিনিস প্রদান করেছি যে টাকা পয়সা দিয়ে এর মূল্য বিচার করা যায় না। আমি সবাইকে এগুলো কেন প্রদান করেছি? এগুলো তোমার সাধনা করার জন্যে, শুধু যদি সাধনা কর, একমাত্র তাহলেই তোমাকে এই জিনিসগুলো দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে অন্যভাবে বলা যায় যে, পরবর্তীকালে তুমি যখন এই পদ্ধতিটা প্রচার করবে, তুমি এই সব জিনিস দিয়ে খ্যাতি এবং লাভের জন্যে প্রয়াসী হবে

না, সুতরাং তুমি আমার মতো করে ক্লাসের আয়োজন করে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবে না। যেহেতু আমাদের বই এবং অন্যান্য সব সামগ্রী ছাপাতে হয়, এবং এই পদ্ধতির প্রচারের জন্যে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়, সেইজন্যে এই সব খরচগুলি মেটানোর জন্যে অর্থের প্রয়োজন। সারা দেশের মধ্যে আমাদের পারিশ্রমিক ইতিমধ্যে সবচেয়ে কম, আর আমরা যেসব জিনিস প্রদান করি সেগুলোও সবচেয়ে বেশী, আমরা লোকেদের সত্যি সত্যি উচ্চস্তরে চালিত করছি, ইতিমধ্যে তোমরা সবাই এটা জানতে পেরেছ। একজন ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থী হিসাবে, তুমি পরবর্তীকালে যখন এই পদ্ধতির প্রচার করবে, সেক্ষেত্রে তোমার জন্যে দুটো আবশ্যকতা আছে:

প্রথম আবশ্যকতা হচ্ছে তুমি কোনো পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবে না। আমরা যে এত কিছু জিনিস তোমাকে প্রদান করেছি, সেসব ধন উপার্জন করা বা খ্যাতি অর্জন করার জন্যে নয়, বরঞ্চ তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে এবং তোমার সাধনা করার জন্যে। যদি তুমি পারিশ্রমিক আদায় কর, তাহলে তোমাকে প্রদান করা সমস্ত জিনিস, আমার ফা-শরীর ফিরিয়ে নেবে, তুমি তখন আর আমাদের ফালুন দাফা-র লোক নও, তুমি যা প্রচার করবে সেটাও ফালুন দাফা নয়। তোমরা যখন এর প্রচার করবে তখন খ্যাতি এবং ব্যক্তিগত লাভের পিছনে ছুটবে না, তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অন্যদের সাহায্য করা উচিত। আমাদের সারা দেশের সমস্ত শিক্ষার্থীরা এইভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশিক্ষকরা এইভাবে নিজেদের কর্তব্য সাধনের মাধ্যমে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তোমরা যে কেউ যদি আমাদের সাধনা পদ্ধতি শিখতে চাও, তাহলে শিখতে আসতে পার এবং যতক্ষণ চাও শিখতে পার। আমরা তোমার প্রতি দায়িত্বশীল থাকব, কোনো মূল্যও ধার্য করব না।

দ্বিতীয় আবশ্যকতা হচ্ছে কোনো ব্যক্তিগত জিনিস দাফা-র মধ্যে যুক্ত করবে না। অর্থাৎ, এই পদ্ধতির প্রচারের পর্বে যদি তোমার দিব্যচক্ষু খুলেও গিয়ে থাকে, যদি তুমি কিছু দেখেও থাক, অথবা যদি তোমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতাও বিকশিত হয়ে থাকে, সেগুলো কোনো ব্যাপারই নয়, তুমি যা কিছুই দেখে থাক না কেন সেসব দিয়ে তুমি আমাদের ফালুন দাফা-র ব্যাখ্যা করবে না। তুমি তোমার স্তর অনুযায়ী যেটুকু দেখেছ সেটা কিছুই নয়, এবং যে ফা আমরা শিখিয়ে থাকি, তার প্রকৃত অর্থ থেকে সেটা অনেক দূরে। সুতরাং তুমি যখন পরবর্তীকালে এই পদ্ধতির প্রচার

করবে, তখন অবশ্যই এই বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, একমাত্র এইভাবেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের ফালুন দাফা-র মূল জিনিসগুলো অপরিবর্তনীয় থাকবে।

এছাড়া আমি যে উপায়ে এই সাধনা পদ্ধতি প্রচার করে থাকি তোমাকে সেইভাবে প্রচার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, আমি যেরকম বিরাট আকারে বক্তৃতার মাধ্যমে ফা প্রচার করে থাকি, তোমাকে সেই উপায় অবলম্বন করে প্রচার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না, তুমি ফা শেখাতেই পারবে না। এর কারণ আমি যা শেখাই তার অর্থ খুবই গভীর এবং সুদূরপ্রসারী, উচ্চস্তরের জিনিসগুলি একত্রিত করে আমি শিক্ষা প্রদান করে থাকি। তোমরা বিভিন্ন স্তরে সাধনা করছ, পরবর্তীকালে তোমার উন্নতি হওয়ার পরে, তুমি যখন আবার এই রেকর্ডিং শুনবে তখনও তোমার নিরন্তর উন্নতি হতে থাকবে, তুমি সর্বদা এটা শুনতে থাকলে তোমার সবসময়েই নতুন নতুন উপলব্ধি হবে, তুমি নতুন নতুন উপকার প্রাপ্ত হবে, এটা এমনকী আরও বেশী হবে বই পড়ার ক্ষেত্রে। আমার বক্তৃতাগুলির মধ্যে খুব উচ্চস্তরের অতি গভীর জিনিসগুলি সম্মিলিত করা আছে, সেইজন্যে তুমি এই ফা শেখাতেই পারবে না। আমার মূল কথাগুলিকে তোমার কথা হিসাবে বলার অনুমতি তোমাকে দেওয়া যাবে না, অন্যথা সেটা হবে ফা চুরি করার মতো কাজ। তুমি শুধু আমার মূল কথাগুলি বলার সময়ে, এটা যোগ করে দেবে যে, ‘‘মাস্টার এইভাবে বলেছেন’’ অথবা ‘‘বইতে এইভাবে লেখা আছে।’’ একমাত্র এইভাবেই তুমি বলবে। কেন এইরকম? কারণ তুমি এইভাবে বললে সেটা দাফা-র শক্তি বহন করবে। তুমি তোমার নিজের উপলব্ধিকে ফালুন দাফা-র জিনিস হিসাবে প্রচার করবে না, অন্যথা তুমি যেটা প্রচার করবে সেটা ফালুন দাফা নয়, সেটা আমাদের ফালুন দাফা-র ক্ষতি করার সমান। তুমি যদি তোমার ধারণা অনুযায়ী অথবা তোমার চিন্তা অনুযায়ী কোনো কিছু বলো, সেটা ফা নয় এবং সেটা লোকেদের উদ্ধার করতে পারবে না, সেটা কোনো প্রভাবও ফেলবে না, সেইজন্যে অন্য কেউ এই ফা শেখাতে পারবে না।

এই সাধনা পদ্ধতি প্রচারের জন্যে, তোমরা শারীরিক ক্রিয়া করার জায়গায় অথবা প্রশিক্ষণের জায়গায় শিক্ষার্থীদের জন্যে অডিও টেপ অথবা ভিডিও টেপ চালাবে, এবং তারপরে প্রশিক্ষক তাদের শারীরিক ক্রিয়াগুলি শেখাবে। তোমরা আলোচনা সভার আকারেও প্রচার করতে পার যেখানে প্রত্যেকে নিজের নিজের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে, আলোচনার

মাধ্যমে, বিশেষভাবে ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে পারবে, আমরা চাই, তোমরা এইভাবেই প্রচার কর। একই সাথে যে শিক্ষার্থী (শিষ্য) ফালুন দাফা-র প্রচার করছে তাকে ''শিক্ষক'' অথবা ''মাস্টার'' অথবা অন্য কিছু বলে সম্বোধন করা উচিত নয়, কারণ দাফা-য় শুধু একজনই মাস্টার আছেন। কে কত আগে অনুশীলন শুরু করেছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, প্রত্যেকেই শিষ্য।

তোমরা যখন ফালুন দাফা-র প্রচার করছ তখন তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ভাবছ: ''মাস্টার ফালুন স্থাপন করতে পারেন, এবং লোকেদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করতে পারেন, কিন্তু আমরা সেটা করতে পারব না।'' এটা কোনো ব্যাপার নয়, ইতিপূর্বে আমি তোমাদের বলেছি যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পিছনে আমার ফা-শরীর রয়েছে, এবং শুধু একটা মাত্র নয়, অতএব আমার ফা-শরীর ওইসব কাজগুলি করবে। তুমি যখন কাউকে শেখাবে, সেক্ষেত্রে যদি তার পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক থাকে, তাহলে সে তখনই এই ফালুন প্রাপ্ত হবে। যদি তার পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সাধনা করতে করতে, শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা হয়ে গেলে, সেও ধীরে ধীরে ফালুন প্রাপ্ত হবে, আমার ফা-শরীর তার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করতে সাহায্য করবে। এছাড়া অন্য আরও উপায় আছে, আমি সেগুলো বলব, যারা আমার বই পড়ে, ভিডিও দেখে, অডিয়ো টেপ শুনে ফা শিখছে এবং শারীরিক ক্রিয়া শিখছে, যদি তারা সত্যিই নিজেদের অনুশীলনকারী মনে করে তাহলে তারাও একইভাবে সমস্ত জিনিস পাবে যা তাদের পাওয়া উচিত।

আমরা শিক্ষার্থীদের অন্য লোকেদের রোগ নিরাময় করার অনুমতি দিই না, কারণ ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অন্য লোকেদের রোগ নিরাময় করা পুরোপুরি নিষেধ। আমরা তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি যাতে তোমরা সাধনা করে উপরে উঠতে পার, আমরা চাই না যে তোমার মধ্যে কোনো আসক্তি জেগে উঠুক, আমরা এটাও চাই না যে তুমি তোমার নিজের শরীরের ক্ষতি কর। আমাদের শারীরিক ক্রিয়া করার জায়গা অন্য চিগোংগ পদ্ধতির শারীরিক ক্রিয়া করার জায়গার তুলনায় ভালো। আমাদের এই জায়গায় তুমি শুধু ক্রিয়া করলেও সেটা তোমার নিজের রোগের চিকিৎসা করানোর থেকে যথেষ্ট ভালো। আমার ফা-শরীরগুলো একটা বৃত্তের আকারে বসে থাকে, ক্রিয়া করার জায়গার উপরে একটা আচ্ছাদন থাকে যার উপরে একটা বিশাল ফালুন থাকে এবং একটা বিরাট ফা-শরীর

আচ্ছাদনের উপর থেকে জায়গাটা পাহারা দেয়। এটা একটা সাধারণ জায়গা নয়, এটা কোনো সাধারণ চিগোংগ পদ্ধতির অনুশীলনের জায়গার মতো নয়, এটা সাধনা করার জায়গা। আমাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন অনুশীলনকারী দেখেছেন যে ফালুন দাফা-র ক্ষেত্রের উপরে একটা লাল আলোর আচ্ছাদন রয়েছে, যেটা পুরোটাই লাল।

আমার ফা-শরীর সরাসরি ফালুন স্থাপন করতে পারে, কিন্তু আমরা তোমার আসক্তিকে প্ররোচিত করতে চাই না। তুমি যখন কাউকে ক্রিয়া শেখাচ্ছ, সে হয়তো বলবে: ‘‘বাঃ, আমি ফালুন পেয়েছি।’’ তুমি ভাববে তুমি এটা স্থাপন করেছ, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি তোমাদের এটা বলছি যাতে এটা তোমাদের আসক্তিকে প্ররোচিত না করে, এসব জিনিস আমার ফা-শরীরই করে থাকে। আমাদের ফালুন দাফা-র শিষ্যদের এইভাবেই এই পদ্ধতির প্রচার করা উচিত।

যদি কেউ ফালুন দাফা-র শারীরিক ক্রিয়াগুলির বিকৃতি ঘটায়, তাহলে সে ফালুন দাফা-র ক্ষতি করছে এবং এই সাধনা পদ্ধতির ক্ষতি করছে। কিছু লোক আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার নির্দেশাবলি দিয়ে কবিতা রচনা করেছে, এটা একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়। একটা প্রকৃত সাধনা পদ্ধতি সবসময়েই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, সেই সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে, এই পদ্ধতিতে অসংখ্য মহান আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কেউই এই জিনিসের সামান্য অংশও পাল্টাতে সাহস করে না, এই ধরনের জিনিস শুধুমাত্র, আমাদের এই ধর্মের বিনাশ কালেই সংঘটিত হচ্ছে। পুরো ইতিহাসকালে এইরকম ব্যাপার কখনোই ঘটেনি, তোমরা অবশ্যই এই বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

বক্তৃতা - চার

ত্যাগ ও প্রাপ্তি

ত্যাগ এবং প্রাপ্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তার উপরে সাধক সমুদায় প্রায়ই আলোচনা করে থাকে, সাধারণ লোকজনেরাও এই আলোচনা করে থাকে। আমরা অনুশীলনকারীরা এই ত্যাগ এবং প্রাপ্তির ব্যাপারটা কীভাবে দেখব? সেটা সাধারণ লোকেদের থেকে আলাদা হবে। সাধারণ লোকেরা চায় নিজেদের লাভ, তারা চিন্তা করে কীভাবে ভালোভাবে এবং আরামে থাকা যায়। আমাদের অনুশীলনকারীরা কিন্তু এরকম নয়, একেবারে এর বিপরীত, সাধারণ লোকজনেরা যেসব জিনিস পায়, আমরা তার পিছনে ছুটতে চাই না। পরিবর্তে আমরা যা পেয়ে থাকি সেগুলো সাধারণ লোকেরা এমনকী চাইলেও পাবে না------যদি সাধনা না করে।

আমরা সাধারণত যে ত্যাগের কথা বলি সেটা খুব ক্ষুদ্র ত্যাগের ক্ষেত্রের মধ্যে সীমিত নয়। কেউ ত্যাগের কথা বললে, লোকেরা যেটা বিবেচনা করে সেটা হয়তো কাউকে কিছু টাকা দান করা, যে লোক সমস্যার মধ্যে আছে তাকে সাহায্যের হাত বাড়ানো, বা রাস্তার ভিখারিকে কিছু দেওয়া। এগুলোও এক ধরনের দান এবং এক ধরনের ত্যাগ। তবে এখানে কেবল একটা বিষয়ে, অর্থাৎ টাকা-পয়সা এবং বস্তুগত জিনিসের ব্যাপারে কিছুটা নিস্পৃহ থাকার ব্যাপারেই বলা হয়েছে। ধন দান করা অবশ্যই এক ধরনের ত্যাগ এবং একটা বেশ বড়ো দিক। কিন্তু আমরা যে ত্যাগের কথা বলব সেটা শুধু এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে সীমিত নয়। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে সাধনা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে অনেক আসক্তি ত্যাগ করতে হবে যেমন, দেখানোর ইচ্ছা, ঈর্ষা, প্রতিযোগিতার মানসিকতা এবং অতি উৎসাহ, এইরকম নানান ধরনের প্রচুর আসক্তি আছে, সবই দূর করতে হবে। কারণ আমরা যে ত্যাগের চর্চা করি তা অনেক বিস্তৃত ব্যাপার, পুরো সাধনার পর্বে সাধারণ মানুষের সব রকমের আসক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের পরিত্যাগ করা উচিত।

কেউ কেউ এটা ভাবতে পারে যে: ‘‘আমরা সাধনা করছি সাধারণ মানুষের মধ্যে, যদি সবকিছু আমরা ত্যাগ করি তাহলে আমরা কি বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের মতো হয়ে গেলাম না? সবকিছু ত্যাগ করা একরকম অসম্ভব মনে হয়।’’ আমাদের এই পদ্ধতিতে যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধনা করবে, তাদের যেহেতু এই সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হবে, সেইজন্যে তারা যতটা সম্ভব সাধারণ মানুষের মতনই থাকবে। তোমাকে সত্যি সত্যি কোনো জিনিস বস্তুগতভাবে ত্যাগ করতে হবে না। এটা কোনো ব্যাপার নয় যে, তোমার পদ কত উঁচুতে অথবা তোমার কত সম্পত্তি আছে। প্রধান বিচার্য বিষয় হচ্ছে, তুমি ওই আসক্তিগুলোকে ছাড়তে পারছ কি পারছ না।

আমাদের এই সাধনা সোজাসুজি মানব মনকে নিশানা করেই করা হয়। প্রধান ব্যাপার হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ ও পারস্পরিক মতভেদের মতো বিষয়গুলোকে নিস্পৃহভাবে এবং হাল্কা ভাবে দেখতে পারছ কি না। মঠে অথবা সুদূর পর্বতে ও জঙ্গলের মধ্যে যে সাধনা, সেটা তোমার সঙ্গে সাধারণ মানবসমাজের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তোমাকে সাধারণ মানুষের আসক্তিগুলো জোর করে ছাড়তে বাধ্য করে, এবং তোমাকে বস্তুগত লাভ থেকে বঞ্চিত করে, এইভাবে তোমার ত্যাগ করা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা কোনো সাধক এই পথ গ্রহণ করে না, সাধারণ মানুষের এই জীবনযাত্রার মধ্যে তার দিক থেকে সবকিছুকে নিস্পৃহভাবে দেখা আবশ্যক, অবশ্য এটা খুবই কঠিন এবং এটা আমাদের সাধনা পদ্ধতির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেজন্যে আমরা যে ত্যাগের কথা বলি, সেটা একটা বৃহত্তর ত্যাগ, কোনো সংকীর্ণ ব্যাপার নয়। এবার আমরা ভালো কাজ করার এবং ধন-সম্পত্তি দান করার ব্যাপারে বলব। আজকাল কিছু ভিখারিকে রাস্তায় দেখবে যারা পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি করে, এমনকী তাদের কাছে তোমার থেকে বেশী টাকা থাকতে পারে। ছোট-খাট ব্যাপার ছেড়ে আমাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধনা করতে হলে, আমাদের খোলা মনে এবং মর্যাদার সাথে বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে সাধনা করা উচিত। আমাদের এই ত্যাগের প্রক্রিয়ায় সত্যিকারের খারাপ জিনিসই আমরা ত্যাগ করি।

লোকেরা সচরাচর বিশ্বাস করে যে কোনো বস্তুর জন্যে প্রয়াস করা ভালো ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে উঁচু স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেটা সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিজের নিজের ছোট ছোট ব্যক্তিগত স্বার্থের

তুষ্টিসাধন মাত্র। ধর্মগুলি বলেছে: তোমার যত ধনই থাকুক, এবং তুমি যত উঁচু পদেই আসীন হও না কেন, সেটা শুধুমাত্র কয়েকটা দশকের জন্যে। কেউ সেটাকে জন্মের সময় সঙ্গে আনতে পারে না, আবার মৃত্যুর সময়ে সঙ্গে নিয়েও যেতে পারে না। গোংগ এত মূল্যবান কেন? সঠিক কারণ হচ্ছে, এটা তোমার মূল আত্মার শরীরের ঠিক উপরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর এটা জন্মের সময়ে সঙ্গে আসে এবং মৃত্যুর সময়ে সঙ্গে যায়। এর উপরে এটা সরাসরি তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান নির্ধারণ করে, সেইজন্যে এর সাধনা এত কঠিন। অন্যভাবে বলা যায় যে, যা তুমি ত্যাগ করছ সেগুলো খারাপ জিনিস, এইভাবে তুমি তোমার মূলে এবং সত্যে ফিরতে পারবে। তাহলে তুমি কী পাবে? তোমার স্তরের উন্নতি হবে, শেষে সঠিক ফল প্রাপ্ত হবে এবং সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে মূল সমস্যার সমাধান হবে। অবশ্য আমরা যদি সাধারণ মানুষের নানান ধরনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে একজন সত্যিকারের সাধকের মানে পৌঁছাতে চাই এবং আমরা যদি এটা এক্ষুনি অর্জন করতে চাই তাহলে সেটা সহজ ব্যাপার নয়, এটা ধীরে ধীরে করা উচিত। তুমি শুনলে আমি বলেছি, ‘‘ধীরে ধীরে করা উচিত’’ এবং তুমি বলবে, ‘‘মাস্টার বলেছেন ধীরে ধীরে করা উচিত, অতএব আমিও ধীরে ধীরে করব।’’ সেটা ঠিক হবে না! তোমাকে নিজের প্রতি কঠোর হতে হবে, যদিও আমরা ধীরে ধীরে তোমার উন্নতি ঘটাব। যদি তুমি আজকে এক্ষুনি এটা করতে পারতে, তাহলে আজই তুমি বুদ্ধ হয়ে যেতে, এটা অবাস্তব, তুমি ধীরে ধীরে এটা প্রাপ্ত হবে।

আমরা যা ত্যাগ করি সেটা প্রকৃতপক্ষে খারাপ জিনিস। সেটা কী? সেটাই হচ্ছে কর্ম এবং সেটাই মানুষের বিভিন্ন ধরনের আসক্তির সাথে সাথে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সাধারণ মানুষের অনেক ধরনের খারাপ চিন্তা আছে, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে অনেক ধরনের খারাপ কাজ করে এবং এক রকমের কালো বস্তু------কর্ম প্রাপ্ত হয়। এটার সঙ্গে আমাদের নিজেদের মনের সরাসরি সম্পর্ক আছে, এই খারাপ বস্তুকে দূর করতে হলে প্রথমে আমাদের মনকে পাল্টাতে হবে।

কর্মের রূপান্তর

সাদা বস্তু এবং কালো বস্তুর মধ্যে রূপান্তরের একটা প্রক্রিয়া আছে। লোকেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজনের মতভেদ ঘটলে, এই

রূপান্তর প্রক্রিয়া কাজ করে। যখন কেউ ভালো কাজ করে তখন সে পায় সাদা বস্তু-----সদ্‌গুণ। যখন কেউ খারাপ কাজ করে তখন সে পায় কালো বস্তু-----কর্ম। এর মধ্যে একটা বংশানুক্রমিক হস্তান্তর প্রক্রিয়াও কাজ করে, কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, ‘‘এটা কি জীবনের প্রথমদিকে খারাপ কাজ করার জন্যে হয়?’’ এটা হয়তো সবসময়ে ঠিক নয়, কারণ কর্ম কেবলমাত্র একটা জন্ম থেকেই সঞ্চিত হয় না। সাধক সমুদায় বিশ্বাস করে যে মূল আত্মার বিনাশ হয় না। যদি মূল আত্মার বিনাশ না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এই জীবনের পূর্বেও সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেছিল, অতএব সে হয়তো কোনো কিছুর জন্যে কারোর কাছে ঋণী ছিল, কারোর থেকে সুবিধা আদায় করেছিল, অথবা অন্য কোনো খারাপ কাজ করেছিল, যেমন কাউকে হত্যা করেছিল ইত্যাদি, এইভাবে কর্ম উৎপন্ন হয়েছিল। এগুলো অন্য মাত্রায় সঞ্চিত হতে থাকে, সে সবসময়ে এই কর্মকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়, একই কথা প্রযোজ্য সাদা বস্তুর ক্ষেত্রেও, তবে এটাই একমাত্র উৎসস্থল নয়। আরও একধরনের পরিস্থিতি আছে, এটা পরিবারের মধ্যে, পূর্বপুরুষদের থেকে পুরুষানুক্রমে এসে সঞ্চিত হতে পারে। অতীতে বয়স্ক লোকেরা বলতেন: ‘‘সদ্‌গুণ সঞ্চয় কর, সদ্‌গুণ সঞ্চয় কর’’ এবং ‘‘তোমার পূর্বপুরুষরা সদ্‌গুণ সঞ্চয় করে গেছেন;’’ ‘‘এই ব্যক্তি সদ্‌গুণ খুইয়ে ফেলছে, সদ্‌গুণ শেষ করে ফেলছে।’’ তাদের বলা কথাগুলি একেবারে সঠিক। এখনকার সাধারণ লোকেরা এইসব কথা কানে শুনতেই চায় না। যদি তুমি অল্পবয়সি লোকেদের সদ্‌গুণ-এর অভাব অথবা সদ্‌গুণ-এর ঘাটতির কথা বলো, তারা সেটা একেবারেই মনের মধ্যে গ্রহণ করবে না। প্রকৃতপক্ষে এই কথাটার অর্থ সত্যিই খুব গভীর, এটা ইদানীং কালের মানুষদের চিন্তার এবং মানসিকতার ক্ষেত্রে শুধু একটা আদর্শ মাত্র নয়, এটা সত্যিই বস্তুগত ভাবে বিদ্যমান। আমাদের মানব শরীরে এই দুরকম বস্তুরই অস্তিত্ব আছে।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে: ‘‘এটা কি সত্যি যে কোনো ব্যক্তির কাছে বেশী কালো বস্তু থাকলে সে উঁচুস্তরে সাধনা করতে পারবে না?’’ তুমি এটা বলতে পার। কালো বস্তু কারোর বেশী থাকলে, সেটা তার আলোকপ্রাপ্তির গুণকে প্রভাবিত করে। কারণ এটা শরীরের চারিদিকে একধরনের ক্ষেত্র তৈরি করে যা সেই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে এবং বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, সেইজন্যে এই ধরনের ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তির গুণ কম হতে পারে। যখন লোকেরা সাধনা এবং চিগোংগ এর ব্যাপারে আলোচনা করবে, তখন

সেই ব্যক্তি এই সবকিছুকে অন্ধবিশ্বাস বলবে, একেবারেই বিশ্বাস করবে না। তার কাছে এসব হাস্যকর মনে হবে। এটা সচরাচর এইরকমই হয় তবে সুনিশ্চিত নয়। তবে কি সেই ব্যক্তির পক্ষে সাধনা করা খুবই কঠিন, সে কি উঁচুস্তরের গোংগ পাবেই না? এটা ঠিক নয়, আমরা বলেছি যে দাফা সীমাহীন এবং এই সাধনা পুরোপুরি নিজের মনের উপরে নির্ভর করে। মাস্টার তোমাকে প্রবেশ দ্বার দিয়ে পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবেন, কিন্তু সাধনা করা তোমার ব্যাপার, তুমি কীভাবে সাধনা করবে সেটা পুরোপুরি তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে। তুমি সাধনা করতে পারবে কি পারবে না সেটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তুমি নিজে সহনশীল হতে পারছ কি না, ত্যাগ করতে পারছ কি না এবং কষ্ট সহ্য করতে পারছ কি না, এই সবের উপরে। তুমি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, তাহলে কোনো অসুবিধাই তোমাকে বাধা দিতে পারবে না, তাহলে আমি বলব যে এটা কোনো সমস্যাই নয়।

যে ব্যক্তির কালো বস্তু বেশী আছে তাকে সাধারণত যে ব্যক্তির সাদা বস্তু বেশী আছে, তার তুলনায় বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যেহেতু সাদা বস্তু বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে সরাসরি সম্মিলিত হয়ে আছে, সেইজন্যে যতক্ষণ একজন ব্যক্তি কোনো মতবিরোধের মধ্যে নিজের চরিত্রের উন্নতিসাধন করতে পারবে ততক্ষণ তার গোংগ-এরও বৃদ্ধি ঘটবে, এটা এইরকমই একটা সরল ব্যাপার। যে ব্যক্তির সদ্‌গুণ বেশী থাকে তার আলোকপ্রাপ্তির গুণ উন্নত হয়, সে কষ্ট সহ্য করতে পারে----- সে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবেও কষ্ট সহ্য করতে পারে। এমনকী এই ব্যক্তিকে যদি শারীরিক যন্ত্রণা বেশী এবং মানসিক যন্ত্রণা কম সহ্য করতে হয় তাহলেও তার গোংগ বাড়তে থাকে। কিন্তু যার কালো বস্তু বেশী আছে তার ক্ষেত্রে এইরকম হবে না। তাকে প্রথমে অবশ্যই এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে: প্রথমে তার কালো বস্তুকে অবশ্যই সাদা বস্তুতে রূপান্তরিত করতে হবে, অর্থাৎ এইরকম একটা প্রক্রিয়া, যা ভীষণই যন্ত্রণাদায়ক। সেইজন্যে কম আলোকপ্রাপ্তির গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে সাধারণত অনেক বেশী দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। যে ব্যক্তির কর্ম বেশী এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণ কম তার পক্ষে সাধনা করা আরও কঠিন।

একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাক, দেখো একজন ব্যক্তি কীভাবে সাধনা করছে। বসে ধ্যান মুদ্রা করার সময়ে দুটো পায়েরই একটা পা আর একটা পা-এর উপরে আড়াআড়ি ভাবে লম্বা সময় পর্যন্ত রাখতে হয়।

এইভাবে পা দুটো রাখার ফলে পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, পা ঝিন-ঝিন করতে থাকে। এইভাবে সময় পেরোতে থাকলে, প্রথমে তার অস্বস্তি হতে থাকে, পরে সে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের ফলে তার শরীরে ও মনে খুবই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হতে থাকে। কিছু লোক পা দুটোকে আড়াআড়ি ভাবে রেখে বসার পরে ব্যথা হলে ভয় পেয়ে যায়, পা দুটোকে নীচে নামিয়ে দেয়, আর করতে চায় না। কিছুলোক এইভাবে একটু বেশীক্ষণ বসলে আর সহ্য করতে পারে না। পা দুটো নামিয়ে দেয়, অনুশীলন ব্যর্থ হয়। কিছু লোক আড়াআড়ি ভাবে পা রেখে বসার ফলে পায়ে ব্যথা হলেই, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে আবার ধ্যান মুদ্রায় বসে। আমরা দেখেছি এতে কোনো কাজ হয় না। কারণ, আমরা দেখেছি পায়ে ব্যথা হওয়ার সময়ে কালো পদার্থ পায়ের মধ্যে নেমে আসে। এই কালো পদার্থই হচ্ছে কর্ম, কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে এই কর্ম দূর হয় এবং সদ্‌গুণ-এ রূপান্তরিত হয়। যখনই ব্যথা হয়, তখনই কর্মের দূর হওয়া শুরু হয়, যত বেশী কর্ম নামতে থাকে, পায়ে তত বেশী ব্যথা হতে থাকে, সুতরাং কোনো কারণ ছাড়া পায়ে ব্যথা হয় না। বসে ধ্যান মুদ্রা করার সময়ে পায়ের ব্যথাটা সাধারণত কিছুক্ষণ পরে পরেই হতে থাকে, ব্যথাটা কিছুক্ষণ থাকে এবং ভীষণ অসহ্য হয়ে ওঠে, এরপরে ব্যথাটা কমে গিয়ে একটু আরাম বোধ হয়, শীঘ্রই আবার ব্যথাটা শুরু হয়ে যায়, সাধারণত এইভাবেই ব্যাপারটা ঘটতে থাকে।

যেহেতু কর্ম টুকরো টুকরো হিসাবে দূর হয়, একটা টুকরো দূর হলে তখন পায়ে একটু আরাম বোধ হয়, শীঘ্রই আর একটা টুকরো এসে যায় তখন পায়ে আবার ব্যথা শুরু হয়ে যায়। কালো পদার্থ দূর হওয়ার পরে ছড়িয়ে পড়ে না, কারণ এই পদার্থটার বিনাশ হয় না, কালো পদার্থ দূর হওয়ার পরে, সরাসরি সাদা পদার্থে রূপান্তরিত হয় যেটা হচ্ছে সদ্‌গুণ। কেন এটার এইভাবে রূপান্তর হয়? কারণ সে কষ্ট সহ্য করেছে, সে নিজে ত্যাগ করেছে এবং যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আমরা বলেছি যে একজন ব্যক্তিকে সদ্‌গুণ পেতে হলে তাকে নিজেকেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, কষ্ট সহ্য করতে হবে এবং ভালো কাজ করতে হবে, অতএব বসে ধ্যান মুদ্রা করার সময়ে এইরকম সমস্যার উদয় হবে। কিছু লোকের পায়ে যেই ব্যথা শুরু হয় তারা তক্ষুনি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, এবং একটু হাঁটাচলা করে আবার ধ্যান-মুদ্রায় বসে, এতে একেবারেই কোনো কাজ হয় না। কেউ কেউ দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়াতে, বাহু দুটো উঁচুতে ধরে রাখার সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং বাহু দুটো নামিয়ে রাখে,

এক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয় না। ওইটুকু কষ্টকে কী হিসাবে ধরা হবে? যদি কেউ বাহু দুটো ওই ভাবে ধারণ করে সাধনায় সাফল্য লাভ করে, তাহলে আমি বলব এটা সত্যিই খুব সহজ হয়ে গেল। সেইজন্যে সাধনায় বসে ধ্যান করার সময়ে এইরকম পরিস্থিতির উদয় হয়।

আমাদের সাধনা পদ্ধতি প্রধানত এই পথ ধরে এগোয় না, কিন্তু এর একটা বিশেষ ভূমিকা তবুও থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজনের সঙ্গে আর একজনের চরিত্রগত মতবিরোধের মধ্যেই আমরা কর্মের রূপান্তর করে থাকি, এটা সচরাচর এইভাবেই প্রকটিত হয়। লোকেদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হলে পরস্পরের মধ্যে যে মতবিরোধ ফুটে ওঠে তা শারীরিক কষ্টকে ছাপিয়ে যায়। আমি বলব শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করা সবচেয়ে সহজ, দাঁতে দাঁত চেপে এটাকে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যখন একজন আর একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে, সেইসময়ে মনকে সংযত রাখাই সবথেকে কঠিন কাজ।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি তার কর্মস্থলে গিয়ে শুনতে পেল যে দুজন লোক তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে, এবং তারা যা বলেছিল সেটা খুবই জঘন্য, সে রাগে ফুঁসতে লাগল। কিন্তু আমরা বলেছি যে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমাকে কেউ আঘাত করলে তুমি প্রত্যাঘাত করবে না, অপমান করলেও তার প্রতিক্রিয়া জানাবে না, নিজের উপরে উঁচু আদর্শ আরোপ করা উচিত। সে চিন্তা করে: ‘‘মাস্টার বলেছেন যে আমরা অনুশীলনকারীরা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা এবং আমাদের ব্যবহার অনেক উদার হওয়া উচিত।’’ সে ওই দুজন লোকের সঙ্গে ঝগড়া করল না। কিন্তু সাধারণত যখন কোনো সমস্যা আসে, সেটা যদি সেই ব্যক্তিকে মানসিকভাবে প্ররোচিত না করে, তাহলে সেটা হিসাবের মধ্যে আসবে না, এবং কাজেও লাগবে না, আর সেই ব্যক্তিরও কোনো উন্নতি হবে না। এইভাবে সে মন থেকে এটা দূর করতে পারে না এবং বিরক্তি নিয়ে থাকে, মনের মধ্যে ব্যাপারটা গেঁথে থাকে, সে সবসময় ঘাড় ঘুরিয়ে সেই দৃশ্যটা দেখতে চাইত যেখানে ওই দুটো লোক তার সম্বন্ধে খারাপ কথা বলছে। সে পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে ওই দুটো লোককে দেখতে পায়, যাদের চেহারায় ভীষণ দুষ্টভাব ফুটে উঠছিল, তারা উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছিল, তৎক্ষণাৎ সে এটা সহ্য করতে পারে না, ক্রোধে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হয়তো তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেয়। যখন একজনের সঙ্গে আর একজনের মতভেদ ঘটে তখন

নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে কঠিন। আমি বলব যে, এটা আরও সহজ হয় যদি ধ্যানে বসে সবকিছুর সমাধান করা যায়, তবে সবসময়ে এইভাবে হবে না।

অতএব ভবিষ্যতে সাধনার সময়ে তোমাকে বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। এই দুর্ভোগগুলো ছাড়া কীভাবে তুমি সাধনা করবে? যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, যদি কোনোরকম স্বার্থের মতভেদ এবং মানসিক বাধা না থাকে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধ্যান মুদ্রায় বসে চরিত্রের উন্নতি কীভাবে হবে? এটা হওয়া অসম্ভব। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বাস্তব জীবনের পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে সত্যি সত্যি দৃঢ় করতে হবে, একমাত্র তাহলেই তার উন্নতি ঘটবে। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘সাধনার সময়ে আমাদের সর্বদা এত দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় কেন? এবং এই দুর্ভোগগুলি অনেকটাই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের মতন।’’ কারণ তুমি সাধনা করছ সাধারণ মানুষদের মধ্যে, তোমাকে হঠাৎ উল্টে দিয়ে মাথাটা নীচের দিকে করে হাওয়ার ভাসিয়ে রেখে, তারপরে ঝোলানো অবস্থায় কষ্ট দেওয়া, এইরকম কখনোই হবে না। সবকিছুই সাধারণ মানুষের অবস্থা অনুযায়ী ঘটবে, কেউ আজকে তোমাকে বিরক্ত করল, কেউ তোমাকে ক্রোধান্বিত করল, কেউ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করল, অথবা কেউ হঠাৎ তোমার সঙ্গে অসম্মান করে কথা বলল, এই সমস্যাগুলোকে তুমি কীভাবে সামলাচ্ছ, এটাই দেখা হবে।

কেন এইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়? তোমার নিজের কর্মের ঋণের থেকেই এসবের উৎপত্তি। আমরা ইতিমধ্যে কর্মের অসংখ্য অংশ দূর করে দিয়েছি, একটা ছোট অংশ মাত্র পড়ে আছে, যেটাকে ভাগ করে দুর্ভোগ হিসাবে বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করা হবে, তোমার চরিত্রের উন্নতিসাধন করার জন্যে। এই দুর্ভোগগুলো তোমার মনকে দৃঢ় করবে এবং নানান ধরনের আসক্তি দূর করবে। এসব তোমার নিজেরই দুর্ভোগ যা আমরা তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্যে ব্যবহার করব এবং তুমি সবই অতিক্রম করতে পারবে। যতক্ষণ তুমি চরিত্রের উন্নতি করতে থাকবে, ততক্ষণ তুমি সেগুলোকে অতিক্রম করতে পারবে, ভয় এটাই যে তুমি নিজেই হয়তো সেগুলোকে অতিক্রম করতে চাও না, যদি দুর্ভোগগুলোকে পার করতে চাও, তাহলে তুমি পার করতে পারবে। অতএব এর পরে যখনই তুমি কোনো মতভেদের সম্মুখীন হবে, কখনোই মনে করবে না যে এটা ঘটনাচক্রে ঘটছে। কারণ যখন কোনো মতভেদ সৃষ্টি হবে, সেটা হঠাৎ

করেই আবির্ভূত হবে, কিন্তু সেটা ঘটনাচক্রে ঘটবে না, সেটা তোমার চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্যে ঘটবে। যতক্ষণ তুমি নিজেকে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে গণ্য করতে পারবে, ততক্ষণ তুমি এটাকে সঠিকভাবে সামলাতে পারবে।

অবশ্য কোনো দুর্ভোগ, বা মতভেদের ব্যাপারে তোমাকে আগে থেকে জানানো হবে না। তোমাকে সব জানানো হলে তুমি সাধনা কীভাবে করবে? সেটা ফলপ্রসু হবে না। এগুলি সাধারণত হঠাৎ করেই আসবে, কারণ, একমাত্র এইভাবেই একজন ব্যক্তির চরিত্রকে পরীক্ষা করা যাবে, এবং একমাত্র এইভাবেই তার চরিত্রের সত্যিকারের উন্নতি ঘটানো যাবে, দেখা হবে যে সে তার চরিত্রকে বজায় রাখতে পারছে কি পারছে না, এটা একমাত্র এইভাবেই দেখা যাবে, সুতরাং কোনো মতভেদ যখনই ঘটছে সেটা কখনোই ঘটনাচক্রে ঘটছে না। অতএব সাধনার পুরো পর্বে, যখনই কর্মের রূপান্তর ঘটবে তখনই এইরকম সমস্যার উদয় হবে। সাধারণ মানুষের কল্পিত শারীরিক কষ্টের তুলনায় এটা অনেক বেশী কঠিন। যখন তুমি শারীরিক ক্রিয়া করছ এবং কিছু বেশী সময় অনুশীলন করছ, অর্থাৎ বাহু দুটোকে উঁচুতে ধরে রাখতে রাখতে ব্যথায় টনটন করতে থাকে অথবা পা দুটো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে কি তোমার গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটছে? তুমি কিছু ঘন্টা বেশী সময় শারীরিক ক্রিয়া করলে তোমার গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটবে কি? এটা কেবলমাত্র মূল শরীরের রূপান্তর করতে থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে শক্তি দ্বারা দৃঢ় করা প্রয়োজন, এর দ্বারা স্তরের কোনো উন্নতি হয় না। মানসিক সংকল্পকে সুদৃঢ় করাই হচ্ছে সত্যিকারের স্তরের উন্নতির চাবিকাঠি। যদি বলো শারীরিক কষ্ট সহ্য করে উন্নতি করা যায়, আমি বলব চীনের কৃষকরা সকলের চেয়ে বেশী কষ্ট সহ্য করে, তাহলে তারা সবাই কি বড়ো বড়ো চিগোংগ মাস্টার হয়ে যাবে? তুমি যত শারীরিক কষ্টই সহ্য কর না কেন সেটা তাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তারা দিনের পর দিন ক্ষেতের মধ্যে প্রখর সূর্যের নীচে পরিশ্রম করে যায়, সেটা যেরকম কষ্টকর সেরকম ক্লান্তিকর, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। সেইজন্যেই আমি বলছি যে, তুমি যদি সত্যিই উন্নতি করতে চাও, তাহলে তুমি অবশ্যই তোমার মনের সত্যিকারের উন্নতি ঘটাবে, একমাত্র তাহলেই প্রকৃত উন্নতি করতে পারবে।

কর্মের রূপান্তর প্রক্রিয়ার সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সাধারণ লোকেদের মতো কোনো কিছুতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে হবে না,

সেইজন্যে সাধারণভাবে আমাদের সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় এবং শান্ত মানসিক অবস্থা বজায় রাখতে হবে। হঠাৎ কোনো সমস্যা সামনে এলে, তখন তুমি ঠিকমতো সেটাকে সামলাতে পারবে। তুমি যদি সর্বদা এইরকম শান্তিপূর্ণ এবং সহানুভূতিশীল মন বজায় রাখতে পার, অকস্মাৎ কোনো সমস্যার উদয় হওয়ার সময়ে, সংঘাত প্রশমনের জন্যে এবং চিন্তা করার জন্যে সময় বা জায়গা থাকবে। তোমার মন যদি সর্বদা অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা, এবং এটা বা সেটার জন্যে লড়াই করার কথা চিন্তা করে, তাহলে আমি বলব যে তুমি সমস্যার সম্মুখীন হলেই লড়াই শুরু করে দেবে, এটা একরকম নিশ্চিত। সুতরাং তুমি যদি কোনো মতভেদের সম্মুখীন হও, আমি বলব যে সেটা ঘটছে তোমার শরীরের কালো পদার্থকে সাদা পদার্থে রূপান্তর করার জন্যে অর্থাৎ সদ্‌গুণে রূপান্তর করার জন্যে।

আজ আমাদের এই মানবজাতি বিকশিত হয়ে যে সীমায় পৌঁছেছে, সেক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেকটা লোকের কাছে কর্মের উপরে কর্ম জমে আছে। প্রত্যেকের শরীরে বেশ বিরাট পরিমাণ কর্ম সঞ্চিত হয়ে আছে। সেইজন্যে সাধারণত কর্মের রূপান্তরের প্রশ্নে এইরকম পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়, যখন তোমার গোংগ বৃদ্ধি পায়, তখন সাথে সাথে তোমার চরিত্রের উন্নতি হয়, একই সাথে তোমার কর্মও দূর হয় এবং রূপান্তরিত হয়। যখন তুমি অন্য লোকের সঙ্গে সমস্যায় পড়বে, সেটা হয়তো পরস্পরের মধ্যে চরিত্রগত মতবিরোধ হিসাবে প্রকটিত হতে পারে, যদি তুমি সেটা সহ্য করতে পার, তাহলে তোমার কর্মও দূর হবে, তোমার চরিত্রেরও উন্নতি হবে, তোমার গোংগ-ও বৃদ্ধি পাবে, সবকিছু একই সাথে হবে। অতীতে লোকেদের অনেক সদ্‌গুণ থাকত, তাদের চরিত্র প্রথম থেকেই অনেক উঁচুতে থাকত, একটু কষ্ট করলেই গোংগ বেড়ে যেত। এখনকার লোকেরা সেইরকম নয়, একটু কষ্ট হলেই আর সাধনা করতে চায় না, এর উপরে উপলব্ধি করাও আরও কঠিন হয়ে যায়, তাদের পক্ষে সাধনা করাও আরও কঠিন হয়ে যায়।

সাধনার মধ্যে তুমি যখন কোনো নির্দিষ্ট মতভেদের সম্মুখীন হবে অথবা কেউ তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, তখন দুটো পরিস্থিতি হতে পারে: একটা হচ্ছে, তুমি হয়তো পূর্ব জন্মে সেই ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলে, তুমি নিজের মনের মধ্যে ভাবছ, আমার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, ‘‘এই লোকটা কী করে আমার সাথে এইরকম ব্যবহার করল?’’ তাহলে তুমি কেন অতীতে এই লোকটার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করেছিলে? তুমি বলবে, ‘‘আমি তখনকার সম্বন্ধে কিছু জানি না। আর

এই জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই,’’ কিন্তু সেটা হবে না। আর একটা পরিস্থিতি আছে, মতভেদের সময়ে, কর্মের রূপান্তরের বিষয়টাও জড়িয়ে আছে, সেইজন্যে কোনো নির্দিষ্ট মতভেদের সম্মুখীন হলে, আমাদের ক্ষমাশীল হতে হবে, সাধারণ মানুষের মতো কাজ করলে হবে না। এটা কর্মস্থলে বা অন্য কাজের পরিবেশেও একইরকম। স্বনিযুক্তি কর্মের ক্ষেত্রেও এটা সত্য, কারণ সেখানেও লোকেদের নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, এটা অসম্ভব যে সামাজিক যোগাযোগ থাকবে না, অন্তত প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক তো থাকবেই।

সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নানান ধরনের মতভেদের উদয় হতে পারে। যারা সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাধনা করছ, এটা কোনো ব্যাপার নয় যে তোমার কত টাকা আছে, বা কর্মস্থলে তোমার পদ কত উঁচুতে, এবং তুমি কী ধরনের স্বনিযুক্তি প্রকল্প অথবা কোম্পানি চালাচ্ছ, তাতেও কিছু এসে যায় না, তুমি যে ধরনের ব্যবসাই কর না কেন সেটা ন্যায়সংগতভাবে করবে এবং সৎ মানসিকতা বজায় রেখে করবে। মানবসমাজে সবরকম পেশারই অস্তিত্ব থাকা উচিত, মানুষের মনই অসৎ হয়ে গেছে, এবং সেটা তার পেশার উপরে নির্ভর করে না। আগেকার দিনে একটা কথা চালু ছিল, ‘‘দশজন ব্যবসায়ীর মধ্যে নয়জনই প্রতারক,’’ এটা সাধারণ লোকেদের কথা, আমি বলব এটা মানুষের মনের ব্যাপার। যদি তুমি সৎ মানসিকতা বজায় রেখে, ন্যায়পরায়ণ হয়ে ব্যবসা কর, যত বেশী প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, তত বেশী টাকা তুমি অবশ্যই উপার্জন করতে পারবে, যেহেতু সাধারণ মানুষদের মধ্যে যে প্রচেষ্টা ব্যয় করবে তার ফল তুমি পাবে। ত্যাগ নেই তো প্রাপ্তি নেই, তুমি পরিশ্রম করলেই ফল পাবে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে একজন ব্যক্তি ভালো মানুষ হতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মতভেদ তৈরি হয়। উঁচু শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে উঁচু শ্রেণীর মতভেদ দেখা যায়, এই সব সমস্যার সমাধান ঠিকভাবে করা সম্ভব, সমাজের যে কোনো শ্রেণীর মধ্যে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব, তার জন্যে তোমাদের সবাইকে বিভিন্ন ধরনের সব আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তিকে নিস্পৃহভাবে দেখতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে তোমরা সবাই নিজেদের ভালো মানুষ হিসাবে প্রমাণ করতে পারবে এবং তোমরা সবাই নিজের নিজের শ্রেণীর মধ্যেই সাধনা করতে পারবে।

বর্তমানে এই দেশে সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্য কোনো বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানে মানুষের পারস্পরিক মতভেদগুলি খুবই অদ্ভুত একটা অবস্থায় পৌঁছেছে, অন্য দেশে এবং পুরো ইতিহাসে এই পরিস্থিতি কখনো তৈরি হয়নি। সেইজন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থজনিত মতভেদগুলো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, লোকেরা একজন আর একজনের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে, সামান্য লাভের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তারা যা চিন্তা করছে এবং তারা যে কৌশল ব্যবহার করছে সেগুলি ভয়ংকর, এমনকী একজন ভালো মানুষ হওয়াও কঠিন। যেমন একজন ব্যক্তি কর্মস্থলে গিয়ে দেখল যে বাতাবরণ ঠিক নেই। পরে তাকে কেউ বলল: ‘‘অমুক ব্যক্তি তোমার সম্বন্ধে নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। তোমার সম্বন্ধে উপরওয়ালার কাছে নালিশ করেছে, এবং তোমার সুনামে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।’’ অন্যেরা তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছে। একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে এটা সহ্য করবে? সে কীভাবে তার ক্রোধ সংবরণ করবে? ‘‘সে আমাকে অসুবিধায় ফেললে আমিও তাকে অসুবিধায় ফেলব। তার যদি সহযোগী থাকে, আমারও সহযোগী আছে, এস আমরা লড়াই করব।’’ সাধারণ মানুষদের মধ্যে তুমি এইরকম করলে তারা তোমাকে শক্তিশালী লোক বলবে। কিন্তু একজন সাধকের পক্ষে সেটা ভয়াবহ ব্যাপার। তুমি যদি সাধারণ মানুষের মতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর আর সংঘর্ষ কর, তাহলে তুমি একজন সাধারণ মানুষ। তুমি যদি তাকে ছাপিয়ে যেতে পার, তুমি এমনকী সেই সাধারণ মানুষের থেকেও খারাপ।

এই বিষয়টাকে আমরা কীভাবে সামলাব? এইরকম মতভেদজনিত পরিস্থিতিতে প্রথমত আমাদের শান্ত থাকা উচিত এবং ওই ব্যক্তির মতন আচরণ কখনোই করা উচিত নয়। অবশ্যই আমরা বিষয়টাকে সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারি। এটা কোনো সমস্যাই নয় যদি আমরা বিষয়টা পরিষ্কার করে বলি। কিন্তু এই ব্যাপারে তোমার খুব বেশী আসক্তি থাকাও ঠিক নয়। আমরা যদি এইরকম সমস্যার মধ্যে পড়ি তাহলে আমরা সাধারণ লোকেদের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই করব না। সে যেরকম করেছে, তুমিও যদি সেইরকম কর তাহলে তুমিও কি সাধারণ মানুষ হয়ে গেলে না? তুমি ওই ব্যক্তির মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই তো করবেই না, উপরন্তু তোমার হৃদয়ে তার প্রতি কোনো বিদ্বেষভাবও রাখবে না, তুমি সত্যিই তাকে ঘৃণা করবে না। তুমি যদি তাকে ঘৃণা করতে শুরু কর, তাহলে তুমি কি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে না? তুমি তাহলে সহনশীলতা পালন করলে না। আমরা সত্য-করুণা-সহনশীলতার কথা বলেছি, অথচ তোমার

মধ্যে করুণা আরও কম দেখা গেল। সেইজন্যে তোমার ওই ব্যক্তির মতো হওয়া উচিত নয়, তুমি সত্যিই তার উপরে ক্রুদ্ধ হবে না। যদিও সে তোমাকে এমন অসম্মানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল যে, তুমি নিজের মাথা পর্যন্ত উঁচু করতে পারছিলে না। তুমি শুধু যে তার উপরে ক্রুদ্ধ হবে না তা নয়, তুমি তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাবে, তাকে সত্যি সত্যিই ধন্যবাদ জানাবে। একজন সাধারণ মানুষ এইরকম ভাবতে পারে: ''এটা কি আহঃ কিউ[57]-এর মতো হল না?'' আমি তোমাদের বলছি, ব্যাপারটা সেরকম নয়।

তোমরা প্রত্যেকে এটা চিন্তা কর, তুমি একজন অনুশীলনকারী, তোমার কি উঁচু আদর্শ মেনে চলা আবশ্যক নয়? সাধারণ লোকেদের নিয়মকানুন তোমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। একজন সাধক হিসাবে তুমি যা পাবে সেটা কি উঁচুস্তরের জিনিস নয়? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই উঁচুস্তরের নিয়ম পালন করবে। সেই ব্যক্তি যা করেছে তুমি যদি সেইরকমই কর তাহলে তুমি কি তার মতনই হয়ে গেলে না? তাহলে তাকে ধন্যবাদ জানাবে কেন? তুমি একটু চিন্তা কর যে তুমি কী পাবে.? এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, ত্যাগ নেই তো প্রাপ্তিও নেই। কিছু পেতে গেলে তোমাকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। ওই ব্যক্তি তোমাকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এক অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল এবং হিসাব অনুযায়ী প্রাপ্তিটা তার তরফে হয়েছে, তোমার ক্ষতির মাধ্যমে লাভটা তার দিকে গেছে, সে তোমাকে যত বেশী অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলবে, তার প্রভাবও তত বেশী হবে, তুমি নিজে সেটা যত বেশী সহ্য করবে, তত বেশী তার সদ্‌গুণ হ্রাস হবে। সেইসব সদ্‌গুণ তোমাকেই দেওয়া হবে। একই সাথে তুমি নিজে যখন সহ্য করবে, তুমি সম্ভবত খুব নিস্পৃহ থাকবে এবং মনের মধ্যে গ্রহণ করবে না।

এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, যদি তুমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে থাক, তাহলে তোমার শরীরে কর্মের রূপান্তর ঘটবে। যেহেতু তুমি দামটা মিটিয়ে দিয়েছ, অতএব যতটা তুমি সহ্য করেছ ততটাই রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং সবই সদ্‌গুণে পরিণত হবে। অনুশীলনকারীরা এই সদ্‌গুণকেই চায় না কি? অতএব তুমি দুই ভাবে লাভ করলে, যেহেতু তোমার কর্মও দূর হয়ে গেল। সে যদি এই পরিস্থিতি সৃষ্টি না করত, তাহলে কীভাবে

---

[57]আহঃ কিউ - চীনদেশের উপন্যাসে বর্ণিত এক মূর্খ চরিত্র।

তোমার চরিত্রের উন্নতি হতো? তুমি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করছ, আমিও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছি, আমরা দুজনে নির্বিরোধভাবে এখানে বসে থাকছি, তখন গোংগ বৃদ্ধি হওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে হবে? আসল কারণ হচ্ছে যে সে তোমার জন্যে এইরকম একটা মতভেদ সৃষ্টি করেছে, যেখানে তোমার চরিত্রের উন্নতি হওয়ার এইরকম একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে, তুমি এর মধ্যে থেকে তোমার নিজের চরিত্রের উন্নতি করতে পারছ, এইভাবে তোমার চরিত্রের উন্নতি হল না কি? তুমি তিন ভাবে লাভ করলে। তুমি একজন অনুশীলনকারী, তোমার চরিত্রের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার গোংগ-ও কি বেড়ে গেল না? তুমি এক শটে চার ভাবে লাভ করলে। তোমার কি সেই ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নয়? তোমার তাকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সত্যি সত্যি ধন্যবাদ জানানো উচিত, বস্তুত এইরকমই হয়ে থাকে।

অবশ্য ওই ব্যক্তির চিন্তাও ভালো ছিল না, তা নাহলে সে তোমাকে তার সদ্‌গুণ প্রদান করত না, কিন্তু সে সত্যিই তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্যে একটা সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ আমাদের চরিত্রের সাধনার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে, চরিত্রের সাধনার সাথে সাথে কর্ম দূর হয়ে যাবে এবং রূপান্তরিত হয়ে সদ্‌গুণে পরিণত হবে, একমাত্র এইভাবে তুমি তোমার স্তরের উন্নতি করতে পারবে, সব একই সাথে ঘটবে। উঁচু স্তর থেকে যদি দেখা যায়, তখন দেখা যাবে যে এই নিয়মগুলো সব পাল্টে গেছে। একজন সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। যদি তুমি উঁচু স্তরে পৌঁছে এই নিয়মগুলোকে দেখ, তাহলে দেখবে পুরোটাই পাল্টে গেছে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে তুমি এই নিয়মগুলোকে ঠিক মনে করবে, কিন্তু বাস্তবে ঠিক নয়। একমাত্র উঁচু স্তরে পৌঁছে যা দেখবে সেটাই হচ্ছে সত্যি সত্যি ঠিক, ব্যাপারটা সচরাচর এইরকমই হয়ে থাকে।

আমি নিয়মগুলো বিস্তারিতভাবে সবাইকে জানালাম, আশা করব যে ভবিষ্যতে সাধনার সময়ে, প্রত্যেকে নিজেকে অনুশীলনকারী হিসাবে গণ্য করে, সত্যিকারের সাধনা করবে, যেহেতু আমি ইতিমধ্যে নিয়মগুলো প্রকাশ করেছি। সম্ভবত কিছু লোক যেহেতু সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকছে, সেইজন্যে তারা এখনও মনে করছে যে সাধারণ মানুষদের সত্যিকারের পার্থিব লাভটা সেখানেই তাদের সামনে রয়েছে, অতএব সেটাই আরও বাস্তবসম্মত। এই সাধারণ মানুষদের প্রচন্ড স্রোতের মধ্যে, তারা নিজেরা উঁচু আদর্শ বজায় রাখতে পারছেই না। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষদের মধ্যে

ভালো মানুষ হওয়ার জন্যে নায়ক এবং প্রবাদ পুরুষরা আদর্শ হিসাবে কাজ করে, কিন্তু তাঁরা হচ্ছে সাধারণ মানুষদের আদর্শ। তুমি একজন সাধক হতে চাইলে, সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের মনের উপরে নির্ভর করে সাধনা করতে হবে, পুরোপুরি নিজের উপরে নির্ভর করে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে হবে, এখানে আদর্শ হিসাবে কিছু নেই। সৌভাগ্যবশত আজ আমরা দাফা-র কথা সবাইকে বলছি, অতীতে তুমি সাধনা করতে চাইলে, তখন শেখানোর মতো কোনো লোকই ছিল না। এইভাবে তুমি দাফা-কে অনুসরণ করে কাজ করলে, সম্ভবত কিছুটা ভালোই করবে। সাধনা করবে কি করবে না, সফল হবে কি হবে না, কোন্ স্তর তুমি ভেদ করতে পারবে, সবকিছু পুরোপুরি তোমার নিজের উপরেই নির্ভরশীল।

অবশ্য কর্মের রূপান্তর সর্বদা সেই প্রকারে হয় না, যেরকম আমি এইমাত্র বললাম, এটা অন্য দিক দিয়েও প্রকটিত হতে পারে। সমাজের মধ্যে, অথবা বাড়িতে যে কোনো জায়গায় এটা ঘটতে পারে। সমস্যাগুলো সম্ভবত রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার সময়ে বা অন্য কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতেও কারোর সামনে আসতে পারে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে যে সমস্ত আসক্তি তুমি ছাড়তে পারছ না, সেসব অবশ্যই দূর করে দেওয়া হবে। তোমার সমস্ত আসক্তিগুলো যতক্ষণ তোমার সঙ্গে আছে সেগুলোকে নানান ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। তুমি হোঁচট খেয়ে পড়বে এবং তার থেকেই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবে, অর্থাৎ এইভাবেই সাধনার মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে।

আরও একটা নির্দিষ্ট ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায়। সাধনার পর্বে তোমাদের অনেকেই লক্ষ্য করবে যে, যখন শারীরিক ক্রিয়া করছ, তোমার পতি বা পত্নী খুব অখুশি হয়। যেই তুমি ক্রিয়া শুরু করেছ, তৎক্ষণাৎ তোমার পতি বা পত্নী তোমার সাথে ঝামেলা শুরু করে দেয়। যদি তুমি অন্য কিছু কর, তাহলে সে মনে কিছু করবে না। মাহ্ জংগ[58] খেলায় তুমি অনেক সময় নষ্ট করলে সে অখুশি হবে, কিন্তু সে অতটা অখুশি হবে না, যতটা চিগোংগ-এর অনুশীলন করলে হবে। শারীরিক ক্রিয়া তোমার পতি বা পত্নীর কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করে না, তোমার শরীরকে

[58]মাহ্ জংগ - চীন দেশের একটি প্রথাগত খেলা, চারজন ব্যক্তি খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

সুস্থ রাখে, তোমার পতি বা পত্নীকে কোনোভাবে বিরক্ত করে না-----কত ভালো ব্যাপার। অথচ যেই তুমি চিগোংগ ক্রিয়া শুরু কর, তখনই তোমার পতি বা পত্নী সব জিনিসপত্র ছুঁড়তে শুরু করে এবং ঝামেলা বাধিয়ে দেয়। কিছু দম্পতি এই শারীরিক ক্রিয়ার জন্যে এমনকী বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত করতে চেয়েছিল। অনেক লোকই বুঝতে পারে না যে কেন এইরকম পরিস্থিতির উদয় হয়? অথচ তুমি পরে যদি তোমার পতি বা পত্নীকে জিজ্ঞাসা কর: ‘‘কেন তুমি আমার শারীরিক ক্রিয়া করার সময়ে এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলে?’’ সে কোনো কারণ বলতে পারে না এবং সে সত্যিই কোনো কারণ বলতে পারে না, ‘‘সত্যিই, আমার অতটা বেশী ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত হয়নি, বস্তুত এত বেশী ক্রোধ সেইসময়ে জেগে উঠেছিল।’’ প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা কী? শারীরিক ক্রিয়ার সময়ে, কর্মের রূপান্তর ঘটে, ত্যাগ নাহলে প্রাপ্তিও হবে না, যা ত্যাগ করা হবে সবই খারাপ জিনিস, তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে।

সম্ভবত যেইমাত্র তুমি তোমার ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবে, তৎক্ষণাৎ তোমার সাথে তোমার পতি বা পত্নী ঝামেলা শুরু করে দেবে, যদি তুমি সহ্য করতে পার, তাহলে তোমার আজকের অনুশীলন ব্যর্থ হবে না। কিছু লোক এটাও জানে যে সাধনায় সদ্‌গুণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেইজন্যে এই ব্যক্তি তার পত্নীর সঙ্গে সাধারণত ভালোভাবে মানিয়ে চলে। সে চিন্তা করে, ‘‘সচরাচর আমি যদি ‘এক’ বলি, ও ‘দুই’ বলে না, কিন্তু আজ ও আমার মাথার উপরে চড়ে বসেছে।’’ সে তার ক্রোধটাকে সামলাতে না পেরে ঝগড়া শুরু করে দিল, এর ফলে আজকের অনুশীলন ব্যর্থ হল। কারণ ওখানে কর্ম ছিল, তার পত্নী সেটা দূর করতে তাকে সাহায্য করছিল, কিন্তু সে সেটা করতে দিল না এবং তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল, অতএব কর্ম দূর হল না। এইরকম ঘটনা অনেক ঘটে এবং আমাদের অনেকেই এইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু তারা এটা চিন্তা করেনি যে কেন এটা হল। তুমি অন্য কিছু করলে তোমার পত্নী সেটাকে খেয়াল করত না, এবং যদিও এটা সত্যিকারের ভালো ব্যাপার, তবুও সে সবসময়ে তোমার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে তোমার পত্নী তোমার কর্ম দূর করার জন্যে তোমায় সাহায্য করছে, যদিও সে নিজে সেটা জানে না। সে তোমার সঙ্গে শুধুমাত্র ওপরে-ওপরে লড়াই করছে এবং হৃদয়ে তোমার প্রতি খুব ভালোভাব আছে এটা সেইরকম নয়, এটা সত্যিকারের ক্রোধ যা তার হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসে। কারণ

যার উপর কর্ম পড়বে তাকেই যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে, ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে এইরকম।

চরিত্রের উন্নতিসাধন

অতীতে অনেক লোকই চরিত্রকে ঠিকমতো বজায় রাখতে পারেনি, সেইজন্যে অনেক সমস্যায় পড়েছে, তাদের সাধনা একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে আর উপরে উঠতে পারেনি। কিছু লোকের সাধনার শুরুতে চরিত্র বেশ ভালো ছিল, সাধনার শারীরিক ক্রিয়া করার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিব্য চক্ষু খুলে গিয়েছিল এবং সাধনায় এক বিশেষ স্তরে পৌঁছে যেতে পেরেছিল। যেহেতু ওই ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল এবং চরিত্রের স্তর উঁচু ছিল, সেইজন্যে তার গোংগ খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছিল। তার চরিত্র যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় তার গোংগ পৌঁছে গিয়েছিল, এরপরে সে যখন তার গোংগ-এর আরও বৃদ্ধি ঘটাতে চাইল, তখনই মতভেদগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠল, তখন ধারাবাহিকভাবে তার চরিত্রের উন্নতিসাধন করা জরুরি হয়ে পড়ল। বিশেষত শুরুতে ভালো জন্মগত সংস্কার থাকার জন্যে, তার বোধ হতো যে তার গোংগ ভালোই বাড়ছে, অনুশীলনও বেশ ভালোই হচ্ছে। হঠাৎ এতগুলি সমস্যা কীভাবে এল? সবকিছুতেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, লোকেরা দুর্ব্যবহার করছে, উপরওয়ালাও ভালো চোখে দেখছে না, বাড়িতেও অবস্থা বেশ সঙ্গিন। হঠাৎ এতগুলো সমস্যার সৃষ্টি কীভাবে হল? সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। যেহেতু তার জন্মগত সংস্কার ভালো ছিল, এবং সে একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছাতে পেরেছিল, যার ফলে এইরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেটা কীভাবে একজন সাধকের সফলতার চূড়ান্ত আদর্শ হবে? সাধনায় এখনও অনেক দূর যেতে হবে! তুমি অবশ্যই নিরন্তর নিজের উন্নতিসাধন করতে থাকবে। তোমার সঙ্গে আসা সামান্য কিছু জন্মগত সংস্কারের কারণেই তুমি এই অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছ, আরও উন্নতিসাধন করতে হলে, আদর্শকে আরও উঁচু করা আবশ্যক।

কেউ কেউ বলে, ‘‘আমি আরও কিছু টাকা রোজগার করে নেব, যাতে পরিবারের জন্যে ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে আমার আর কোনো চিন্তা থাকবে না, এরপরে আমি সাধনা করব।’’ আমি বলব এটা কেবল তোমার আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী চিন্তামাত্র, তুমি অন্যদের জীবনে

হস্তক্ষেপ করতে পার না, তুমি অন্যদের ভাগ্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পার না, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তোমার পত্নী, ছেলে, মেয়ে, মাতা-পিতা এবং ভাইয়েরাও। তুমি এসব নির্ধারণ করতে পার কি? এছাড়া তোমার যদি বাড়িতে কোনো দুশ্চিন্তা না থাকে, এবং তোমার যদি কোনো সমস্যাই না থাকে, তাহলে তুমি আর কীসের সাধনা করবে? তুমি এই শারীরিক ক্রিয়াগুলো পুরোপুরি আরামের সঙ্গে কীভাবে করবে? কোথায় এই ধরনের ব্যাপার আছে? এটাই তোমার চিন্তা যা তুমি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ দিয়ে করে থাক।

সাধনায় অবশ্যই এই দুর্ভোগগুলির মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে, এটা দেখা হবে যে বিভিন্ন ধরনের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা তুমি ছাড়তে পারছ কি পারছ না, তুমি ওগুলোর প্রতি উদাসীন থাকতে পারছ কি পারছ না। তোমার যদি ওই জিনিসগুলোর প্রতি আসক্তি থাকে, তাহলে তুমি সাধনায় সফল হতে পারবে না। যা কিছু ব্যাপার হোক না কেন, সবকিছুরই একটা পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক আছে, মানুষ কেন মানুষ হিসাবে থাকতে পারছে? কারণ মানুষের মধ্যে আবেগ আছে, লোকেরা শুধু এই আবেগের জন্যেই জীবনযাপন করে, পরিবার-পরিজনদের মধ্যে স্নেহভাব, পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে প্রেম, পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা, অনুভূতি, বন্ধুত্ব, পারস্পরিক ভাব-ভালোবাসার জন্যে কিছু করা, তুমি যেখানেই যাও না কেন এই আবেগের বাইরে যেতে পারবে না। তুমি কোনো কিছু করতে চাও অথবা করতে চাও না, তুমি খুশি হও অথবা অখুশি হও, তুমি কোনো কিছু ভালোবাস অথবা ঘৃণা কর, সমগ্র মানবসমাজের প্রত্যেকটা জিনিসই সম্পূর্ণরূপে এই আবেগের থেকেই আসে। তুমি যদি আবেগ ত্যাগ করতে না চাও সাধনা করতে পারবে না। তুমি যদি এই আবেগের থেকে বেরিয়ে আসতে পার, কোনো কিছুই তোমার উপরে প্রভাব ফেলতে পারবে না, সাধারণ মানুষের আসক্তিগুলো তোমাকে আর বিচলিত করতে পারবে না। এর জায়গায় যা আসবে সেটা হচ্ছে অপরের দুঃখে সহানুভূতির মনোভাব যা অনেক বেশী মহৎ জিনিস। অবশ্য একবারে এই আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ ব্যাপার নয়, সাধনা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং নিজের আসক্তিগুলোকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করার প্রক্রিয়া, তবুও তোমাকে নিজের প্রতি অবশ্যই কঠোর হতে হবে।

আমাদের সাধকদের ক্ষেত্রে হঠাৎই মতভেদ উদয় হবে। কী করা উচিত? তুমি সর্বদা সহানুভূতিশীল হৃদয় এবং শান্তিপূর্ণ মানসিক অবস্থা

বজায় রাখবে, তাহলে তুমি কোনো সংকটের মুখোমুখি হলে ভালোভাবে সামলাতে পারবে, কারণ এতে সংঘাত প্রশমনের জায়গা থাকবে। তুমি সবসময়ে সহানুভূতিশীল থাকবে এবং অন্যদের প্রতি সদিচ্ছার ভাব রাখবে, যখনই কোনো কিছু করবে, সর্বদা অন্যদের কথা চিন্তা করবে, প্রতিটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময়ে প্রথমেই তুমি চিন্তা করবে যে, অন্যেরা এটা সহ্য করতে পারবে কি পারবে না, এটা অন্যদের ক্ষতি করবে না তো, এইভাবে চললে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। সেইজন্যে তোমার সাধনার সময়ে উচুঁ আদর্শ অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং নিজের উপরে আরও উচ্চতর আদর্শ প্রয়োগ করা উচিত।

কিছু লোক প্রায়শ এটা বুঝতেই পারে না। কিছু লোকের দিব্য চক্ষু খোলা থাকে এবং একজন বুদ্ধকে দেখতে পায়। সে বাড়িতে গিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে এবং মনে মনে প্রার্থনা করে: ‘‘তুমি আমার প্রতি লক্ষ্য রাখছ না কেন? দয়া করে আমার এই সমস্যার সমাধান করে দাও!’’ বুদ্ধ অবশ্যই কিছু করবেন না, কারণ ওই সমস্যাটা বুদ্ধই তৈরি করেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার চরিত্রের যেন উন্নতি ঘটে এবং ওই সমস্যার মধ্যে দিয়ে তোমার যেন উন্নতি হয়। কী করে তিনি তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবেন? তিনি তোমার সমস্যার সমাধান কখনোই করবেন না। তিনি যদি তোমার সমস্যার সমাধান করে দেন, তাহলে কীভাবে তোমার গোংগ বাড়বে? কীভাবে তোমার চরিত্রের এবং স্তরের উন্নতি হবে? গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তোমার গোংগ-এর বৃদ্ধি ঘটানো। একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তার দৃষ্টিতে, মানুষ হওয়াটা উদ্দেশ্য নয় এবং এই মানবজীবন মানুষ হিসাবে কাজ করার জন্যে নয়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি যেন তোমার মূলে ফিরতে পার। মানুষকে প্রচুর কষ্ট করতে হয়, তাঁরা ভাবেন লোকেরা যত বেশী কষ্ট সহ্য করবে ততই ভালো, তাড়াতাড়ি ঋণগুলি শোধ হয়ে যাবে, তাঁদের এইরকমই ভাবনা। কিছু লোক এটা বুঝতে পারে না, কারোর প্রার্থনায় কাজ না হলে, সে তখন বুদ্ধের কাছে নালিশ জানায়: ‘‘তুমি আমাকে সাহায্য করছ না কেন? প্রত্যেকদিন আমি ধূপকাঠি জ্বালাই ও প্রণাম করি।’’ কেউ কেউ এমনকী এই কারণে বুদ্ধ মূর্তিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এবং বুদ্ধের বদনাম করতে শুরু করে দেয়। যেহেতু সে বুদ্ধের বদনাম করেছে, সেইজন্যে তার চরিত্র নীচে নেমে যায়, এবং তার গোংগ-ও অন্তর্হিত হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে তার কোনো কিছুই আর থাকল না, এতে তার বুদ্ধের প্রতি ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়, সে ভাবে যে বুদ্ধ তার সর্বনাশ করে দিল। সে বুদ্ধের চরিত্রকে একজন সাধারণ মানুষের

মানদণ্ড দিয়ে বিচার করে, সে কীভাবে বিচার করবে? সে সাধারণ মানুষের মানদণ্ড দিয়ে একটা উঁচু স্তরের ব্যাপারকে বিচার করছে, সেটা কীভাবে সম্ভব? সেইজন্যে এইধরনের সমস্যা প্রায়ই ঘটে থাকে, যেখানে লোকেরা নিজেদের জীবনের কষ্টগুলিকে তাদের প্রতি অবিচার মনে করে, অনেক লোক এইভাবে নীচে নেমে গেছে।

গত কয়েক বছরে অনেক বিখ্যাত চিগোংগ মাস্টার নীচে নেমে গেছে। অবশ্য প্রকৃত চিগোংগ মাস্টাররা তাদের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সমাপ্ত করে সবাই ফিরে গেছেন। কেউ কেউ এখনও রয়ে গেছে যারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে হারিয়ে গেছে, যদিও তাদের চরিত্র নীচে নেমে গেছে তবুও তারা এখনও কাজ করে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে তাদের গোংগ-ও শেষ হয়ে গেছে। কয়েকজন চিগোংগ মাস্টার আগে অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত ছিল এবং এখনও সমাজের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের মাস্টাররা দেখেছেন যে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে, তারা খ্যাতি এবং ব্যক্তিগত লাভের মধ্যে থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছে না, তাদের মধ্যে আর কোনো আশা না দেখে, তাদের মাস্টাররা তাদের সহ আত্মাকে নিয়ে গেছেন, সব গোংগ সহ আত্মার শরীরেই ছিল। এই বিশেষ ধরনের উদাহরণ বেশ অনেক আছে।

আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে এই ধরনের উদাহরণ অপেক্ষাকৃত কম, যদি কিছু থাকেও সেটা অতটা লক্ষণীয় নয়। তবে চরিত্র উন্নত হওয়ার ব্যাপারে চমকপ্রদ উদাহরণ বিশেষত অনেক দেখা যায়। একজন শিক্ষার্থী সানডংগ প্রদেশের একটা শহরে কাপড় বোনার কারখানায় কাজ করত, সে ফালুন দাফা শেখার পরে অন্য কর্মীদেরও অনুশীলন করতে শিখিয়েছিল, এর ফলে পুরো কারখানায় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটেছিল। আগে সে প্রায়ই তোয়ালের টুকরো কারখানা থেকে লুকিয়ে ঘরে নিয়ে যেত এবং অন্য কর্মচারীরাও নিয়ে যেত। ফালুন দাফা শেখার ফলে সে আর নিয়ে যেত না, পরিবর্তে যা আগে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো ফেরত দিয়েছিল। অন্যেরা তাকে এইরকম করতে দেখার পরে, কেউ আর বাড়িতে কিছু নিয়ে যেত না, এমনকী কিছু কর্মচারী পূর্বে নেওয়া জিনিস কারখানায় ফেরত-ও দিয়েছিল, পুরো কারখানায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

একটা শহরের এক কারখানায় ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থীরা কেমন অনুশীলন করছে সেটা দেখার জন্যে দাফা শিক্ষাদান কেন্দ্রের এক

পরিচালক একবার সেখানে গিয়েছিল, কারখানার প্রবন্ধক নিজে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে এসেছিল: ‘‘আপনাদের এই ফালুন দাফা শেখার পর থেকেই কর্মচারীরা তাড়াতাড়ি কাজ করতে আসছে এবং বাড়িতে দেরি করে ফিরছে। তারা খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে, উপরওয়ালা যাকে যে কাজ ভাগ করে দিচ্ছে, তারা সেটা বাছ-বিচার না করেই করছে, এবং নিজের লাভের জন্যে লড়াইও করছে না। তাদের এইরকম কাজ করার ফলে সমগ্র কারখানায় নৈতিক আদর্শের অনেক উন্নতি হয়েছে, কারখানার আর্থিক লাভও বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনাদের সাধনা এত শক্তিশালী, আপনাদের মাস্টার কখন আসছেন? আমিও ওনার বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে চাই।’’ আমাদের ফালুন দাফা-র প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে জনগণকে উঁচু স্তরে নিয়ে আসা। এছাড়া এটা, সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির উন্নতির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, যদিও এই কাজ করা এর অভিপ্রায় নয়। যদি প্রত্যেকে নিজের অন্তরে অনুসন্ধান করে, আর চিন্তা করে যে কীভাবে ভালো আচরণ করা যায়, আমি বলব সমাজে স্থিতি আসবে এবং মানবজাতির নৈতিকতার মান উন্নত হবে।

যখন তাইউয়ান[59] শহরে ফা এবং শারীরিক ক্রিয়া শেখাচ্ছিলাম, সেখানে পঞ্চাশ বছরেরও বেশী বয়সি একজন অনুশীলনকারী ছিল, সে এবং তার স্বামী আমার বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতে আসছিল। যখন তারা রাস্তার মাঝামাঝি এসেছে, একটা গাড়ি খুব দ্রুত আসছিল, হঠাৎ গাড়ির পিছনে দেখার আয়নায় মহিলার কাপড় ফেঁসে গেল। এইভাবে তার কাপড় ফেঁসে যাওয়া অবস্থায় গাড়িটা তাকে দশ মিটারেরও বেশী দূরে টেনে নিয়ে গেল এবং তারপরে ‘‘ধপ’’ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। গাড়িটা এর পরে কুড়ি মিটারেরও বেশী দূরে গিয়ে থামলো। চালক গাড়ির থেকে নামার পরে খুব বিরক্ত হল: ‘‘এই যে তুমি রাস্তায় চলার সময়ে চোখে দেখতে পারছিলে না।’’ এখনকার লোকেরা এইরকমই, কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রথমেই দায়িত্বটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে, সে দোষী না দোষী নয় সেটা না জেনেই। গাড়ির অন্য আরোহীরা বলল: ‘‘দেখো মহিলার কতটা চোট লেগেছে, হাসপাতালে নিয়ে চলো।’’ চালকের হুঁশ এল, তাড়াতাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: ‘‘মাসীমা কেমন আছেন? পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে কি? হাসপাতালে চলুন, পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে আসব।’’ সেই শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে ভূমি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

[59]তাইউয়ান - শাংক্সী প্রদেশের রাজধানী।

‘‘আমি ঠিক আছি, তোমরা যেতে পার।’’ সে কাপড়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে, তার স্বামীকে নিয়ে চলে গেল।

সে ক্লাসে এসে আমাকে এই ব্যাপারটা বলল এবং আমার বেশ ভালো লাগল। আমাদের এই শিক্ষার্থীর চরিত্র সত্যিই খুব উঁচু। সে আমাকে বলল: ‘‘মাস্টার আজ আমি ফালুন দাফা পড়েছিলাম, যদি আমি ফালুন দাফা না পড়তাম তাহলে আমি ওইরকম আচরণ করতে পারতাম না।’’ সবাই একটু চিন্তা কর, অবসর হয়ে গেছে, জিনিসপত্রের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে, কোনো কল্যাণকারী ভাতাও নেই। পঞ্চাশের উপরে যার বয়স তাকে একটা গাড়ি অতদূরে টেনে নিয়ে গিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কোথায় তার চোট লাগতে পারত? সব জায়গায় লাগতে পারত, সে মাটিতে শুয়ে থাকতে পারত এবং একদম উঠত না। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সে চলে যেত, সে হাসপাতালেই থেকে যেত এবং সেখান থেকে আর আসত না। একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো ঠিক এইরকমই ঘটত। কিন্তু সে একজন শিক্ষার্থী এবং সে এইরকম করেনি। আমরা বলেছি যে ভালো অথবা খারাপ পরিণাম আসে একটা চিন্তার মাধ্যমে। এই চিন্তাটা অন্যরকম হলে তার পরিণামও অন্যরকম হতো। এইরকম বেশী বয়সে তার জায়গায় যদি অন্য কোনো সাধারণ মানুষ থাকত, তাহলে তার চোট লাগত না কি? অথচ তার চামড়ায় আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগেনি। ভালো অথবা খারাপ পরিণাম আসে একটা চিন্তা থেকে। যদি সে ওখানে পড়ে থাকত আর বলতো: ‘‘ওঃ, আমি ভালো নেই, এখানে লাগছে, ওখানে লাগছে।’’ তাহলে হয়তো তার লিগামেন্ট ছিঁড়তে পারত, হাড় ভাঙ্গতে পারত, এবং পক্ষাঘাত হতে পারত। সেক্ষেত্রে তোমাকে যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন, শেষ জীবনে তোমাকে হাসপাতালেই থাকতে হতো, আর উঠে দাঁড়াতে পারতে না। তোমার কি আরাম হতো? আশে পাশের যারা ঘটনাটা দেখেছিল, এমনকী তাদের কাছেও ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেছিল যে বয়স্ক মহিলা কিছু টাকা পাওয়ার এই সুযোগ কাজে লাগাল না এবং টাকা আদায় করল না। আজকাল মানুষের নৈতিক আদর্শ বিকৃত হয়ে গেছে। চালক গাড়িটা প্রচন্ড গতিতে চালাচ্ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে ধাক্কা মারতে চেয়েছিল কি? এটা কি সে অনিচ্ছাকৃতভাবে করেনি? এখনকার লোকেরা এইরকমই। যদি এই সুযোগে তার কাছ থেকে টাকা না আদায় করা হয়, তাহলে এমনকী আশেপাশের দাঁড়ানো লোকেরাও মনে করে যে ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত হল না। আমি বলেছি যে এখন লোকেরা এমনকী ভালো এবং খারাপের

পার্থক্যটুকু পর্যন্ত করতে পারে না। বর্তমানে কেউ যদি কোনো লোককে বলে যে, ‘‘তুমি খারাপ কাজ করছ,’’ সে বিশ্বাসই করবে না। কারণ মানুষের নৈতিক আদর্শের সবকিছুই পাল্টে গেছে, কিছু লোক শুধু নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেই না, টাকার জন্যে এরা যে কোনো কাজ করতে পারে। যদি কেউ নিজের স্বার্থের পিছনে না ছোটে, তাহলে স্বর্গ আর মর্ত্য তাকে যেন ধ্বংস করে ফেলবে----এমনকী এটাই হয়েছে এখনকার আদর্শমন্ত্র!

বেজিংয়ে একজন শিক্ষার্থী ছিল, সে রাতের খাওয়ার পরে তার বাচ্চাকে চিয়ানমান[60]-এর বিপণি চত্বরে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে দেখল যে, একটা প্রচার গাড়ি থেকে লটারির টিকিট বিক্রি হচ্ছে, বাচ্চা ওই হৈ-চৈ পূর্ণ রঙ্গমেলায় যোগ দিতে চাইল এবং লটারি খেলতে চাইল। ‘‘তুমি যদি খেলতে চাও তো খেলতে পার।’’ খেলার জন্যে সে বাচ্চাকে এক য়ুয়ান দিল, তক্ষুনি লটারি খেলে বাচ্চা দ্বিতীয় পুরস্কার পেল, একটা ছোটদের দামি সাইকেল। বাচ্চার ভীষণ আনন্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার মনে একটা চিন্তার উদয় হল: ‘‘আমি একজন অনুশীলনকারী, আমি কীভাবে এই জিনিসের পিছনে ছুটলাম? বিনা পয়সায় আমি যদি এইভাবে জিনিস গ্রহণ করি, তাহলে এর পরিবর্তে কতটা সদ্‌গুণ আমাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে?’’ সে বাচ্চাকে বলল: ‘‘এটা নিও না, তুমি চাইলে পরে আমরা নিজেরাই কিনে নেব।’’ বাচ্চাটার মন খুব খারাপ হয়ে গেল: ‘‘আমি যখন তোমাকে কিনে দিতে বলেছিলাম, তখন কিনে দাওনি, আর আমি যখন নিজে থেকে এটা লটারিতে পেলাম, তুমি এটা নিতে দিচ্ছ না।’’ বাচ্চা কাঁদতে থাকল, ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিল, কোনো উপায় না দেখে লোকটি সাইকেলটা বাড়িতেই নিয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে সে যত এটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকল, ততই তার মন অস্থির হয়ে উঠল, ‘‘আমি সোজাসুজি ওই লোকগুলির কাছে টাকা পাঠিয়ে দেব।’’ কিন্তু পরে আবার ভেবে দেখল, ‘‘লটারির টিকিট আর নেই, আমি যদি ওদের টাকা পাঠাই, ওরা কি নিজেদের মধ্যেই ভাগ করে নেবে না? আমি টাকাটা সরাসরি আমার কর্মস্থলেই দান করে দেব।’’

সৌভাগ্যবশত ওই কর্মস্থলে বেশ কিছু ফালুন দাফা-র শিক্ষার্থী ছিল এবং ওই ব্যক্তির উপরওয়ালাও তাকে বুঝতে পারল। অন্য কোনো

---

[60]চিয়ানমান - বেজিংয়ে বানিজ্যের ব্যাপারে একটি প্রধান জেলা।

সাধারণ পরিস্থিতিতে বা অন্য কোনো সাধারণ কর্মস্থলে যদি তুমি বলো যে, তুমি একজন সাধক এবং লটারিতে জেতা সাইকেল নিতে চাও না, টাকাটা কর্মস্থলে দান করতে চাও, তোমার উপরওয়ালাই মনে করবে যে তুমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছ। অন্যেরা হয়তো অনেক রকম টিপ্পনী কাটবে: ‘‘লোকটা সাধনা করতে করতে বিপথে চলে গেছে কি? চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে কি?’’ আমি বলেছি যে নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটেছে। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে এটা কোনো বড়ো ব্যাপার ছিল না, এরকম প্রায়ই হতো, কেউই এটাকে অদ্ভুত মনে করত না।

আমরা বলেছি যে মানুষের নৈতিক আদর্শের যতই পরিবর্তন হোক না কেন, বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা চিরকাল অপরিবর্তনীয় রয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে তুমি ভালো, বাস্তবে তুমি হয়তো ভালো নও; যদি কেউ বলে যে তুমি খারাপ, বাস্তবে তুমি হয়তো খারাপ নও, এর কারণ ভালো এবং খারাপ মাপার যে মাপকাঠি, সেটা বিকৃত হয়ে গেছে। কেবল যে ব্যক্তি এই বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবে, সেই একমাত্র ভালো মানুষ, এটাই ভালো অথবা খারাপ মানুষ বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি, এবং বিশ্বের মধ্যে স্বীকৃত। যদিও মানবসমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে, মানবজাতির নৈতিকতার মান ভীষণ ভাবে নেমে গেছে, মানুষের নৈতিকতা প্রতিদিন খারাপ হয়েই যাচ্ছে, এবং লাভই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে গেছে, তবুও মানবজাতির পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু বিশ্বের পরিবর্তন ঘটছে না। একজন সাধক হিসাবে সাধারণ মানুষের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষ বলছে যে এই জিনিসটা ঠিক, তুমিও সেই অনুসারে কাজ করবে এটা ঠিক নয়। যখন সাধারণ মানুষ বলছে এটা ভালো, সেটা হয়তো ভালো নয়; যখন সাধারণ মানুষ বলছে এটা খারাপ, সেটা হয়তো খারাপ নয়। এই সময়ে যখন নৈতিক আদর্শ বিকৃত হয়ে গেছে এবং একজন মানুষ খারাপ কাজ করছে, তুমি যদি তাকে বলো যে সে খারাপ কাজ করছে, সে এমনকী বিশ্বাসই করবে না! একজন সাধক হিসাবে এই বিশ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী সবকিছুর বিচার করা উচিত, একমাত্র তখনই সে প্রভেদ করতে পারবে যে কোন্‌টা সত্যিই ভালো আর কোন্‌টা সত্যিই খারাপ।

শক্তিপাত (গুয়ানডিংগ)

সাধনার জগতে এক ধরনের আনুষ্ঠানিক রীতি আছে, যাকে বলে শক্তিপাত। শক্তিপাত হচ্ছে বুদ্ধ মতের তন্ত্রসাধনার অন্তর্গত এক ধরনের ধর্মীয় রীতি। এই শক্তিপাত রীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা পালন করা হলে, এই ব্যক্তি অন্য কোনো সাধনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে না, তাকে এই সাধনা পদ্ধতির সত্যিকারের শিষ্য হিসাবে স্বীকার করা হবে। এখন এর মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে? এই ধর্মীয় রীতি চিগোংগ অনুশীলনের মধ্যেও প্রয়োগ করা হচ্ছে, শুধু মাত্র যে তন্ত্রসাধনায় এর প্রচলন আছে তা নয়, তাও চিগোংগ পদ্ধতিতেও এই শক্তিপাত রীতি পালন করা হচ্ছে। আমি বলেছি যে যারা তন্ত্র সাধনার নাম করে সমাজে তন্ত্র পদ্ধতি শেখাচ্ছে তারা সবাই প্রতারক। কেন এইরকম বলা হচ্ছে? কারণ তাংগ তন্ত্র বিদ্যা এক হাজারেরও বেশী বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মূলত এর কোনো অস্তিত্বই আর নেই, তিব্বতীয় তন্ত্রবিদ্যা ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণে সম্পূর্ণরূপে হান[61] ভূখন্ডে কখনোই প্রচারিত হয়নি। বিশেষত এটা একটা গুপ্তশিক্ষা, সেইজন্যে এর সাধনা অবশ্যই গুপ্তভাবে মঠের মধ্যে করতে হবে, এছাড়া মাস্টার অবশ্যই গুপ্তভাবে এই সাধনা শেখাবে এবং গুপ্তভাবে শিষ্যকে দিয়ে এই সাধনা করিয়ে যাবে। যদি এইভাবে সবকিছু না করা হয়, এটা নিশ্চিতভাবেই শেখানো সম্ভব নয়।

বেশ কিছু লোক এইরকম একটা লক্ষ্য নিয়ে তিব্বতে গিয়ে চিগোংগ শিখতে চায়, তারা একজন মাস্টার খুঁজে তন্ত্রবিদ্যা শিখতে চায়, যাতে ভবিষ্যতে তারা চিগোংগ মাস্টার হয়ে বিখ্যাত এবং ধনী হতে পারে। সবাই চিন্তা কর: একজন প্রকৃত জীবিত বুদ্ধ মতের লামা[62], যাঁর যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাও খুব শক্তিশালী হয় এবং যে ব্যক্তি শিখতে এসেছে তার মনে কী আছে তিনি সেটা পড়তে পারেন। এই ব্যক্তি কেন এখানে এসেছে সেটা তিনি এই ব্যক্তির মনকে একবার দেখেই বুঝতে পারবেন: ‘‘তুমি এখানে আমাদের পদ্ধতিটা শিখতে এসেছ যাতে তুমি চিগোংগ মাস্টার হয়ে ধন ও খ্যাতি অর্জন করতে পার, এবং তুমি

---

[61] হান - চীন দেশের প্রধান জাতি। মধ্য চীনের প্রদেশগুলি এবং অঞ্চলগুলি হচ্ছে হান জাতি অধ্যুষিত এলাকা।

[62]লামা - তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের মাস্টারদের প্রথাগত উপাধি।

আমাদের এই বুদ্ধ সাধনা পদ্ধতির ক্ষতি করবে।'' ধন ও খ্যাতি অর্জনের জন্যে তুমি চিগোংগ মাস্টার হতে যে প্রয়াস করছ, সেই প্রয়াসের মাধ্যমে তোমাকে কীভাবে আমাদের বুদ্ধ সাধনার এই গম্ভীর পদ্ধতির ইচ্ছামতো ক্ষতি করতে দেওয়া যাবে? তোমার উদ্দেশ্যটা কী? অতএব তাঁরা তাকে কিছুই শেখাবেন না এবং সেই ব্যক্তিও কোনো সত্যিকারের শিক্ষা প্রাপ্ত হবে না। অবশ্য ওখানে এত মঠ আছে যে, সেই ব্যক্তি ভাসা-ভাসা সামান্য কিছু শিখতেও পারে। যদি তার মন সৎ না হয় এবং সে চিগোংগ মাস্টার হওয়ার লক্ষ্যে খারাপ কাজ করে, তাহলে সেইসময়ে তার উপরে সত্তাভর করে। পশু সত্তার মধ্যে শক্তি থাকে, কিন্তু এটা তিব্বতের তন্ত্রবিদ্যার থেকে আসে না। যারা সত্যি সত্যি ধর্মকে পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তিব্বতে যায়, তারা হয়তো ওখানেই আস্তানা গড়ে তোলে, আর ফিরে আসে না, তারাই সত্যিকারের সাধক।

এটা বিস্ময়কর যে, বর্তমানে অনেক তাও পদ্ধতিতেও শক্তিপাত রীতির কথা বলা হচ্ছে। তাও পদ্ধতিতে শক্তি প্রবাহের নাড়ীর প্রয়োগ আছে, এরা তথাকথিত শক্তিপাত রীতি কেন পালন করছে? আমি যখন দক্ষিণে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম, সেই অনুযায়ী যতটুকু আমি জানি, বিশেষত গুয়াংগডংগ অঞ্চলে এটা অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়, যেখানে দশটার বেশী গোলমেলে ধরনের চিগোংগ প্রথা চালু আছে যারা শক্তিপাত রীতি পালন করে। এর অর্থ কী? যদি মাস্টার তোমার জন্যে শক্তিপাত করে, তুমি তার শিষ্য হয়ে যাবে, অন্য কোনো পদ্ধতি শিখতে পারবে না, যদি অন্য পদ্ধতি শেখো তাহলে সে তোমাকে শাস্তি দেবে কারণ সে ওইরকমই করে। এটা কি একটা অশুভ পদ্ধতি নয়? সে যা শেখাচ্ছে সেটা শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জিনিস, লোকেরা এটা শিখতে চায় কারণ তারা তাদের শরীর ভালো রাখতে চায়। সে এই সব কেন করে? কোনো একজন লোক বলেছিল যে, তার চিগোংগ অনুশীলন করলে অন্য কোনো চিগোংগ অনুশীলন করতে পারবে না। সে কি লোকেদের উদ্ধার করতে পারবে এবং সাধনায় পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারবে? সে লোকেদের বিপথে চালিত করছে! অনেক লোক এইরকম করছে।

তাও বিদ্যাতে কখানোও এটার কথা বলা হতো না, কিন্তু এখানেও এই তথাকথিত শক্তিপাতের আবির্ভাব হয়েছে। আমি দেখেছি যে, যে চিগোংগ মাস্টার শক্তিপাত রীতি পালন করার ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর, তুমি কি জান তার গোংগ স্তম্ভ কতটা উঁচু? সেটা দোতলা বা তিনতলা

বাড়ির সমান উঁচু, আমি দেখলাম, একজন বিখ্যাত চিগোংগ মাস্টার হিসাবে তার গোংগ এতটাই নেমে গেছে যে সেটা শোচনীয় ভাবে কম হয়ে গেছে। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লোক লাইন দিয়ে আছে তাকে দিয়ে শক্তিপাত করানোর জন্যে। তার গোংগ বেশী নেই, ওইটুকু উঁচু মাত্র, শীঘ্রই সেটা আরও নেমে গিয়ে কিছুই আর থাকবে না। কী দিয়ে সে তখন শক্তিপাত করবে, এটা কি লোকেদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে না? অন্য মাত্রা থেকে দেখলে, সত্যিকারের শক্তিপাতে একজন ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত, হাড়গুলো সব রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে সাদা রঙের মণির মতো দেখতে লাগে। অর্থাৎ এতে গোংগ এবং উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করে লোকটির দেহকে শোধন করা হয়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরটাকে পরিষ্কার করা হয়। এই চিগোংগ মাস্টার কি এইরকম করতে পারবে? সে করতে পারবে না। সে কী করবে? অবশ্য সে সম্ভবত ধর্মীয় সব ব্যাপার করবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে যেই তুমি তার বিদ্যা শিখবে, তুমি তার লোক হয়ে যাবে, তার ক্লাসে হাজিরা দিতে হবে, তার জিনিস শিখতে হবে। লক্ষ্য হচ্ছে সে যেন তোমার টাকাটা পেতে পারে, তার বিদ্যা যদি কেউই না শেখে, তবে সে টাকা করতে পারবে না।

অন্য বুদ্ধ মতের শিষ্যদের মতো, ফালুন দাফা-র শিষ্যদেরও অন্য মাত্রার উঁচুস্তরের মাস্টাররা, অনেকবার শক্তিপাত করবে, কিন্তু তোমাকে জানানো হবে না। দিব্যশক্তির অধিকারী লোকেরা হয়তো বুঝতে পারবে, সংবেদনশীল লোকেরা হয়তো অনুভবও করতে পারবে, তারা হয়তো ঘুমের মধ্যে বা অন্য কোনো সময়ে অকস্মাৎ অনুভব করবে যে একটা গরম স্রোত মাথার উপর থেকে সারা শরীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তোমাকে উচ্চতর গোংগ দেওয়াটা শক্তিপাতের উদ্দেশ্য নয়, গোংগ তোমার নিজের সাধনা দ্বারাই বাড়াতে হবে। শক্তিপাত একটা দৃঢ়তা বৃদ্ধির পদ্ধতি যা শরীরকে শোধন করে এবং আরও পরিষ্কার করে। শক্তিপাত অনেকবারই করতে হয়, এটা তোমার শরীরকে প্রতিটি স্তরে শোধন করতে সাহায্য করে। যেহেতু সাধনা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে এবং গোংগ মাস্টারের উপরে নির্ভর করে, সেইজন্যে শক্তিপাতের এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান আমরা পালন করি না।

কিছু লোক আছে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে (দীক্ষা) তাদের মাস্টারের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। যে কথা বললাম, সেই ব্যাপারে আমি কিছু বলব, অনেক লোক দীক্ষার মাধ্যমে আমাকে তাদের মাস্টার করতে চায়।

ইতিহাস অনুযায়ী আমাদের এই সময়কালটা চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে আলাদা। নতজানু হয়ে প্রণাম করার অর্থ কী কাউকে মাস্টার হিসাবে স্বীকার করা। আমরা এইসব রীতিনীতি পালন করি না। অনেকে মনে করে: ‘‘যদি আমি প্রণাম করি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পবিত্র হৃদয়ে বুদ্ধর পূজা করি, তাহলে গোংগ বেড়ে যাবে।’’ আমি বলব, ওসব হাস্যকর ব্যাপার, সত্যিকারের সাধনা সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে, কোনো কিছুর জন্যে প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। বুদ্ধকে পূজা করার প্রয়োজন নেই, ধূপকাঠি জ্বালানোরও প্রয়োজন নেই, একজন সাধকের আদর্শ অনুযায়ী সত্যিকারের সাধনা করলে বুদ্ধ তোমাকে দেখে বেশ খুশিই হবেন। যদি তুমি বাইরে সবসময় খারাপ কাজ কর, আর এখানে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তাঁকে প্রণাম কর, তাহলে তিনি তোমাকে দেখে খুশি হবেন না। এটাই কি সত্যি নয়? সত্যিকারের সাধনা তোমার নিজের উপরেই নির্ভর করে। আজ তুমি আমাকে প্রণাম করলে এবং দীক্ষার মাধ্যমে আমার শিষ্য হলে, কিন্তু দরজার বাইরে গেলেই যা খুশি তাই করবে, তাহলে এর কী প্রয়োজন? আমরা এইধরনের রীতি-নীতির কথা বলি না, তুমি সম্ভবত আমার নামও খারাপ করতে পার।

আমরা তোমাদের সবাইকে এত কিছু দিয়েছি, অতএব তোমরা যতক্ষণ সত্যি সত্যি সাধনা করতে থাকবে এবং নিজেরা দাফা-র আবশ্যকতা কঠোরভাবে মেনে চলবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের শিষ্য হিসাবে পরিচালিত করব। যতক্ষণ তোমরা ফালুন দাফা-র সাধনা করবে, আমরা তোমাদের শিষ্য হিসাবে পরিচালিত করব। তুমি সাধনা করতে না চাইলে, আমরা কিছুই করতে পারব না। তুমি সাধনা না করলে শুধু নামটা বয়ে নিয়ে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় অনুশীলন পর্বের শিক্ষার্থী হতে পার, শুধুমাত্র ক্রিয়াগুলির অনুশীলন করলেই আমাদের শিষ্য হয়ে যাবে কি? তোমাকে অবশ্যই আমাদের চরিত্রের আদর্শ অনুযায়ী সত্যিকারের সাধনা করে যেতে হবে, শুধু তাহলেই সুস্থ সবল শরীর পাবে, শুধু তাহলেই সত্যিকারের উঁচুস্তরে উঠতে পারবে। সেইজন্যে আমরা এইসব আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলি না, যতক্ষণ তুমি সাধনা করে যাবে, ততক্ষণ তুমি আমাদের এই পদ্ধতির সাধক। আমার ফা-শরীর সবকিছু জানে, তুমি কী চিন্তা করছ সবই সে জানে, সে সবকিছুই করতে পারে। তুমি সাধনা না করলে সে তোমার তত্ত্বাবধান করবে না, তুমি সাধনা করলে সে তোমাকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করে যাবে।

কোনো কোনো চিগোংগ পদ্ধতির শিক্ষার্থী, যে কখনও মাস্টারের দেখাই পায়নি, সে বলে যে, কোনো বিশেষ দিকে মুখ করে প্রণাম করলে এবং কয়েক শত য়ুয়ান প্রদান করলে এতেই কাজ হয়ে যাবে। এটা কি নিজেকে এবং একই সাথে অন্যদেরও প্রতারণা করা হল না? এর উপরে ওই লোকটি খুবই একনিষ্ঠ হয়ে পড়ে, এর পর থেকে সে তার চিগোংগ পদ্ধতিকে এবং মাস্টারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, সে অন্যদের বলে যে তারা যেন অন্য চিগোংগ পদ্ধতি না শেখে। আমার এটা দেখে খুবই হাস্যকর মনে হয়। কিছু লোক ''মস্তক স্পর্শ করা *(মো ডিংগ)*[63]'' পদ্ধতি মেনে চলে, কেউ জানে না এই স্পর্শের ফলে কী কাজ হয়।

তন্ত্রবিদ্যার নাম নিয়ে যারা চিগোংগ শেখাচ্ছে তারাই যে শুধু প্রতারক তা নয়, যারা বৌদ্ধধর্মের নাম নিয়ে চিগোংগ শেখাচ্ছে তারাও প্রতারক। প্রত্যেকে চিন্তা কর, কয়েক হাজার বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের সাধনা পদ্ধতি ওই রকমই আছে, কেউ যদি তাকে পাল্টে দেয় তাহলে সেটাকে কি বৌদ্ধধর্ম বলা যাবে? একটা সাধনা পদ্ধতি হচ্ছে বুদ্ধত্বের জন্যে গম্ভীর সাধনা, এছাড়া সেটা অত্যন্ত রহস্যময়, একটা সামান্য পরিবর্তনও সবকিছু ওলট-পালট করে দেবে। যেহেতু গোংগ-এর রূপান্তর প্রক্রিয়াটা খুবই জটিল ব্যাপার, সে কী অনুভব করছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিছু অনুভব করার উপরে সাধনা নির্ভর করে না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একরকমের সাধনা পদ্ধতি, যা একবার পাল্টে দিলে সেটা তখন আর সেই পদ্ধতি থাকবে না। প্রত্যেক সাধনা পদ্ধতির জন্যে একজন করে মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে থাকেন, এবং প্রত্যেক পদ্ধতির সাধনার মাধ্যমে অনেক মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তার আবির্ভাব হয়েছে। কেউই ইচ্ছামতো একটা সাধনা পদ্ধতির পরিবর্তন করতে সাহস পায় না, অথচ একজন সামান্য চিগোংগ মাস্টার, তার কী এমন শক্তিশালী সদ্‌গুণ আছে যে সে ওই তত্ত্বাবধায়ক মাস্টারের সঙ্গে প্রতারণা করছে এবং বুদ্ধ সাধনা পদ্ধতির পরিবর্তন করছে? যদি সত্যিই এটার পরিবর্তন করা হয়, তখন সেটা কি আর ওই পদ্ধতি থাকবে? নকল চিগোংগ পদ্ধতিকে আলাদা করে চেনা যায়।

---

[63] *মো ডিংগ* - মস্তক স্পর্শ করা, কিছু চিগোংগ মাস্টার লোকেদের মাথার উপরটা স্পর্শ করে শক্তি প্রদান করে।

রহস্যময় মার্গের স্থাপনা

‘‘রহস্যময় মার্গের স্থাপনা’’ কে ‘‘রহস্যময় এক রন্ধ্র’’ও বলা যায়। এই নামগুলি *দ্যান জিংগ, তাও জাংগ* আর *শিংগ মিংগ গুইঝি*[64] নামক বইগুলিতে পাওয়া যেতে পারে। তাহলে ব্যাপারটা কী? অনেক চিগোংগ মাস্টারই এই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার করে বলতে পারে না। তার কারণ একজন সাধারণ চিগোংগ মাস্টার, তার স্তর অনুযায়ী এটার কিছুই দেখতে পারে না এবং তার দেখার অনুমতিও নেই। একজন সাধক যদি এটা দেখতে চায় তবে তাকে জ্ঞান দৃষ্টির উপরের স্তরে অথবা তারও উপরের স্তরে পৌঁছাতে হবে। একজন সাধারণ চিগোংগ মাস্টার এই স্তরে পৌঁছাতে পারে না, সেইজন্যে সে এগুলো দেখতে পায় না। পুরো ইতিহাস জুড়ে সাধক সমাজে এটা আলোচিত হয়ে আসছে যে রহস্যময় মার্গ কী? রহস্যময় এক রন্ধ্র কোথায় আছে? কীভাবে একে স্থাপন করা যায়? *দ্যান জিংগ, তাও জাংগ,* আর *শিংগ মিংগ গুইঝি* এই সব বইতে তুমি দেখবে যে তারা সবাই তত্ত্বগুলিকে ঘিরেই আলোচনা করে গেছে, মূল বিষয়টা নিয়ে তোমাকে কিছুই বলেনি। তারা আলোচনার পর আলোচনা করেই গেছে এবং তোমাকে আরও বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, কেউই বিষয়টা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেনি, তার কারণ এই মূল বিষয়টা সাধারণ লোকের জানার কথা নয়।

আরও আমি তোমাদের বলব, যেহেতু তোমরা আমাদের ফালুন দাফা-র শিষ্য, একমাত্র সেইজন্যেই আমি এই কথাগুলো বলব: কখনোই বিভ্রান্তিকর চিগোংগ বইগুলি পড়বে না, আমি উপরে উল্লেখিত কয়েকটি প্রাচীন বই-এর কথা বলছি না, এখনকার লোকেদের লেখা বিকৃত চিগোংগ বইগুলির কথা বলছি, এমনকী তুমি ওগুলো খুলেও দেখবে না। তোমার মনে এই সামান্যতম চিন্তাটুকুও যদি আসে: ‘‘বাঃ, এই বাক্যটা বেশ ভালো।’’ অর্থাৎ যখনই এই চিন্তাটা তোমার মনের মধ্যে একটা ঝিলিক দিয়ে যাবে, তক্ষুনি ওই বই থেকে ভর করা সত্তা উঠে এসে তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে। অনেক বই-ই লেখা হয়েছে ভর করা সত্তার প্রভাবে, যেগুলো মানুষের খ্যাতি এবং লাভের প্রতি আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে

---

[64] *শিংগ মিংগ গুইঝি* - মন এবং শরীরের সাধনায় পথ নির্দেশ, চীন দেশের সাধনা অনুশীলনের গ্রন্থ।

পারে। নকল চিগোংগ বই প্রচুর, সত্যিই প্রচুর আছে, অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক আছে যারা সত্তা ভর করা অবস্থায় বিভ্রান্তিকর সব জিনিস লেখে। এমনকী উপরোক্ত কয়েকটি প্রাচীন বই এবং এই ধরনের অন্য প্রাচীন বইগুলোও না পড়াই ভালো, কারণ সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ থাকার প্রশ্নটা এসে যায়।

চীনের চিগোংগ সমিতির একজন কর্মকর্তা আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিল, শুনে আমার ভীষণ হাসি পেয়েছিল। সে বলেছিল যে বেজিংয়ে একজন লোক ছিল, যে সর্বদা চিগোংগ-এর উপরে বক্তৃতাগুলো শুনতে যেত। সে একটার পর একটা বক্তৃতা শুনেই যাচ্ছিল, এইভাবে বেশ কিছু কাল শোনার পরে তার মনে হল যে সে যা শুনেছে, চিগোংগ তার থেকে বেশী কিছু নয়। যেহেতু সবাই একই স্তরে ছিল, সেইজন্যে তারা একই জিনিস বলতো। অন্য নকল চিগোংগ মাস্টারদের মতো তারও মনে হল এগুলিই চিগোংগ-এর অন্তর্নিহিত বিষয়! তখন সেও চিগোংগ-এর উপরে বই লিখতে চাইল। সবাই চিন্তা কর, যে ব্যক্তি চিগোংগ অনুশীলন করে না সেও চিগোংগ বই লিখতে চাইছে। বর্তমানে চিগোংগ বইগুলোতে তুমি তার থেকে নকল করছ, সে তোমার থেকে নকল করছে। সে লিখতে থাকল, লিখতে লিখতে যেই রহস্যময় মার্গের বিষয়টা এসে গেল তখন তার লেখা আর এগোতে পারছিল না। কে এটা ভালোভাবে জানে যে রহস্যময় মার্গ কী? সত্যিকারের চিগোংগ মাস্টারদের মধ্যেও কয়েকজন ছাড়া কারোরই এটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই। সে একজন নকল চিগোংগ মাস্টারের কাছে জানতে চাইল। সে জানত না যে এই চিগোংগ মাস্টার নকল, কারণ সে চিগোংগ সম্বন্ধে মূলত কিছুই জানে না। কিন্তু এই নকল চিগোংগ মাস্টার যদি এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে তাহলে অন্য লোকেরা কি তাকে নকল মনে করবে না? সেইজন্যে সে সাহস করে আজগুবি একটা উত্তর দিল যে, রহস্যময় এক রন্ধ্র পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে থাকে। শুনে খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে। তোমরা হাসবে না, কারণ বইটা ইতিমধ্যে চিগোংগ সমিতি থেকে প্রকাশিতও হয়ে গেছে। সেইজন্যে এটাই বলতে চাই যে আমাদের এখনকার চিগোংগ বইগুলো কতটা হাস্যকর স্তরে পৌঁছে গেছে, তুমিই বলো যে এইরকম বই পড়ে তোমার কী কাজ হবে, কোনো কাজ হবে না, এগুলো কেবল লোকেদের ক্ষতিই করতে পারে।

রহস্যময় মার্গ-এর স্থাপনা কী? কোনো ব্যক্তির ত্রিলোক-ফা সাধনার সময়ে, তার সাধনা যখন মাঝামাঝি স্তর পার করে যাবে অথবা ত্রিলোক ফা

সাধনার উঁচু স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন ওই ব্যক্তির অমর শিশুর বিকাশ শুরু হয়। অমর শিশু এবং আমাদের উল্লেখিত দিব্য শিশু দুটো আলাদা ব্যাপার। দিব্য শিশু খুব ছোট, চঞ্চল এবং দুরন্ত হয়। অমর শিশু নড়াচড়া করে না, মূল আত্মা একে নিয়ন্ত্রণ করে না, সে স্থির হয়ে বসে থাকে, সে হাত দুটোর একটা আর একটার উপরে একত্রে রাখে, এবং পা দুটোর একটা আর একটার উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে পদ্মফুলের উপরে বসে থাকে। অমর শিশু দ্যান ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়ে বাড়তে থাকে, অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে যখন সে সূচের অগ্রভাগের থেকেও ছোট থাকে তখনও তাকে দেখা সম্ভব।

এছাড়া আর একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার, সত্যিকারের দ্যান ক্ষেত্র একটাই আছে, তলপেটের জায়গায়। এই ক্ষেত্রটা থাকে, একজন ব্যক্তির শরীরের মধ্যে *হুইয়িন*[65] আকুপাংচার বিন্দুর উপরে এবং পেটের নীচে। অনেক ধরনের গোংগ, অনেক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা, অনেক ধরনের ক্ষমতাশালী জিনিস, ফা-শরীর, অমর শিশু, দিব্য শিশু, এবং আরও অনেক অনেক প্রাণসত্তা এই ক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

অতীতে কয়েকজন সাধক ঊর্ধ্ব দ্যান ক্ষেত্র, মধ্য দ্যান ক্ষেত্র, এবং নিম্ন দ্যান ক্ষেত্রের কথা বলেছিল, আমি বলব যে তারা ভুল বলেছিল। কিছু লোক বলে যে তাদের মাস্টাররা বংশানুক্রমে এগুলো শিখিয়ে গেছে এবং বইতেও লেখা আছে। আমি সবাইকে বলব যে প্রাচীন কালেও বিকৃতি ছিল, যদিও কিছু জিনিস এত বছর ধরে হস্তান্তরিত হয়ে চলে আসছে তথাপি সেটা অবধারিতভাবে ঠিক নাও হতে পারে। কিছু নীচুস্তরের পার্থিব পদ্ধতি, সাধারণ লোকেদের মধ্যে সর্বদাই হস্তান্তরিত হয়ে আসছে কিন্তু সেগুলো দিয়ে সাধনা করা যায় না, এবং কোনো কাজেরও নয়। তারা যেটাকে ঊর্ধ্ব দ্যান ক্ষেত্র, মধ্য দ্যান ক্ষেত্র, অথবা নিম্ন দ্যান ক্ষেত্র বলে, সেক্ষেত্রে তারা এটাই বোঝাতে চায় যে, যে জায়গায় দ্যান উৎপন্ন হবে সেটাই দ্যান ক্ষেত্র। এটা কি হাসির কথা নয়? যদি কেউ অনেকক্ষণ ধরে মনকে কোনো একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে রাখে, তখন সেখানে শক্তিপুঞ্জ উৎপন্ন হবে যা দ্যান তৈরি করবে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো, তুমি তোমার মনকে বাহুর উপরে কেন্দ্রীভূত কর এবং এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে রাখ, তাহলে দ্যান তৈরি হবে। অতএব কিছু লোক এইরকম পরিস্থিতি

---

[65] *হুইয়িন* - পায়ু এবং জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত একটি আকুপাংচার বিন্দু।

দেখে বলতো যে দ্যান ক্ষেত্র সব জায়গায় আছে, এটা শুনে আরও হাস্যকর মনে হয়। তারা মনে করে যেখানে দ্যান তৈরি হয়, সেটাই দ্যান ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে এটা একটা দ্যান, কিন্তু ক্ষেত্র নয়। তুমি হয়তো বলবে দ্যান সব জায়গায় আছে অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দ্যান, মধ্য দ্যান, নিম্ন দ্যান, এইভাবে বললে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ক্ষেত্র মাত্র একটাই আছে যা সত্যি সত্যি উৎপন্ন করে অসংখ্য ফা এবং এটার অবস্থান তলপেটের জায়গায়। সেজন্যে ঊর্ধ্ব দ্যান ক্ষেত্র, মধ্য দ্যান ক্ষেত্র, নিম্ন দ্যান ক্ষেত্র এইসব কথাগুলো ভুল। কেউ মনকে অনেকক্ষণ কোথাও কেন্দ্রীভূত করে রাখলে, সেখানেই দ্যান উৎপন্ন হবে।

অমর শিশুর জন্ম হয় তলপেটের দ্যান ক্ষেত্রে এবং এটা ধীরে ধীরে আরও বাড়তে থাকে এবং আরও বড়ো হতে থাকে। বাড়তে বাড়তে যখন পিংপং বলের মতো বড়ো হয়, তখন তার পুরো শরীরের গড়নটা স্পষ্ট দেখা যায়, এবং নাক, চোখ সব তৈরি হয়ে যায়। যখন অমর শিশু পিংপং বলের মতো বড়ো হয়ে যায়, তখন তার ঠিক পাশে একটা ছোট গোল বুদ্বুদ্ তৈরি হয়। উৎপন্ন হওয়ার পরে, অমর শিশুর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্বুদ্-এরও বৃদ্ধি হতে থাকে। যখন অমর শিশুর উচ্চতা চার ইঞ্চির মতো হয়ে যায়, তখন একটা পদ্মফুলের পাপড়ি আবির্ভূত হয়। যখন অমর শিশুর উচ্চতা পাঁচ ছয় ইঞ্চির মতো হয়, তখন পদ্মফুলের পাপড়িগুলো মূলত তৈরি হয়ে যায়, পদ্মফুলের পাপড়িগুলোর একটা থাক দৃশ্যমান হয়, উজ্জ্বল সোনার অমর শিশু একটা সোনার পদ্মফুলের থালার উপরে বসে আছে, দেখতে অতীব সুন্দর। এটাই হচ্ছে অবিনাশী বজ্রশরীর, যাকে বুদ্ধ মতে বলা হয়, ‘‘বুদ্ধ শরীর’’ এবং তাও মতে বলা হয়, ‘‘অমর শিশু।’’

আমাদের এই পদ্ধতিতে দুই রকম শরীরের সাধনা করা হয়, দুটোরই প্রয়োজন আছে, মূল শরীরেরও রূপান্তর দরকার। সবাই এটা জান যে, বুদ্ধশরীরকে সাধারণ লোকেদের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেওয়া যায় না। অনেক প্রচেষ্টার পরে এর আকারটা দেখা যেতে পারে, এবং সাধারণ লোকের চোখ দিয়ে এর জ্যোতি দেখা যেতে পারে। যাই হোক এই ভৌতিক শরীরটা রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পরেও সাধারণ মানুষদের মধ্যে একে সাধারণ মানুষের শরীরের মতোই দেখতে লাগবে, সাধারণ মানুষ দেখে বুঝতে পারবে না, যদিও এই শরীরটা মাত্রাগুলোর মধ্যে যাতায়াত করতে পারবে। যখন অমর শিশুর উচ্চতা চার-পাঁচ ইঞ্চি হয়, হাওয়া বুদ্বুদ্-এর উচ্চতাও ততটাই হয়। এটা ঠিক হাওয়া বেলুনের ঝিল্লির মতো এবং স্বচ্ছ।

অমর শিশু ধ্যানমুদ্রায় স্থির হয়ে বসে থাকে। এতটা বড়ো হয়ে যাওয়ার পরে, হাওয়া বুদ্বুদ্ দ্যান ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে চায়, কারণ এটা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে পরিণত হয়ে গেছে, ‘‘তরমুজ পেকে গেলে যেমন বোঁটা থেকে ছিঁড়ে পড়ে যায়’’, এটাও সেইরকম উপরে উঠতে চায়। উপরে ওঠার প্রক্রিয়াটা খুবই ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু এর ওঠাটা প্রত্যেকদিন দেখা যায়। এটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে। আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান করি তাহলে এর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারব।

যখন এটা একজন ব্যক্তির বুকের ঠিক মাঝখানে *তানঝোংগ*[66] বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন সেখানে কিছুটা সময়ের জন্যে অবস্থান করে। কারণ মানুষের শরীরের মূল উপাদান এবং অনেক জিনিস (হৃৎপিন্ডও এখানে থাকে) হাওয়া বুদ্বুদের মধ্যে নিজেদের একটা সেট সৃষ্টি করে। মূল উপাদানের জিনিসগুলি দিয়ে হাওয়া বুদ্বুদ্-এর সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিছুটা সময় চলে গেলে, এটা আবার উপরে উঠতে শুরু করে। যখন এটা গলার মধ্যে দিয়ে যেতে থাকে, তখন সেই ব্যক্তির শ্বাসরোধ অনুভব হতে থাকে, যেন সমস্ত রক্তনালী অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, বোধ হয় যেন জায়গাটা ফুলে গেছে এবং খুব কষ্ট হতে থাকে, ব্যাপারটা একদিনে বা দুদিনেই কেটে যায়। এরপরে এটা মাথায় পৌঁছে যায়। আমরা একে বলি ‘‘নিওয়ানে আরোহণ।’’ যদিও আমরা বলছি যে এটা নিওয়ানে পৌঁছে গেছে, প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার সম্পূর্ণ মস্তিষ্কের মতোই এতটা বড়ো, তুমি বোধ করবে যেন তোমার মাথাটা ফুলে উঠেছে। যেহেতু নিওয়ান মানব শরীরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান, সেইজন্যে এর মূল উপাদানের জিনিসগুলি বুদ্বুদ্-এর মধ্যে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। এরপরে বুদ্বুদ্ দিব্য চক্ষুর সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে, সংকুচিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, তখন ওখানে খুব কষ্ট বোধ হতে থাকে। দিব্য চক্ষু ফুলে গিয়ে ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে, কপালের পাশের রগদুটো ফুলে উঠে, চোখ দুটো যেন ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে থাকে। এই বোধগুলো হতে থাকে যতক্ষণ না বুদ্বুদ্ দিব্য চক্ষুর সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সংকুচিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই, সঙ্গে সঙ্গে কপালের জায়গায় ঝুলে পড়ে, একেই বলে রহস্যময় মার্গের স্থাপনা-----এটা এখানেই ঝুলতে থাকে।

---

[66] *তানঝোংগ* - বুকের মাঝখানে অবস্থিত একটি আকুপাংচার বিন্দু।

যাদের দিব্যচক্ষু খোলা আছে, তারা এই সময়ে কিছুই দেখতে পায় না। কারণ বুদ্ধ এবং তাও মতের সাধনায় রহস্যময় মার্গ-এর আভ্যন্তরীণ জিনিসগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করার জন্যে, এর সব দরজা বন্ধ রাখা হয়। এখানে সামনে দুটো বড়ো দরজা আর পিছনে দুটো দরজা থাকে, সেগুলো সবই বন্ধ থাকে, ঠিক বেজিং-য়ের তিয়েনআনমান-এর প্রবেশ পথ এর মতো, যার দুই দিকে দুটো করে বড়ো দরজা আছে। রহস্যময় মার্গকে তাড়াতাড়ি তৈরি করার জন্যে এবং সমৃদ্ধ করার জন্যে, দরজাগুলো অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া খোলা হয় না। যারা দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখতে পারে, এই পর্যায়ে তারা কিছুই দেখতে পারে না---তাদের দেখতে দেওয়া হয় না। এটার ওখানে ঝুলে থাকার উদ্দেশ্যটা কী? কারণ আমাদের শরীরের শয়ে শয়ে শক্তি নাড়ী এখানে এসে মিলিত হয়েছে, এই সব শক্তিনাড়ী অবশ্যই রহস্যময় মার্গের ভিতর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে আবার ফিরে আসবে, এদের সবারই রহস্যময় মার্গে যাওয়া চাই। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রহস্যময় মার্গের মধ্যে আরও কিছু ভিত্তি স্থাপন করা এবং এই জিনিসগুলোর একটা সেট তৈরি করা। যেহেতু মানুষের শরীর একটা ছোট বিশ্বের মতো, এটা একটা ছোট জগৎ তৈরি করবে যার মধ্যে মানুষের শরীরের মূল উপাদানের জিনিসগুলি সব তৈরি হয়ে থাকবে। কিন্তু এটা শুধু তৈরি করার জন্যে এক সেট সহায়ক ব্যবস্থা মাত্র, এখনও পুরোপুরি ক্রিয়াশীল নয়।

চিমেন মতে[67]-র সাধনা পদ্ধতিতে রহস্যময় মার্গ খোলা থাকে। যখন রহস্যময় মার্গ বাইরে প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটা একটা নলের আকারে থাকে, ধীরে ধীরে এটা গোলাকার হয়ে যায়, সেইজন্যে এর দুই দিকের দরজাগুলি খোলা থাকে। যেহেতু চিমেন মতে বুদ্ধের সাধনা বা তাও-এর সাধনা করা হয় না, সেইজন্যে একজন ব্যক্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। বুদ্ধ মত এবং তাও মতের অন্তর্ভুক্ত অনেক মাস্টার আছেন, তাঁরা সবাই তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন, অতএব তোমার দেখার প্রয়োজন নেই, এবং তুমি কোনো সমস্যাতেও পড়বে না। কিন্তু চিমেন মতে ব্যাপারটা সেইরকম নয়, সে অবশ্যই নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে, সেইজন্যে তাকে অবশ্যই দেখার ক্ষমতাটা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু সেইসময়ে দিব্য চক্ষু দিয়ে জিনিসগুলোকে দেখলে তখন সেটা দূরবিনের নল দিয়ে দেখার মতন মনে হবে। এই জিনিসগুলোর একটা সেট তৈরি

[67] চিমেন পদ্ধতি - অ-প্রথাসিদ্ধ সাধনা পথ।

হওয়ার পরে, প্রায় এক মাসের মতো সময় কেটে যাওয়ার পরে এটা ভিতরে ফিরতে শুরু করে। মাথার ভিতরে ফিরে যাওয়ার পরে, সেটাকে বলা হয় ''রহস্যময় মার্গের অবস্থানের পরিবর্তন।''

রহস্যময় মার্গ ফিরে আসার সময়েও তোমার মাথাটা ফুলে গেছে বোধ হবে এবং কষ্ট হতে থাকবে। এবার এটা মাথার পিছনের *য়ুঝেন*[68] বিন্দু দিয়ে সংকুচিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়, এই সংকুচিত হয়ে বাইরে যাওয়ার সময়েও তোমার খুব কষ্ট বোধ হতে থাকবে, মনে হবে যেন মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তখন এটা একবারে বাইরে বেরিয়ে যাবে এবং এটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি বোধ হবে। বাইরে বেরনোর পরে রহস্যময় মার্গ খুব গভীর একটা মাত্রায় ঝুলতে থাকে এবং এটা ওই খুব গভীর মাত্রায় শারীরিক আকারে বিদ্যমান থাকে, সেইজন্যে ঘুমানোর সময়ে ওটার উপর চাপ পড়ে না। কিন্তু একটা কথা আছে, যখন রহস্যময় মার্গ প্রথমবার স্থাপন করা হয়, তোমার বোধ হবে যেন চোখের সামনে কিছু একটা আছে। যদিও এটা অন্য মাত্রাতে থাকে, তোমার চোখের সামনে সবসময়ে আবছা আবছা বোধ হবে, ঠিক যেন কোনো একটা জিনিস তোমার চোখের সামনে বাধা সৃষ্টি করছে, যা খুব একটা আরামদায়ক নয়। যেহেতু য়ুঝেন আকুপাংচার বিন্দু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বড়ো মার্গ সেহেতু এখানেও মাথার পিছনে এর জিনিসগুলোর একটা সেট তৈরি করা প্রয়োজন। এবার রহস্যময় মার্গ শরীরের মধ্যে আবার প্রবেশ করতে শুরু করে। ''রহস্যময় এক রন্ধ্র'' বলতে ঠিক একটা রন্ধ্রকে বোঝায় না, কারণ এটা অনেকবার অবস্থান বদল করে। এটা নিওয়ানে পৌঁছানোর পরেই নীচে নামতে শুরু করে। এটা শরীরের মধ্যে দিয়ে নীচে নেমে সোজাসুজি পিঠের নিম্নভাগের মাঝখানে *মিংগমেন*[69] আকুপাংচার বিন্দুতে পৌঁছায়। এই মিংগমেন বিন্দুতে এটা আবার বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

এই মিংগমেন বিন্দু মানব শরীরের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য আকুপাংচার বিন্দু। তাও মতে একে বলে রন্ধ্র এবং আমরা বলি মার্গ *(গুয়ান)*, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মুখ্য মার্গ, এটা সত্যিকারের লোহার দরজার মতো যার মধ্যে অগুনতি লোহার দরজার স্তর রয়েছে। সবাই জান

---

[68] *য়ুঝেন* - মাথার পিছনের নীচের অংশে অবস্থিত আকুপাংচার বিন্দু।

[69] *মিংগমেন* - ''জীবনের দ্বার'' পিঠের নীচের অংশের মাঝখানে অবস্থিত একটি আকুপাংচার বিন্দু।

যে মানব শরীরে অনেকগুলি স্তর রয়েছে, আমাদের এখনকার এই দেহের কোষগুলি একটা স্তর, এর ভিতরের অণুগুলি আর একটা স্তর, পরমাণু, প্রোটন, ইলেকট্রন, অনন্ত সূক্ষ্ম কণা, এবং অনন্ত সূক্ষ্ম কণারও অনন্ত সূক্ষ্ম কণা, এই অন্তিম সূক্ষ্ম কণা পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা করে দরজার স্তর স্থাপন করা আছে। সেইজন্যে অসংখ্য অলৌকিক শক্তি, প্রচুর কলাকৌশলগত জিনিস, সবকিছু এই বিভিন্ন স্তরের দরজাগুলির ভিতরে তালাবন্ধ থাকে। অন্য পদ্ধতিগুলিতে দ্যান-এর সাধনা করা হয়, দ্যান-এর বিস্ফোরণের সময়ে প্রথমেই মিংগমেন বিন্দুর বিস্ফোরিত হয়ে খোলাটা আবশ্যক, এটা বিস্ফোরিত হয়ে না খুললে অলৌকিক শক্তিগুলি মুক্ত হতে পারে না। রহস্যময় মার্গ এই জিনিসগুলোর একটা সেট মিংগমেন বিন্দুতে তৈরি করার পরে আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। শরীরে প্রবেশ করে এটা তখন তলপেটের জায়গায় ফিরতে শুরু করে, একেই বলে ‘‘রহস্যময় মার্গের যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন।’’

ফিরে আসার পরে রহস্যময় মার্গ তার উৎপত্তিস্থলে ফেরে না, ওই সময়ে অমর শিশু ইতিমধ্যে অনেকটা বড়ো হয়ে যায়, হাওয়া বুদ্বুদ্ অমর শিশুকে ঢেকে দেয় এবং ঘিরে থাকে। অমর শিশু বাড়তে থাকে, সেটাও একসাথে বাড়তে থাকে। তাও মতে, সাধারণত অমর শিশুর চেহারা যখন ছয় বা সাত বছরের বাচ্চার মতো হয়, তখন একে শরীরের বাইরে যেতে দেওয়া হয়, যাকে বলে ‘‘অমর শিশুর পৃথিবীতে জন্ম হওয়া।’’ একজন ব্যক্তির মূল আত্মার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এটা শরীরের বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে। মানব শরীরটা স্থির হয়ে থাকে, নড়াচড়া করে না, মূল আত্মা বাইরে বেরিয়ে যায়। সাধারণত বুদ্ধ মতে সাধনার মাধ্যমে অমর শিশু যখন সেই ব্যক্তির মতো বড়ো হয়ে যায় তখন তার কোনো বিপদের ভয় থাকে না। এই সময়ে তাকে সাধারণত শরীর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার এবং শরীর থেকে আলাদা হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, সে শরীরের বাইরে বের হতে পারে। এই সময়ে অমর শিশু সেই ব্যক্তির সমান বড়ো হয়ে যায়, আচ্ছাদনটাও বড়ো হয়ে যায়, আচ্ছাদনটা এমনকী তার শরীরের বাইরেও বর্ধিত হয়ে যায়, এটাই হচ্ছে রহস্যময় মার্গ। অমর শিশু এতটা বড়ো হয়ে যাওয়ার কারণে, এটা স্বাভাবিক ভাবেই শরীরের বাইরে বর্ধিত হয়ে যায়।

তোমরা হয়তো মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তি দেখে থাকবে, এবং দেখেছ যে বুদ্ধ সবসময় একটা বৃত্তের মধ্যে থাকেন, বিশেষত বুদ্ধের ছবিতে, সবসময়েই একটা বৃত্ত থাকে, যার মধ্যে বুদ্ধ বসে আছেন। বুদ্ধের

অনেক প্রতিমূর্তিই এইরকম। বিশেষ করে অতীতের মন্দিরগুলোতে বুদ্ধের ছবি সব এইরকম। একজন বুদ্ধ একটা বৃত্তের মধ্যে বসে থাকেন কেন? কেউই এটা পরিষ্কার করে বলেনি। আমি তোমাদের বলছি যে, এটাই রহস্যময় মার্গ। কিন্তু এখন একে আর রহস্যময় মার্গ বলা যাবে না। একে বলা হয় ‘‘স্বর্গ,’’ যদিও প্রকৃতপক্ষে একে স্বর্গ বলা যায় না। এতে শুধু অনেক সেট সহায়ক ব্যবস্থা থাকে, ঠিক যেমন একটা কারখানায় উৎপাদনের জন্যে এক সেট সহায়ক ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না, এখানে অবশ্যই শক্তির উৎস এবং কাঁচামাল থাকবে, একমাত্র তাহলেই উৎপাদন হবে। কয়েক বছর আগে অনেক সাধক বলতো: ‘‘আমার গোংগ-এর উচ্চতা বোধিসত্ত্বের থেকেও বেশী অথবা আমার গোংগ-এর উচ্চতা বুদ্ধের থেকেও বেশী,’’ এটা শুনে অন্য লোকেদের কাছে সেটা খুব দুর্বোধ্য মনে হতো। প্রকৃতপক্ষে তারা যা বলেছিল সেটা কিন্তু একটুও দুর্বোধ্য নয়, বাস্তবিক এই পৃথিবীতে সাধনা করে গোংগ-কে অবশ্যই খুব উঁচুতে নিয়ে যেতে হবে।

এইরকম পরিস্থিতি কীভাবে সম্ভব যে, একজন ব্যক্তি সাধনা করে বুদ্ধের থেকে উঁচুতে পৌঁছে গেছে? এটা ঠিক এইভাবে উপরে উপরে বোঝা সম্ভব নয়, তার গোংগ সত্যিই খুব উঁচুতে আছে। এর কারণ সে সাধনা করতে করতে খুব উঁচু স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে, যখন তার সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্তি ঘটবে, ঠিক সেইসময়ে তার গোংগ সত্যিই খুব উঁচুতে থাকে। তার অলৌকিক শক্তির বিকাশ এবং সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্তির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, তার নিজের গোংগ-এর দশ ভাগের আট ভাগ তার চরিত্রের মান সমেত কম করে দেওয়া হয়। আর এই শক্তি তার স্বর্গকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন হয়, যা তার নিজস্ব স্বর্গ। তোমরা সবাই জান যে একজন সাধককে এই গোংগ এবং বিশেষভাবে তার চরিত্রের মান প্রাপ্ত করার জন্যে, জীবনভর অসংখ্য কষ্ট সহ্য করে, কঠিন পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে দৃঢ় থাকতে হয় এবং সাধনা চালিয়ে যেতে হয়। সেইজন্যে এটা অত্যন্ত মূল্যবান, এই মূল্যবান জিনিসের দশ ভাগের আট ভাগ দিয়ে তার স্বর্গ সমৃদ্ধ হয়। সেইজন্যে ভবিষ্যতে সে যখন সাধনায় সাফল্য লাভ করবে, সে যা কিছু পাওয়ার চিন্তা করবে হাত বাড়ালেই সেটা পাবে, সে যা চাইবে তাই পাবে, সে যা করতে চাইবে তাই করতে পারবে, সবকিছুই তার স্বর্গে থাকবে। এটাই তার প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন সদ্‌গুণ যা সে নিজে কষ্ট সহ্য করে সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

সে এই শক্তিকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো কিছুতে রূপান্তরিত করতে পারে। সেইজন্যে বুদ্ধ যদি কিছু চায়, কিছু খেতে চায়, কিছু খেলতে চায়, সে সবকিছুই পাবে, এগুলি তার নিজের সাধনার থেকেই উপলব্ধ হয়েছে, এটাই তার বুদ্ধ অবস্থান, এটা ছাড়া তার সাধনা সফল হতো না। এই সময়ে এটাকে তার নিজস্ব স্বর্গ বলা যায়, আর দশ ভাগের যে দুই ভাগ গোংগ অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়ে তার সাধনা পূর্ণতা লাভ করবে এবং তাও প্রাপ্তি ঘটবে। যদিও দশভাগের মধ্যে শুধু দুই ভাগ মাত্র গোংগ অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু তার শরীর আর তালাবন্ধ থাকবে না। সে তার শরীর নাও রাখতে পারে অথবা রাখতেও পারে, কিন্তু তার শরীর ইতিমধ্যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, সেই সময়ে সে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিরাটভাবে প্রদর্শন করতে পারে, যা ক্ষমতার দিক দিয়ে অতুলনীয়। যখন সে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করছিল সেই সময়ে সচরাচর তার শরীর তালাবন্ধ অবস্থায় থাকত এবং বড়ো কোনো ক্ষমতা থাকত না, তার গোংগ যত উঁচুই হোক না কেন তাকে সংযত রাখা হতো, আর এখন এটা অন্যরকম।

বক্তৃতা - পাঁচ

ফালুন প্রতীক

আমাদের ফালুন দাফা-র প্রতীক হচ্ছে ফালুন। যাদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তারা দেখতে পারবে যে ফালুন ঘুরেই যাচ্ছে। আমাদের ওই ছোট ফালুন ব্যাজ-এর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, এটা ঘুরেই যাচ্ছে। বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা অনুযায়ী আমাদের এই সাধনা পরিচালিত হচ্ছে। আমরা বিশ্বের বিবর্তনের নিয়মানুযায়ী অনুশীলন করি, সেইজন্যে আমাদের এই সাধনা খুবই বিশাল। এক অর্থে ফালুনের এই ছবিটা হচ্ছে এই বিশ্বেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। বুদ্ধ মতে এই বিশ্বকে দশ দিক সম্পন্ন জগৎ হিসাবে ধারণা করা হয়, এতে আছে চারটে পাশ এবং আটটা দিক, সম্ভবত কিছু লোক ফালুনের উপরে এবং নীচে একটা করে শক্তিস্তম্ভ দেখতে পায়, সেইজন্যে যখন এর উপরটা এবং নীচটা যোগ করা হবে, তখন ফালুন সত্যিই একটা দশ দিক সম্পন্ন জগৎ-এর মতো হবে, যা দিয়ে এই বিশ্ব গঠিত এবং এটা বুদ্ধ মত অনুযায়ী এই বিশ্বের সার কথাকে উপস্থাপন করে।

অবশ্য এই বিশ্বের মধ্যে আছে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, আমাদের এই ছায়াপথও এর অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র বিশ্ব গতিশীল, এই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জগুলিও গতিশীল, সেইজন্যে এই ফালুন-এর ছবিতে অবস্থিত তাইজি প্রতীকগুলো এবং ছোট 卍 (শ্রীবৎস)[70] প্রতীকগুলোও ঘুরছে, সম্পূর্ণ ফালুন-ও ঘুরছে এবং মাঝখানের বড়ো 卍 প্রতীকটাও ঘুরছে। এক বিশেষ অর্থে একে আমাদের ছায়াপথের প্রতীকী রূপ বলা যায়, একই সাথে আমরা যেহেতু বুদ্ধ মতানুসারী সেইজন্যে মধ্যিখানটাতে বুদ্ধ মতের প্রতীক রাখা হয়েছে, এটা উপর থেকে এইরকমই দেখতে। সমস্ত বিভিন্ন ধরনের

---

[70]শ্রীবৎস চিহ্ন - স্বস্তিক চিহ্ন, সংস্কৃত ভাষায় ‘‘আলোক চক্র’’ বা প্রকাশ চক্র, এই চিহ্নটি 2500 বছরেরও পূর্বে প্রাচীন গ্রীস, পেরু, ভারত এবং চীনে পাওয়া গেছে। বহু শতাব্দী ধরে এটি সৌভাগ্যের প্রতীক, সূর্যের প্রতীক এবং দৈবশক্তির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পদার্থের অন্য মাত্রাগুলিতে অস্তিত্বের রূপ বিদ্যমান, ঐ অন্য মাত্রাগুলোর মধ্যে এদের অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ভীষণ জটিল এক বিবর্তন প্রক্রিয়া এবং অস্তিত্বের রূপ বিদ্যমান। এই ফালুন প্রতীক হচ্ছে বিশ্বেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, অন্য সব মাত্রাতেও এর অস্তিত্বের রূপ ও বিবর্তন প্রক্রিয়া বিদ্যমান, সেইজন্যে আমি একে বলি একটা জগৎ।

যখন ফালুন ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঘোরে তখন সে নিজে নিজেই বিশ্বের থেকে শক্তি শোষণ করে। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরার সময়ে শক্তিটাকে বাইরে ছেড়ে দেয়, ভিতরের দিকে (ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী) ঘোরার সময়ে নিজেকে উদ্ধার করে, বাইরের দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) ঘোরার সময়ে অন্য লোকেদের উদ্ধার করে, এটা আমাদের এই সাধনার বৈশিষ্ট্য। কিছু লোক বলে: ‘‘আমরা তো বুদ্ধ মতের অনুগামী, তাহলে এর মধ্যে তাইজি-ও আছে কেন? এই তাইজি তাও মতের নয় কি?’’ এর কারণ আমরা যে সাধনা করি সেটা খুবই বিশাল, এটা সমগ্র বিশ্বের সাধনা করার সমান। তাহলে সবাই চিন্তা কর: এই বিশ্বে দুটো বড়ো সাধনার পদ্ধতি আছে, বুদ্ধ মত ও তাও মত, এর মধ্যে কোনো একটাকে বাদ দিলে এই বিশ্ব অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, তাকে সম্পূর্ণ বিশ্ব বলা যাবে না। সেইজন্যে আমাদের এখানে তাও মতের জিনিসও রয়েছে। কিছু লোক বলে: ‘‘শুধু তো তাও মত নয়, এছাড়াও আছে খৃষ্টান ধর্ম, কনফুসিয়াস ধর্ম, এবং আরও অন্য সব ধর্ম ইত্যাদি।’’ আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, কনফুসিয়াস মতের সাধনায় অত্যন্ত উচ্চস্তরে পৌঁছে গেলে সেটা তাও মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আবার অনেক পশ্চিমের ধর্মগুলিতে সাধনায় উচ্চস্তরে পৌঁছে গেলে সেগুলো বুদ্ধ মতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সেগুলো বুদ্ধ মতের একই সাধনা প্রণালীর অন্তর্গত। অর্থাৎ এইরকম দুটোই বড়ো প্রণালী আছে।

তাহলে তাইজি-র দুটো নকশার মধ্যে একটাতে উপরেরটা লাল, নীচেরটা নীল এবং আর একটাতে উপরেরটা লাল, নীচেরটা কালো, এইরকম কেন? আমরা সাধারণত চিন্তা করি যে, তাইজি সাদা এবং কালো এই দুটো পদার্থ দিয়ে তৈরি অর্থাৎ য়িন এবং য়িয়াংগ এই দুটো চি। এই বিবেচনা খুবই ভাসাভাসা স্তরের, তাইজির প্রকাশ বিভিন্ন মাত্রাতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সর্বোচ্চ স্তরে এর যে প্রকাশ সেখানে এর রঙটা এই রকম। আমরা সাধারণত তাও সম্বন্ধে ভাবি যে এর উপরটা লাল এবং নীচটা কালো। উদাহরণস্বরূপ আমাদের কিছু লোকের দিব্য চক্ষু খুলে গেছে। তারা

আবিষ্কার করেছে যে, খালি চোখে তারা যেটাকে লাল দেখছে সেটাই কেবল একটা স্তর দূরের অন্য মাত্রাতে সবুজ দেখতে। ওই সোনালি হলুদ রঙকে অন্য মাত্রাতে নীলাভ লাল দেখায়, এর এইরকম বৈসাদৃশ্য আছে, অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রাতে রঙের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন হতে থাকে। উপরটা লাল এবং নীচটা নীল, এই তাইজি-টা মহান আদি তাও মতের অন্তর্ভুক্ত, চিমেন সাধনা পদ্ধতিও এর অন্তর্ভুক্ত। চারপাশে চারটে ছোট 卍 প্রতীক বুদ্ধ মতের, এগুলো এবং মাঝখানে যেটা আছে সবই একরকম, সবই বুদ্ধ মতের। এই ফালুনের রঙগুলো অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, আমরা এটাকেই ফালুন দাফা-র প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করি।

আমরা দিব্যচক্ষুর মধ্যে দিয়ে যখন ফালুন-কে দেখব তখন এটা আবশ্যক নয় যে রঙগুলো একই রকম থাকবে। এর পশ্চাতপটের রঙ পাল্টাতে পারে, কিন্তু রূপরেখা পাল্টায় না। তোমার তলপেটে আমার স্থাপন করা যে ফালুনটা ঘুরছে, সেটা তুমি দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখার সময়ে লাল হতে পারে, বেগুনি হতে পারে, সবুজ হতে পারে, আবার কোনো রঙ ছাড়াও হতে পারে। এর পশ্চাতপটের রঙ লাল থেকে কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশী নীল, নীল এবং বেগুনি এইভাবে নিরন্তর পাল্টাতে থাকে। এর ফলে তুমি যেটা দেখবে সেটা হয়তো অন্য রঙ। কিন্তু এর মধ্যে থাকা 卍 প্রতীকের এবং তাইজির রঙ এবং রূপরেখা পাল্টায় না। আমাদের মনে হয়েছে যে নকশাটার পশ্চাতপটের এই রঙটা দেখতে তুলনামূলকভাবে ভালো, সেইজন্যে এই রঙটা রেখেছি। যাদের অলৌকিকক্ষমতা আছে তারা এই মাত্রা ভেদ করে অনেক অনেক জিনিস দেখতে পারে।

কিছু লোকের বক্তব্য: ‘‘এই 卍 প্রতীক দেখে হিটলারের জিনিস মনে হয়।’’ আমি সবাইকে বলছি, এই প্রতীকটা নিজে কোনো সামাজিক বর্গের ধারণাকে সূচিত করে না। কিছু লোকের বক্তব্য: ‘‘এই প্রতীকটার কোনা যদি ঘুরিয়ে এই দিকে কাত করে দেওয়া যায় তাহলে এটা হিটলারের জিনিস হয়ে যাবে।’’ এটা এইরকম নয়, কারণ এটা দুদিকেই ঘোরে। আমাদের এই মানবসমাজ দুই হাজার পাঁচশ’ বছর আগে শাক্যমুনির সময়ে, এই চিহ্নটাকে ব্যাপকভাবে জানতে পেরেছিল। হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এখন পর্যন্ত শুধু কয়েকটা দশক মাত্র পার হয়েছে, সে এই প্রতীককে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল। কিন্তু যে রঙ সে ব্যবহার করেছিল সেটা ছিল আমাদের থেকে আলাদা, সেটা কালো ছিল, এছাড়া সেটার কোনা উপরের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো ছিল এবং এটা

খাড়া অবস্থায় ব্যবহার করা হয়েছিল। এই ফালুন সম্বন্ধে আমি এতটাই বলব, আমরা শুধু এর বাইরের চেহারাটা নিয়েই আলোচনা করলাম।

তাহলে বুদ্ধ মতের ক্ষেত্রে এই 卍 প্রতীক কী নির্দেশ করে? কিছু লোক বলে এটা সৌভাগ্যের নির্দশন, এটা সাধারণ লোকেদের ব্যাখ্যা। আমি সবাইকে বলব যে এই 卍 প্রতীক একজন বুদ্ধের স্তরের সূচক, একমাত্র বুদ্ধস্তরে পৌঁছালে তবেই এটা পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব এবং অর্হৎ-এর এটা থাকে না। তবে মহান বোধিসত্ত্বদের, চারজন মহান বোধিসত্ত্বদের সবারই এটা আছে। আমরা দেখেছি যে এই মহান বোধিসত্ত্বরা সবাই সাধারণ বুদ্ধের স্তরকে অতিক্রম করে অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন, এমনকী তথাগতর থেকেও উঁচুতে আছেন। তথাগত স্তরের উপরে অনেক বুদ্ধ আছেন যা গুনে শেষ করা যাবে না। তথাগতর শুধু একটা 卍 প্রতীক আছে। যাঁরা তথাগতর স্তরের উপরে পৌঁছে গেছেন, তাদের 卍 প্রতীক আরও বেশী হতে থাকে। যিনি বুদ্ধ স্তরের দ্বিগুণ উপরে আছেন তাঁর দুটো 卍 প্রতীক থাকে, যাঁরা আরও উঁচুতে, তাঁদের তিনটে, চারটে, পাঁচটা, এমনকী এত বেশী থাকে যে সারা শরীর ঢেকে যায়। মাথায়, কাঁধে, হাঁটুতেও এগুলো আবির্ভূত হয়। অনেক বেশী হয়ে গিয়ে স্থানসংকুলান নাহলে হাতের তালুতে, হাতের আঙ্গুলে, পায়ের পাতায়, পায়ের আঙ্গুলে ইত্যাদি সব জায়গায় এই প্রতীকের আবির্ভাব হয়। প্রতিনিয়ত এই স্তর উঁচু হতে থাকলে, এই 卍 প্রতীকও প্রতিনিয়ত বেশী করে বাড়তে থাকবে। সেইজন্যে এই 卍 প্রতীক বুদ্ধের স্তর নির্দেশ করে। বুদ্ধের স্তর যত উঁচু হতে থাকবে তাঁর তত বেশী 卍 প্রতীক থাকবে।

চিমেন পদ্ধতি

বুদ্ধ মত এবং তাও মত ছাড়াও, চিমেন পদ্ধতি আছে, যাকে তারা নিজেরা বলে চিমেন সাধনা। আমাদের সাধারণ লোকেদের সাধনা পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে এইরকম ধারণা আছে: চীনের প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত লোকেরা বুদ্ধ মত এবং তাও মত এই দুটোকেই প্রথাসম্মত সাধনা পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে, তারা এগুলোকেই সৎ সাধনা পদ্ধতি মনে করে। এই চিমেন অনুশীলন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত কোনোদিনই সেইভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি। খুব কম লোকই এর অস্তিত্ব

সম্বন্ধে অবগত আছে, এবং সেটাও শুধুমাত্র শিল্প সাহিত্যের কাজকর্ম থেকেই শুনেছে।

চিমেন পদ্ধতি আছে কি? আছে। আমার সাধনা পর্বের, বিশেষ করে শেষের বছরগুলিতে আমার সঙ্গে চিমেন মতের তিনজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের পদ্ধতির সারবস্তু আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন, যেগুলো খুবই অতুলনীয় জিনিস এবং সত্যিই ভালো। যেহেতু এই জিনিসগুলো খুব অতুলনীয়, সেইজন্যে এদের অনুশীলন থেকে বিকশিত হওয়া জিনিসগুলো খুবই অদ্ভুত হয়, সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না। এর উপরে এই পদ্ধতির লোকেরা এই কথাটাও বলে যে তারা বুদ্ধ-ও নয়, তাও-ও নয়; বুদ্ধের সাধনাও করে না এবং তাও-এর সাধনাও করে না। যখন লোকেরা শুনল যে তারা বুদ্ধের সাধনাও করে না অথবা তাও-এর সাধনাও করে না, তখন এর নাম দিল ''পার্শ্বপথ'' অথবা ''অপ্রথাসম্মত পথ'', কিন্তু তারা নিজেরা বলে চিমেন পদ্ধতি। পার্শ্বপথ অথবা অপ্রথাসম্মত পথ নামকরণটা মর্যাদাহানিকর হতে পারে, কিন্তু নেতিবাচক নয়, এর অর্থ এই নয় যে এটা অশুভ পদ্ধতি, সেটা নিশ্চিত। এমনকী এর আক্ষরিক অর্থটাও একে অশুভ পদ্ধতি হিসাবে সূচিত করে না। ইতিহাস অনুযায়ী, বুদ্ধ মত এবং তাও মত, এই দুটোকেই ''সৎ সাধনা পদ্ধতি'' বলা হতো। লোকেরা এই চিমেন পদ্ধতিকে বুঝতে পারত না বলে নাম দিয়েছিল পার্শ্বপথ অথবা অপ্রথাসম্মত পথ, অর্থাৎ সৎ সাধনা পথ নয়। ''অপ্রথাসম্মত পথ'' বলতে বোঝায় '' একটা গোলমেলে পথ '', প্রাচীন চীনদেশীয় শব্দভান্ডার অনুযায়ী সাধারণভাবে এইরকমই অর্থ বোঝায়।

তাহলে এগুলো অশুভ পদ্ধতি নয় কেন? কারণ এই পদ্ধতিতেও চরিত্রকে কঠোরভাবে বজায় রাখা আবশ্যক, এদের লোকেরাও বিশ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী সাধনা করে, এরাও এই বিশ্বের প্রকৃতিকে ও বিশ্বের নিয়মকে অমান্য করে না, এরাও খারাপ কাজ করে না, সেইজন্যে এগুলোকে অশুভ পদ্ধতি বলা যায় না। বুদ্ধ মত এবং তাও মত, এই দুটোকে সৎ সাধনা পদ্ধতি বলার কারণ এটা নয় যে এই বিশ্বের প্রকৃতি এই দুটো পদ্ধতির অনুরূপ, বরঞ্চ কারণটা হচ্ছে বুদ্ধ মতের এবং তাও মতের এই দুটো সাধনা পদ্ধতি এই বিশ্বের প্রকৃতিকে মেনে চলে। একটা চিমেন পদ্ধতির সাধনাতেও এই বিশ্বের প্রকৃতিকে মেনে চলা আবশ্যক, সেক্ষেত্রে এটা অশুভ পদ্ধতি নয়, একই সাথে এটা সৎ সাধনা পদ্ধতি, এর

কারণ ভালো-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায় বিচারের মানদণ্ড হচ্ছে বিশ্বের প্রকৃতি। এদের সাধনা প্রকৃতিকে মেনেই করা হয়, সেইজন্যে এটাও সৎ সাধনা পথ। যদিও এদের সাধনার জন্যে বিশেষ আবশ্যকতা বুদ্ধ মত এবং তাও মতের থেকে আলাদা। এই পদ্ধতিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করা হয় না, এর প্রচারের পরিধি খুবই ছোট। তাও মতে অনেক শিষ্যকে শেখানো হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু একজন শিষ্যই সত্যিকারের শিক্ষাটা পায়, বুদ্ধ মতে সমস্ত জীবন সত্তার উদ্ধারের কথা বলা হয়, যে সাধনা করতে পারবে সেই সাধনা করবে।

চিমেন পদ্ধতি দুজনের কাছে হস্তান্তর করা যায় না, অনেকটা লম্বা সময়ের ইতিহাসে শুধু একজন ব্যক্তিকেই বেছে নিয়ে শেখানো হয়। সেইজন্যে পুরো ইতিহাসে সাধারণ লোকেরা এইসব জিনিস দেখতে পারেনি। অবশ্য চিগোংগ যখন জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছিল, সেই সময়ে আমি দেখেছিলাম যে, এদের কিছু লোক জনসমক্ষে এসে শেখাতে শুরু করেছিল, কিন্তু এইভাবে শেখাতে শেখাতে তারা আবিষ্কার করল যে, এটা সম্ভব হবে না। কারণ কিছু জিনিস শেখানোর ক্ষেত্রে তাদের মাস্টারের একেবারেই অনুমতি ছিল না। তুমি জনসাধারণের মধ্যে কিছু প্রচার করতে চাইলে, কখনোই শিক্ষার্থীদের বেছে নিতে পারবে না। যারা শিখতে আসবে তাদের চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন স্তরের হবে। তারা নানান রকমের মানসিকতা নিয়ে শিখতে আসবে, কত রকমের সব মানুষ সেখানে আসবে, অতএব তুমি শিষ্য বাছাই করে শেখাতে পারবে না। সেইজন্যে চিমেন সাধনা পদ্ধতি কখনোই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হয়নি, এরকম করলে সহজেই বিপদ ঘটতে পারে, কারণ এদের জিনিসগুলো সত্যিই অসাধারণ।

কিছু লোক ভাবে যে, বুদ্ধ মতের সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধ হয় এবং তাও মতের সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হয়, তাহলে কোনো শিক্ষার্থী চিমেন পদ্ধতির সাধনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে সে কী হবে? সে একজন বিচরণকারী অমর জীবন হবে, তাঁর এই বিশ্বে নির্দিষ্ট কোনো সীমানা থাকবে না। তোমরা সবাই জান যে তথাগত বুদ্ধের আছে সাহা স্বর্গ; অমিতাভ বুদ্ধের আছে পরমানন্দময় স্বর্গ; ভেষজ বুদ্ধের আছে পান্না স্বর্গ; প্রত্যেক তথাগত বুদ্ধের এবং মহান বুদ্ধের একটা করে নিজস্ব স্বর্গ আছে। প্রত্যেক মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা একটা করে নিজস্ব স্বর্গ নির্মাণ করেন, যার মধ্যে তাঁর প্রচুর শিষ্য জীবনযাপন করে। চিমেন পদ্ধতিতে তাঁর এই

বিশ্বে নির্দিষ্ট কোনো সীমানা থাকবে না, তিনি হবেন ঠিক যেন একজন ভ্রাম্যমান দেবতা বা বিচরণকারী অমর জীবন।

অশুভ পদ্ধতির অনুশীলন

অশুভ পদ্ধতির অনুশীলন কী? এটা কয়েক রকমের হয়: এক ধরনের লোকেরা বিশেষভাবে এই অশুভ পদ্ধতির চর্চা করে, কারণ বংশপরম্পরায় এই জিনিস লোকেদের মধ্যে দিয়ে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। কেন তারা এই সব জিনিস হস্তান্তরিত করেছে? কারণ তারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে খ্যাতি, লাভ এবং অর্থের পিছনে ছুটে বেড়িয়েছে, তারা এতেই মনোযোগ দিয়েছে। অবশ্যই এই সব লোকেদের চরিত্র উঁচু হয় না এবং এদের গোংগ প্রাপ্তি হয় না। তারা তাহলে কী পায়? কর্ম। যদি কোনো ব্যক্তির কর্মের পরিমাণ বিরাট হয়ে যায়, সেটা একরকম শক্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু তার কোনো স্তর থাকে না, একজন সাধকের তুলনায় সে কিছুই নয়, যদিও সাধারণ লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার থাকতে পারে। কারণ এই কর্মও শক্তির একটা প্রকাশ, এর ঘনত্ব খুব বেশী হয়ে গেলে, এটা মানব শরীরের অলৌকিক ক্ষমতারও শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে, এটা এইভাবেও কার্যকরী হতে পারে। সেইজন্যে সব সময়েই কিছু লোক এই জিনিস শিখিয়ে আসছে। তাদের বক্তব্য: ‘‘আমি খারাপ কাজ করব, লোকেদের গালাগালি দেব, আমার গোংগ বাড়তে থাকবে।’’ তাদের গোংগ বাড়ছে না, প্রকৃতপক্ষে ওই কালো পদার্থের ঘনত্ব বাড়ছে, কারণ খারাপ কাজ করে তারা প্রাপ্ত হয় কালো পদার্থ-----কর্ম। সেইজন্যে তারা তাদের নিজস্ব জন্মগত সামান্য কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে এই কর্ম দিয়ে শক্তিশালী করতে পারে, এইভাবে তাদের মধ্যে সামান্য কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বিকশিত হতে পারে, কিন্তু সেরকম বড়ো কিছু কাজ তারা করতে পারে না। এই ধরনের লোকেরা মনে করে যে, খারাপ কাজ করার মাধ্যমে তারা গোংগ বৃদ্ধি করতে পারে, এটাই তাদের তত্ত্ব।

কিছু লোক বলে, ‘‘তাও যদি এক ফুট লম্বা হয়, তাহলে অসুর দশ ফুট লম্বা হবে।’’ এটা সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রচলিত অধার্মিক কথা, একটা অসুর কখনোই তাও-এর থেকে উঁচু হতে পারে না। এখানে পরিস্থিতি হচ্ছে এইরকম যে, আমরা মানবজাতি যে বিশ্বটাকে জানি সেটা শুধু অসংখ্য বিশ্বের মধ্যে একটা ছোট বিশ্ব মাত্র, আমরা একে সংক্ষেপে

বিশ্ব বলে থাকি। আমাদের এই বিশ্ব সুদূর অতীতে প্রত্যেকবার একটা লম্বা সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে, এক মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হতো। এই মহাপ্রলয় এই বিশ্বের সমস্ত কিছু, এমনকী গ্রহগুলো সমেত, সমস্ত জীবনও ধ্বংস করে দিতে পারত। এই বিশ্বের গতিরও একটা নিয়ম আছে, আমাদের বিশ্বের এখনকার পর্যায়ে, শুধু যে মানবজাতি খারাপ হয়েছে তা নয়। অনেক জীবন সত্তা ইতিমধ্যে একটা পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছে যে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দূর অতীতে আমাদের এই বিশ্বের মহাকাশের মধ্যে একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এটা দেখতে পারছে না, কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবিনের সাহায্যে যা আমরা দেখতে পারছি, সেগুলো একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষেরও পূর্বের ঘটনা। বর্তমানে জ্যোতিষ্কগুলোতে যে পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলোকে দেখতে চাইলে আমাদের অবশ্যই আরও এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আলোকবর্ষ পার হয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, যা খুবই দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার।

বর্তমানে সমগ্র বিশ্ব ইতিমধ্যে একটা খুব বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকবার যখনই এইরকম পরিবর্তন ঘটে, সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জীবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়, সম্পূর্ণ বিনাশকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকবার এইরকম ঘটনা ঘটলে পূর্বতন বিশ্বের বিদ্যমান প্রকৃতি এবং সমস্ত বস্তু বিস্ফোরণে উড়ে যায়। সাধারণভাবে এই বিস্ফোরণে সমস্ত জীবনেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রত্যেকবার বিস্ফোরণের সময়ে সবকিছুই পুরোপুরি মুছে যায় না। যখন খুব উঁচু স্তরের মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা নতুন বিশ্ব পুনঃনির্মাণ করেন, তখন এর মধ্যে বিস্ফোরণে মৃত্যু না হওয়া কিছু জীবন রয়ে যায়। মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা এই নতুন বিশ্বকে তাঁদের নিজেদের প্রকৃতি এবং আদর্শ অনুযায়ী নির্মাণ করেন, সেইজন্যে এই বিশ্বের প্রকৃতি আগের বিশ্বের থেকে আলাদা।

বিস্ফোরণে যাদের মৃত্যু হয় না তারা এই বিশ্বের কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের আগেকার স্বভাব এবং নিয়মনীতি বজায় রাখে। কিন্তু নতুনভাবে নির্মিত এই বিশ্ব, কিছু করার ক্ষেত্রে নতুন বিশ্বের প্রকৃতি ও নিয়মনীতি মেনে চলে। সেইজন্যে যাদের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় না তারা এই বিশ্বের নিয়মনীতির মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরে পরিণত হয়। কিন্তু তারা অতটা খারাপ নয়, তারা শুধু আগের পর্বের বিশ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজকর্ম করতে থাকে, এদেরই লোকেরা ‘‘স্বর্গীয় অসুর’’ বলে থাকে। কিন্তু সাধারণ

মানুষের ক্ষেত্রে তারা কোনো ভয়ের কারণ নয়, তারা কখনোই লোকেদের ক্ষতি করে না। তারা শুধু কাজকর্ম করার সময়ে ওইসব আগেকার নিয়মনীতি ধরে রাখে। অতীতে সাধারণ লোকেদের এই সব জিনিস জানতে দেওয়া হতো না। আমি তোমাদের বলব যে তথাগত স্তরের উপরে প্রচুর বুদ্ধ আছেন যাদের অবস্থান অনেক উঁচুতে, এই অসুররা কোনো হিসাবের মধ্যেই আসে না। যদি তুলনা করা যায় তাহলে এরা অতি ক্ষুদ্র। বার্ধক্য, ব্যাধি, এবং মৃত্যু এগুলোও এক ধরনের অসুর, কিন্তু এগুলোও সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বের প্রকৃতিকে বজায় রাখার জন্যে।

বুদ্ধ মতে পূনর্জন্মের 'ছ'টা পথের উল্লেখ আছে, সেখানে একটা অসুরের পথের বিষয়েও বলা আছে, প্রকৃতপক্ষে এরা অন্য মাত্রার জীবনসত্তা, মানুষের মূল প্রকৃতি বহন করে না। মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের চোখে এরা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা এদের নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষদের চোখে এরা খুবই ভয়ংকর। এদের কিছুটা শক্তি থাকে, এরা সাধারণ মানুষকে একরকম জন্তু হিসাবে গণ্য করে, এরা মানুষকে ভোজন করতে পছন্দ করে। কয়েক বছর হল এরাও বাইরে এসে চিগোংগ-এর প্রচার করছে। এদের কী ধরনের জিনিস হিসাবে গণ্য করা যায়? এদের বিকাশ কি মানুষেরই মতন.? এরা মানুষের পক্ষে খুবই ভয়ের ব্যাপার, কারণ তুমি এদের জিনিস শিখলে তোমাকে এদের কাছে যেতে হবে এবং তুমি এদেরই একজন হয়ে যাবে। কিছু লোক অনুশীলনের সময়ে খারাপ চিন্তা করে, যদি এদের চিন্তাধারার সঙ্গে সেটা মিলে যায়, তাহলে এরা তোমাকে শেখাতে আসবে। একটা সৎ ভাব একশ'টা অশুভকে দমিয়ে রাখতে পারে, যদি তুমি কোনো কিছুর পিছনে না ছোট, তাহলে কেউই তোমাকে বিরক্ত করতে সাহস করবে না। যদি তোমার মধ্যে অশুভ চিন্তার উদয় হয়, এবং তুমি খারাপ জিনিসের পিছনে ছোট, তাহলে এরা তোমাকে সাহায্য করতে আসবে, এবং তুমি আসুরিক পথের সাধনা অনুসরণ করবে, তখন এই সমস্যার উদয় হবে।

আর একটা অবস্থা আছে যাকে বলে, ''নিজের অজান্তে অশুভ পদ্ধতির অনুশীলন।'' নিজের অজান্তে অশুভ পদ্ধতি অনুশীলন কাকে বলে? অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজে না বুঝেই অশুভ পদ্ধতি অনুশীলন করছে। এই ব্যাপারটা খুবই সার্বজনীন এবং খুবই ব্যাপক। ঠিক যেমন আগের দিন বলেছিলাম যে অনেক লোক অশুভ চিন্তা নিয়ে অনুশীলন করে। তুমি তাদের কাউকে দেখেছ যে সে দন্ডায়মান অবস্থায় শারীরিক

ক্রিয়া করছে, কিন্তু তার হাত এবং পা, ক্লান্তিতে কাঁপছে। অথচ তার মনও বিশ্রামে নেই, সে ভাবছে: ‘‘জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমাকে কিছু কেনাকাটা করতেই হবে, শারীরিক ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলেই কিনতে চলে যাব, তা নাহলে দাম বেড়ে যাবে।’’ আর একজন লোক হয়তো চিন্তা করছে: ‘‘কর্মস্থলে এখন ফ্ল্যাট বন্টন করা হচ্ছে, আমি কি একটা পাব না? ফ্ল্যাট বিলি করা লোকটার সঙ্গে আমার কখনোই বনিবনা হয় না।’’ যতই সে এটা চিন্তা করতে থাকে ততই তার ক্রোধ বাড়তে থাকে: ‘‘ও নিশ্চয়ই আমাকে ফ্ল্যাট দেবে না। আমি ওর সাথে কীভাবে মোকাবিলা করব-----’’ সব ধরনের চিন্তা তার মনে উদয় হতে থাকে। আমি যেরকম আগেই বলেছি, তারা সর্বদা পরিবারের বিষয় থেকে শুরু করে দেশের বড়ো বড়ো ব্যাপার পর্যন্ত, সব জিনিস নিয়ে কথা বলতেই থাকে, এবং যে বিষয়টা তার ক্রোধ উদ্রেক করে, সেই বিষয়ে সে যত বেশী কথা বলতে থাকে তত তার ক্রোধ আরও বাড়তে থাকে।

চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে সদ্‌গুণ-এর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের শারীরিক ক্রিয়া করার সময়ে যদি ভালো চিন্তা করতে না পার, তাহলে অন্তত খারাপ চিন্তা করবেই না, সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনো কিছুই চিন্তা না কর। এর কারণ নীচু স্তরের চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে একটা ভিত্তি প্রস্তুত করতে হয়, এই ভিত্তিটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে, কারণ মানুষের চিন্তার কার্যকলাপের একটা নির্দিষ্ট প্রভাব আছে। সবাই চিন্তা কর যে তুমি তোমার গোংগ-এর মধ্যে কী সব জিনিস যোগ করছ? তোমার অনুশীলনের থেকে যেসব জিনিস বিকশিত হয়েছে সেগুলো কি ভালো? সেগুলো কি কালো নয়? কতজন লোক এই ধরনের চিন্তা ছাড়া চিগোংগ অনুশীলন করে? তুমি সবসময়ে শারীরিক ক্রিয়া করা সত্ত্বেও তোমার রোগ দূর হচ্ছে না কেন? যদিও কিছু লোক শারীরিক ক্রিয়া করার জায়গায় কোনো খারাপ চিন্তা করে না, কিন্তু ক্রিয়া করার সময়ে সর্বদা অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার চিন্তা করে, এটা পেতে চায়, সেটা পেতে চায়, তাদের আছে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অবস্থা এবং বিভিন্ন ধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। বস্তুত তারা নিজেরা ইতিমধ্যে অজান্তে অশুভ পদ্ধতি অনুশীলন করে যাচ্ছে, তুমি যদি বলো যে সে অশুভ পদ্ধতি অনুশীলন করছে, সে খুশি হবে না: ‘‘একজন বড়ো চিগোংগ মাস্টার আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।’’ কিন্তু এই বড়ো চিগোংগ মাস্টার তোমাকে সদ্‌গুণ-এর প্রতি গুরুত্ব দিতে বলেছেন, তুমি কি সেটা করেছিলে? তুমি যখন চিগোংগ-এর ক্রিয়া করছ, তখন সর্বদা কিছু খারাপ চিন্তা যোগ করছ, তুমিই বলো,

কীভাবে এর থেকে ভালো জিনিস বিকশিত হবে? এটাই হল সমস্যা, এটাই হচ্ছে নিজের অজান্তে অশুভ পদ্ধতি অনুশীলন করা, এটা খুবই সার্বজনীন।

পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা

সাধক সমুদায়ের মধ্যে একটা সাধনা পদ্ধতি আছে যাকে বলা হয় পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা। সম্ভবত তোমরা তিব্বতের তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতির কথা জান, যেখানে দেওয়ালে খোদাই করা বুদ্ধের মূর্তিতে বা চিত্র-তে একটা পুরুষের শরীর একটা মহিলার শরীরকে ধরে সাধনা করছে। পুরুষের শরীরের আকৃতিটা দেখতে কখনো কখনো বুদ্ধের মতো, ধরে আছে একটা নগ্ন মহিলার শরীর। কিছু ক্ষেত্রে বুদ্ধের রূপান্তরিত হওয়া শরীরটা ঠিক যেন বজ্রের প্রতিমূর্তি, ষাঁড়ের মতো মাথা এবং ঘোড়ার মতো মুখ, এও ধরে আছে একটা নগ্ন মহিলার শরীর। এইরকম কেন? আমরা প্রথমেই সবার কাছে এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করব। আমাদের এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র চীনদেশেই কনফুসিয়াস মতের প্রভাব ছিল না, কয়েক শতাব্দী পূর্বে, আমাদের সমগ্র মানবজাতির নৈতিক মূল্যবোধ মোটামুটি একই রকম ছিল। সেইজন্যে এই সাধনা পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি, এই পদ্ধতি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছিল, কিন্তু এই পদ্ধতিতে সত্যিই সাধনা করা সম্ভব। যখন এইরকম সাধনা পদ্ধতি আমাদের চীনদেশে প্রবর্তন করা হয়েছিল, তখন চীন দেশের লোকেরা এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেনি, কারণ এতে পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনার ব্যাপার ছিল এবং একটা অংশে ছিল কিছু গোপন অনুশীলন পদ্ধতি, সেইজন্যে তাংগ রাজবংশের হুই-ছ্যাংগ সময়কালে সম্রাটের দ্বারা এই পদ্ধতিকে হান ভুখন্ডে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছিল। অতএব এই পদ্ধতিকে হান ভূখন্ডে প্রচারের জন্যে সম্মতি দেওয়া হয়নি, সেইসময়ে একে বলা হতো তাংগ তন্ত্র বিদ্যা। কিন্তু তিব্বতের অনন্য বাতাবরণের জন্যে এবং এর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যতার কারণে, সেখানে এই পদ্ধতি প্রচার লাভ করেছিল। এইভাবে সাধনা কেন করা হয়? পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে য়িন সংগ্রহ করে য়িয়াংগ-এর ক্ষতিপূরণ করা এবং য়িয়াংগ সংগ্রহ করে য়িন-এর ক্ষতিপূরণ করা, এইভাবে এরা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে সাধনা করতে থাকে এবং য়িন-য়িয়াংগ এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্য অর্জন করে।

সবাই জান যে বুদ্ধ মতে এবং তাও মতে, বিশেষ করে তাও মতের য়িন-য়িয়াংগ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, মানুষের শরীরে য়িন এবং য়িয়াংগ এই দুয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। যেহেতু মানবশরীরে য়িন এবং য়িয়াংগ এই দুটোই আছে, সেইজন্যে এই শরীরের সাধনার মাধ্যমে অনেক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা এবং অমর শিশু, দিব্য শিশু, ফা-শরীর ইত্যাদি জীবনসত্তা সৃষ্টি হয়। য়িন-য়িয়াংগ শরীরে থাকার কারণে, কোনো ব্যক্তি সাধনার দ্বারা প্রচুর জীবনসত্তা বিকশিত করতে পারে। সেটা পুরুষের শরীর অথবা মহিলার শরীর যেটাতেই হোক না কেন, সব একই রকম, দ্যান ক্ষেত্রের জায়গায় ওইসব জীবনসত্তাগুলো উৎপন্ন হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, এই তত্ত্বটা খুবই সত্যি। তাও মতে সাধারণত মানুষের শরীরের উপরের অংশটাকে য়িয়াংগ এবং নীচের অংশটাকে য়িন হিসাবে ধরা হয়; শরীরের পশ্চাৎভাগকে য়িয়াংগ এবং সম্মুখভাগকে য়িন ধরা হয়; আবার শরীরের বাঁ দিকটাকে য়িয়াংগ এবং ডান দিকটাকে য়িন ধরা হয়। আমাদের চীন দেশে এইরকম কথা চালু আছে যে, শরীরের বাঁ দিকটা পুরুষ এবং ডান দিকটা মহিলা, কথাগুলো এখান থেকেই এসেছে এবং খুবই যুক্তিযুক্ত। যেহেতু মানব শরীরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই আছে য়িন এবং য়িয়াংগ, এই য়িন এবং য়িয়াংগ-এর পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবে এই শরীর য়িন ও য়িয়াংগ-এর মধ্যে ভারসাম্য অর্জন করতে পারে, এবং অনেক জীবন সত্তার জন্ম দিতে পারে।

এটা একটা বিষয় ব্যাখ্যা করেছে যে,, পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা পদ্ধতির প্রয়োগ না করেও, আমরা এইভাবে সাধনার খুব উচ্চস্তরে উঠতে পারি। যদি কেউ এই পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে, কিন্তু এটাকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে, তাহলে আসুরিক বাধা আসবে, তখন সেটা অশুভ পদ্ধতি হয়ে যাবে। যদি তন্ত্রবিদ্যার খুব উচ্চস্তরে পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে ভিক্ষু বা লামার সাধনার স্তর খুব উঁচু হওয়া আবশ্যক। সেইসময়ে তার মাস্টার তাকে পথপ্রদর্শন করে সাধনায় এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেহেতু তার চরিত্র খুব উন্নত, সে নিজেকে সংযত রাখতে পারবে, এবং অধঃপতিত হয়ে খারাপ কোনো কিছুতে রূপান্তরিত হবে না। আর যাদের চরিত্র খুব নীচুতে, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই এই পদ্ধতির প্রয়োগ করবে না, তা নাহলে তারা অশুভ পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করবে এটা নিশ্চিত। যেহেতু এদের চরিত্র সীমিত, আর সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং লালসা এরা ত্যাগ করতে পারেনি, এবং সেখানেই আছে এদের চরিত্রের মাপকাঠি, অতএব

একবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে, সেটা নিশ্চিতই অশুভ হবে। সেইজন্যে আমরা বলেছি যে এটাকে ইচ্ছামতো নীচু স্তরে প্রচার করলে সেটা অশুভ পদ্ধতিরই প্রচার করা হবে।

এই কয়েক বছর ধরে বেশ কিছু চিগোংগ মাস্টার পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা শেখাচ্ছে। এখানে আশ্চর্যের কী আছে? তাও মতেও, পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে, তবে এটাও ঠিক যে এর আবির্ভাব বর্তমানে হয়নি, এটা তাংগ রাজবংশের সময়ে শুরু হয়ছিল। তাও মতের মধ্যে পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা পদ্ধতির কীভাবে উদয় হল? তাও মতের তাইজি তত্ত্ব অনুযায়ী, মানব শরীর একটা ছোট বিশ্ব, যার মধ্যে আছে তার নিজস্ব য়িন এবং য়িয়াংগ। সমস্ত সত্যিকারের মহান সাধনা পদ্ধতি সেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে, কেউ ইচ্ছামতো একে পাল্টালে বা ইচ্ছামতো এতে কিছু জিনিস যোগ করলে, সেই পদ্ধতির জিনিসগুলোর মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং সেই সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। সেইজন্যে যদি তোমার পদ্ধতির মধ্যে পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনার ব্যাপার না থাকে, তাহলে কখনোই সেই সাধনা করবে না। যদি এটার প্রয়োগ কর, তাহলে বিপথগামী হবে এবং সমস্যায় পড়বে। বিশেষত আমাদের ফালুন দাফা-র এই পদ্ধতিতে, পুরুষ ও মহিলার যুগ্ম সাধনা নেই, আমরা এটা শেখাই না। এই বিষয়টাকে আমরা এইভাবেই দেখি।

মন এবং শরীরের সাধনা

মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনার বিষয়টা ইতিমধ্যে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা হচ্ছে চরিত্রের সাধনা ছাড়াও, একই সাথে শরীরের সাধনা করা, অন্য ভাবে বলা যায় যে একজন ব্যক্তির মূল শরীরের রূপান্তর ঘটবে। মূল শরীরের রূপান্তর প্রক্রিয়ার সময়ে মানবদেহের কোষসমূহ ধীরে ধীরে উচ্চশক্তি সম্পন্ন পদার্থ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে থাকবে এবং বয়স বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মন্থর হয়ে যাবে। শরীরটাকে দেখে মনে হবে যেন তারুণ্যের দিকে ফিরে যাচ্ছে, এই ফিরে যাওয়া ধীরে ধীরে ঘটতে থাকবে এবং রূপান্তরও ধীরে ধীরে ঘটতে থাকবে। শেষে শরীরটা সম্পূর্ণরূপে উচ্চশক্তির পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবে। তখন ওই ব্যক্তির শরীর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে অন্য ধরনের পদার্থের শরীরে

রূপান্তরিত হয়ে যাবে। আমি যেরকম বলেছিলাম, ওই ধরনের শরীর, পঞ্চতত্ত্ব পেরিয়ে গেছে, সেটা আর এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে নেই, তার ওই শরীরটা হচ্ছে এক অক্ষয় শরীর।

মঠের সাধনায় শুধু মনেরই সাধনা করা হয়, সেইজন্যে শারীরিক ক্রিয়ার কথা বলা হয় না, শরীরের সাধনার কথা বলাও হয় না, এখানে নির্বাণের শিক্ষা দেওয়া হয়। শাক্যমুনি যে পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন তাতে নির্বাণের কথা বলেছিলেন, বাস্তবিক শাক্যমুনির নিজের খুব উচ্চস্তরের মহান ধর্ম ছিল, তিনি তাঁর মূল শরীরকে সম্পূর্ণরূপে উচ্চশক্তির পদার্থে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন, যা তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সাধনা পদ্ধতিকে লোকেদের মধ্যে রেখে যাওয়ার জন্যে নিজে নির্বাণের পথ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কেন এইভাবে শিখিয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন লোকেরা যেন তাদের আসক্তিগুলোকে যত দূর সম্ভব ত্যাগ করতে পারে, সমস্ত কিছুই যেন ত্যাগ করতে পারে, এমনকী সবশেষে এই শরীরকেও যেন ত্যাগ করতে পারে, কোনো আসক্তিই যেন আর না থাকে। তিনি চেয়েছিলেন লোকেরা যেন যতদূর সম্ভব এটা করতে পারে, সেইজন্যে তিনি নির্বাণের পথ গ্রহণ করেছিলেন, এবং বৌদ্ধভিক্ষুরা সবাই চিরকাল নির্বাণের পথ গ্রহণ করে গেছেন। নির্বাণের অর্থ, একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু মৃত্যুর পরে, তাঁর ভৌতিক শরীরকে ফেলে দেয়, তাঁর নিজের মূল আত্মা তার গোংগ সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে।

তাও মতে শরীরের সাধনার উপরে জোর দেওয়া হয়, যেহেতু তারা শিষ্য বাছাই করে নেয়, এবং সমস্ত জীবের উদ্ধারের কথা বলে না, তাদের কাছে শিখতে আসা লোকেরা খুব ভালো হয়, সত্যিই ভালো হয়, সেইজন্যে তারা কলাকৌশল-এর ব্যাপার শেখায় এবং কীভাবে শরীরের সাধনা করতে হয় সেই বিষয় নিয়ে শেখায়। কিন্তু বুদ্ধ মতের এই নির্দিষ্ট সাধনা পদ্ধতিতে, আরও বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের সাধনায় এটা শেখানো হয় না। তবে এরকম নয় যে, কোনো পদ্ধতিতেই এটা শেখানো হয় না। বুদ্ধ মতের অনেক উচ্চস্তরের সাধনা পদ্ধতিতে এটা শেখানো হয়, আমাদের পদ্ধতিতেও এটা শেখানো হয়। আমাদের এই ফালুন দাফা পদ্ধতিতে মূল শরীরের প্রয়োজন আছে এবং অমর শিশুরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু এ দুটো পৃথক ব্যাপার। অমর শিশুর শরীরও একরকম উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দিয়ে গঠিত, কিন্তু একে ইচ্ছামতো আমাদের এই মাত্রাতে প্রদর্শন করানো যাবে না। আর এই মাত্রাতে অনেকদিন যাবৎ আমাদের এই সাধারণ

মানুষের মতো রূপকে ধরে রাখার জন্যে, আমাদের মূল শরীরের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সেইজন্যে মূল শরীরের রূপান্তরের পরে, যদিও এর কোষসমূহ উচ্চশক্তির পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়, কিন্তু এর অণুদের রাসায়নিক সংযোগ এবং তাদের বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে না, সুতরাং এই শরীরকে দেখতে মোটামুটি সাধারণ মানুষের মতনই মনে হবে। কিন্তু একটা তফাৎ থাকবে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে, এই শরীরটা অন্য মাত্রাতে প্রবেশ করতে পারবে।

যে ব্যক্তি মন এবং শরীরের এই যুগ্ম সাধনা করে তাকে বাইরে থেকে দেখে খুব অল্পবয়সি মনে হবে, তাকে দেখে তার বয়সটা যেরকম মনে হয় তার সঙ্গে প্রকৃত বয়সের ফারাক খুব বেশী। একদিন এক মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করল: ‘‘মাস্টার আপনার চোখে আমার বয়সটা কত মনে হয়?’’ প্রকৃতপক্ষে ওই মহিলার বয়স তখন প্রায় সত্তর বছরের কাছাকাছি, কিন্তু তাকে দেখে বয়সটা চল্লিশের কোঠায় মনে হচ্ছিল। তার চামড়ায় কোনো ভাঁজ ছিল না, মুখটা মসৃণ ফর্সা, রঙটা যেন দুধে আলতা, তাকে দেখে কোনোভাবেই সত্তর বছর বয়সের লোক মনে হচ্ছিল না। এরকম ঘটনা আমাদের ফালুন দাফা শিক্ষার্থীদের ঘটে থাকে। একটা মজার কথা বলা যেতে পারে। অল্পবয়সি মহিলারা মুখের ত্বক ফর্সা করার জন্যে এবং ভালো করার জন্যে সর্বদা মুখমন্ডলের পরিচর্যা করতে চায়। আমি বলব যে তুমি যদি সত্যি সত্যি মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা অনুশীলন কর, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই এগুলো পাবে, সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে তোমাকে আর মুখমন্ডলের পরিচর্যা করতে হবে না। এই ধরনের উদাহরণ আমরা আর উল্লেখ করব না। আগে জীবনের সব ক্ষেত্রেই বয়স্ক লোকেরা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, তারা আমাকে যুবক মনে করত। এখন পরিস্থিতি আরও ভালো হচ্ছে এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে অল্পবয়সি লোকেরাই এখন তুলনামূলকভাবে বেশী হয়ে গেছে, বাস্তবিক আমিও এখন আর যুবক নেই, পঞ্চাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এখন আমার বয়স ইতিমধ্যে তেতাল্লিশ বছর হয়ে গেছে।

ফা-শরীর (ফাশেন)

বুদ্ধমূর্তির চারিদিকে একটা ক্ষেত্র থাকে কেন? অনেক লোকই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেউ কেউ বলে: ‘‘বুদ্ধমূর্তির সামনে ভিক্ষুদের

শাস্ত্রীয় বচন উচ্চারণ করার কারণে বুদ্ধমূর্তির একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।’’ অন্যভাবে বলা যায় যে এর সামনে ভিক্ষুদের সাধনার ফলে ক্ষেত্রটার সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রটা ভিক্ষুদের অথবা অন্য যে কোনো লোকের সাধনার মাধ্যমেই সৃষ্টি হোক না কেন, শক্তিটা ছড়ানো অবস্থায় থাকবে, কোনো নির্দিষ্ট দিকে থাকবে না, সমগ্র উপাসনা গৃহের মেঝে, ছাদ, এবং দেওয়ালগুলিতে সর্বত্র সমানভাবে এই ক্ষেত্রটার থাকা উচিত। তাহলে শুধু এই বুদ্ধমূর্তির ক্ষেত্রটা এত শক্তিশালী কেন হয়? বিশেষ করে দূরবর্তী পর্বতের মূর্তিতে, অথবা কোনো কোনো গুহার ভিতরের মূর্তিতে, অথবা পাথরের গায়ে খোদাই করা মূর্তিতে সাধারণত এই ক্ষেত্রটা দেখা যায়। কেন এই ক্ষেত্রটার উদ্ভব হয়? একজন এইভাবে ব্যাখ্যা করে তো আর একজন অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু কেউই পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধমূর্তির ক্ষেত্রটার কারণ হচ্ছে, একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ফা-শরীর এই বুদ্ধমূর্তিতে আছে। যেহেতু একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ফা-শরীর এখানে থাকে, সেইজন্যে এটাতে শক্তি থাকে।

শাক্যমুনি অথবা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর[71], যিনিই হোন না কেন যদি ইতিহাস অনুযায়ী সত্যিই তাঁরা বিরাজ করে থাকেন, তোমরা চিন্তা কর, তাঁদের সাধনার সময়ে তাঁরাও কি অনুশীলনকারী ছিলেন না। যখন কোনো ব্যক্তি সাধনা করতে করতে বহিঃত্রিলোক ফা-এর খুব উঁচুতে একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যায়, তখন ফা-শরীর উৎপন্ন হয়। ফা-শরীর শরীরের দ্যান ক্ষেত্রের জায়গায় উৎপন্ন হয়, এটা ফা এবং গোংগ দিয়ে নির্মিত, অন্য মাত্রাতেও এর অভিব্যক্তি ঘটে। ওই ব্যক্তির মতো একইরকম বিরাট শক্তির অধিকারী এই ফা-শরীরও। কিন্তু ফা-শরীরের চেতনা এবং চিন্তা মুখ্য শরীরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথচ ফা-শরীর নিজেও আবার সম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং সত্যিকারের এক স্বতন্ত্র জীবন। সেইজন্যে সে নিজে স্বাধীনভাবে যে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ফা-শরীর যা করে এবং ওই ব্যক্তির মুখ্য চেতনা যা করতে চায় দুটো একই, একেবারে একইরকম। একজন ব্যক্তি নিজে একটা কাজ যেভাবে করবে, তার ফা-শরীরও সেইভাবেই ওই কাজটা করবে। এটাই হচ্ছে ফা-শরীর, যার প্রসঙ্গে আমরা বলছিলাম। আমি যা করতে চাই যেমন, যে শিষ্যরা সত্যিকারের সাধনা করছে তাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা, এসবই আমার ফা-শরীর

---

[71]বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর - পরমানন্দ দিব্যলোকের দুইজন প্রবীণ বোধিসত্ত্বর মধ্যে অন্যতম, তিনি তাঁর করুণার জন্যে পরিচিত।

করে দেয়। যেহেতু ফা-শরীরের আমাদের সাধারণ মানুষদের মতো শরীর নেই, এটা অন্য মাত্রাতে প্রকটিত হতে পারে। এই জীবন সত্তার শরীরটা স্থায়ী নয় এবং অপরিবর্তনীয় নয়। এটা পরিবর্তিত হয়ে বড়োও হতে পারে, এবং ছোটও হতে পারে। কোনো কোনো সময়ে পরিবর্তিত হয়ে এটা খুব বিরাট হতে পারে, এতই বিরাট যে ফা-শরীরের সম্পূর্ণ মাথাটাও দেখা যায় না; কোনো কোনো সময়ে এটা পরিবর্তিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হতে পারে, এতই ক্ষুদ্র যে একটা কোষের থেকেও ক্ষুদ্র হয়ে যেতে পারে।

মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা

কারখানায় নির্মিত একটা বুদ্ধমূর্তি শুধু শিল্পকলার একটা নিদর্শন মাত্র। মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে কোনো বুদ্ধের ফা-শরীরকে এই বুদ্ধমূর্তিতে আবাহন করে স্থাপন করা এবং বুদ্ধ শরীরের প্রত্যক্ষ রূপ হিসাবে সাধারণ লোকেদের মধ্যে এর উপাসনা করা। অনুশীলনকারী যখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সাধনা করতে থাকে, তখন বুদ্ধমূর্তির ফা-শরীর, ওই ব্যক্তির জন্যে ফা রক্ষা করে, তার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাকে রক্ষা করে। এটাই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারটা তখনই সম্ভব হবে, যদি মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধিসম্মত অনুষ্ঠানে শুধু সৎ চিন্তা প্রেরণ করা হয়, এবং খুব উচ্চস্তরের মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তার দ্বারা, অথবা এই ধরনের শক্তির অধিকারী খুব উচ্চস্তরের সাধকের দ্বারা কাজটা সম্পন্ন করা হয়।

মঠগুলিতে বুদ্ধমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়, তারা বলে যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা হলে বুদ্ধমূর্তি কাজ করবে না। এখন মঠগুলিতে ভিক্ষুদের মধ্যে সত্যিকারের মহান মাস্টাররা আর নেই, সবাই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। ‘‘মহান সাংস্কৃতিক আন্দোলন’’-এর পরে, সত্যিকারের শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়েই অনেক অল্পবয়সি ভিক্ষু এখন মঠাধ্যক্ষ হয়ে গেছে, এবং অনেক শিক্ষাই হারিয়ে গেছে। সেইজন্যে তাদের কোনো একজনকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়: ‘‘বুদ্ধমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কীসের জন্যে প্রয়োজন?’’ সে বলবে: ‘‘বুদ্ধমূর্তি প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে কাজ করবে।’’ কীভাবে এটা নির্দিষ্টভাবে কাজ করবে সে ব্যাপারে সে পরিষ্কার করে বলতে পারে না। সেইজন্যে সে শুধু আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সে শাস্ত্রের একটা ছোট অনুলিপি বুদ্ধমূর্তির মধ্যে রেখে, সেটাকে কাগজ দিয়ে সেঁটে বন্ধ করে দেয়। তারপরে সে মূর্তির সামনে শাস্ত্রীয় বচন পাঠ করে

এবং দাবি করে যে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেছে। কিন্তু মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যিই অর্জিত হল কি? সেটা নির্ভর করে সে কীভাবে শাস্ত্রপাঠ করেছে তার উপরে। শাক্যমুনি বলেছিলেন যে সৎ মনে এবং একাগ্র চিত্তে শাস্ত্র পাঠ করতে হবে যা সেই সাধনা পদ্ধতির যে স্বর্গ সেটাকে সত্যি সত্যি কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হবে, একমাত্র তাহলেই একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাকে আবাহন করা সম্ভব হবে। তখন ওই আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ফা-শরীর ওই মূর্তির উপরে অধিষ্ঠান করলে, একমাত্র তাহলেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ হবে।

কোনো এক ভিক্ষু শাস্ত্র পাঠ করছে, অথচ মনে মনে চিন্তা করছে: ‘‘মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে কত টাকা আমাকে দেবে?’’ অথবা যখন শাস্ত্র পাঠ করছে তখন মনে মনে চিন্তা করছে: ‘‘অমুক অমুক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে।’’ এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, এখন ধর্মের শেষ পর্বে এই ধরনের ঘটনাও যে ঘটছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। আমরা এখানে বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করছি না, কিন্তু এখন ধর্মের শেষ পর্বে কিছু মঠ আর শান্তিপূর্ণ নেই। যখন তাদের মনের মধ্যে এই সব জিনিস রয়েছে এবং তারা এইরকম কুচিন্তা পাঠাচ্ছে, তাহলে একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তা কীভাবে আসবেন? অতএব মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য একেবারেই পূরণ হচ্ছে না। কিন্তু এটাই ধ্রুব সত্য নয়, এখনও কিছু ভালো মঠ এবং তাও আশ্রম আছে।

আমি একটা শহরে এক ভিক্ষুকে দেখেছিলাম যার হাত ভীষণ কালো ছিল। সে একটা শাস্ত্রের অনুলিপি বুদ্ধমূর্তির ভিতরে ঢুকিয়ে কোনোরকমে জায়গাটা বন্ধ করল, তারপরে মুখ দিয়ে বিড় বিড় করে কয়েকটা শব্দ বলার পরেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেল। সে আর একটা বুদ্ধমূর্তি নিল এবং আবার বিড় বিড় করে কয়েকটা শব্দ বলল। সে প্রত্যেকবার মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে চল্লিশ য়ুয়ান করে ধার্য করছিল। এখন ভিক্ষুরাও এটাকে বিক্রয়যোগ্য পণ্য মনে করে ব্যবসা করছে এবং বুদ্ধমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টাকা রোজগার করছে। আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম যে মূর্তিগুলোতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি, মূলত সে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেই পারছিল না, আজকাল ভিক্ষুরা এরকম কাজও করছে। আমি আরও কী জিনিস দেখেছি জান? মঠের মধ্যে একজন লোক, দেখে মনে হল একজন গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সে দাবি করছিল যে সে বুদ্ধমূর্তির

প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছে। সে একটা আয়না ধরে সূর্যের দিকে রেখে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত করে বুদ্ধমূর্তির উপরে ফেলল, তারপরে ঘোষনা করল যে, মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। সবকিছু কীরকম হাস্যকর স্তরে পৌঁছে গেছে! আজ বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এবং এটা একটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

নানজিংগ[72] শহরে একটা বিরাট ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি বানানো হয়েছিল এবং হংকং-এর লানতাও দ্বীপে স্থাপন করা হয়েছিল। এটা খুবই বড়ো বুদ্ধমূর্তি। এই বুদ্ধমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে সারা পৃথিবীর থেকে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু যোগদান করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন ভিক্ষু একটা আয়না ধরে সূর্যের দিকে রেখে উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত করে বুদ্ধমূর্তির মুখের উপরে ফেলে দিয়ে ঘোষনা করল যে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এইরকম একটা মহতী সভায় এবং এইরকম একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে যে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা দেখে আমার সত্যিই দুঃখ বোধ হচ্ছিল! এটা আশ্চর্য নয় যে শাক্যমুনি বলেছিলেন: ‘‘ধর্মের শেষ পর্বে, ভিক্ষুদের পক্ষে নিজেদের উদ্ধার করাই কঠিন, আর অন্যদের উদ্ধার করার কথা তো ছেড়েই দাও।’’ এর সঙ্গে আবার অনেক ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্র-কে নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করেছে। এমনকী তাও মতের *পশ্চিমের রানী মা*-র শাস্ত্রও মঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেসব জিনিস বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রে নেই সেগুলোও মঠের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এর ফলে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং ব্যাপারটা এখন খুবই গোলমেলে হয়ে গেছে। অবশ্য সত্যিকারের সাধনা করছে এইরকম ভিক্ষু এখনও আছে, তারা খুবই ভালো। প্রকৃতপক্ষে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার ফা-শরীরকে আবাহন করা, যাতে তাঁর ফা-শরীর ওই বুদ্ধমূর্তিতে অবস্থান করে। এটাই হচ্ছে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

সুতরাং যে বুদ্ধমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়নি, তার উপাসনা করা উচিত নয়। যদি এর উপাসনা করা হয় তবে পরিণাম খুব সাংঘাতিক হবে। কীরকম সাংঘাতিক পরিণাম হবে? বর্তমানে যারা মানুষের শরীর বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে, তারা আবিষ্কার করেছে যে আমাদের একজন লোকের চিন্তা এবং তার মস্তিষ্কের কার্যকলাপ একধরনের পদার্থ সৃষ্টি করে। আমরা খুব উচ্চস্তরে দেখেছি যে এটা সত্যিই একধরনের পদার্থ। কিন্তু এই

[72]নানজিংগ -- জিয়াংগসু প্রদেশের রাজধানী।

পদার্থের আকৃতি, আমাদের বর্তমানের গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত মস্তিষ্কের তরঙ্গের মতো নয়। বরঞ্চ এর আকৃতি পুরোপুরি মানব মস্তিষ্কের মতো। সচরাচর একজন সাধারণ মানুষ যখন কোনো বিষয়ে চিন্তা করে তখন মানুষের মস্তিষ্কের আকার সম্পন্ন একটা জিনিস নির্গত হয়, কিন্তু এর শক্তি নেই, সেইজন্যে নির্গত হওয়া জিনিসটা একটু পরেই চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। অপরদিকে একজন সাধকের শক্তি অনেকক্ষণ সুরক্ষিত থাকে। এটা বলা ঠিক নয় যে, এই বুদ্ধমূর্তিটি কারখানায় নির্মিত হওয়ার পরে এর চিন্তাশক্তি থাকে, কখনোই থাকে না। কিছু বুদ্ধমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় না, এমনকী এগুলোকে মঠের মধ্যে নিয়ে আসা হলেও মূর্তিগুলোর প্রাণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পূরণ হবে না। যদি মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা, কোনো নকল চিগোংগ মাস্টার অথবা কোনো অশুভ পদ্ধতির লোককে দিয়ে করানো হয়, তাহলে সেটা আরও বিপজ্জনক, শিয়াল অথবা নেউল মূর্তির উপরে চড়ে বসবে।

যে বুদ্ধমূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়নি, তুমি সেই মুর্তির আরাধনা করলে তা খুবই ভয়ংকর। কতটা ভয়ংকর হতে পারে? আমি বলেছি যে মানবসমাজে আজ পর্যন্ত যতটা বিকাশ হয়েছে সবকিছুরই অধঃপতন হচ্ছে, সমগ্র সমাজ, সমগ্র বিশ্বের সবকিছুরই ক্রমাগত সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে। আমাদের সাধারণ লোকেদের মধ্যে যা সব ঘটছে, সেসবই তাদের নিজেদের সৃষ্টি। এমনকী একটা সৎ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া এবং একটা সৎ পথ অনুসরণ করে চলা খুবই কঠিন, কারণ নানান দিক দিয়ে সব বাধাগুলো আসতে থাকবে। তুমি বুদ্ধকে উপাসনা করতে চাও, কিন্তু বুদ্ধ কে? এমনকী তুমি উপাসনা করতে চাইলেও খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। তোমার বিশ্বাস নাহলে আমি ব্যাখ্যা করব: প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হওয়া বুদ্ধমূর্তির সামনে গিয়ে প্রথমে একজন লোক যদি নতজানু হয়ে প্রণাম করে তাহলে সর্বনাশ হবে। আজকাল কতজন লোক, সত্যিকারের সিদ্ধিলাভ করার মানসিকতা নিয়ে বুদ্ধের উপাসনা করে? সেই ধরনের লোক খুবই কম। বেশীরভাগ লোকের বুদ্ধের উপাসনা করার লক্ষ্য কী? তারা দুর্ভোগ কাটাতে চায়, কঠিন সমস্যার সমাধান চায়, ধনী হতে চায়, এগুলোর পিছনেই তারা ছুটছে। এই জিনিসগুলো বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রে আছে কি? এ রকম জিনিস একেবারেই নেই।

একজন বুদ্ধের উপাসক, যে টাকা পয়সার পিছনে ছুটছে, সে যদি বুদ্ধমূর্তি অথবা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর বা কোনো তথাগতর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বলে: ‘‘প্রভু, আমাকে ধনী হতে সাহায্য কর,’’ ব্যস,

একটা সম্পূর্ণ চিন্তা তৈরি হয়ে যায়। যেহেতু চিন্তাটা বুদ্ধমুর্তির উদ্দেশ্যে করা হয়, সেইজন্যে সেটা তৎক্ষণাৎ বুদ্ধমূর্তির উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। অন্য মাত্রাতে এই অস্তিত্বশীল বস্তুটা বড়োও হতে পারে, ছোটও হতে পারে। চিন্তাটা এই অস্তিত্বশীল বস্তুটার উপরে পৌঁছানোর পরে এই বুদ্ধমূর্তির একটা মস্তিষ্ক থাকে, এটা চিন্তাও করতে পারে, কিন্তু এর কোনো শরীর থাকে না। অন্য লোকেরাও বুদ্ধমুর্তিটার উপাসনা করতে থাকে, এইভাবে উপাসনা করতে করতে তারা একে কিছুটা শক্তি প্রদান করে। বিশেষত কোনো অনুশীলনকারী এর উপাসনা করলে আরও বিপদ, এই উপাসনা ধীরে ধীরে একে আরও শক্তির জোগান দেয় এবং একটা আকার সম্পন্ন শরীর সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই আকার সম্পন্ন শরীরটা অন্য মাত্রাতে তৈরি হয়। এটা তৈরি হওয়ার পরে অন্য মাত্রাতে বিরাজমান থাকে, এটা এই বিশ্বের কিছুটা সত্য জানতে পারে, সেইজন্যে এ লোকেদের জন্যে কিছু কাজ করতে পারে, এইভাবে এর গোংগ একটু বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ শর্ত সাপেক্ষে লোকেদের সাহায্য করে, তার জন্যে একটা মূল্যও থাকে। অন্য মাত্রাতে এ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং খুব সহজেই সাধারণ লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই আকার সম্পন্ন শরীরটা দেখতে একেবারে বুদ্ধমূর্তির মতো, এইভাবে মানুষের উপাসনার মাধ্যমে নকল বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সৃষ্টি হয়, নকল তথাগত সৃষ্টি হয়, ঠিক বুদ্ধের মতো চেহারা সম্পন্ন, বুদ্ধের মূর্তি। কিন্তু এই নকল বুদ্ধের অথবা নকল অবলোকিতেশ্বরের মানসিকতা অত্যন্ত খারাপ, টাকার পিছনে ছুটে বেড়ায়। অন্য মাত্রায় এর উৎপত্তি, এটা চিন্তা করতে পারে এবং কিছুটা সত্য জানে, এটা বড়ো দুষ্কর্ম করতে সাহস পায় না, কিন্তু ছোট দুষ্কর্ম করতে পারে। কখনো কখনো এ লোকেদের সাহায্য করে, লোকেদের সাহায্য না করলে এ পুরোপুরি অশুভ হয়ে যাবে এবং একে মেরে ফেলা হবে। এ কীভাবে সাহায্য করে? কেউ প্রার্থনা করে: ‘‘হে বুদ্ধ, দয়া করে আমাকে সাহায্য কর, আমার বাড়িতে অমুক অসুস্থ আছে।’’ ‘‘বেশ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করব।’’ এ তোমাকে প্রণামী বাক্সের ভিতরে টাকা ফেলতে বলবে, যেহেতু টাকার প্রতি এর মন রয়েছে। প্রণামী বাক্সের ভিতরে বেশী করে টাকা ফেললে, তোমার রোগটা আরও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। যেহেতু এর কিছুটা শক্তি আছে, অন্য মাত্রা থেকে সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিশেষ করে, যে ব্যক্তির গোংগ আছে সে যদি এর উপাসনা করে সেটা আরও বিপজ্জনক। অনুশীলনকারী কী প্রার্থনা করছে? সে টাকা চাইছে। সবাই চিন্তা কর, একজন অনুশীলনকারী কেন টাকার পিছনে ছুটবে? পরিবারের কারোর দুর্ভোগ এবং রোগ দূর করার জন্যে

প্রার্থনা করাও হচ্ছে পরিবারের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আসক্তি। তুমি অন্য লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাও, কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব ভাগ্য আছে। তুমি এর উপাসনা করার সময়ে বিড়বিড় করে বললে: ‘‘কৃপা কর, আমি যেন একটু ধনী হতে পারি।’’ ‘‘ঠিক আছে,’’ এ তোমাকে সাহায্য করবে। এ ব্যাকুলভাবে চায় যে তুমি আরও টাকা চাও, তুমি যত বেশী চাইবে, তত বেশী জিনিস এ তোমার থেকে নিতে পারবে, লেনদেনটা ন্যায্যভাবেই হবে। অন্য লোকেরা অনেক টাকা প্রণামী বাক্সে ফেলেছে, এ তোমাকে তার থেকে কিছুটা পাইয়ে দেবে। কীভাবে টাকাটা পাবে? দরজার বাইরে বেরিয়ে তুমি হয়তো একটা টাকার ব্যাগ কুড়িয়ে পাবে, অথবা কর্মস্থলে তোমাকে হয়তো একটা বোনাস দেবে, যাই হোক এ যেন তেন প্রকারেণ তোমার টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এ কিন্তু বিনা শর্তে তোমাকে সাহায্য করছে না? ক্ষতি বিনা লাভ নেই। এর গোংগ-এর অভাব আছে, সেইজন্যে তোমার গোংগ কিছুটা নিয়ে নেবে অথবা তোমার সাধনার দ্বারা বিকশিত হওয়া দ্যান বা অন্য জিনিস নিয়ে নেবে, এই জিনিসগুলোই এ চায়।

এই নকল বুদ্ধরা কখনো কখনো খুবই ভয়ংকর হয়। আমাদের অনেকেই, যাদের দিব্যচক্ষু খোলা আছে তারা মনে করে যে তারা বুদ্ধকে দেখেছে। কেউ একজন বলবে যে আজ একদল বুদ্ধ মন্দিরে এসেছিল এবং একজন অমুক নামের বুদ্ধ ওই বুদ্ধর দলটাকে চালনা করছিল। সে বর্ণনা করবে যে, গতকালের বুদ্ধের দলটা কীরকম ছিল এবং আজকে যে দলটা এসেছে সেটা কীরকম, আবার এই দলটা চলে যাওয়ার একটু পরেই আর একটা দল এসে হাজির। এরা কারা? এরা এই শ্রেণীর অন্তর্গত, এরা সত্যিকারের বুদ্ধ নয় এবং নকল, এদের সংখ্যা সত্যিই প্রচুর।

যদি কোনো মন্দিরে এই ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা আরও ভয়ংকর। কোনো ভিক্ষু এর উপাসনা করলে, এ ভিক্ষুর দায়িত্ব নিয়ে নেবে: ‘‘তুমি আমার উপাসনা করছিলে? তুমি পরিষ্কার মনেই আমার উপাসনা করছিলে! ঠিক আছে, তুমি কি সাধনা করতে চাও না? আমি তোমার দায়িত্ব নিলাম, সাধনা কীভাবে করতে হয় আমি তোমাকে শেখাবো।’’ এ তোমার জন্যে ব্যবস্থা করে দেবে, কিন্তু সাধনা শেষ হওয়ার পরে তুমি কোথায় পৌঁছাবে? যেহেতু এ তোমার সাধনার ব্যবস্থা করেছে, অতএব উচ্চস্তরের সাধনার পদ্ধতির কোনো ধারাই তোমাকে গ্রহণ করবে না। যেহেতু এ তোমার সব ব্যবস্থা করেছে, অতএব ভবিষ্যতে তোমাকে এর

তত্ত্বাবধানেই ফিরে যেতে হবে। তাহলে তোমার এই সাধনাটা বিফল হয়ে গেল না কি? আমি বলব বর্তমানে মানবজাতির পক্ষে সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত করা খুবই কঠিন। এই ধরনের ঘটনা প্রায় হামেশাই দেখা যায়। আমাদের অনেকেই নাম করা পর্বত এবং বড়ো নদীর ধারে বুদ্ধের জ্যোতি পর্যবেক্ষণ করেছে, যার বেশীরভাগই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের শক্তি থাকে এবং এরা তার প্রকাশও করতে পারে। একজন সত্যিকারের মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা নিজেকে কখনোই এত সহজে প্রকাশ করেন না।

অতীতে তথাকথিত পার্থিব বুদ্ধ এবং পার্থিব তাও, অপেক্ষাকৃত কম দেখা যেত। এখন কিন্তু এরা সংখ্যায় প্রচুর। এরা খারাপ কাজ করলে, উচ্চতর জীবন এদের ধ্বংস করে দেয়। এরকম অবস্থায় এরা দৌড়ে বুদ্ধমূর্তিতে আশ্রয় নেয়। সচরাচর একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা সাধারণ মানুষদের নিয়মনীতির মধ্যে ইচ্ছামতো হস্তক্ষেপ করেন না, একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার অবস্থান যত উঁচুতে হবে, ততই তিনি সাধারণ মানুষদের নিয়মনীতির মধ্যে হস্তক্ষেপ কম করবেন, সামান্যতম হস্তক্ষেপও করবেন না। যত যাই হোক, তিনি অকস্মাৎ বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে বুদ্ধমূর্তিকে আঘাত করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলবেন না, তিনি এই কাজ করবেন না। সেইজন্যে এটা দৌড়ে বুদ্ধমূর্তিতে আশ্রয় নিলে, কিছু করা হয় না। অতএব এটা যখন বুঝতে পারে যে একে ধ্বংস করা হবে, তখন দৌড়ে পালায়। সুতরাং তুমি কি আসল বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে দেখেছ? তুমি কি সত্যিকারের বুদ্ধকে দেখেছ? সেটা বলা খুব কঠিন।

আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে একটা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত: ‘‘আমাদের বাড়ির বুদ্ধমূর্তিগুলো নিয়ে কী করব?’’ হয়তো অনেকেই আমার কথা চিন্তা করেছ। শিক্ষার্থীদের সাধনায় সাহায্য করার জন্যে আমি বলছি, তোমরা এইভাবে করতে পার: আমার বইটা (কারণ বই-এর মধ্যে আমার ছবি আছে) অথবা আমার একটা ছবি এবং বুদ্ধমূর্তি দুহাতে ধরে বৃহৎ পদ্ম হস্ত মুদ্রা[73] কর। এরপরে, ঠিক যেন মাস্টার মনে করে, আমার কাছে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে প্রার্থনা কর। বিষয়টা আধ মিনিটের মধ্যেই মিটে যাবে। আমি সবাইকে বলতে চাই, এটা শুধুমাত্র আমাদের সাধকদের জন্যেই করা যাবে। এই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ক্ষেত্রে করা যাবে না। আমরা শুধু সাধকদের তত্ত্বাবধান করি।

[73]বৃহৎ পদ্ম হস্ত মুদ্রা - প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্যে হস্ত মুদ্রা।

কিছু লোক বলে যে তারা আমার ছবি তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নিয়ে যাবে অশুভ আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, সাধারণ লোকেদের অশুভ আত্মা তাড়ানোটা আমার কাজ নয়। এটা হচ্ছে মাস্টারের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা।

পার্থিব বুদ্ধ এবং পার্থিব তাও-দের বিষয়ে বললাম। আরও একরকমের পরিস্থিতি আছে, অতীতে চীনদেশে অনেক লোক সুদূর পর্বতে এবং গভীর অরণ্যের মধ্যে সাধনা করতেন। কেন এখন এইরকম নেই? প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কেউ যে নেই, তা নয়। তাঁরা শুধু সাধারণ লোকেদের এটা জানতে দেন না, এঁদের সংখ্যা একটুও কমেনি, এঁদের সবারই অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এটা ঠিক নয় যে এই কয়েক বছরে এঁরা সব অদৃশ্য হয়ে গেছেন, এই সব লোকেরা এখনও আছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে এঁদের সংখ্যা প্রায় কয়েক হাজার, আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে এঁরা বেশী আছেন। বিশেষ করে কিছু বিখ্যাত পর্বতে এবং বড়ো বড়ো নদীর ধারে এঁরা থাকেন, আরও কয়েকটা উঁচু পর্বতের মধ্যেও এঁরা থাকেন। অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে এঁরা সব গুহাগুলোকে বন্ধ করে রাখেন, এদের অস্তিত্ব তোমাদের চোখে পড়বে না। এঁদের সাধনা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে এগোয়, এঁদের সাধনা পদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত এলোমেলো, এঁরা সাধনার সার বস্তুটাকে ধরতে পারেননি। আর আমরা সরাসরি মনকে লক্ষ্য করি, আমরা বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রকৃতি এবং বিশ্বের স্বরূপ অনুসারে সাধনা করি। সেইজন্যে নিঃসন্দেহে আমাদের গোংগ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু সাধনার পথগুলো ঠিক যেন পিরামিডের আকারে সাজানো আছে, শুধু মাঝখানের পথই প্রধান পথ। কেউ শাখা পথে এবং ছোট পথে সাধনা করলে, তাঁর চরিত্র উন্নত নাও হতে পারে এবং তাঁদের সাধনা উঁচুতে না পৌঁছালেও গোংগ উন্মোচিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের সাধনার প্রধান পথের থেকে এঁরা অনেক দূরে।

একজন এইরকম ব্যক্তিও শিষ্যদের মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষার প্রচার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে তিনি এইরকম একটা সাধনা পদ্ধতিতে যতটা উঁচুতে পৌঁছেছেন, এবং তাঁর চরিত্র যতটা উঁচুতে পৌঁছেছে, তাঁর শিষ্যদের সবারই সাধনা ততটা উঁচু পর্যন্তই পৌঁছাতে পারবে। পার্থিব ছোট পদ্ধতিগুলো যত ধারের দিকের, সেগুলোর নিয়মকানুন তত বেশী, সাধনার পদ্ধতিও জটিল, তাঁরা সাধনার সারবস্তুকেই ধরতে পারেন না। একজন ব্যক্তির সাধনার ক্ষেত্রে তার চরিত্রের সাধনাই হচ্ছে প্রধান, তাঁরা এটুকুও

বুঝতে পারেন না, তাঁরা মনে করেন কষ্ট সহ্য করেই সাধনা করতে হয়। একটা লম্বা সময়কাল কাটানোর পরে, কয়েকশ’ বছর বা হাজার বছরেরও বেশী সাধনা করার পরে তাঁদের এই অল্প একটু গোংগ বৃদ্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এই গোংগ সাধনায় কষ্ট সহ্য করার ফলে প্রাপ্ত হননি, কীভাবে প্রাপ্ত হন? এটা ঠিক যেন একজন সাধারণ মানুষের মতো, যার যুবা অবস্থায় অনেক আসক্তি থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছানোর সময়ে যখন বছরগুলি পেরিয়ে যেতে থাকে, তার ভবিষ্যৎ যখন আশাহীন হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই এই সব আসক্তি দূর হতে থাকে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এইধরনের ছোট সাধনার পথেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, এই ব্যক্তি যখন ধ্যানমুদ্রা, গভীর ধ্যানের ক্ষমতা, এবং কষ্ট সহ্য করার উপরে নির্ভর করে সাধনা করেন, তিনি দেখেন যে গোংগ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন না যে একটা লম্বা এবং কষ্টকর সময়কালের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর সাধারণ মানুষের আসক্তিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এই আসক্তিগুলো ধীরে ধীরে দূর হওয়ার ফলেই তাঁর গোংগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের নিশানা এবং সত্যিকারের লক্ষ্য থাকে মনের ওই আসক্তিগুলোর প্রতি, যাতে ওই আসক্তিগুলোকে দূর করে, সাধনায় খুব দ্রুত অগ্রসর হতে পারি। আমি কয়েকটা জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে কিছু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, যাঁরা বহু বছর ধরে সাধনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন: ‘‘কেউ জানে না যে আমরা এখানে আছি, আপনি যে কাজ করছেন, সেই কাজে আমরা হস্তক্ষেপ করব না, এবং কোনো সমস্যা সৃষ্টি করব না।’’ এঁরা অপেক্ষাকৃত ভালো লোকেদের মধ্যে পড়েন।

কিছু খারাপ লোকও ছিল, তাদের সঙ্গেও আমাদের মোকাবিলা হয়েছে, একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি প্রথমবার যখন গুইঝোউ[74] -তে গিয়েছিলাম গোংগ শেখানোর জন্যে, সেই সময়ে একজন লোক ক্লাস চলাকালীন আমার খোঁজ করে বলল যে, তার মাস্টার আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার মাস্টার একজন অমুক বিশিষ্ট ব্যক্তি, যে অনেক বছর ধরে সাধনা করেছে। আমি দেখলাম ওই লোকটা য়িন চি বয়ে বেড়াচ্ছে, দেখতে খুবই ভয়ংকর, মুখমন্ডলটা হলদে মোমের মতো। আমি বললাম, তার সাথে দেখা করার মতো সময় নেই, এই বলে প্রত্যাখ্যান করলাম।

[74]গুইঝোউ - দক্ষিণপশ্চিম চীনের একটি প্রদেশ।

তার বৃদ্ধ মাস্টারের রাগ হল, আমার সাথে ঝামেলা শুরু করে দিল, প্রতিদিন আমার কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করতে লাগল। আমি এইরকম ব্যক্তি যে লোকের সাথে বিবাদ করা পছন্দ করি না, এবং ওই লোকটা বিবাদ করার যোগ্যও নয়। সে যখনই আমার বিরুদ্ধে খারাপ জিনিস প্রয়োগ করত, আমি তখনই সেটা পরিষ্কার করে ফেলতাম, তারপরে আমি আমার ফা শেখাতাম।

অতীতে মিংগ রাজবংশের[75] সময়ে এক ব্যক্তি ছিল যে তাও মতে সাধনা করত, তাও সাধনার সময়ে তার শরীরে একটা সাপ ভর করেছিল, পরবর্তীকালে এই তাও সাধকের সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মৃত্যু ঘটে, ওই সাপটা তখন সাধকের শরীরটা অধিকার করে, সাধনার দ্বারা মনুষ্যরূপ ধারণ করেছিল। এই লোকটার মাস্টার হচ্ছে ওই সাপটারই সাধনার দ্বারা অর্জিত মনুষ্যরূপ। যেহেতু এর স্বভাবটা পাল্টায়নি, নিজেকে পুনরায় একটা বিরাট সাপে রূপান্তরিত করে আমার সাথে ঝামেলা করতে থাকল। আমি দেখলাম এর অযৌক্তিক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেইজন্যে আমি একে হাত দিয়ে ধরলাম, এবং খুব শক্তিশালী গোংগ, যাকে বলে ‘‘দ্রাবক গোংগ,’’ ব্যবহার করে এর শরীরের নীচের অংশটাকে বিগলিত করে জলে পরিণত করলাম, এর উপরের অংশটা দৌড়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

একদিন তার এক শিষ্য আমাদের গুইঝোউ-এর সহায়ক কেন্দ্রের সেচ্ছাসেবী নির্দেশকের সাথে যোগাযোগ করে বলেছিল যে তার মাস্টার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নির্দেশক সেখানে গিয়েছিল, তাকে একটা গাঢ় অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকতে হয়েছিল, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু একটা ছায়ার মতো কেউ বসে আছে দেখা যাচ্ছিল, তার চোখ দিয়ে সবুজ আলো বেরোচ্ছিল। যখন সে চোখ খুলছিল, গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠছিল, আর যেই চোখ বন্ধ করছিল গুহাটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। সে স্থানীয় ভাষায় বলল: ‘‘লি হোংগ জি আবার আসবেন, এইবার আমরা কেউ কোনোরকম অসুবিধার সৃষ্টি করব না, আমি ভুল করেছিলাম। লি হোংগ জি মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছেন।’’ শিষ্য তাকে জিজ্ঞাসা করল: ‘‘মাস্টার দয়া করে উঠে দাঁড়ান, আপনার পায়ে কী হয়েছে?’’ সে বলল: ‘‘আমি উঠে দাঁড়াতে পারব না, আমার পায়ে আঘাত লেগেছে।’’

---

[75]মিংগ রাজবংশ - চীনের ইতিহাসে 1368 A.D. – 1644 A.D. একটি সময়কাল।

কীভাবে আঘাত লেগেছে সেটা জিজ্ঞাসা করলে, সে বর্ণনা করতে শুরু করল, তার সমস্যা সৃষ্টির পর্ব। সে উনিশ্‌শ তিরানব্বই সালে বেজিং-য়ের প্রাচ্যদেশীয় স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে, পুনরায় আমার সাথে ঝামেলা করতে শুরু করে দিল। যেহেতু সে সর্বদা খারাপ কাজ করত এবং আমার দাফা-র প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল, আমি তাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিলাম। তার বিনাশের পরে তার সাথী প্রবীণ এবং নবীন শিষ্য-শিষ্যারা সবাই আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে চেয়েছিল, আমি তাদের কয়েকটা কথা বলেছিলাম। তারা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল এবং এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে কেউ আর কিছু করতে সাহস পায়নি, তারা পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছিল যে কী ব্যাপার চলছিল। তাদের মধ্যে তখনও কয়েকজন একেবারে সাধারণ মানুষ ছিল, যারা খুব লম্বা সময় ধরে সাধনা করছিল। আমি এখানে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে বলতে গিয়ে এই কয়েকটা উদাহরণ দিলাম।

যাদু বিদ্যার বিষয়

যাদু বিদ্যা কী? সাধক সমাজে, অনেকেই চিগোংগ শেখানোর পর্বে এটাকে সাধনার শ্রেণীভুক্ত জিনিস হিসাবে শিখিয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাকে সাধনার শ্রেণীভুক্ত কোনো জিনিস হিসাবে ধরা যায় না। এটা একধরনের পারদর্শিতা, যাদু মন্ত্র উচ্চারণ, কলাকৌশল শেখানো হয়। এর আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসাবে যাদু নকশা আঁকা, ধূপ জ্বালানো, কাগজের টুকরো পোড়ানো, যাদু মন্ত্র উচ্চারণ, ইত্যাদির প্রয়োগ করা হয়। এতে রোগ সারানো সম্ভব, রোগ সারানোর পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটাই খুব বৈশিষ্ট্যসূচক। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একজন ব্যক্তির মুখমন্ডলে একটা ফোঁড়া হয়েছে, এই পদ্ধতির চর্চাকারী একটা তুলি কলম সিঁদুরের মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে, মাটিতে একটা বৃত্ত আঁকবে, এবার বৃত্তের মধ্যে একটা ‘‘X’’ চিহ্ন আঁকবে, সে ওই ব্যক্তিকে বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়াতে বলবে। এরপরে সে যাদু মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করবে। পরে সে তুলি কলমটাকে সিঁদুরে ডুবিয়ে ওই ব্যক্তির মুখমন্ডলে বৃত্ত আঁকতে থাকবে, আঁকার সময়ে সে যাদু মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকবে। সে আঁকতেই থাকবে, আঁকতেই থাকবে, শেষে তুলি কলম দিয়ে ফোঁড়ার উপরে একটি বিন্দু বানাবে, তখন মন্ত্র উচ্চারণটাও শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে বলবে যে, সে ভালো হয়ে গেছে। ওই ব্যক্তি তখন হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলবে যে ফোঁড়াটা ছোট হয়ে গেছে, ব্যথাও নেই,

অর্থাৎ এটা কাজ করেছে। এইরকম সামান্য রোগ তারা সারাতে পারে, কিন্তু জটিল রোগ ঠিক করতে পারে না। কোনো ব্যক্তির বাহুতে যন্ত্রণা হলে সে কী করবে? সে মুখে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করবে এবং হাত দুটো প্রসারিত করতে বলবে, এই ব্যথার হাতের *হেগু*[76] বিন্দুতে ফুঁ করে হাওয়া ছাড়বে, এই হাওয়া তখন অন্য হাতের হেগু বিন্দু দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ওই ব্যক্তি এই হাওয়ার বহে যাওয়া অনুভব করতে পারবে। এবার হাতের যন্ত্রণার জায়গায় স্পর্শ করলে আর অতটা যন্ত্রণা করবে না। এছাড়া আরও পদ্ধতি আছে, যেমন কাগজ পোড়ানো, যাদু নকশাচিত্র আঁকা, যাদু নকশাচিত্র সেঁটে দেওয়া ইত্যাদি, তারা এসবই করে।

তাও মতের পার্থিব শাখাপথগুলিতে শরীরের সাধনা শেখানো হয় না, সেসব ক্ষেত্রে পুরোটাই হচ্ছে, ভাগ্যগণনা, *ফেংশুই*[77] দেখা, অশুভ আত্মা তাড়ানো এবং রোগ নিরাময় করা। এসবের বেশীর ভাগই পার্থিব শাখা পথগুলোতে প্রয়োগ করা হয়। তারা রোগ নিরাময় করতে পারে, কিন্তু যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেটা ভালো নয়। তারা কী জিনিস দিয়ে রোগ সারায় সেটা আমরা বলব না, কিন্তু আমাদের দাফা-র সাধকরা এসবের উপযোগ করবে না। কারণ এরা খুব নিম্নস্তরের এবং খুব খারাপ বার্তা বয়ে বেড়ায়। প্রাচীন কালে চীন দেশে রোগ নিরাময় করার পদ্ধতিগুলোকে কতকগুলো বিষয়ে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল, যেমন, হাড়ভাঙ্গা ঠিক করা, আকুপাংচার, মালিশ করা, হস্তচালনা দ্বারা স্নায়ুর চিকিৎসা করা, আকুপ্রেসার, চিগোংগ চিকিৎসা, ভেষজ চিকিৎসা ইত্যাদি, এইরকম অনেকগুলো বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেকটা চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটা বিষয় বলা হতো। এই যাদু বিদ্যাকে তেরো নম্বর বিষয় হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। সেইজন্যে এর পুরো নামটা বলা হয় ‘‘ যাদু বিদ্যা - তেরো নম্বর বিষয়।’’ যাদু বিদ্যা আমাদের সাধনার অন্তর্গত জিনিস নয়, এটা সাধনার দ্বারা গোংগ প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপার নয়, এটা এক ধরনের দক্ষতা।

---

[76] *হেগু* বিন্দু - হাতের পিছনদিকে বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনীর মধ্যে অবস্থিত।

[77] *ফেংশুই* - চীনের বাস্তুশাস্ত্র

বক্তৃতা - ছয়

চিগোংগ মনোবিকার

সাধনার জগতে একটা কথা প্রচলিত আছে যাকে বলে চিগোংগ মনোবিকার, জনগণের উপরে এর একটা খুব বড়ো প্রভাব রয়েছে। কিছু লোক এত বেশী এর প্রচার করেছে যে অনেক লোকই চিগোংগ-এর অনুশীলন করতে ভয় পায়। লোকেরা একবার যখন শোনে যে চিগোংগ অনুশীলন করলে চিগোংগ মনোবিকার হতে পারে, তখন ভয়ে কেউ আর এটা চেষ্টা করতে সাহস করে না। প্রকৃতপক্ষে, আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, চিগোংগ মনোবিকারের একেবারেই অস্তিত্ব নেই।

বেশ কিছু লোকের মন সত্যনিষ্ঠ না হওয়ার দরুন তাদের উপর সত্তা ভর করে। এই ধরনের ব্যক্তির মুখ্য চেতনা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং মনে করে এটাই হচ্ছে গোংগ। এদের শরীরটা ভর করা সত্তা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, এরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, চিৎকার এবং আর্তনাদ করতে থাকে। চিগোংগ-এর এইরকম প্রকাশ দেখে লোকেরা ভয়ে আর এটার চর্চা করতে সাহস পায় না। আমাদের অনেক লোক এটাকেই চিগোংগ মনে করে, এটা কীভাবে চিগোংগ অনুশীলন হবে? এটা কেবল রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে সবথেকে নীচু অবস্থা, কিন্তু এসব খুবই ভয়ংকর। যদি তুমি এই পথে অভ্যস্ত হয়ে পড়, তাহলে তোমার মুখ্য চেতনা কখনোই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। তখন তোমার শরীরটা, সহ চেতনা অথবা বাইরের কোনো বার্তা অথবা ভর করা কোনো সত্তা ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে, তখন তুমি বিপজ্জনক কাজ করে ফেলতে পার এবং সাধকসমাজের খুব বিরাট ক্ষতি করে ফেলতে পার। একজন ব্যক্তির অসৎ মানসিকতার দ্বারা এবং নিজেকে দেখানোর আসক্তির দ্বারা এসব সৃষ্টি হয়, এটা চিগোংগ মনোবিকার নয়। আমরা জানি না কীভাবে কিছু লোক তথাকথিত চিগোংগ মাস্টার হয়ে গেল, এরাই আবার চিগোংগ মনোবিকার নিয়ে বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চিগোংগ-এর অনুশীলন থেকে কখনোই চিগোংগ মনোবিকার হয় না। বেশীরভাগ লোক প্রধানত সাহিত্যের রচনা, যেমন কুংফু উপন্যাস ইত্যাদির

মাধ্যমে এই নামটা শুনেছে। যদি বিশ্বাস না হয়, প্রাচীন বইগুলো এবং সাধনার বইগুলো খুলে দেখতে পার। এরকম জিনিস কোথাও নেই, চিগোংগ মনোবিকার কীভাবে হয়ে থাকে? মূলগতভাবে এই ধরনের জিনিস কখনোই ঘটে না।

লোকেরা সাধারণত মনে করে চিগোংগ মনোবিকার কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। এইমাত্র আমিও এক প্রকারের কথা বললাম। একজন ব্যক্তির মন সৎ না হওয়ার কারণে কোনো সত্তা ভর করে, সে নানান ধরনের মানসিকতার কবলে পড়ে কোনো একটা চিগোংগ অবস্থা সৃষ্টি করে লোকেদের দেখানোর চেষ্টা করে। কেউ কেউ সরাসরি অলৌকিক ক্ষমতার পিছনে ছোটে, অথবা নকল চিগোংগ অনুশীলন করে। চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে সে সর্বদা তার মুখ্য চেতনাকে ছেড়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, কোনো কিছুই তার অবগত থাকে না, শরীরকে অন্যদের হাতে ছেড়ে দেয়। সে মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সহ চেতনা এবং বাইরের বার্তাগুলো তার শরীরের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে। সে অদ্ভুত আচরণ করতে থাকে। তাকে একটা অট্টালিকার উপর থেকে ঝাঁপ দিতে বললে সে ঝাঁপ দিয়ে দেবে, তাকে জলে ঝাঁপ দিতে বললে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে দেবে। এমনকী সে নিজেও আর বাঁচতে চায় না, সে শরীরকে অন্যদের হাতে সঁপে দেয়। এটা চিগোংগ মনোবিকার নয়, সে চিগোংগ অনুশীলনের থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে এবং প্রথমদিকে ইচ্ছাকৃতভাবে এরকম আচরণ করার ফলে এটা হয়ে থাকে। অনেক লোক মনে করে, শরীরকে দোলানোই হচ্ছে চিগোংগ। প্রকৃতপক্ষে কেউ যদি সত্যিই এই অবস্থার মধ্যে চিগোংগ অনুশীলন করে তাহলে সাঙ্ঘাতিক পরিণাম তৈরি হতে পারে। এটা চিগোংগ অনুশীলন নয়, এটা সাধারণ লোকেদের আসক্তির জন্যে এবং অভীষ্ট লাভের চেষ্টার জন্যে সৃষ্টি হয়।

আর এক ধরনের পরিস্থিতি হয় যখন চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে কারোর চি কোনো একটা জায়গায় আটকে পড়ে এবং আর এগোতে পারে না অথবা চি মাথার থেকে নীচে নামতে পারছে না, তখন সে ভয় পেয়ে যায়। মানুষের শরীর একটা ছোট বিশ্ব। বিশেষত তাও পদ্ধতিতে যখন চি কোনো বাধা অতিক্রম করে, সেই সময়ে কেউ এই সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, চি কোনো বাধা অতিক্রম করতে না পারলে, চি ঐ জায়গাতেই আটকে যায়। এটা শুধু যে মাথাতেই হয়, তা নয়, শরীরের অন্য জায়গাতেও এইরকম হতে পারে, কিন্তু মানুষের মাথাই সবথেকে

সংবেদনশীল জায়গা। চি মাথার উপরে উঠেই নীচে নেমে আসে, যদি চি কোনো বাধা অতিক্রম করতে না পারে, সেই সময়ে সে বোধ করবে মাথাটা যেন ভারী হয়ে গেছে এবং ফুলে গেছে, মাথায় যেন একটা চি-এর মোটা টুপি পরে আছে, ইত্যাদি। এইরকম কয়েক ধরনের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু চি কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এটা লোকেদের মধ্যে কোনো সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে না এবং মূলত কোনোরকম রোগও উৎপন্ন করতে পারে না। কিছু লোক চিগোংগ-এর বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে না এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করে। যার ফলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে লোকেরা মনে করে যে, কারোর চি মাথার উপরে উঠে নীচে না নামতে পারলে চিগোংগ মনোবিকারের উদয় হবে, সে বিপথগামী হবে ইত্যাদি, এর ফলে অনেক লোকই ভয় পেয়ে যায়।

চি মাথার উপরে উঠে নীচে না নামলে, সেটা কেবল একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কিছু লোকের ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ সময়, হয়তো অর্ধেক বছর কেটে গেছে তবু চি নীচে নামছে না। নীচে না নামলে একজন সত্যিকারের চিগোংগ মাস্টারের খোঁজ করতে হবে, সে তখন চি-কে চালনা করে নীচে নামিয়ে আনবে। চিগোংগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা যখনই একটা বাধা অতিক্রম করতে পারছি না, অথবা চি নীচে নামছে না তখন আমাদের চরিত্রের মধ্যেই কারণগুলো খুঁজে দেখতে হবে যে আমি কি খুব বেশী সময়কাল ধরে একটা স্তরে আটকে আছি, তাহলে আমাকে অবশ্যই চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে! তুমি সত্যিই যদি চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে পার, তখন দেখবে যে চি নীচে নেমে এসেছে। তুমি যদি শুধু তোমার নিজের শরীরের গোংগ-এর রূপান্তরের উপরে জোর দাও এবং তোমার চরিত্রের পরিবর্তনের উপরে জোর না দাও, তখন চি-এর নীচে নামার ব্যাপারটা তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে, একমাত্র তখনই সামগ্রিকভাবে রূপান্তরগুলি ঘটবে। যদি কারোর চি সত্যিই আটকে যায়, তাহলেও কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না, প্রায়শ আমাদের মনই সমস্যা তৈরি করে। এর উপরে কেউ নকল চিগোংগ মাস্টারের কাছে শুনেছে যে চি মাথায় চলে গেলে কিছু গণ্ডগোল হতে পারে, তখন সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যায়। হয়তো এই আতঙ্কিত মন সত্যিই কোনো সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। যেহেতু একবার তুমি ভয় পেয়েছ, এটা একটা আতঙ্কের মানসিকতা, এটা কি একটা আসক্তি নয়? যখন তোমার মধ্যে এই আসক্তির উদ্ভব হয়েছে, তখন একে অবশ্যই দূর করা উচিত নয় কি? যত তুমি ভয়

পাবে ততই তোমাকে দেখে অসুস্থ মনে হবে। তোমার এই আসক্তিকে অবশ্যই দূর করতে হবে, যাতে তুমি এই শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পার এবং ভয়ের মানসিকতা দূর করে নিজের উন্নতি ঘটাতে পার।

একজন অনুশীলনকারী সাধনা করলেও ভবিষ্যতে আরামের মধ্যে থাকতে পারবে না, শরীরে অনেক গোংগ-এর আবির্ভাব ঘটবে, এইসব খুব শক্তিশালী জিনিস তোমার শরীরের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে, তুমি তখন এভাবে অথবা সেভাবে অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে। তোমার অস্বস্তির প্রধান কারণ হচ্ছে, তুমি নিজে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাক এই বুঝি শরীরে কোনো রোগ দানা বাঁধছে? প্রকৃতপক্ষে তোমার শরীরের ভিতরে সব শক্তিশালী জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে, এগুলো সবই গোংগ, এগুলো সব অলৌকিক ক্ষমতা এবং অনেক জীবন সত্তা। যখন এগুলো নড়াচড়া করবে তখন শরীরের মধ্যে চুলকানি, ব্যথা, অস্বস্তি ইত্যাদি অনুভব করবে, স্নায়ুতন্তুগুলির শেষ প্রান্ত খুব সংবেদনশীল হয়ে যায়, নানান ধরনের সব অবস্থার আবির্ভাব হতে থাকবে। যতক্ষণ না তোমার শরীর উচ্চ শক্তিযুক্ত পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হচ্ছে, ততক্ষণ এই সব ধরনের অনুভূতি হতে থাকবে। বস্তুত ব্যাপারটা ভালোই হচ্ছে। একজন সাধক হিসাবে তুমি যদি সর্বদা নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে কর, যদি সর্বদা নিজেকে অসুস্থ মনে কর, তাহলে কীভাবে সাধনা করবে? আমাদের সাধনার সময়ে দুর্ভোগ উপস্থিত হলে তুমি যদি নিজেকে একজন সাধারণ মানুষ মনে কর, তাহলে আমি বলব তোমার চরিত্র সেই সময়ে নীচে নেমে গিয়ে সাধারণ মানুষের জায়গায় চলে গেছে। তখন অন্তত এই একটা প্রশ্নে, তুমি সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে গেছ।

সত্যিকারের অনুশীলনকারী হিসাবে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার না করে, আমাদের খুব উঁচু স্তর থেকে বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তুমি যদি মনে কর যে তোমার রোগ হয়েছে, তাহলে সেটা হয়তো সত্যিই তোমার শরীরে রোগ নিয়ে আসবে। এর কারণ তুমি যদি একবার মনে কর যে তুমি অসুস্থ, তোমার চরিত্রের উচ্চতা সাধারণ মানুষের মতো হয়ে যাবে। চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে এবং সত্যিকারের সাধনায় বিশেষভাবে এইরকম অবস্থায় কখনোই রোগ আসতে পারে না। তোমরা সবাই জান যে, কেউ সত্যি সত্যি অসুস্থ হলে তার সত্তর ভাগ মানসিক ব্যাপার এবং তিরিশ ভাগ অসুস্থতা। অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রায়শ সে প্রথমে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে, মন সেটা সামলাতে পারে না এবং প্রচন্ড

চাপের মধ্যে পড়ে যায়, যা তার অসুস্থতার দ্রুত অবনতি ঘটায়, সাধারণত এইরকম ব্যাপারই ঘটে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে একজন ব্যক্তি ছিল, যাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তার একটা বাহু তুলে ধরে তাকে বলা হয়েছিল যে এটা কেটে রক্ত বের করা হবে। তারপরে তার চোখ দুটো ঢেকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার কব্জিতে একটু আঁচড় কেটে দেওয়া হয়েছিল (প্রকৃতপক্ষে কোনো রক্তপাত ঘটানো হয়নি), একটা কলের জল খুলে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সে টপ টপ করে জল পড়ার শব্দটা শুনতে পারে। তার মনে হয়েছিল যেন তার নিজের রক্ত টপ টপ করে পড়ছে, একটু পরেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। আসলে কিন্তু একটুও রক্তপাত ঘটানো হয়নি, সেটা ছিল একটা জলের ধারা যা টপ টপ করে পড়ছিল, তার মনই তার মৃত্যু নিয়ে এসেছিল। তুমি যদি সবসময়ে মনে কর যে তোমার রোগ আছে, তাহলে সম্ভবত তুমি নিজেই রোগটাকে নিয়ে আসবে। এর কারণ তোমার চরিত্র ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে গেছে, আর সাধারণ মানুষের তো অবশ্যই রোগ হবে।

একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তুমি যদি সর্বদা মনে কর এটা একটা রোগ, তাহলে তুমি বস্তুত রোগটাকে চাইছ, তুমি রোগটাকে চাইলে, সেক্ষেত্রে রোগটা তোমার শরীরে ঢুকে পড়তে পারে। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমার চরিত্র উঁচু হওয়া উচিত, তোমার সবসময়ে রোগকে ভয় পাওয়া উচিত নয়, রোগকে ভয় পাওয়াও একটা আসক্তি এবং এটা তোমার কাছে ঠিক একই রকম সমস্যা নিয়ে আসবে। সাধনার সময়ে কর্ম দূর করা হয়, কর্মকে দূর করা যন্ত্রণাদায়ক, আরামের মধ্যে দিয়ে তোমার গোংগ কীভাবে বৃদ্ধি পাবে! এছাড়া আর কীভাবেই বা তোমার আসক্তি দূর হবে? আমি তোমাদের সবাইকে বৌদ্ধধর্মের থেকে একটা গল্প বলব। অতীতে একজন ব্যক্তি সাধনায় অনেক প্রচেষ্টার ফলে অর্হৎ হয়েছিল। যখন সে সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত করবে এবং অর্হৎ হবে, ঠিক সেই সময়ে সে কি খুশি না হয়ে থাকতে পারে? সে ত্রিলোক অতিক্রম করে যাবে! এই খুশি হওয়াও একটা আসক্তি, অতি উৎসাহের আসক্তি। একজন অর্হৎ অবশ্যই নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকবে, তার মন অবিচলিত থাকবে, কিন্তু সে অকৃতকার্য হল এবং তার সাধনা ব্যর্থ হল। সাধনা ব্যর্থ হওয়ায় তাকে অবশ্যই নতুনভাবে সব সাধনা করতে হবে। সে পুনরায় নতুনভাবে উপরে ওঠার সাধনা শুরু করল, অনেক প্রচেষ্টার ফলে আবার সাধনা করে উপরে উঠল। এইবার সে ভয় পেয়ে গেল, সে নিজেকে মনে মনে বলল: ‘‘আমি এবার খুশি হবো না, তা নাহলে আবার খুশি হওয়ার ফলে নীচে

নেমে যাব।’’ এই ভয়ের ফলে সে পুনরায় অকৃতকার্য হল। এই ভয় পাওয়াও একধরনের আসক্তি।

আবার আর এক ধরনের পরিস্থিতি আছে, যখন কোনো ব্যক্তি মনোবিকারে আক্রান্ত হয়, তখন তার উপরে চিগোংগ মনোবিকারের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। কিছু লোক এরকমও আছে যারা অপেক্ষা করে, কখন আমি তাদের মনোবিকার নিরাময় করব! আমি বলব মনোবিকার শরীরের কোনো রোগ নয়। আমারও এই সব ব্যাপার দেখাশোনা করার সময় নেই। কেন? কারণ মনোবিকারগ্রস্ত লোকেদের কোনো ভাইরাস থাকে না, শরীরের ভিতরে রোগলক্ষণ সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, শরীরে কোনো ক্ষতও থাকে না। আমার দৃষ্টিতে এটা কোনো রোগই নয়। মনোবিকারগ্রস্ত লোকের মুখ্য চেতনা খুবই দুর্বল হয়, কতটা দুর্বল হয়ে যায়? এটা ঠিক সেইরকম যেখানে একজন ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব নিতে চায় না। মনোবিকারগ্রস্ত লোকের মুখ্য আত্মা ঠিক এইরকমই হয়। সে এই শরীরের দায়িত্ব নিতে চায় না। সে সবসময়ে একটা বিহ্বল অবস্থার মধ্যে থাকে, মনকে কখনোই সচেতন করতে পারে না। ওই সময়ে তার সহ-চেতনা এবং বাইরের বার্তাগুলো এসে তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রত্যেকটা মাত্রার মধ্যে অনেক স্তর থাকে, বিভিন্ন ধরনের সব বার্তা এসে তাকে বাধা দেয়। এছাড়া তার মুখ্য আত্মা হয়তো আগের জীবনে কিছু খারাপ কাজ করেছিল, তার জন্যে সেই পাওনাদাররা হয়তো তার ক্ষতি করতে চায়, নানান ধরনের সব জিনিস ঘটতে পারে। আমরা বলব এই ব্যাপারগুলোই হচ্ছে মনোবিকার। আমি এর জন্যে কীভাবে তোমার চিকিৎসা করব? আমি বলব একজন ব্যক্তি বাস্তবে এইভাবেই মনোবিকার প্রাপ্ত হয়। তাহলে এই ব্যাপারে কী করা উচিত? তাকে শিক্ষা দাও, তার মনকে সচেতন করতে সাহায্য কর। কিন্তু এই কাজটা করা খুবই কঠিন। তুমি দেখবে মানসিক হাসপাতালে একজন ডাক্তার বৈদ্যুতিক শক্ দেওয়ার দন্ডটা হাতে নিলে, মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ খুব ভয় পেয়ে চুপ করে যায় এবং উল্টোপাল্টা কথা বলা বন্ধ করে। এটা কেন হয়? সেই সময়ে তার মুখ্য আত্মা সজাগ হয়ে যায়, সে বৈদ্যুতিক শক্-কে ভয় পায়।

সাধারণত লোকেরা একবার সাধনার দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে, আনন্দের সঙ্গেই সেটা করতে থাকে, প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধ স্বভাব আছে এবং সাধনা করার মানসিকতাও প্রত্যেকের আছে। সেইজন্যে একবার এই সাধনা শেখার পরে অনেকেই এটাকে বাকি জীবনে অনুসরণ করে চলে। সে

সাধনায় সফল হতে পারল কি পারল না, অথবা সে ফা প্রাপ্ত হল কি হল না, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, তার মন অন্ততপক্ষে তাও-প্রাপ্তির চেষ্টা করে যায় এবং সে সর্বদা এটা অনুশীলন করতে থাকে। সবাই জানে যে এই ব্যক্তি চিগোংগ অনুশীলন করে, তার অফিসের লোকেরা জানে, পাড়ার লোকেরা জানে এবং প্রতিবেশীরাও সবাই জানে যে সে চিগোংগ অনুশীলন করে। কিন্তু সবাই চিন্তা কর, কয়েক বছর আগে কে সত্যিকারের সাধনা করত? কোনো লোকই করত না। একমাত্র সত্যিকারের সাধনাই মানব জীবনের পথ পাল্টাতে পারে। আর সে তো একজন সাধারণ মানুষ, সে শুধু মাত্র রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে চিগোংগ অনুশীলন করত, কে তার জীবনের পথ পাল্টাবে? একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে সে কোনো একদিন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কোনো একদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে, কোনো একদিন হয়তো মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে, অথবা মৃত্যুর কবলে পড়তে পারে। সাধারণ মানুষের সমস্ত জীবনই এইরকম। তুমি দেখেছ যে একজন ব্যক্তি পার্কের মধ্যে চিগোংগ অনুশীলন করছে, প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু সত্যিকারের সাধনা করছে না, সে উঁচুস্তরের সাধনা করতে চায় কিন্তু সৎ সাধনা প্রাপ্ত হয়নি, সেইজন্যে সে সাধনায় উন্নতি করতেই পারে না। তার শুধু উঁচুস্তরের সাধনা করার ইচ্ছা আছে, সে এখনও একজন চিগোংগ শিক্ষার্থী হিসাবে রোগ নিরাময় করা এবং শরীর সুস্থ রাখার নীচু স্তরেই রয়ে গেছে। কেউ তার জীবনের পথ পাল্টাতে পারবে না, অতএব তার রোগ থাকবেই। এমনকী সদ্‌গুণ-এর প্রতি জোর না দিলে তার রোগও ঠিক হবে না। আবার এই কথাও বলা যায় না যে, চিগোংগ অনুশীলন করলে কোনো রোগই হবে না।

তাকে অবশ্যই প্রকৃত সাধনা করতে হবে, চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, একমাত্র সত্যিকারের সাধনা করলে, তবেই সে তার রোগ দূর করতে পারবে। যেহেতু চিগোংগ অনুশীলন কোনো শারীরিক ব্যায়াম নয় বরঞ্চ সাধারণ লোকেদের থেকে আরও উঁচু এক ধরনের জিনিস, অতএব চিগোংগ অনুশীলনকারীর জন্যে আরও উঁচু নিয়ম এবং উঁচু আদর্শের আবশ্যকতা রয়েছে, তাকে অবশ্যই এগুলো সব পালন করতে হবে একমাত্র তাহলেই তার লক্ষ্য পূরণ হবে। কিন্তু অনেক লোকই এইভাবে সবকিছু করে না, সেইজন্যে তারা সাধারণ মানুষই রয়ে যায় এবং সময় এলে পরে রোগ প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্তির হঠাৎ একদিন মস্তিস্কে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে, অথবা হঠাৎ কোনো একধরনের অসুখ হতে পারে, অথবা কোনো একদিন সে মনোবিকারে আক্রান্ত হতে পারে। সবাই জানে

যে সে চিগোংগ অনুশীলন করে, অতএব একবার তার মনোবিকার হলেই, লোকেরা বলবে: ‘‘তার চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে,’’ এবং এই বড়ো ছাপটা লাগিয়ে দেবে। সবাই চিন্তা কর, এইরকম করা কি যুক্তিসম্মত হল? বাইরের লোক ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না, এমনকী পেশাদার লোক এবং অনেক চিগোংগ অনুশীলনকারীর পক্ষেও সত্যিকারের কারণ জানা খুব কঠিন। যদি এই ব্যক্তির মনোবিকার বাড়িতে হয় তাহলে অতটা সমস্যা হবে না, যদিও লোকেরা বলে বেড়াবে যে এটা চিগোংগ থেকেই হয়েছে; আর যদি এই ব্যক্তির মনোবিকার অনুশীলনস্থলে হয়, তাহলে তো ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে যাবে। একটা বড়ো ছাপ সেঁটে দেওয়া হবে, যা অনেক চেষ্টা করেও দূর করা যাবে না, সব খবরের কাগজগুলো প্রচার করবে যে চিগোংগ থেকে মনোবিকার হয়েছে। কিছু মানুষ চোখ বন্ধ করে চিগোংগ-এর বিরোধিতা করে: ‘‘দেখো এই কিছুক্ষণ আগে লোকটা কত ভালোভাবে চিগোংগ অনুশীলন করছিল, আর এখন এইরকম হয়ে গেল।’’ কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে তার যা যা হওয়ার কথা সবই হবে। হয়তো তার অন্য কোনো রোগ হতে পারত বা অন্য কোনো সমস্যার উদয় হতে পারত, সবকিছুই চিগোংগ-এর জন্যেই হয়েছে এটা বলা কি যুক্তিসংগত? ব্যাপারটা ঠিক যেন আমাদের হাসপাতালের ডাক্তারের মতো; যেহেতু সে ডাক্তার, অতএব এই জীবনে কখনোই তার রোগ হওয়া উচিত নয়। এইভাবে এটা বোঝা সম্ভব কি?

সেইজন্যে বলা যায়, অনেক লোকই চিগোংগ-এর সত্যিকারের অবস্থাটা না বুঝে এবং এর মূল নীতিগুলো না জেনে দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে মন্তব্য করে থাকে। একবার কোনোরকম সমস্যার সৃষ্টি হলেই সব ধরনের ছাপ চিগোংগ-এর উপর চাপিয়ে দেয়। খুব অল্প সময় হল, চিগোংগ জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু অনেক লোকই এর সম্বন্ধে এক ধরনের একগুঁয়ে মনোভাব পোষণ করে সর্বদা একে অস্বীকার করে, অপবাদ দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে। এটা বোঝা যায় না যে এদের মানসিকতা কীরকম। তারা চিগোংগ-কে এতটাই অপছন্দ করে, যেন মনে হয় চিগোংগ-এর সঙ্গে এদের কোনো ব্যাপার জড়িয়ে আছে, একবার চিগোংগ-এর প্রসঙ্গ উঠলেই, এরা বলবে এটা কাল্পনিক। চিগোংগ হচ্ছে বিজ্ঞান এবং আরও উচ্চতর বিজ্ঞান। শুধুমাত্র এই লোকগুলোর ভীষণ একগুঁয়ে মনোভাব এবং খুবই সীমিত জ্ঞানের জন্যেই এইরকম ঘটে থাকে।

আরও একরকম পরিস্থিতি আছে যাকে সাধক সমাজে ‘‘চিগোংগ অবস্থা’’ বলে। এই ধরনের লোকের মন আনমনা হয়ে থাকে, কিন্তু এটা চিগোংগ মনোবিকার নয়, সে খুবই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন। আমি প্রথমেই চিগোংগ অবস্থা কী সে ব্যাপারে বলব। সবাই জান যে, আমাদের চিগোংগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে জন্মগত সংস্কারের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীতে সবদেশেই কিছু লোক আছে যারা ধর্মকে বিশ্বাস করে এসেছে। আর এই চীন দেশে কয়েক হাজার বছর ধরে লোকেরা বৌদ্ধধর্ম অথবা তাও ধর্মে বিশ্বাস করে এসেছে। তারা বিশ্বাস করে যে ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাবে এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবে। কিন্তু কিছু লোক বিশ্বাস করে না। বিশেষত মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে এগুলোকে নিন্দা করা হতো এবং অন্ধবিশ্বাস বলা হতো। কিছু লোক মনে করে যে সে যা বুঝতে পারেনি, সে বই পড়ে যা শেখেনি, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি যেখানে পৌঁছাতে পারেনি অথবা এখনও যেসব জিনিস জানা যায়নি, তাদের বিবেচনায় এগুলো সবই অন্ধবিশ্বাস। কয়েক বৎসর পূর্বে এইরকম লোক অনেক বেশী ছিল, এখন তুলনামূলকভাবে কম। কারণ কিছু ঘটনা বাস্তবে আমাদের এই মাত্রাতে ইতিমধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও তুমি স্বীকার কর না। তুমি এর সামনাসামনি হতে ভয় পাও, কিন্তু এখন লোকেরা সাহস করে এসব নিয়ে বলছে, লোকেরা চোখে দেখে এবং কানে শুনেও চিগোংগ-এর পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছে।

কিছু লোকের একগুঁয়েমী এমন স্তরে যে, তুমি একবার চিগোংগ শব্দটা উল্লেখ করলেই তারা মনের ভিতর থেকে তোমাকে লক্ষ্য করে হাসতে থাকবে। তারা মনে করবে তুমি অন্ধবিশ্বাসী, এবং খুবই হাস্যকর। তুমি একবার চিগোংগ-এর কোনো ঘটনার কথা উত্থাপন করলেই তারা তোমাকে খুবই মূর্খ মনে করবে। যদিও এই ধরনের কোনো ব্যক্তি মানসিকতার দিক দিয়ে একগুঁয়ে, কিন্তু তার জন্মগত সংস্কার হয়তো খারাপ নয়। যদি তার সংস্কার ভালো হয় এবং সে চিগোংগ অনুশীলন করতে চায়, তার দিব্যচক্ষু খুব উঁচুস্তরে খুলে যেতে পারে এবং অলৌকিক ক্ষমতারও উদয় হতে পারে। সে চিগোংগ বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে এটা কখনোও নিশ্চিত করতে পারে না যে সে অসুস্থ হবে না। সে অসুস্থ হলে হাসপাতালে যায়, যদি পশ্চিমী চিকিৎসায় তার অসুখ ঠিক না হয়, সে চীনের চিকিৎসা ব্যবস্থার ডাক্তারকে দেখাতে যায়, যখন চীনের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সে ভালো না হয় এবং কোনো পরম্পরাগত ঔষধ বিধিতেও কাজ না হয়, তখন তার চিগোংগ-এর কথা মনে পড়ে। সে নিজে চিন্তা করে:

‘‘আমি একবার ওখানে গিয়ে ভাগ্যটাকে পরীক্ষা করে দেখব যে চিগোংগ আমার রোগটাকে সত্যিই নিরাময় করতে পারে কি না।’’ সে খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওখানে যায়। যেহেতু তার জন্মগত সংস্কার ভালো, সেইজন্যে সে যখনই চিগোংগ অনুশীলন শুরু করল, সে সেটা ভালো করে করতে থাকল। হয়তো কোনো চিগোংগ মাস্টার তার প্রতি আগ্রহী হলেন, অথবা অন্য মাত্রার কোনো উঁচুস্তরের জীবন সত্তা তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ তার দিব্যচক্ষু খুলে গেল, অথবা সে আধা-আলোকপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌঁছে গেল। তার দিব্যচক্ষু খুব উঁচু স্তরে খুলে গেল, অকস্মাৎ সে এই বিশ্বের কিছুটা বাস্তব অবস্থা দেখতে পারল, এছাড়া সে অলৌকিক ক্ষমতারও অধিকারী হল। তুমিই বলো এই ব্যক্তি এই ধরনের অবস্থা দেখার পরে, তার মস্তিষ্ক সেটা গ্রহণ করতে পারবে কি? তুমি চিন্তা করে দেখোতো যে তার মানসিক অবস্থা কীরকম হতে পারে? পূর্বে যেটাকে অন্ধবিশ্বাস মনে করত, যেটাকে নিশ্চিতভাবে ঘটা অসম্ভব মনে করত এবং অন্য লোকেরা যেটার উল্লেখ করলে হাস্যকর মনে করত, সেটাই এখন বাস্তবে চোখের সামনে দৃশ্যমান হচ্ছে, এবং সে সত্যিই সেটার সংস্পর্শে রয়েছে। তার মস্তিষ্ক এটা হজম করতে পারছে না, যেহেতু খুব বেশী মানসিক চাপ তাকে নিতে হচ্ছে, সে যা বলছে অন্যেরা সেটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু তার চিন্তাধারাটা যুক্তিনিষ্ঠ, অসংলগ্ন নয়। সে দুই দিকের সম্পর্কের মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্যটা আনতে পারছে না। সে আবিষ্কার করে যে মানুষ যা করছে ভুল করছে, অথচ অন্য দিকে যা হচ্ছে সাধারণত ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু সে যদি অন্য দিকের মতো কাজ করে, তখন লোকেরা তাকে বলে যে ভুল হচ্ছে। লোকেরা তাকে বুঝতে পারে না, সেইজন্যে বলে যে অনুশীলনের ফলে তার চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে।

বস্তুত এই ব্যক্তির চিগোংগ মনোবিকার হয়নি, আমাদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক যারা চিগোংগ অনুশীলন করে, তাদের এই ধরনের ঘটনা একেবারেই ঘটবে না, কেবল খুব একগুঁয়ে কিছু লোকেদেরই এইরকম চিগোংগ অবস্থা হতে পারে। আমাদের এখানে যারা বসে আছ, তাদের অনেকেরই দিব্যচক্ষু খুলে গেছে, সংখ্যাটা বেশ ভালোই। তারা সত্যিই অন্য মাত্রার জিনিসগুলি দেখতে পারে, তারা বিস্ময় বোধ করে না, তারা বেশ ভালোই বোধ করে, তাদের মস্তিষ্ক কোনো পীড়া অনুভব করে না এবং এই ধরনের চিগোংগ অবস্থারও উদয় হয় না। চিগোংগ অবস্থা উদয় হওয়ার পরে সেই ব্যক্তি খুবই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়, তার কথাবার্তা বেশ দার্শনিকসুলভ এবং অত্যন্ত যুক্তিসম্মত হয়। শুধু তার বলা

কথাগুলো সাধারণ লোকেরা বিশ্বাস করে না। সে হয়তো কখনো তোমাকে বলে যে, সে অমুক লোককে দেখেছে, যার মৃত্যু হয়ে গেছে এবং সে তাকে কিছু করতে বলেছে। সাধারণ লোক তাকে বিশ্বাস করতে পারবে কি? পরে সে বুঝতে পারে যে, এইসব জিনিস বাইরে না বলে তার নিজের মনের মধ্যেই রাখা উচিত, এইভাবে সে দুই দিকের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে ঠিকভাবে বজায় রাখতে পারে। সচরাচর এই সব লোকেদের অলৌকিক ক্ষমতাও থাকে এবং এটা চিগোংগ মনোবিকারও নয়।

আর এক ধরনের অবস্থা আছে, যাকে বলা হয় ''প্রকৃত উন্মাদবস্থা,'' এটা খুবই কম দেখা যায়। ''প্রকৃত উন্মাদবস্থা''বলতে আমরা যা বলছি, এর অর্থ কিন্তু সত্যিই উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়, এর অর্থ হচ্ছে সত্যিকারের সাধনা করা। প্রকৃত উন্মাদবস্থা কীরকম? আমি বলব সাধকদের মধ্যে, এক লক্ষ জনের মধ্যে একজন লোকের এইরকম হতে পারে, খুবই কম দেখা যায়। সেইজন্যে এটা সার্বজনীন নয়, এবং সমাজের উপরে কোনো প্রভাবও সৃষ্টি করে না।

''প্রকৃত উন্মাদবস্থা''র ক্ষেত্রে সাধারণত একটা পূর্বশর্ত থাকে, অর্থাৎ এই ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার অত্যন্ত ভালো এবং বয়সের দিক দিয়ে সে অবশ্যই খুব প্রবীণ। বয়স বেশী হওয়ায়, সাধনা করতে চাইলেও ইতিমধ্যে খুব দেরি হয়ে গেছে। অত্যন্ত উন্নত জন্মগত সংস্কার নিয়ে এরা খুবই উচ্চ স্তর থেকে সাধারণত কোনো বিশেষ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে এখানে আসে। সাধারণ মানবসমাজে আসতে সকলেই ভয় পায় কারণ, একবার স্মৃতিটা মুছে গেলে সে আর কাউকে চিনতে পারে না। সাধারণ মানুষের এই সামাজিক বাতাবরণে আসার পরে লোকেরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার ফলে সে খ্যাতি এবং লাভের প্রতি বেশী মনোযোগ দেয়, শেষে সে নীচে নেমে যায়। এমন দিন কখনো আর আসবে না যখন সে মুক্ত হতে পারবে। সেইজন্যে কেউই আসতে সাহস করে না এবং প্রত্যেকেই ভয় পায়। তবুও এইরকম লোক আছে, যে এখানে আসে, এখানে আসার পরে, সে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সত্যিই ঠিকভাবে চলতে পারে না, সে সত্যিই নীচে নেমে যায়, এবং সারা জীবনে অনেক খারাপ কাজ করে। যখন সে জীবনযাপনের সময়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে সংগ্রাম করে, তখন সে খুব বেশী খারাপ কাজ করে ফেলে এবং অনেক বেশী জিনিসের ঋণে জড়িয়ে পড়ে। তার মাস্টার এটা দেখেন যে এই ব্যক্তি নীচে নেমে যাবে। কিন্তু সে সাধনায় সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, তাকে

এইভাবে এত সহজে নীচে নেমে যেতে দেওয়া যায় না! কী করা যায়? মাস্টার খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, অন্য কোনো সাধনার পদ্ধতিও তার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সময়ে কোথায় মাস্টারের খোঁজ পাওয়া যাবে? তাকে অবশ্যই নতুন করে সাধনার মাধ্যমে মূলে ফিরতে হবে। কিন্তু এটা বলা সহজ করা কঠিন। তার বয়সও বেড়ে গেছে, সাধনার জন্যে সময় খুব কমই আছে। এখন কোথায় মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতির খোঁজ পাওয়া যাবে.?

এই ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার অবশ্যই খুব ভালো থাকতে হবে, অত্যন্ত বিশেষ এই পরিস্থিতি হলে, কেবলমাত্র তখনই এই উন্মাদ করে দেওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে যখন এটা নিশ্চিত যে, এই ব্যক্তির আর কোনো আশা নেই এবং সে নিজে আর তার মূলে ফিরতে পারবে না, সেই অবস্থায় হয়তো এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ তাকে উন্মাদ করে দেওয়া হয়, তার মস্তিষ্কের কিছু অংশের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন, আমরা ঠান্ডাকে ভয় পাই এবং নোংরাকে ভয় পাই, সেইজন্যে মস্তিষ্কের যে অংশটা ঠান্ডাকে ভয় পায় এবং যে অংশটা নোংরাকে ভয় পায় সেগুলোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইভাবে তার মস্তিষ্কের, কিছু অংশের কাজ বন্ধ করার ফলে তার মানসিক সমস্যার উদয় হয়, সে সত্যিকারের উন্মাদের মতো আচরণ করতে থাকে। কিন্তু এইরকম লোকেরা সাধারণত অন্যায় কাজ করে না, সে কাউকে অপমান করে না বা কাউকে আঘাত করে না, এরা প্রায়ই ভালো কাজ করে। কিন্তু সে নিজের প্রতি খুবই নিষ্ঠুর। যেহেতু সে ঠান্ডা বুঝতে পারে না, শীতকালে সে খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে দৌড়ে বেড়ায় এবং একটা পাতলা কাপড় পরে থাকে। তার পা ঠান্ডায় এতটাই জমে যায় যে অনেকটা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। যেহেতু সে নোংরা বুঝতে পারে না, সেইজন্যে মানব মল খেতে সাহস করে এবং মানব মূত্র পান করতে সাহস করে। পূর্বে আমি এইরকম এক ব্যক্তিকে জানতাম যে ঠান্ডায় জমে খুব শক্ত পাথরের মতো হয়ে যাওয়া ঘোড়ার মল খুব সুস্বাদু হিসাবে কামড়ে কামড়ে খেত। সে এত কষ্ট সহ্য করতে পারত যা সাধারণ মানুষ সচেতন অবস্থায় সহ্য করতে পারবে না। তুমি চিন্তা করো, সে এই উন্মাদবস্থার জন্যে কত বেশী কষ্ট সহ্য করেছিল। অবশ্য এরা প্রায়ই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং বেশীরভাগই বয়স্ক মহিলা। অতীতে বয়স্ক মহিলাদের পা বেঁধে রাখা হতো পা ছোট করার জন্যে, অথচ এরকম একজন বয়স্ক মহিলা ছিল যে সহজেই দুই মিটারেরও বেশী

উঁচু দেওয়াল লাফ দিয়ে পেরোতে পারত। যখন তার পরিবারের লোকেরা দেখল যে সে উন্মাদ হয়ে গেছে এবং সর্বদা বাড়ির বাইরে দৌড়ে যাচ্ছে, তখন তারা তাকে ঘরের ভিতরে তালা বন্ধ করে রাখত। যখন পরিবারের লোকেরা বাইরে যেত, তখন সে তার আঙ্গুল তালার দিকে নিশানা করে খুলে ফেলত এবং বাড়ির বাইরে চলে যেত। তখন তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে তালা বন্ধ করে রাখত। সবাই বাড়ি থেকে চলে গেলে শরীরকে একটু ঝাঁকিয়ে শিকল খুলে ফেলত। তাকে চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল না, এইভাবে সে প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছিল। যেহেতু সে খুব নির্মম কষ্ট সহ্য করেছিল এবং কষ্টটা খুবই ভয়ংকর ছিল, সেইজন্যে তার খারাপ কাজ করার ঋণগুলো খুব তাড়াতাড়ি শোধ হয়ে গিয়েছিল। এর জন্যে সবথেকে বেশী হলে তিন বছর লাগে, সচরাচর এক বা দুই বছরেই ব্যাপারটা মিটে যায়। সে যেরকম দুর্ভোগ সহ্য করেছিল, সেটা খুবই সাংঘাতিক ছিল। এটা শেষ হওয়ার পরে সে হঠাৎ বুঝতে পারে যে কী কী ঘটেছিল। যেহেতু এইভাবে তার সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার গোংগ সঙ্গে সঙ্গে খুলে গিয়ে অনেক ধরনের দৈবিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল। এই ঘটনা খুবই কম দেখা যায়, ইতিহাসে এইরকম কিছু ঘটনা দেখা গেছে। কিন্তু যেসব লোকেদের জন্মগত সংস্কার সাধারণ মানের, তাদের ক্ষেত্রে এইরকম করতে দেওয়া যাবে না। সবাই জান যে ইতিহাসে উন্মাদ ভিক্ষুদের কথা এবং উন্মাদ তাও সাধকদের কথা সত্যিই নথিভুক্ত করা আছে। কোনো একজন উন্মাদ ভিক্ষু মন্ত্রী ছিন হুই[78]কে মন্দির থেকে ঝাড়ু মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, উন্মাদ তাও পুরোহিতদের নিয়েও গল্প আছে। এইরকম চিরায়ত কাহিনী অনেক আছে।

চিগোংগ মনোবিকার (অসুরের মতো আগুনের মধ্যে প্রবেশ করা) সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে, এর কোনো অস্তিত্ব নেই। যদি কোনো লোক সত্যি সত্যি আগুন সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে আমি বলব লোকটা সত্যিই অসাধারণ। যদি কোনো ব্যক্তি মুখ হাঁ করে আগুন বের করতে পারে, বা হাত প্রসারিত করে আগুন নির্গত করতে পারে, অথবা যদি কেউ হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে সিগারেটের আগুন ধরাতে পারে, তাহলে আমি একে বলব অলৌকিক ক্ষমতা!

---

[78]ছিন হুই - দক্ষিণ দিকের সংগ রাজবংশের সময়ে রাজ দরবারের একজন দুষ্ট মন্ত্রী (1127 A.D. -1279 A.D.)।

চিগোংগ অনুশীলনে আসুরিক বাধা

চিগোংগ অনুশীলনে আসুরিক বাধা বলতে কী বোঝায়? অর্থাৎ চিগোংগ অনুশীলন করার সময়ে প্রায়ই আমাদের সামনে কিছু বাধা সহজেই এসে যায়। চিগোংগ অনুশীলন কীভাবে আসুরিক বাধা-কে আহ্বান করে আনতে পারে? যেহেতু কোনো ব্যক্তি সাধনা করতে চাইলে সেটা বাস্তবে খুবই কঠিন, সত্যিকারের সাধনায় মূলত আমার ফা-শরীরের সুরক্ষা ছাড়া সফল হওয়া সম্ভবই নয়, তুমি যেই দরজার বাইরে পা ফেলবে, তোমার জীবন নিয়ে সমস্যা হতে পারে। মানুষের মুখ্য আত্মার বিনাশ নেই, অতীতের জীবনগুলোতে সামাজিক কাজকর্মের সময়ে, তুমি হয়তো কারোর কাছে ঋণী ছিলে, কারোর থেকে সুযোগ গ্রহণ করেছিলে, অথবা কোনো দুষ্কর্ম করেছিলে, সেইজন্যে পাওনাদাররা তোমার খোঁজ করবে। বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা দেওয়া হয়: মানুষের জীবন হচ্ছে তার কর্মফল ভোগ করার জন্যে। তুমি কারোর কাছে ঋণী ছিলে, সে তোমাকে খুঁজে বার করবে সেই ঋণ ফেরত পাওয়ার জন্যে। যতটা ফেরত পাওয়ার কথা, সে যদি তার থেকে বেশী পেয়ে যায়, তাহলে আবার সামনের বারে, সে সেটা তোমাকে ফেরত দেবে। যদি পুত্র পিতা-মাতাকে অশ্রদ্ধা করে, তবে সামনের জীবনে দুজনের ভূমিকার অদল-বদল হবে, অর্থাৎ এইভাবে কর্মফলভোগ চক্রাকারে চলতেই থাকবে। কিন্তু আমরা সত্যিই আসুরিক বাধা পর্যবেক্ষণ করেছি, যা তোমাকে চিগোংগ অনুশীলন করতে দেবে না, এসবেরই পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক আছে, কারণ ছাড়া কিছু হয় না, কোনো কারণ ছাড়া এটা ঘটতে দেওয়াই যাবে না।

চিগোংগ-এর ক্ষেত্রে আসুরিক বাধার যে রূপটা সাধারণত সবচেয়ে বেশী দেখা যায় সেটা এই রকম। চিগোংগ অনুশীলনের পূর্বে তোমার চারিদিকের পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্তই ছিল। যেহেতু তুমি চিগোংগ শিখেছ, তুমি সর্বদা এটা অনুশীলন করতে পছন্দ কর, কিন্তু তুমি যখনই বসে ধ্যান করতে শুরু করবে, হঠাৎ তুমি বোধ করবে যে বাইরের পরিবেশ আর শান্ত নেই। গাড়ির হর্ন বাজতে থাকবে, বাইরের পথ বারান্দায় লোকেদের হাঁটাচলার শব্দ, কথা বলার শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হতে থাকবে, বাইরে কেউ রেডিওটাও চালিয়ে দেবে। হঠাৎ করে জায়গাটা আর শান্ত থাকবে না। তুমি চিগোংগ অনুশীলন না করলে পরিবেশটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু তুমি একবার চিগোংগ অনুশীলন শুরু

করলেই এইরকম হবে। আমাদের অনেকেই এটা গভীরভাবে ভেবে দেখেনি যে সত্যিকারের ব্যাপারটা কী, তোমার শুধু অদ্ভুত বোধ হবে, তুমি চিগোংগ অনুশীলন করতে না পেরে বেশ হতাশ হয়ে পড়বে। এই ''অদ্ভুতভাবটা'' তোমার অনুশীলন থামিয়ে দেবে অর্থাৎ অসুর তোমাকে বাধা দিল, এ লোকেদের চালনা করে তোমাকে বাধা দিল। এটা বাধা সৃষ্টির এক সরলতম রূপ, যা তোমার অনুশীলন থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটাতে সফল হল। ''তুমি চিগোংগ অনুশীলন করে তাও প্রাপ্ত হবে, অতএব তুমি যে ঋণগুলো শোধ করনি সেগুলোর কী হবে?'' তারা এতে সম্মত হবে না, এবং তোমাকে অনুশীলন করতে দেবে না। কিন্তু এটাও সাধনার একটা স্তরের প্রতিফলন, কিছুকাল কেটে যাওয়ার পরে আর এই ঘটনা ঘটার অনুমতি দেওয়া হবে না, অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে ঋণগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পরে তারা আর তোমাকে বাধা দেওয়ার অনুমতি পাবে না। এর কারণ যারা আমাদের ফালুন দাফা-র সাধনা করে তাদের সাধনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত উন্নতি হয়, তারা স্তরগুলিকেও তুলনামূলকভাবে দ্রুত ভেদ করতে থাকে।

আরও এক প্রকার আসুরিক বাধা আছে। তোমরা জান যে চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে আমাদের দিব্যচক্ষু খুলে যেতে পারে। কিছু লোকের বাড়িতে চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে দিব্যচক্ষু খুলে যেতে পারে, তখন কেউ কেউ ভয়াবহ দৃশ্য বা ভয়ংকর চেহারা দেখতে পারে। তাদের কারোর থাকে না আঁচড়ানো এলোথেলো চুল, কেউ কেউ তোমার সাথে ভীষণভাবে লড়াই করতে চায়, এমনকী নানান ধরনের ভাবভঙ্গি করতে থাকে, খুবই ভয় পাওয়ার মতো সব লোক। অনেক সময়ে যখন তুমি অনুশীলন করছ, তখন এদেরকে বাইরের থেকে জানলার দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখা যায় যা খুবই ভয়ংকর। এই পরিস্থিতির উদয় হয় কেন? এসবই আসুরিক বাধার রকম-ফের। কিন্তু আমাদের ফালুন দাফা-র এই পদ্ধতিতে এইরকম পরিস্থিতি খুব কমই দেখা যায়। একশ' জনের মধ্যে হয়তো একজনের হতে পারে। বেশীর ভাগ লোকেদেরই এর সম্মুখীন হতে হয় না। যেহেতু এর দ্বারা আমাদের সাধনায় কোনো লাভ হবে না, সেইজন্যে তোমার প্রতি এই প্রকারের বাধা সৃষ্টি করতে এদের অনুমতি দেওয়া হয় না। অথচ অন্য সাধারণ পদ্ধতিগুলিতে এই ব্যাপারটা সবচেয়ে সার্বজনীন ঘটনা এবং এটা অবশ্যই বেশ লম্বা সময়কাল ধরে চলতে থাকে। কিছু লোক ভীষণ ভয় পেয়ে যায়, এই কারণে চিগোংগ অনুশীলন করতে পারে না। লোকেরা সাধারণত রাত্রিবেলায় বেশ শান্ত পরিবেশে

অনুশীলন করা পছন্দ করে, তখন সে যদি চোখ খুলে দেখে যে কেউ একজন ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে দেখতে অর্ধেকটা মানুষের মতো এবং অর্ধেকটা প্রেতের মতো, তাহলে সে ভয় পেয়ে আর অনুশীলন করতে সাহস করে না। আমাদের ফালুন দাফাতে সাধারণত এই ঘটনা দেখা যায় না, কিন্তু কিছু বিরল ব্যতিক্রমও আছে, কিছু লোকের পরিস্থিতি খুবই বিশেষ ধরনের হতে পারে।

আরও একধরনের পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের যুগ্ম সাধনা, এতে রণক্রীড়া (martial arts) এবং অন্তরের সাধনা দুইই শেখানো হয়, এই ধরনের পদ্ধতি তাও মতেই অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। একবার কোনো ব্যক্তি এই সাধনা পদ্ধতি শিখে নিলে তাকে প্রায়ই এই ধরনের আসুরিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ চিগোংগ পদ্ধতিতে এরকম বাধা আসে না, শুধু যে ব্যক্তি অন্তর এবং বাহিরের এই যুগ্ম সাধনা করে, অথবা রণক্রীড়ার সাধনা করে, তার ক্ষেত্রে লোকেরা লড়াই করার জন্যে এই ব্যক্তির খোঁজ করে। যেহেতু এই পৃথিবীতে অনেক তাও সাধক আছে, যাদের অনেকেই রণক্রীড়া অনুশীলন করে, অথবা অন্তর এবং বাহিরের যুগ্ম সাধনা করে। একজন রণক্রীড়ার অনুশীলনকারীরও গোংগ বিকশিত হতে পারে। কেন পারে? সেই ব্যক্তি যদি তার অন্য আসক্তিগুলোকে যেমন খ্যাতি, ব্যক্তিগত লাভ দূর করতে পারে, তাহলে তার গোংগ-এর বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আসক্তি দূর হতে অনেক সময় লাগে, অপেক্ষাকৃত দেরিতে দূর হয়, সেইজন্যে সে সহজেই এই ধরনের জিনিস করে যায়, সাধনার একটা বিশেষ স্তরের মধ্যেই এটা সংঘটিত হয়। সে যখন ধ্যানে বসে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তখন সে জানতে পারে যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রণক্রীড়া অনুশীলন করছে, তখন তার মূল আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে সেই সেই ব্যক্তির খোঁজ করে পরীক্ষা করতে চায় যে রণক্রীড়াতে কার দক্ষতা বেশী, অতএব লড়াই বেধে যায়। অন্য মাত্রাতেও এই ধরনের পরিস্থিতির আবির্ভাব হতে পারে, সেক্ষেত্রে কেউ এসে তার সঙ্গে লড়াই করতে বা মোকাবিলা করতে চাইতে পারে, যদি সে লড়াই করতে না চায়, তাহলে সত্যি সত্যি তাকে মেরেও ফেলতে পারে, সেইজন্যে পরস্পরের মধ্যে লড়াই বেধে যায় এবং লড়াই চলতেই থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়লেই, কেউ তাকে খুঁজে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সামিল করে এবং এমনকী তার রাত্রির বিশ্রামটুকুও হয় না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়েই তার প্রতিযোগিতা করার আসক্তিকে দূর করতে হবে, যদি সে প্রতিযোগিতা করার আসক্তি ত্যাগ

করতে না পারে, তাহলে সে সর্বদা এইরকমই রয়ে যায়। যদি এইরকম ব্যাপার চলতেই থাকে, তাহলে আরও কয়েক বছর কেটে গেলেও সে এই স্তর পার করতে পারে না। এই ব্যক্তি আর চিগোংগ অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারে না, তার ভৌতিক শরীর আর এটা সহ্য করতে পারে না, যেহেতু সে খুব বেশী শক্তি ব্যয় করে ফেলেছে, এবং ঠিকভাবে সামলাতে না পারলে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। সেইজন্যে অন্তর ও বাহিরের এই যুগ্ম সাধনায় এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং এটা বেশ হামেশাই ঘটে। আমাদের অন্তরের সাধনা পদ্ধতিতে এই ধরনের পরিস্থিতি ঘটে না এবং ঘটতেও দেওয়া হয় না। আমি এইমাত্র কয়েক প্রকারের কথা বললাম যেগুলোর অস্তিত্ব বেশ হামেশাই দেখা যায়।

আরও এক প্রকার আসুরিক বাধা আছে যার সম্মুখীন সবাইকে হতে হয়, আমাদের পদ্ধতির সবাইকে এই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এটা এক ধরনের কাম-জনিত আসুরিক বাধা। এই জিনিসটা খুবই গম্ভীর। সাধারণ মানবসমাজে স্বামী এবং স্ত্রীর যে বিবাহিত জীবন, একমাত্র তার ফলেই মানবজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেহেতু এইভাবেই মানবজাতির বিকাশ ঘটছে, সেইজন্যে এই মানবসমাজের মধ্যে আছে আবেগ, সেই কারণে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই জিনিসটা পুরোপুরি যুক্তিসংগত। যেহেতু লোকেদের আবেগ আছে, সেইজন্যে ক্রোধ একটা আবেগ, একইভাবে আনন্দ, ভালোবাসা, ঘৃণা, কোনো কিছু করতে পছন্দ করা, কোনো কিছু করতে অপছন্দ করা, কে ভালো বা কে মন্দ এটা বিচার করা, কোনো কাজ করতে ভালো লাগা অথবা কোনো কাজ করতে ভালো না লাগা এসবই হচ্ছে আবেগ, সাধারণ মানুষ এই আবেগ নিয়েই জীবনযাপন করে। সেইজন্যে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে এবং একজন উচ্চতর মানুষ হিসাবে এই সব নিয়ম দিয়ে কোনো কিছু বিচার করবে না, তোমাকে এই জিনিসের বাধা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে। সেইজন্যে, আবেগ থেকে এত যেসব আসক্তি উদ্ভূত হয়, সেগুলোকে আমাদের নিস্পৃহভাবে দেখা উচিত, শেষে সবগুলোকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে হবে। আকাঙ্ক্ষা এবং কাম এই সব জিনিস মানুষের আসক্তির অন্তর্ভুক্ত, এই সব জিনিস দূর করা উচিত।

আমাদের এই পদ্ধতিতে যারা সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করছে, তাদের ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হওয়ার জন্যে বলা হয় না। অল্পবয়সি সাধকদের জন্যে পারিবারিক জীবনযাপনের বন্দোবস্তই করা উচিত। তাহলে এই

বিষয়টাকে আমাদের কীভাবে বিবেচনা করা উচিত? আমি বলেছি যে আমাদের এই পদ্ধতিতে মানব মনকেই সরাসরি নিশানা করা হয়। কোনো বস্তুগত সুবিধা সত্যি সত্যি হারাতে হয় না। বিপরীতপক্ষে, সাধারণ মানুষদের পার্থিব লাভের মধ্যে থেকে তোমার চরিত্রকে দৃঢ় করতে হবে, তাহলেই তোমার চরিত্রের সত্যিকারের উন্নতি ঘটবে। তোমার এই আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে পারলে, তুমি সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে পারবে এবং তোমাকে পার্থিব লাভ ত্যাগ করতে বলা হলে, তুমি অবশ্যই সেটা ত্যাগ করতে পারবে। তোমার আসক্তিগুলোকে ত্যাগ না করলে, তুমি কোনো কিছুই ত্যাগ করতে পারবে না, সেইজন্যে সত্যিকারের সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের সাধনা করা। মন্দিরের সাধনায় তোমাকে এই সব জিনিস ছাড়তে বাধ্য করা হয় যাতে তোমার আসক্তিগুলোকে দূর করা যায়, জোর করে সমস্ত জিনিস থেকে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং তোমাকে এ সম্বন্ধে চিন্তাও করতে দেওয়া হয় না, এটাই তাদের পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতিতে তোমার এইরকম পথ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আমরা চাই যে তোমার ঠিক সামনে পার্থিব লাভ পড়ে থাকলেও, তুমি যেন সেগুলোর প্রতি নিস্পৃহভাব রাখতে পার, সেইজন্যে আমাদের এই সাধনা পদ্ধতি সবচেয়ে শক্তিশালী। আমরা তোমাকে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হতে বলব না। আমরা সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করি, ভবিষ্যতে আমাদের এই পদ্ধতি আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে, আমাদের প্রত্যেককে আধা ভিক্ষু হতে হবে না, এবং এটা ঠিক নয় যে প্রত্যেক ফালুন দাফা শিক্ষার্থীকে ওই রকম হতে হবে। আমাদের এই সাধনায় আবশ্যকতা হচ্ছে এই যে যদিও তুমি সাধনা করছ, কিন্তু তোমার স্ত্রী বা স্বামী হয়তো সাধনা করছে না, সেক্ষেত্রে সাধনার জন্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ আমরা এই ব্যাপারটাকে নিস্পৃহভাবে দেখব, সাধারণ মানুষের মতো এই ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। বিশেষ করে, বর্তমান সমাজের তথাকথিত যৌন স্বাধীনতা, এই সব অশ্লীল জিনিসগুলো সাধারণ লোকেদের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে যাচ্ছে। কিছু মানুষ এগুলোকে অনেক গুরুত্ব দেয়, কিন্তু আমরা সাধক হিসাবে এগুলোকে খুব নিস্পৃহভাবে দেখব।

উচ্চস্তর থেকে দেখলে বলা যায় যে সমাজে সাধারণ লোকেরা সত্যিই কাদা ঘাঁটছে, তারা মনেও করছে না যে এটা অত্যন্ত নোংরা জিনিস, তারা এই পৃথিবীতে কাদা নিয়েই খেলে যাচ্ছে। আমরা বলেছি যে এই ব্যাপারটার কারণে নিজের পরিবারে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবে না। সেইজন্যে

বর্তমান পর্যায়ে তুমি এটাকে নিস্পৃহভাবে দেখবে, একটা স্বাভাবিক এবং সংগতিপূর্ণ বিবাহিত জীবন বজায় রাখবে। ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছালে তখন সেই স্তরের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, বর্তমানে এইরকমই চলতে থাকবে, আমাদের প্রয়োজনীয়তাটুকু পালন করে যেতে পারলেই যথেষ্ট। অবশ্য বর্তমানে সমাজে যেরকম অবস্থা চলছে তুমি সেইরকম হবে না, সেটা কীভাবে হতে দেওয়া যাবে!

আরও একটা বিষয় আছে, সবাই জান যে আমাদের অনুশীলনকারীদের শরীরে শক্তি আছে। এখন আমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আশি থেকে নব্বই ভাগ লোকের, শুধুমাত্র যে রোগ ঠিক হয়ে যাবে তা নয়, তাদের মধ্যে গোংগ-এরও বিকাশ ঘটবে। সেইজন্যে তোমার শরীর খুব ক্ষমতাশালী শক্তি বহন করবে। এখন তোমার গোংগ এবং চরিত্রের স্তর সমানুপাতিকরূপে নেই। বর্তমানে তোমার গোংগ সাময়িকভাবে উঁচুতে আছে, যেহেতু একবারে তোমার গোংগ বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন তুমি চরিত্রের উন্নতি করছ। ধীরে ধীরে তুমি সমান তালে এগোতে পারবে এবং এটা নিশ্চিত যে, এই সময়কালের মধ্যেই তুমি সমান তালে এগোতে পারবে, সেইজন্যে আমরা সময়ের আগেই ব্যাপারটা করে দিয়েছি, অন্যভাবে বলা যায় যে, তোমার কাছে কিছুটা শক্তি আছে। যেহেতু সৎ সাধনার দ্বারা আবির্ভূত হওয়া এই শক্তি বিশুদ্ধ এবং সহানুভূতিশীল, সেইজন্যে তোমরা সবাই যারা এখানে বসে আছ, তারা একটা শান্তিপূর্ণ এবং করুণাময় পরিবেশ অনুভব করতে পারবে। আমি নিজে এইভাবে সাধনা করে এসেছি এবং আমি এই জিনিসগুলি বহন করি। তোমরা এখানে যারা বসে আছ সবাই একটা সমন্বয়ের ভাব অনুভব করতে পারবে, কারোর মনে কোনো বাজে চিন্তার উদয় হবে না, এমনকী সিগারেট টানার কথাও মনে আসবে না। ভবিষ্যতে তুমি যখন দাফা-র আবশ্যকতা অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, তখন তোমার সাধনার মাধ্যমে বিকশিত গোংগ এইরকমই হবে। তোমার গোংগ সামর্থ্যের নিরন্তর বৃদ্ধির সময়ে তোমার শরীরের গোংগ-এর যে শক্তি বাইরে ছড়ানো অবস্থায় থাকবে সেটাও যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। এমনকী শক্তিটা অতটা ক্ষমতাসম্পন্ন না হলেও, একজন সাধারণ মানুষকে তোমার এই ক্ষেত্রের মধ্যে, অথবা তুমি বাড়িতে থাকাকালীন অন্য লোকেদেরও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। বাড়িতে পুরো পরিবার হয়তো তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কেন এটা হয়? এর জন্যে তোমার মনকেও ব্যবহার করতে হয় না। যেহেতু এই ক্ষেত্রটা পবিত্র, শান্তিপূর্ণ, করুণাময়, এবং সৎচিন্তা যুক্ত, সেইজন্যে লোকেরা চট্ করে

খারাপ চিন্তা বা খারাপ কাজ করতে পারবে না, ক্ষেত্রটার কার্যকারিতা এই রকমই।

অন্য একদিন আমি বলেছিলাম যে ‘‘বুদ্ধ জ্যোতি সর্বত্র আলোকিত করে, যুক্তিযুক্ততা এবং ন্যায়নিষ্ঠতা সবকিছুর সামঞ্জস্যবিধান করে,’’ অর্থাৎ বলা যায় যে আমাদের শরীরের বাইরে যে শক্তি ছড়িয়ে থাকে তা সমস্ত অস্বাভাবিক অবস্থাকে সংশোধন করে। সেইজন্যে তুমি যদি এই জিনিসগুলো চিন্তা না কর তাহলে, এই ক্ষেত্রের প্রভাবে তোমার পতি বা পত্নী না বুঝেই তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তুমি যদি ওই চিন্তা না কর এবং তুমি যদি ওই ধরনের চিন্তা না আসতে দাও, তাহলে তোমার পতি বা পত্নীরও ওই চিন্তা আসবে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয়, এখনকার এই পরিবেশে, যেখানে দূরদর্শন খুললেই কীসব দেখবে যা সহজেই লোকেদের আকাঙ্ক্ষাগুলোকে প্ররোচিত করতে পারে, কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে তোমার এই নিয়ন্ত্রণটা কার্যকরী থাকবে। ভবিষ্যতে তুমি যখন সাধনায় উচ্চস্তরে পৌঁছাবে তখন আমার দিক থেকে তোমাকে বলার প্রয়োজন হবে না, তুমি নিজে নিজেই বুঝতে পারবে যে তোমাকে কী করতে হবে, তখন সেটা হবে অন্য আর এক পরিস্থিতি এবং তুমি সমন্বয়পূর্ণ জীবনধারা বজায় রাখতে পারবে। তুমি এই ব্যাপারগুলোকে খুব বেশী গুরুত্ব দেবে না, সুতরাং তুমি যদি এটা নিয়ে খুব বেশী দুশ্চিন্তা কর, তাহলে সেটাও একরকম আসক্তি। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যৌনতা কোনো বিষয় নয়, কিন্তু ইচ্ছাটা থাকে, তুমি সেটাকে উদাসীনভাবে দেখবে, মনের মধ্যে সুষমভাব রাখবে, তাহলেই ঠিক হবে।

তাহলে কোন্ ধরনের কাম-জনিত আসুরিক বাধার সম্মুখীন হতে হবে? যদি তোমার ডিংগ[79](ধ্যানের একটা অবস্থা)-এর ক্ষমতা যথেষ্ট না হয়, তাহলে সেটা ঘুমানোর সময়ে স্বপ্নের মধ্যে উদয় হবে, তুমি যখন ঘুমিয়ে আছ অথবা বসে ধ্যান করছ, হঠাৎ এটা দেখা দেবে: তুমি যদি পুরুষ হও তাহলে এক সুন্দরীর আবির্ভাব হবে, যদি মহিলা হও তাহলে তোমার মনের পছন্দ মতো এক পুরুষের আবির্ভাব হবে, কিন্তু তারা বিবস্ত্র থাকবে। একবার তুমি উত্তেজিত হলেই বীর্যস্খলন করবে এবং ব্যাপারটা বাস্তবে পরিণত হবে। সবাই চিন্তা কর, আমাদের এই সাধনায়, শরীরের প্রাণশক্তির নির্যাস তোমার জীবনের সাধনার জন্যে প্রয়োজন, তুমি সর্বদা

[79]ডিংগ - ধ্যানাবস্থা যখন মন পুরোপুরি শূন্য অথচ সচেতন।

এইরকম বীর্যস্খলন করে যেতে পার না। একই সাথে তুমি কামের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে পারলে না, এটা কীভাবে হতে দেওয়া যাবে? সেইজন্যে আমি সবাইকে বলছি যে তোমরা প্রত্যেকেই এই বিষয়টার সম্মুখীন হবে, এবং এটা নিশ্চিত। যখন আমি ফা শেখাচ্ছি, সেইসময় একটা প্রবল শক্তি আমি তোমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রেরণ করছি। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে তুমি হয়তো মনে করতে পারবে না যে আমি বিশেষভাবে কী বলেছি, কিন্তু তুমি বাস্তবে এই সমস্যাটার সম্মুখীন হওয়ার সময়ে, মনে করতে পারবে যে আমি কী বলেছিলাম। যদি তুমি নিজেকে শুধু একজন অনুশীলনকারী হিসাবে মনে রাখতে পার, সেক্ষত্রে তুমি তৎক্ষণাৎ এটা মনে করতে পারবে এবং তখন নিজেকে সংযত রাখতে পারবে, তাহলেই তুমি এই বাধাটা অতিক্রম করতে পারবে। যদি তুমি প্রথমবারে এই পরীক্ষাটা পাশ করতে না পার, তাহলে দ্বিতীয়বারে এটা পাশ করা আরও কঠিন। তবে এরকমও হয় যে তুমি প্রথমবার পাশ করতে পারলে না, তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে ভীষণভাবে বিষন্ন হয়ে পড়লে, সম্ভবত এইরকম মনোভাব এবং এইরকম মানসিক অবস্থা, তোমার মনের স্মৃতিটাকে আরও দৃঢ় করবে, সেক্ষেত্রে আবার বিষয়টার সম্মুখীন হলে, তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে এবং পরীক্ষাটা পাশ করতে পারবে। যদি কেউ পাশ করতে না পারে, অথচ এর প্রতি মনোযোগ না দেয়, তাহলে তার পক্ষে পরবর্তীকালে পাশ করা আরও কঠিন হয়ে যায়, ব্যাপারটা নিশ্চিতই এইরকম।

এটা এক প্রকারের আসুরিক বাধা, আবার মাস্টারও একটা বস্তুকে আর একটা বস্তুতে রূপান্তরের মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। এই দুই প্রকারেরই অস্তিত্ব আছে, যেহেতু প্রত্যেককে এই পরীক্ষাটা অবশ্যই পাশ করতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে সাধনা শুরু করি, যার প্রথম ধাপই হচ্ছে এই পরীক্ষা, প্রত্যেককেই এর সম্মুখীন হতে হবে। আমি সবাইকে একটা উদাহরণ দিই, আমি যখন উহান[৪০] শহরে ক্লাস নিচ্ছিলাম সেখানে একজন শিক্ষার্থী ছিল, তিরিশ বছর বয়সের এক যুবক। আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে ধ্যানে বসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে ধ্যানের গভীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরে সে হঠাৎ একদিকে বুদ্ধ অমিতাভ এবং আর এক দিকে লাও জি-কে আবির্ভূত হতে দেখল। নিজের উপলব্ধির

[৪০]উহান - হুবেই প্রদেশের রাজধানী।

অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সে আমাকে এটাই তার প্রতিবেদনে বলেছিল। তাঁরা দেখা দেওয়ার পরে তার দিকে তাকালেন এবং কোনো কথা না বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এবার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দেখা দিলেন, তাঁর হাতে ছিল ফুলদানি, যার মধ্যে থেকে একটা সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী উড়ে আসছিল। সে সেখানে ধ্যানে বসে সবকিছু খুব সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারছিল, তার বেশ আনন্দ হচ্ছিল। হঠাৎ ধোঁয়াটা কতকগুলো সুন্দরী মহিলাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এই সুন্দরীরা ছিল সব স্বর্গীয় উড়ন্ত অপ্সরা, যারা দেখতে খুবই সুন্দর। তারা তার জন্যে নৃত্য প্রদর্শন করতে থাকল, তাদের ভঙ্গিমা এবং অঙ্গ সঞ্চালন এত মাধুর্য্যমন্ডিত ছিল! সে নিজে নিজে চিন্তা করল: ‘‘আমি এখানে অনুশীলন করছি, সেইজন্যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর আমাকে পুরস্কৃত করার জন্যে কিছু সুন্দরীদের রূপান্তরিত করেছেন আমাকে দেখানোর জন্যে এবং এই স্বর্গীয় উড়ন্ত অপ্সরারা আমার জন্যে নৃত্য প্রদর্শন করছে।’’ যখন সে এটা চিন্তা করে আনন্দ বোধ করছিল, সেই সময়ে হঠাৎ সুন্দরীরা বিবস্ত্র হয়ে গেল এবং তার দিকে নানারকমের অঙ্গভঙ্গি করতে থাকল, তার কাছে এসে গলা এবং কোমর জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকল। আমাদের এই শিক্ষার্থীর চরিত্রের উন্নতি খুব দ্রুত ঘটেছিল এবং এই যুবকটি সতর্ক হয়ে গেল, সে প্রথমেই চিন্তা করল: ‘‘আমি সাধারণ লোক নই, আমি একজন অনুশীলনকারী, আমার সঙ্গে তোমাদের এইরকম আচরণ করা উচিত নয়, আমি ফালুন দাফা-র সাধনা করি।’’ যখনই এই চিন্তাটা এল, সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, যেহেতু সবই জাদুবলে তৈরি করা হয়েছিল। তখন বুদ্ধ অমিতাভ এবং লাও জি পুনরায় দেখা দিলেন। লাও জি যুবকটির দিকে ইঙ্গিত করে, বুদ্ধ অমিতাভকে হেসে বললেন: ‘‘ছেলেটিকে শেখানো সম্ভব।’’ অর্থাৎ উনি বলতে চাইলেন যে ছেলেটি ভালো, এবং শেখানো যাবে।

ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে অথবা উচ্চ মাত্রার দিক দিয়ে দেখলে, একজন ব্যক্তি সাধনা করতে পারবে কি পারবে না, সেটা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং কাম, এই জিনিসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্যে আমাদের এই জিনিসগুলোকে সত্যি সত্যি নিস্পৃহভাবে দেখা উচিত। কিন্তু আমাদের সাধনা সাধারণ মানুষদের মধ্যে করতে হবে, সেইজন্যে আমরা তোমাকে এগুলোর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকতে বলব না। অন্তত, এখনকার পর্যায়ে তোমার উচিত এগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখা, এবং পূর্বে তুমি যেরকম করতে সেইরকম

করবে না। একজন অনুশীলনকারীর এইরকমই হওয়া উচিত। চিগোংগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে কোনো সময়ে যে কোনো বাধাই আসুক না কেন তোমাকে অবশ্যই নিজের মধ্যে এর কারণগুলিকে খুঁজে বের করতে হবে, দেখতে হবে যে তুমি কোন্ কোন্ জিনিস এখনও ত্যাগ করনি।

নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা

''নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা'' বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেকটা স্তরের মাত্রার মধ্যে মানব শরীরের একটা বস্তুগত ক্ষেত্র আছে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটার মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছু ছায়ার মতো তোমার এই মাত্রার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে, যদিও সেগুলি ছায়া কিন্তু তাদেরও বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে। তোমার মাত্রার ক্ষেত্রের সবকিছুই তোমার মস্তিষ্কের চিন্তার নিয়ন্ত্রণে, অর্থাৎ এইভাবে বলা যায় যে তুমি যদি শান্তভাবে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখো এবং মনকে ব্যবহার না কর, তুমি যা দেখবে সেটা সত্যি, যখনই একটু চিন্তা করবে, সেই সময়ে যা দেখবে সবই মিথ্যা, এটাই হচ্ছে নিজের মন থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা অথবা বলা যায় ''চিন্তার সাথে সাথে রূপান্তর।'' যেহেতু কিছু অনুশীলনকারী নিজেদের সাধক হিসাবে দেখে না, নিজেরা নিজেদের ঠিকভাবে আয়ত্তে রাখতে পারে না, তারা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে যায়, ছোট-খাট ক্ষমতা, এবং কৌশলের প্রতি আসক্তি রেখে দেয়, এমনকী অন্য মাত্রার কিছু জিনিস শোনার প্রতি আসক্তি বজায় রাখে, তারা এই সব জিনিসের পিছনে আসক্তি নিয়ে ছুটে বেড়ায়, সেইজন্যে এই ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধার সম্মুখীন হওয়া সবচেয়ে সহজ এবং নীচে নেমে যাওয়াও সবচেয়ে সহজ। একজন লোকের সাধনার স্তর যত উঁচুতেই থাকুক না কেন, একবার এই সমস্যার উদয় হলে, সে একেবারে তলায় পড়ে যায় এবং তার সম্পূর্ণরূপে পতন হয়। এটা অত্যন্ত গম্ভীর সমস্যা। এটা ঠিক অন্য সমস্যাগুলোর মতো নয়, যেখানে একজন ব্যক্তি এইবারের চরিত্রের পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলেও, হোঁচট খেয়ে উঠে দাঁড়ানো লোকেদের মতো, আবার সাধনা চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধার সমস্যাটা সেরকম নয়, তার এই পুরো জীবনই নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষত যেসব অনুশীলনকারীর দিব্যচক্ষু একটা নির্দিষ্ট স্তরে খুলে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা সহজেই উদয় হতে পারে। আবার কিছু লোকের মানসিক চেতনা সর্বদা বাইরের

বার্তাগুলির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে, বাইরের এই বার্তাগুলি যা বলে, সে তাই বিশ্বাস করে, যার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে আমাদের কিছু লোকের দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার পরে, বাইরের বার্তাগুলি তাদের বিভিন্ন দিক দিয়ে বাধা প্রদান করতে থাকে।

আমরা একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সাধনার নীচু স্তরে মনকে নির্বিকার রাখা খুব কঠিন। তোমার মাস্টারকে কিরকম দেখতে, সেটা হয়তো পরিষ্কারভাবে দেখতে পারছ না। একদিন হঠাৎ এক বিরাট এবং লম্বা অমরসত্তা তোমার কাছে এসে হাজির হল। এই অমরসত্তা তোমার প্রশংসা করে কিছু বলল এবং তারপর তোমাকে কয়েকটা জিনিস শেখালো। তুমি সেটা গ্রহণও করলে এবং তখন তোমার গোংগ বিকৃত হয়ে গেল। তোমার মনের ভিতরে আনন্দ হল, তুমি তাকে মাস্টার হিসাবে গ্রহণ করলে, তুমি তার সাথে গিয়ে শিখতে থাকলে, কিন্তু তার হয়তো সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত হয়নি, সে শুধু ঐ মাত্রাতে তার শরীরটাকে রূপান্তরিত করে বড়ো বা ছোট করতে পারে। এটা তোমার ঠিক চোখের সামনে উন্মোচিত হয়েছে এবং তুমি এক বিরাট অমরসত্তাকে দেখতে পারছ, সত্যিই রোমাঞ্চকর! মনে এইরকম আনন্দ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তুমি কি তার কাছে শেখার জন্যে যাবে না? একজন সাধক যদি নিজেকে ঠিকভাবে সংযত রাখতে না পারে তাহলে তাকে উদ্ধার করা খুবই কঠিন, সে সহজেই নিজের সর্বনাশ করে ফেলতে পারে। স্বর্গের লোকেরা সবাই অমর, অথচ তাদেরও সবার সঠিক ফল প্রাপ্ত হয়নি, এবং তাদেরও সংসারের চক্রের মধ্যে একইভাবে ঘুরতে হয়। তুমি যদি ইচ্ছামতো এইরকম কাউকে মাস্টার হিসাবে গ্রহণ কর এবং তাকে অনুসরণ কর, তাহলে সে তোমাকে কোন্ স্তরে নিয়ে যাবে? এমনকী সে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারেনি, তোমার সাধনা কি ব্যর্থ হল না? শেষে তোমার নিজের গোংগ এলোমেলো হয়ে যাবে। মানুষের মনকে অবিচলিত রাখা খুবই কঠিন। আমি সবাইকে বলছি, এটা খুবই গম্ভীর সমস্যা, ভবিষ্যতে আমাদের অনেকের মধ্যেই এই সমস্যাটার আবির্ভাব হবে। আমি তোমাদের ফা শিখিয়েছি, তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে কি পারবে না, সেটা পুরোপুরি তোমার নিজের উপরেই নির্ভরশীল, আমি শুধু এক ধরনের পরিস্থিতির উল্লেখ করলাম। অন্য কোনো সাধনা পদ্ধতির আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দেখলেও তুমি অবিচলিত থাকবে, শুধু এক পদ্ধতিতেই সাধনা করে যাবে। কোনো বুদ্ধ, কোনো তাও, কোনো অমর সত্তা, অথবা কোনো অসুর, এদের কেউই যেন তোমার মনকে বিচলিত

করতে না পারে এবং এইভাবে চললে, আশা করা যায় যে তুমি অবশ্যই সফল হবে।

নিজের মন থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা আরও এক ধরনের পরিস্থিতিতে হতে পারে। কোনো মৃত আত্মীয় দেখা দিয়ে বাধা সৃষ্টি করবে, সে বিলাপ করে কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে এটা করতে বলবে, সেটা করতে বলবে, এইরকম সব হতে পারে। তোমার মন কি বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবে? মনে কর, তুমি তোমার এই বাচ্চাটাকে অত্যধিক স্নেহ কর, অথবা তোমার পিতামাতাকে ভালোবাস। তোমার পিতামাতা ইতিমধ্যে গত হয়েছেন, তারা তোমাকে কিছু কাজ করতে বলছে-----যেসব কাজ করা উচিত নয়, তুমি সেসব কাজ করলে সর্বনাশ হবে, অনুশীলনকারী হওয়া এইরকমই কঠিন। সবাই বলছে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসে গেছে। এমনকী কনফুসিয়াস ধর্মের জিনিসও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, যেমন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, পুত্র-কন্যার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা, এসবও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এসব বিষয়-বস্তু ছিল না। এর অর্থটা কী? যেহেতু একজন ব্যক্তির সত্যিকারের জীবন হচ্ছে তার মূল আত্মা, এই মূল আত্মাকে যে মা জন্ম দিয়েছে, সেই হচ্ছে প্রকৃত মা। এই ছয় পথের পুনর্জন্মের চক্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে, তোমার অনেক মা ছিল যারা মানুষ ছিল অথবা মানুষ ছিল না, এই মা-দের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। ওই সমস্ত জীবনগুলোতে তোমার অনেক পুত্র-কন্যাও ছিল, এদের সংখ্যাও গুনে শেষ করা যাবে না। কে তোমার মা? কে তোমার পুত্র বা কন্যা? জীবনাবসানে একবার চোখ দুটো বুজে গেলে কেউ কাউকে চিনতে পারবে না, তবে তোমাকে কর্মের ঋণ শোধ করতেই হবে। লোকেরা মায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে এবং এসব জিনিস ত্যাগ করতে পারে না। কিছু লোক পুত্র-কন্যার মৃত্যুর পরেও তাদের ছাড়তে পারে না, বলতে থাকে যে তারা কত ভালো ছিল; আবার কেউ একজন বলে বেড়ায় যে তার মা কত ভালো ছিল, কিন্তু তার মা মারা গেছে, সে হৃদয়ে এত দুঃখ পায় যে বাকি জীবনটুকু তাকে অনুসরণ করে যেতে চায়। তুমি চিন্তা কর, মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে তোমাকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে না কি? এই প্রকারে তারা তোমাকে ভালোভাবে জীবনযাপন করতেও দেবে না।

সাধারণ মানুষ হয়তো এটা বুঝতে পারবে না, তোমার যদি এই সব জিনিসের প্রতি আসক্তি থাকে তাহলে সাধনা একেবারেই করতে পারবে না, সেইজন্যে বৌদ্ধধর্মে এইসব বিষয়বস্তু নেই। তুমি যদি সাধনা করতে চাও

তাহলে সাধারণ মানুষের এইসব আবেগ দূর করতে হবে। অবশ্য আমরা সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে সাধনা করছি, আমাদের পিতামাতাকে সম্মান জানানো উচিত, বাচ্চাদের শিক্ষিত এবং নিয়মানুবর্তী করা উচিত, সব রকম পরিস্থিতির মধ্যে অন্যদের সাথে আমাদের ভালো ব্যবহার করা উচিত এবং লোকেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, আর পরিবারের লোকেদের ক্ষেত্রে তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। সবার সাথে একই ধরনের ব্যবহার করা উচিত, পিতামাতা এবং পুত্র-কন্যা সবার সাথে ভালো আচরণ করা উচিত, সর্বক্ষেত্রে অন্যদের কথা বিবেচনা করা উচিত। এই হৃদয়টা স্বার্থপর হবে না, পুরোটাই সহানুভূতিশীল এবং পরোপকারী হৃদয় হবে। আবেগ সাধারণ মানুষের জিনিস, সাধারণ মানুষ এই আবেগের জন্যেই জীবনযাপন করে।

অনেক মানুষ নিজেদের সংযত রাখতে পারে না, ফলে সাধনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কেউ একজন দাবি করতে পারে যে তাকে বুদ্ধ কিছু বলেছেন। কেউ হয়তো তোমাকে বলল যে তোমার আজকে সমস্যা আসবে, অথবা কিছু খারাপ ঘটবে, সে বলল যে তুমি কীভাবে এগুলো এড়াতে পার। আবার কেউ তোমাকে লটারির প্রথম পুরস্কারের নম্বরটা বলল এবং সেটার জন্যে চেষ্টা করতে বলল। যদি না কেউ তোমার জীবনসংশয়জনিত বিপদ এবং তার থেকে উদ্ধারের সম্বন্ধে কিছু বলে, সেক্ষেত্রে যারাই তোমাকে এই সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে কোনো কিছু লাভের কথা বলবে তারা সবাই অসুর। তুমি যদি সাধারণ মানুষদের মধ্যে এগিয়ে যেতে চাও অথচ দুর্ভোগের পরীক্ষাগুলিকে অতিক্রম করতে না পার, তাহলে তুমি উন্নতিসাধন করতে পারবে না। তুমি যদি সাধারণ মানুষদের মধ্যে খুব ভালোভাবে আরামের মধ্যে জীবনযাপন কর, তাহলে সাধনা কীভাবে করবে? তোমার কর্ম কীভাবে রূপান্তরিত হবে? তুমি সেইরকম পরিবেশ কীভাবে পাবে যেখানে তোমার চরিত্রের উন্নতি করতে পারবে এবং কর্মের রূপান্তর ঘটাতে পারবে? তোমরা অবশ্যই এই ব্যাপারটা মনের মধ্যে রাখবে। একজন অসুর তোমার প্রশংসা করে বলতে পারে যে তোমার স্তর কত উঁচু, তুমি কত মহান বুদ্ধ, তুমি কত মহান তাও এবং তোমাকে কত পরম বিস্ময়কর সে মনে করে, যা সবই মিথ্যা। একজন সত্যিকারের উঁচুস্তরের সাধক হিসাবে, তুমি বিভিন্ন ধরনের আসক্তির সবই অবশ্যই ত্যাগ করবে। তোমরা যখনই এই সব বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখন অবশ্যই সতর্ক থাকবে!

অনুশীলনের সময়ে দিব্যচক্ষু খুলে যেতে পারে। দিব্যচক্ষু খোলা থাকলে একজন ব্যক্তির সাধনায় অসুবিধা হতে পারে, আবার দিব্যচক্ষু খোলা না থাকলেও সাধনায় অসুবিধা হতে পারে, উভয় ক্ষেত্রেই সাধনা করা সহজ নয়। দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার পরে বিভিন্ন ধরনের বার্তা তোমাকে বাধা দেবে তখন তোমার নিজেকে সংযত রাখা সত্যিই খুব কঠিন। অন্য মাত্রার সবকিছুই যেন চোখ ধাঁধানো, চমৎকার জিনিসের সম্ভার, যেগুলো অত্যন্ত সুন্দর এবং খুবই চিত্তাকর্ষক। এগুলোর যে কোনোটাই তোমার মনকে বিচলিত করতে পারে। একবার মনে দোলা লাগলেই তোমার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হবে, তোমার গোংগ এলোমেলো হয়ে যাবে, সাধারণত এইরকমই হয়। সুতরাং নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা প্রাপ্ত লোকেদের ক্ষেত্রে, নিজেদের সংযত রাখতে না পারার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। যেমন ধর, একজন লোকের ক্ষেত্রে একবার অসৎ চিন্তা উৎপন্ন হলেই খুব বিপদ। একদিন তার দিব্যচক্ষু খোলা আছে এবং সে সবকিছু খুব পরিষ্কার দেখতে পারছে। সে চিন্তা করল: ‘‘এই অনুশীলনের জায়গায় আমার দিব্যচক্ষু ভালোভাবে খোলা আছে, হয়তো আমি ঠিক একজন সাধারণ মানুষ নই, তাই কি? আমি মাস্টার লি-র ফালুন দাফা শিখতে পেরেছি, আমি এটা এত ভালোভাবে শিখেছি যা অন্য সবার থেকে ভালো, সম্ভবত আমি একজন সাধারণ মানুষই নই।’’ এই চিন্তাগুলো ইতিমধ্যে ভুল দিকে যাচ্ছে। সে চিন্তা করল: ‘‘হয়তো আমি একজন বুদ্ধও, বেশ, আমি নিজেকে একটু দেখি’’ সে নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো যে সে সত্যিই একজন বুদ্ধ। কেন এমন হল? এই মাত্রার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে তার শরীরের চারপাশের সমস্ত বস্তু তার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, যাকে বলে, ‘‘চিন্তার সাথে সাথে রূপান্তর।’’

এই বিশ্বের থেকে প্রতিফলিত সমস্ত কিছু তার চিন্তার দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে একজন ব্যক্তির মাত্রার ক্ষেত্রের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণে, একই কথা প্রযোজ্য প্রতিফলিত ছায়াগুলির ক্ষেত্রেও যেগুলির বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে। সেই ব্যক্তি চিন্তা করল: ‘‘হয়তো আমি একজন বুদ্ধ এবং সম্ভবত আমি যা পরিধান করে আছি সেটা বুদ্ধেরই পোষাক।’’ সে তখন দেখবে যে সে যা পরিধান করে অছে সেটা বুদ্ধেরই পোষাক। ‘‘আশ্চর্য, আমি সত্যিই একজন বুদ্ধ,’’ সে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। ‘‘হয়তো আমি কোনো ছোট-খাট বুদ্ধ নই,’’ সে আবার তাকিয়ে দেখলো যে সে একজন বিরাট

বুদ্ধ। ‘‘হয়তো আমি এমনকী লি হোংগ জি-র থেকেও মহান!’’ সে আবার দেখলো: ‘‘আশ্চর্য, আমি সত্যিই লি হোংগ জি-র থেকেও মহান’’, এরকমও কিছু লোক আছে যারা তাদের কান দিয়ে এটা শুনতে পায়, একটা অসুর বাধা সৃষ্টি করার জন্যে বলবে: ‘‘তুমি লি হোংগ জি-র থেকেও মহান, তুমি লি হোংগ জি-র থেকে অনেক অনেক বেশী মহান।’’ সে এটা বিশ্বাসও করে। তুমি কেন এটা চিন্তা করছ না যে ভবিষ্যতে তুমি কীভাবে সাধনা করবে? তুমি কি কখনো সাধনা করেছ? কে তোমাকে সাধনা শিখিয়েছে? এমনকী সত্যিকারের বুদ্ধও যদি এখানে কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে আসে, তবে তাকেও অবশ্যই নতুন করে সাধনা শুরু করতে হবে, তার পূর্বের নিজস্ব গোংগ তাকে দেওয়া হয় না, শুধু তার সাধনা এখন দ্রুততর হবে। যখন এরকম হয়, অর্থাৎ একবার কারোর মধ্যে এই সমস্যার উদয় হলে, তার পক্ষে নিজেকে এর থেকে বের করে আনা খুবই কঠিন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একটা আসক্তি সৃষ্টি হয়। এই আসক্তি সৃষ্টি হওয়ার পরে সে যা কিছু বলতে সাহস করে: ‘‘আমিই বুদ্ধ, তোমাদের অন্য কারোর কাছে শেখার প্রয়োজন নেই। যেহেতু আমিই বুদ্ধ, আমি তোমাদের বলে দেব কীভাবে কী করতে হবে।’’ সে এই সব করতে শুরু করে।

আমাদের ছাংগছুন-এও কি এইরকম একজন ব্যক্তি ছিল না? সে প্রথমে বেশ ভালোই ছিল, পরে এইসব করতে শুরু করল। সে নিজেকে বুদ্ধ মনে করল, শেষে নিজেকে অন্য সবার থেকে বড়ো মনে করতে থাকল, অর্থাৎ সে নিজেকে সামলাতে পারেনি এবং একটা আসক্তি জেগে উঠেছিল। এইরকম ঘটনা ঘটল কেন? বৌদ্ধধর্মে বলা হয়: তুমি যা কিছুই দেখো না কেন তাকে অগ্রাহ্য করবে, সবই আসুরিক মায়া, শুধু ধ্যানের দ্বারা সাধনার মাধ্যমে উন্নতি করবে। কেন তারা এইসব জিনিস দেখতে দেয় না এবং সেগুলোতে আসক্ত হতে দেয় না? কারণ তারা ভয় পায় যে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। বৌদ্ধধর্মের সাধনায় কোনো শক্তিবৃদ্ধি করার সাধনা পদ্ধতি নেই, এদের শাস্ত্রেও এই জিনিসগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কোনো পথপ্রদর্শন করা নেই। এই ধর্মটা শাক্যমুনি সেইসময়ে প্রচার করেননি। সেইজন্যে ‘নিজের মনের থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা’ অথবা ‘চিন্তার সাথে সাথে রূপান্তর’ এই সমস্যাকে এড়ানোর জন্যে, তিনি সাধনার মধ্যে যে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায় সেই সবকিছুকে আসুরিক মায়া নাম দিয়েছিলেন। সেইজন্যে একবার আসক্তির আবির্ভাব হলেই আসুরিক মায়ার সৃষ্টি হয়, এর থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই কঠিন। সম্ভবত ঠিকভাবে এর

মোকাবিলা না করলে এই ব্যক্তি শেষ হয়ে যায় এবং আসুরিক পথ গ্রহণ করে। যেহেতু সে নিজেকে বুদ্ধ বলছে, সে নিজেকে ইতিমধ্যে অসুর বানিয়ে ফেলেছে, সবশেষে তাকে হয়তো কোনো সত্তা ভর করবে অথবা সে অন্য কিছু নিয়ে আসবে, তখন সে পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। তার মনও নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাবে, সে একেবারে নীচে নেমে যাবে। এইরকম লোকের সংখ্যা প্রচুর, এই ক্লাসেও এখন অনেকে নিজের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে, এমনকী তাদের কথা বলার ভাবভঙ্গিও অন্যরকম। তোমার সত্যিকারের অবস্থা কী তার সম্বন্ধে খোঁজ করা বৌদ্ধধর্মেও নিষেধ আছে। এইমাত্র আমি যা বললাম সেটা আর এক ধরনের পরিস্থিতি যাকে বলে ''নিজের মন থেকে উৎপন্ন আসুরিক বাধা'' অথবা ''চিন্তার সাথে সাথে রূপান্তর।'' বেজিংয়ে এইরকম কিছু শিক্ষার্থী আছে, অন্য অঞ্চলেও এইরকম কিছু শিক্ষার্থীর আবির্ভাব হয়েছে, উপরন্তু এটা অনুশীলনকারীদের মধ্যে ভীষণ বাধার সৃষ্টি করে।

কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: ''মাস্টার, আপনি এই সমস্যা দূর করে দিচ্ছেন না কেন?'' তোমরা সবাই চিন্তা কর, যদি আমরা তোমার সাধনা পথের সমস্ত বাধাগুলিই পরিষ্কার করে দিই, তাহলে তুমি কীভাবে সাধনা করবে? অর্থাৎ এইরকম আসুরিক বাধাজনিত পরিস্থিতির মধ্যেই তোমাকে দেখাতে হবে যে তুমি সাধনা চালিয়ে যেতে পারছ কিনা, তুমি সত্যটাকে সত্যিই উপলব্ধি করতে পারছ কিনা, বাধাগুলিকে সহ্য করতে পারছ কিনা, এবং তুমি এই সাধনার পথে একনিষ্ঠ থাকতে পারছ কিনা। বিরাট ঢেউ বালি ধুয়ে নিয়ে যায়, সাধনা হচ্ছে এইরকম ব্যাপার, শেষে যা পড়ে থাকবে সেটাই সত্যিকারের সোনা। এই প্রকার বাধা না থাকলে আমি বলব একজন ব্যক্তির পক্ষে সাধনা করা খুবই সহজ। এমনকী আমার দৃষ্টিতেও তোমাদের সাধনা খুব সহজ। ওই উচ্চস্তরের মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তারা দেখলে এটাকে আরও অনুচিত মনে করবেন: ''আপনি কী করছেন? আপনি কি এটাকে লোকেদের উদ্ধার করা বলবেন? সাধনার পথে কোনো বাধাই নেই, একজন ব্যক্তি একবারে শেষ পর্যন্ত সাধনা করে যেতে পারবে। এটা কি সাধনা? যত বেশী অনুশীলন করছে তত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হচ্ছে, কোনো প্রতিবন্ধকতাই নেই। এটা কী করে হতে দেওয়া যায়?'' এটাই হচ্ছে প্রশ্ন, আমিও এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে, আমি এইরকম অনেক আসুরিক বাধার মোকাবিলা করেছি। আমাকে যদি সবসময়ে এইরকম করে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে আমারও সেটা ঠিক মনে হয় না। অনেকেই আমাকে বলেছেন: ''আপনি

এদের সাধনা খুবই সহজ করে দিয়েছেন। লোকেদের শুধু ওই অল্প একটু কষ্ট নিজেদের সহ্য করতে হয়, তাদের নিজেদের মধ্যে সামান্য কিছু সমস্যা থাকে মাত্র, তাদের মধ্যে প্রচুর আসক্তি রয়ে গেছে, যেগুলো তারা ছাড়তে পারছে না! যখন এরা বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়বে তখন এরা আপনার মহান পথ (দাফা) বুঝতে পারবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন হিসাবে রয়ে যাচ্ছে!'' বিষয়টা এইরকম, সেইজন্যে প্রতিবন্ধকতা থাকবে, পরীক্ষাও থাকবে। এইমাত্র আমি এক প্রকারের আসুরিক বাধার সম্বন্ধে বললাম। সত্যি সত্যি লোকেদের উদ্ধার করা খুবই কঠিন, অথচ একজন লোকের সর্বনাশ করা অত্যন্ত সহজ। একবার তোমার মন অসৎ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাধনা শেষ হয়ে যাবে।

মুখ্য চেতনা শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন

একজন ব্যক্তি তার পূর্বের জীবনগুলিতে অনেক খারাপ কাজ করে থাকলে সেগুলো সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে এবং সাধকের ক্ষেত্রে কর্মের বাধা সৃষ্টি করে, সেইজন্যেই আছে জন্ম, বার্ধক্য, রোগ এবং মৃত্যুর অস্তিত্ব। এগুলো হচ্ছে সাধারণ কর্ম। একটা শক্তিশালী কর্ম আছে যার প্রভাব সাধকদের উপরে অত্যন্ত বেশী তাকে বলে চিন্তাকর্ম। জীবনযাপন করার জন্যে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই চিন্তা করতে হয়। কিন্তু সে সাধারণ মানুষদের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ফলে তার মনের মধ্যে প্রায়শ খ্যাতি, লাভ, কাম, ক্রোধ, ইত্যাদির জন্যে চিন্তা উৎপন্ন হতে থাকে। ধীরে ধীরে এগুলোর থেকে এক ধরনের শক্তিশালী চিন্তাকর্ম সৃষ্টি হয়। অন্য মাত্রাতে যেহেতু সবকিছুরই জীবন আছে, কর্মের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যখন কোনো ব্যক্তি সৎভাবে সাধনা করতে চায়, তখন তাকে অবশ্যই কর্ম দূর করতে হবে। কর্মকে দূর করার অর্থ তাকে নির্মূল করা এবং রূপান্তরিত করা। কর্ম অবশ্য এটা হতে দিতে চায় না, সেইজন্যে লোকেদের দুর্ভোগ থাকবে, প্রতিবন্ধকতাও থাকবে। কিন্তু চিন্তাকর্ম সরাসরি একজন ব্যক্তির মনে হস্তক্ষেপ করে, সেইজন্যে সে মনে মনে মাস্টার এবং দাফা-র প্রতি নিন্দাসূচক কথা বলে অথবা সে কিছু অশুভ চিন্তা করে বা খারাপ কথা ভাবে। যখন এরকম ঘটে, তখন কিছু সাধক বুঝতেই পারে না যে কী হচ্ছে, ভাবে যে সে নিজেই এইরকম চিন্তা করছে। আবার কেউ কেউ ভাবে এগুলো ভর করা সত্তা থেকে আসছে, কিন্তু এগুলো কোনো সত্তার থেকে আসে না, বরঞ্চ চিন্তাকর্মগুলো তাদের মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে সৃষ্টি

হয়। কিছু লোকের মুখ্য চেতনা শক্তিশালী থাকে না এবং চিন্তাকর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খারাপ কাজ করতে থাকে, তাদের সবকিছু শেষ হয়ে যায়, তাদের স্তর নীচে নেমে যায়। কিন্তু বেশীরভাগ লোক নিজেদের শক্তিশালী চিন্তার (তাদের শক্তিশালী মুখ্য চেতনা) দ্বারা একে দূর করতে পারে এবং বাধা দিতে পারে। এইরকম হলে বলা যায় যে এই সব লোকেদের উদ্ধার করা সম্ভব, তারা ভালো থেকে খারাপ-কে পৃথক করতে পারে অর্থাৎ তাদের আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো। আমার ফা-শরীর এইরকম চিন্তাকর্মের বেশীরভাগটাই দূর করতে সাহায্য করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশীই দেখা যায়। একবার এর উদয় হলেই এটা দেখা হবে যে তুমি এই খারাপ চিন্তাগুলিকে নিজে নিজে কাটিয়ে উঠতে পার কিনা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পারলে তুমি এই কর্মকে দূর করতে পারবে।

চিন্তা সৎ হওয়া আবশ্যক

অসৎ চিন্তা বলতে কী বোঝায়? অর্থাৎ সে সবসময়ে নিজেকে অনুশীলনকারী হিসাবে চিন্তা করতে পারে না। একজন অনুশীলনকারীকে সাধনার সময়ে দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। যখন দুর্ভোগ আসে সেগুলি হয়তো পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসাবে প্রকটিত হতে পারে, অথবা একজন আর একজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা অন্য কিছু করছে, যেগুলো তোমার চরিত্রকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, এই ধরনের ঘটনা অপেক্ষাকৃত বেশী করে ঘটে। তুমি আর কোন্ ধরনের দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে? আমাদের শরীরে হঠাৎ অস্বস্তি বোধ হবে, যেহেতু কর্মের ফলভোগ বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকটিত হতে পারে। একটা বিশেষ মুহূর্তে তুমি এমনকী সত্যি-মিথ্যা বা আসল-নকল পর্যন্ত বিচার করতে পারবে না; তোমার নানান ধরনের সব সন্দেহ হবে, যেমন গোংগ আছে না নেই, তুমি সাধনা করতে পারবে কি পারবে না, সাধনায় সফল হতে পারবে কি পারবে না, বুদ্ধ আছে কি নেই, এবং তাঁরা সত্যি না মিথ্যা। ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতির উদয় হবে, তোমার মধ্যে মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করা হবে, তোমার বোধ হবে যেন ওইসব জিনিসের অস্তিত্ব নেই, সেগুলো সবই মিথ্যা, অর্থাৎ তুমি সংকল্পে দৃঢ় কিনা সেটা দেখা হবে। তুমি যদি বলো যে তুমি অবশ্যই দৃঢ় এবং অটল থাকবে, সেক্ষেত্রে এইরকম মন নিয়ে তুমি যদি ঠিক সেই সময়ে সত্যিই দৃঢ় এবং অটল থাকতে পার, তখন তুমি স্বাভাবিকভাবেই ভালো করবে, কারণ ইতিমধ্যে তোমার চরিত্রের উন্নতি

ঘটে গেছে। কিন্তু তুমি যদি এখন অস্থির থাক এবং ওই দুর্ভোগগুলোকে এখনই তোমাকে দেওয়া হয়, তুমি একবারেই উপলব্ধি করতে পারবে না যে কী হচ্ছে, তুমি কোনোভাবেই সাধনা করতে পারবে না। দুর্ভোগগুলি নানান দিক দিয়েই আসতে পারে।

সাধনার পর্বে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এইভাবে সাধনা করে উপরের দিকে উঠতে হবে। সুতরাং আমাদের কিছু লোক আছে যাদের শরীরে একবার কোনো জায়গায় অস্বস্তি হলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে মনে করে যে তাদের রোগ হয়েছে, তারা সব সময়ে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে আচরণ করতে পারে না। তাদের এইরকম ব্যাপার ঘটলেই তারা নিজেরা মনে করে এটা রোগ, ‘‘আমার এত বেশী সমস্যা হচ্ছে কেন?’’ আমি তোমাকে বলছি, ইতিমধ্যে এর অনেকটাই আমি দূর করে দিয়েছি, তোমার সমস্যার অনেকটাই কমিয়ে আনা হয়েছে। যদি এটা দূর না করা হতো সেক্ষেত্রে তুমি এই সমস্যার সম্মুখীন হলে হয়তো মরেই যেতে, অথবা তুমি হয়তো আর কোনোদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতে না। সেইজন্যে, তুমি সামান্য একটু সমস্যার সম্মুখীন হলেই, সেটাকে সহ্য করা কঠিন মনে করছ, ব্যাপারটা এত আরামদায়ক কীভাবে হবে? একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ছাংগছুন-এ বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে একজন ব্যক্তি ছিল যার জন্মগত সংস্কার খুব ভালো ছিল, আমি এই লোকটার মধ্যে সত্যিই উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখেছিলাম, সেইজন্যে আমি তার দুর্ভোগ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম যাতে সে শীঘ্রই কর্মের ঋণ শোধ করতে পারে এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে। আমি এইভাবে ব্যাপারটা প্রস্তুত করছিলাম। যাই হোক একদিন হঠাৎ তার মস্তিষ্কের রক্তনালী অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু লক্ষণ দেখা গেল, সে মাটিতে পড়ে গেল, তার বোধ হল যে সে আর নড়তে পারছে না, যেন তার চার হাত-পা কোনো কাজই করতে পারছে না, তাকে জরুরী পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সে হাঁটাচলা করতে পারল। তোমরা চিন্তা কর, মস্তিষ্কের রক্তনালী অবরুদ্ধ হওয়ার পরে সে কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আবার হাঁটাচলা করতে পারল এবং চার হাত-পা সব নাড়াতে পারল? কিন্তু সে ফিরে এসে দোষ দিতে থাকল যে ফালুন দাফা শিখেই তার গণ্ডগোল হয়েছে। সে কিন্তু এটা চিন্তাও করল না যে মস্তিষ্কের রক্তনালী অবরুদ্ধ হওয়ার পরে সে কী করে এত দ্রুত সেরে উঠল? যদি সে ফালুন দাফা না শিখত, তাহলে যখন সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, হয়তো সেখানেই তার

মৃত্যু হতো, অথবা তাকে হয়তো বাকি জীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েই কাটাতে হতো, এবং তার মস্তিষ্কের রক্তনালী সত্যি সত্যিই অবরুদ্ধ হতো।

এর থেকে এটাই বলা যায় যে একজন মানুষকে উদ্ধার করা ঠিক কত কঠিন। এত কিছু তার জন্যে করা হয়েছিল তবুও সে এটা উপলব্ধি করতে পারেনি, তার পরিবর্তে এইরকম কথা বলেছিল। কোনো এক প্রবীণ শিক্ষার্থী বলেছিল: ‘‘আমি সারা শরীরে এত অস্বস্তি অনুভব করি কেন? আমি সবসময়ে হাসপাতালে যাই কিন্তু ইঞ্জেকশনে কোনো কাজ হয় না, ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হয় না।’’ এমনকী আমাকে এটা বলতে তার লজ্জাও বোধ হয় না! অবশ্যই ওষুধ কোনো কাজ করবে না। এসব কোনো রোগই নয়, অতএব কী করে কাজ করবে? তুমি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখতে পার, কোনো রোগই নেই, তুমি শুধু অস্বস্তি বোধ করছ মাত্র। আমাদের একজন শিক্ষার্থী হাসপাতালে গিয়েছিল এবং তাকে ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে কতকগুলো সুঁচ বেঁকে গিয়েছিল, শেষে তরল ওষুধটা বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু কোনো সুঁচ ভিতরে ঢোকাতে পারেনি। সে বুঝতে পারল: ‘‘ওহো, আমি একজন সাধক, আমার ইঞ্জেকশন নেওয়া উচিত নয়।’’ তখন তার উপলব্ধি হল যে তার ইঞ্জেকশন নেওয়া উচিত নয়। সেইজন্যে যখনই আমরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হবো, আমাদের অবশ্যই এই বিষয়টার প্রতি নজর দেওয়া উচিত। কেউ কেউ ভাবে যে আমি তাদের হাসপাতালে যেতে দেব না, সে চিন্তা করে: ‘‘আপনি আমাকে হাসপাতালে যেতে দেবেন না, সেইজন্যে আমি একজন চিগোংগ মাস্টারের কাছে যাব।’’ তার তখনো মনে হতে থাকে যে তার রোগ হয়েছে, এবং সে চিগোংগ মাস্টারকে দেখাতে চায়। কিন্তু সত্যিকারের চিগোংগ মাস্টারকে কোথায় খুঁজে পাবে? যদি কোনো নকলকে দেখায় তবে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমরা বলেছি: ‘‘একজন চিগোংগ মাস্টার আসল না নকল সেটা কীভাবে বুঝবে?’’ এমনকী স্বঘোষিত চিগোংগ মাস্টার সংখ্যায় প্রচুর। আমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলোর করা পরীক্ষাগুলোর প্রামাণিক তথ্যও আমার হাতে রয়েছে। অনেক চিগোংগ মাস্টারই নকল ও স্বঘোষিত, এদের অনেকেই লোকেদের ধাপ্পা দেয় এবং ঠকায়। এইরকম নকল চিগোংগ মাস্টারও রোগ সারাতে পারে। সে কীভাবে রোগ সারায়? তাকে কোনো সত্তা ভর করে আছে, ভর করা সত্তা ছাড়া সে লোককে ঠকাতে পারবেই না! এই সত্তাও শক্তি নির্গত করতে পারে এবং

রোগ সারাতে পারে, এরও এক ধরনের শক্তি থাকে, এ খুব সহজেই সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদের বলেছি, ওই সত্তা যখন তোমার চিকিৎসা করছে, তখন সে তোমাকে কী প্রেরণ করছে? অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে সেসব হচ্ছে ওই সত্তারই প্রতিমূর্তি, তোমার শরীরে এগুলো প্রেরণ করছে, তুমিই বলো, তুমি কী করবে? ''একজন দেবতাকে আমন্ত্রণ করে আনা সহজ কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানো কঠিন।''[81] আমরা সাধারণ মানুষদের নিয়ে কোনো কিছু বলতে চাই না, তারা সাধারণ মানুষের মতো থাকতে চায় এবং তারা সাময়িক আরাম চায়। কিন্তু তুমি একজন অনুশীলনকারী, তুমি কি তোমার শরীরটাকে নিরন্তর শোধন করতে চাও না? যদি এগুলো তোমার শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে তুমি তার থেকে কবে উদ্ধার পাবে? তার উপরে এদের কিছু শক্তিও থাকে। কিছু লোক ভাবে: ''ফালুন এগুলোকে ঢুকতে দিল কেন? মাস্টারের ফা-শরীর আমাদের রক্ষা করছিল না কি?'' এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে: তুমি যদি নিজে কোনো কিছুর পিছনে ছোট, তাহলে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না, তুমি যদি কোনো কিছু চাও, তাহলে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। আমার ফা-শরীর তোমাকে থামাতে চেষ্টা করবে এবং তোমাকে ইঙ্গিত করবে। কিন্তু এ যদি দেখে যে তুমি সব সময়ে এইরকমই করছ, তাহলে এ তোমার প্রতি যত্ন নেবে না, জোর করে কাউকে দিয়ে কীভাবে সাধনা করাবে? কেউ তোমাকে দিয়ে জোর করে সাধনা করাতে পারবে না, কেউ তোমাকে সাধনা করার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। সত্যিকারের উন্নতি হওয়াটা তোমার নিজের উপরেই নির্ভরশীল, তুমি উন্নতি করতে না চাইলে কেউ কোনো কিছু করতে পারবে না। তোমাকে নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ফা-ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তুমি যদি এখনও উন্নতি করতে না চাও, তাহলে কার উপরে দোষ চাপাবে? তুমি নিজে কোনো কিছু চাইলে, ফালুন এবং আমার ফা-শরীর কোনোরকম বাধা দেবে না, এটা নিশ্চিত। কিছু লোক অন্য চিগোংগ মাস্টারের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল, বাড়িতে ফিরে তারা অসুস্থ বোধ করছিল, ওটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিলই। তখন আমার ফা-শরীর তোমাকে রক্ষা করেনি কেন? কিন্তু তুমি ওখানে কী করতে গিয়েছিলে? এই যে তুমি শুনতে গিয়েছিলে, তুমি কি কোনো কিছু পাওয়ার চেষ্টা করনি? তুমি যদি ওগুলো কানের ভিতর দিয়ে না ঢোকাতে

[81] ''একজন দেবতাকে আমন্ত্রণ করে আনা সহজ কিন্তু তাকে ফেরত পাঠানো কঠিন'' - এটি চীন দেশে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি প্রবাদ বাক্য অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাওয়া সহজ কিন্তু বেরিয়ে আসা কঠিন।

তাহলে ওরা ঢুকতে পারত কি? কিছু লোক এমনকী তাদের ফালুন বিকৃত করে ফেলেছে। আমি তোমাকে বলছি, এই ফালুন এমনকী তোমার জীবনের থেকেও বেশী মূল্যবান, এটা একটা উন্নত ধরনের জীবনসত্তা, তুমি ইচ্ছামতো একে ধ্বংস করতে পার না। বর্তমানে নকল চিগোংগ মাস্টারদের সংখ্যা প্রচুর, তাদের মধ্যে অনেকে বেশ বিখ্যাত। আমি চীনের চিগোংগ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বলেছিলাম যে, প্রাচীনকালে একবার দা জি[82] নামে এক উপপত্নী রাজদরবারে খুব গোলমাল সৃষ্টি করেছিল, ওই শিয়ালটা খুবই ভয়ংকর কাজ করেছিল, কিন্তু সেটাও আধুনিক কালের নকল চিগোংগ মাস্টারদের মতো এত ক্ষতিকর ছিল না, এরা পুরো দেশের সর্বনাশ করছে, কত লোক যে এদের প্রতারণার শিকার হয়েছে! উপর থেকে দেখলে খুব ভালো মনে হবে, কিন্তু তুমি কি জান যে এদের মধ্যে কতজন লোক তাদের শরীরে ওইসব জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছে? নকল চিগোংগ মাস্টার ওইসব জিনিস পাঠালে ওগুলো তোমার শরীরে থাকবে। ওগুলো খুবই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, সেইজন্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে বাইরে থেকে দেখে এদেরকে চেনা খুবই কঠিন।

কিছু লোক হয়তো চিন্তা করছ: ‘‘আজকের এই চিগোংগ-এর আলোচনা সভায় যোগদান করে এবং লি হোংগ জি-র বক্তৃতা শোনার পরে এখন আমি বুঝতে পারছি যে চিগোংগ কত মহান এবং প্রগাঢ়! পরবর্তীকালে অন্য কোনো চিগোংগ-এর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলে আমি সেখানেও যোগদান করব।’’ আমি বলব ওইসব জায়গায় তোমার অবশ্যই যাওয়া উচিত নয়, যদি শোন তাহলে অশুভ জিনিসগুলো তোমার কানের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করবে। একটা লোককে উদ্ধার করা খুব কঠিন, তোমার চিন্তাকে পরিবর্তন করা খুব কঠিন, তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করাও খুব কঠিন। নকল চিগোংগ মাস্টারের সংখ্যা খুবই বেশী, এমনকী যে চিগোংগ মাস্টার সৎ সাধনা পদ্ধতির শিক্ষা প্রদান করছে, তার শরীরটা কি সত্যিই শুদ্ধ? কিছু পশু খুবই ভয়ংকর হয়, যদিও এই সব জিনিস তার শরীরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না, সে কিন্তু এগুলোকে তাড়িয়েও দিতে পারে না। তার এবং বিশেষ করে তার শিক্ষার্থীদের, এইসব জিনিসের সঙ্গে বিরাটভাবে মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা নেই, যখন এই চিগোংগ

---

[82]দা জি - শাংগ রাজবংশের শেষ সম্রাটের দরবারে এক দুষ্ট উপপত্নী (1765 B.C.– 1122 B.C.)। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, তাকে শিয়ালের আত্মা ভর করেছিল এবং তাকে শাংগ রাজবংশের পতনের কারণ বলা হয়ে থাকে।

মাস্টার গোংগ প্রদান করে, তখন তার মধ্যে অনেক ধরনের সব জিনিস মিশে থাকে। এটা ঠিক যে সে নিজে বেশ সৎ, কিন্তু তার শিক্ষার্থীরা সৎ নয়, নানান ধরনের সত্তা তাদের ভর করে আছে, সবকিছুই তাদের মধ্যে আছে।

তুমি যদি সত্যি সত্যি ফালুন দাফা-র সাধনা করতে চাও, তাহলে ওইসব জায়গায় কিছু শুনতে যেও না। অবশ্য তুমি যদি ফালুন দাফা-র সাধনা করতে না চাও, এবং সবকিছু অনুশীলন করতে চাও, তাহলে যেতে পার। আমিও তোমাকে বাধা দেব না, কারণ তুমিও আর ফালুন দাফা-র শিষ্য নও, কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে, তখন কিন্তু তুমি বলতে পারবে না যে ফালুন দাফা-র কারণে সেটা হয়েছে। তুমি যদি চরিত্রের আদর্শগুলো মেনে চলো এবং দাফা অনুযায়ী সাধনা কর, একমাত্র তাহলেই তুমি ফালুন দাফা-র সত্যিকারের অনুশীলনকারী। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘আমি কি অন্য চিগোংগ পদ্ধতির অনুশীলনকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি?’’ আমি তোমাকে বলছি যে তারা শুধু চিগোংগ অনুশীলন করছে, এবং তুমি দাফা-র সাধনা করছ, এই ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তোমার স্তর তাদের থেকে এত উঁচুতে উঠে যাবে যে তুমি সেটা ধারণাও করতে পারবে না, এই ফালুন অনেক প্রজন্মের সাধনার ফলে সৃষ্টি হয়েছে, প্রচন্ড এর ক্ষমতা। অবশ্য তুমি যদি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও, সেক্ষেত্রে তুমি যদি এটা নিশ্চিত করতে পার যে, তুমি তাদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না অথবা চাইবে না, শুধু স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রাখবে, তাহলে সেটা কোনো বড়ো সমস্যা নয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির শরীরে সত্যিই যদি খারাপ জিনিস থাকে, তাহলে তার সঙ্গে মেলামেশা না করাই সবচেয়ে ভালো। বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে, একজন যদি অন্য চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করে, সেটা কোনো বড়ো সমস্যা বলে আমি মনে করি না। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, যেহেতু তুমি সৎপথে সাধনা করছ, তোমার অনুশীলনের ফলে অন্যদের উপকার হবে। তোমার স্বামী বা স্ত্রী যদি অশুভ পদ্ধতিতে সাধনা করে, তবে তার শরীরে অশুভ জিনিস থাকতে পারে। তোমার নিরাপত্তার জন্যে তাকেও অবশ্যই শোধন করা হবে। তোমার জন্যে অন্য মাত্রাগুলিকেও শোধন করা হবে। তোমার ঘরের পরিবেশও শোধন করা হবে। তোমার পরিবেশ যদি শোধন করা না হয়, বিভিন্ন জিনিস তোমাকে বাধা দিতে থাকবে, তাহলে তুমি অনুশীলন কীভাবে করবে?

তবে একটা পরিস্থিতিতে আমার ফা-শরীর তোমাকে শোধন করতে সাহায্য করবে না। আমাদের একজন শিক্ষার্থী একদিন দেখলো যে আমার ফা-শরীর তার বাড়িতে আসছে, তার ভীষণ আনন্দ হল: ‘‘মাস্টারের ফা-শরীর এখানে আসছে, মাস্টার দয়া করে ঘরের ভিতরে আসুন।’’ আমার ফা-শরীর তখন বলেছিল: ‘‘তোমার ঘরটা খুবই নোংরা হয়ে আছে, ওখানে খুব বেশী জিনিস রয়েছে’’ এবং তখন সে চলে গেল। সাধারণত অন্য মাত্রাতে অনেক অশুভ আত্মা থাকলে, আমার ফা-শরীর সেগুলোকে পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু তার ঘরটা নানান ধরনের যাচ্ছেতাই সব চিগোংগ বই দিয়ে ভর্তি ছিল। শিক্ষার্থী এটা বুঝতে পারল, সে বইগুলোকে পুড়িয়ে দিয়ে অথবা বিক্রী করে ঘরটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখল। এর পরে আমার ফা-শরীর আবার ফিরে এসেছিল। শিক্ষার্থী এটাই আমাকে বলেছিল।

কিছু লোক আবার ভাগ্য-গণনাকারীদের কাছে যেতে চায়। কোনো একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ‘‘মাস্টার আমি এখন ফালুন দাফা-র অনুশীলন করি, আমার *ঝউ য়ি (পরিবর্তনের বই)* অথবা ভাগ্য-গণনার জিনিসগুলোতে খুব উৎসাহ আছে, আমি কি এগুলো এখনও ব্যবহার করতে পারি?’’ আমি এইভাবে বলব: যদি তুমি একটা বিশেষ পরিমাণ শক্তি বয়ে বেড়াও, তাহলে তোমার বলা কথাগুলোর একটা প্রভাব থাকবে। একটা জিনিস ওইভাবে হওয়ার নয়, অথচ তুমি লোকটাকে বলছ ওইভাবেই হবে, সেক্ষেত্রে তুমি হয়তো খারাপ কাজ করে ফেলতে পার। একজন সাধারণ মানুষ খুবই দুর্বল, তার মধ্যে বিদ্যমান বার্তাগুলি স্থায়ী নয় এবং খুব সম্ভবত কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। যদি তুমি মুখ খোল এবং কিছু কথা তাকে বলো, তাহলে হয়তো সেই দুর্ভোগটা ঘটে যেতেও পারে। যেমন ধর, এই ব্যক্তির খুব বেশী কর্ম আছে, তাকে অবশ্যই সেটা ভোগ করে শোধ করতে হবে, কিন্তু তুমি সর্বদা তাকে ভালো ভালো জিনিস বলে যাচ্ছ, এবং সে কর্মের ঋণ শোধ করতে পারছে না, এটা কি ঠিক? তুমি কি তার ক্ষতি করছ না? কিছু লোক এগুলোকে ঠিক ছাড়তে পারে না, তারা এসবের প্রতি আসক্ত থাকে, ভাবে তাদের যেন বিশেষ দক্ষতা আছে, এটা কি আসক্তি নয়? এছাড়া এমনকী তুমি যদি সত্যিই জান যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তাহলেও একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমার চরিত্রকে রক্ষা করা উচিত, তুমি স্বর্গীয় গোপন তথ্য নিজের ইচ্ছামতো সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পার না, এটাই নিয়ম। তুমি *পরিবর্তনের বই* ব্যবহার করে যে ভাবেই ভাগ্য গণনা কর না কেন, অন্ততপক্ষে কিছু

জিনিস ইতিমধ্যে সত্যি নয়, তুমি এইভাবে অথবা সেইভাবে, যে ভাবেই গণনা কর, কিছু ঠিক হবে, কিছু ভুল হবে। সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে এই ভাগ্য গণনা করার মতো জিনিসগুলোর থাকার অনুমতি আছে। যেহেতু তুমি সত্যিকারের গোংগ-এর অধিকারী ব্যক্তি, আমি বলব একজন সত্যিকারের অনুশীলনকারী হিসাবে তোমার নিজের উপরে উঁচু আদর্শ আরোপ করা উচিত। অথচ কিছু অনুশীলনকারী নিজেদের ভাগ্যগণনা করার জন্যে অন্য লোকের খোঁজ করে এবং জিজ্ঞাসা করে: ‘‘তুমি আমার ভাগ্য গণনা করে বলো যে আমি কীরকম আছি? আমার অনুশীলন কেমন চলছে? অথবা আমার কোনো দুর্ভোগ আছে কি?’’ সে এই ভবিষ্যৎবাণী জানার জন্যে অন্যদের খোঁজ করে। যদি তোমাকে ওই দুর্ভোগগুলো সম্বন্ধে আগেই বলা হয়, তোমার উন্নতি কীভাবে হবে? একজন অনুশীলনকারীর সম্পূর্ণ জীবনই পাল্টে দেওয়া হয়েছে, তার হস্তরেখা বিচার, চেহারার বিচার, জন্মকুন্ডলী এবং তার শরীরের সমস্ত বার্তাগুলি ইতিমধ্যে ভিন্ন রকমের হয়ে গেছে, সবই পাল্টে গেছে। তুমি ভাগ্য-গণনাকারীর কাছে গেছ, অর্থাৎ তুমি তাকে বিশ্বাস করেছ, তা নাহলে তুমি ভাগ্য গণনা করাতে গেছ কেন? সে তোমাকে উপরে উপরে কিছু জিনিস বলবে, তোমার অতীতের কিছু জিনিস নিয়ে বলবে, কিন্তু সবই আসলে পাল্টে গেছে। তাহলে তুমি চিন্তা কর: যখন তুমি কারোর কাছে ভাগ্য গণনা করাচ্ছিলে, তখন তুমি কি তার কথা শুনছিলে না এবং বিশ্বাস করছিলে না? এইভাবে কি তোমার উপর একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হল না? এই মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার পরে, তুমি সেটা নিয়ে মনের মধ্যে চিন্তা করতে থাকলে, তাহলে সেটা কি একটা আসক্তি নয়? এই আসক্তিকে কীভাবে দূর করবে? এইভাবে তুমি নিজেই তোমার উপর দুর্ভোগটা চাপিয়ে দিলে না কি? তোমার নিজের তৈরি করা এই আসক্তিকে দূর করার জন্যে তোমাকে আরও অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে না কি? প্রত্যেকটা পরীক্ষা এবং প্রত্যেকটা দুর্ভোগ সবকিছুর মধ্যে এই প্রশ্নটা থাকে, হয় তুমি সাধনায় উপরের দিকে উঠবে নয়তো নীচের দিকে নামবে। এমনিতেই এটা কঠিন, তথাপি তুমি স্বআরোপিত এই দুর্ভোগ যোগ করছ, এটা কীভাবে অতিক্রম করবে? তোমাকে হয়তো এর ফলে দুঃখদুর্দশা এবং সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তোমার জীবনের রাস্তা বদলে যাওয়ার পরে, অন্য কাউকে আর দেখতে দেওয়া যাবে না। যদি অন্য কেউ এটাকে দেখতে পারে এবং যদি তোমাকে বলতে পারে যে তোমার দুর্ভোগ কোন্ সময়ে আসবে, তাহলে তুমি সাধনা কীভাবে করবে? সেইজন্যে এটাকে কোনোভাবেই দেখতে দেওয়া যাবে না। অন্য সাধনার পথের কাউকেই এটা দেখতে

দেওয়া যাবে না, এমনকী একই সাধনা পথের সাথি শিষ্যদেরও এটাকে দেখতে দেওয়া যাবে না, কেউই এটা সঠিক বলতে পারবে না। যেহেতু ওই জীবনটাই পাল্টে গেছে অর্থাৎ এটা এখন সাধনার জন্যে জীবন।

কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা অন্য ধর্মের বই অথবা অন্য চিগোংগ-এর বই পড়তে পারে কি না? আমরা বলেছি যে ধর্মের বইগুলি, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের বইগুলি, সবই লোকেদের এটাই শিক্ষা দেয় যে চরিত্রের সাধনা কীভাবে করবে। যেহেতু আমরাও বুদ্ধ মতাবলম্বী, সেইজন্যে কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে, শাস্ত্রের অনেক জিনিস অনুবাদ প্রক্রিয়ার সময়ে ইতিমধ্যে ভুলভাবে অনুবাদ করা হয়েছে, এর উপরে শাস্ত্রের অনেক ব্যাখ্যাও বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী করা হয়েছে এবং অনেক রকমের সংজ্ঞাও ইচ্ছামতো নিরূপণ করা হয়েছে, এর ফলে ধর্মের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব লোকেরা ইচ্ছামতো শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করেছিল, তাদের স্তর বুদ্ধের জগৎ থেকে অনেক দূরে ছিল, তারা শাস্ত্রের সত্যিকারের অর্থটা একেবারেই জানত না, সেইজন্যে বিষয়গুলোর উপরে তাদের ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তুমি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করতে চাও, সেটা অত সহজ নয় এবং তুমি নিজে নিজে সেটা উপলব্ধিও করতে পারবে না। কিন্তু তুমি বলছ: ‘‘আমার শাস্ত্রে আগ্রহ আছে।’’ তুমি সর্বদা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যাচ্ছ, তাহলে তুমি সেই পদ্ধতিতেই সাধনা করছ, কারণ শাস্ত্রের মধ্যে সেই সাধনাপথের গোংগ এবং ফা সম্মিলিত করা থাকে। যদি একবার সেটা অধ্যয়ন কর তাহলে তুমি সেই পদ্ধতিটাই শিখলে----এটা এইরকমই সমস্যা। তুমি যদি গভীরভাবে সেটা অধ্যয়ন কর এবং সেটার ওপরেই সাধনা কর, তাহলে তুমি হয়তো আমাদের এই সাধনাপদ্ধতির পরিবর্তে ওই পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছ। সাধনার ব্যাপারে লোকেরা চিরকাল বলে এসেছে, ‘‘দ্বিতীয় পদ্ধতি কখনোই নয়।’’ তুমি যদি সত্যিই এই একটা পদ্ধতিতে সাধনা করতে চাও তাহলে তুমি শুধু এই পদ্ধতির শাস্ত্রই অধ্যয়ন করবে।

এখন চিগোংগ বইগুলোর প্রসঙ্গে এটা বলা যায় যে সাধনা করতে চাইলে এসব পড়া যাবে না। বিশেষত বর্তমান কালে প্রকাশিত চিগোংগ বইগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, ওসব পড়া উচিত নয়। একই কথা প্রযোজ্য এই সব বই-এর প্রসঙ্গে যেমন, ‘*হলুদ সম্রাটের আভ্যন্তরীণ রসায়ন শাস্ত্র*’, ‘*মন এবং শরীরের সাধনায় পথ নির্দেশ (শিংগ মিংগ*

গুইবি)’, অথবা *‘তাও জাঙ্গ’*। যদিও এগুলোর মধ্যে ওইসব খারাপ জিনিস থাকে না, কিন্তু এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বার্তা বিদ্যমান। যেহেতু এগুলো নিজেরাই এক একটা সাধনার পথ, সেইজন্যে যখনই তুমি এসব পড়বে, তখনই ওই জিনিসগুলো তোমার মধ্যে গিয়ে যুক্ত হবে এবং তোমাকে বাধা দেবে। যখনই তুমি ভাববে যে এই বাক্যটা সঠিক এবং ভালো, তখনই এটা চলে আসবে এবং তোমার গোংগ-এর মধ্যে যুক্ত হবে। যদিও এটা খারাপ জিনিস নয়, কিন্তু অকস্মাৎ অন্য একটা জিনিস তোমার মধ্যে যুক্ত হলে, সেক্ষেত্রে তুমিই বলো কীভাবে তুমি সাধনা করবে? এটা কি সমস্যা সৃষ্টি করবে না? যদি তুমি একটা টেলিভিশন সেটের ইলেকট্রনিক্স অংশের মধ্যে কোনো অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ যুক্ত কর, তাহলে এই টেলিভিশন সেটের কী হবে বলে মনে হয়? এটা সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হয়ে যাবে, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে নিয়ম। এছাড়া বর্তমানে অনেক চিগোংগ বই-ই নকল, যেগুলো নানান ধরনের বার্তা বহন করে। আমাদের একজন শিক্ষার্থী যখন একটা চিগোংগ বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল, একটা বড়ো সাপ লাফ দিয়ে উঠে এসেছিল। অবশ্য আমি এটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। আমি এইমাত্র যা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের অনুশীলনকারীরা যদি নিজেদের সঠিকভাবে সামলাতে না পারে, তাহলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, এর অর্থ, তাদের চিন্তা সৎ না হওয়ার দরুন তারা সমস্যা ডেকে আনছে। আমরা তোমাদের সুবিধার্থে এসব বলছি, যাতে তোমরা সবাই জানতে পার যে কী করতে হবে এবং কীভাবে সেগুলোকে আলাদা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সমস্যার সৃষ্টি না হয়। আমি এইমাত্র যা বললাম, সেটা জোর দিয়ে না বললেও তোমরা অবশ্যই সেটার প্রতি মনোযোগী হবে। কারণ প্রায়শ এই বিষয় থেকেই সমস্যার সৃষ্টি হয়, সচরাচর এখান থেকেই সমস্যা উঠে আসে। সাধনা অত্যন্ত কষ্টকর এবং ভীষণ গম্ভীর, তুমি সামান্য অমনোযোগী হলেই নীচে নেমে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে, সেইজন্যে তোমার মনকে অবশ্যই সৎ হতে হবে।

রণক্রীড়া (Martial Arts) চিগোংগ

আভ্যন্তরীণ সাধনা পদ্ধতি ছাড়া রণক্রীড়া চিগোংগ-ও আছে। রণক্রীড়া চিগোংগ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে আমি অবশ্যই একটা বিষয়ে জোর দেব, বর্তমানে সাধনার জগতে অনেক প্রকার চিগোংগ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

এখন এখানে তথাকথিত চিত্রকলা চিগোংগ, সংগীতকলা চিগোংগ, হস্তলিপি চিগোংগ এবং নৃত্যকলা চিগোংগ সব রকমই উদয় হয়েছে, এগুলো সবই কি চিগোংগ? আমার আশ্চর্য বোধ হয়। আমি বলব এরা চিগোংগ-কে নষ্ট করে দিচ্ছে, শুধু যে নষ্ট করছে তা নয়, সরলভাবে বলা যায় এরা চিগোংগ-এর সর্বনাশ করছে। এদের তত্ত্বের ভিত্তিটা কী? এটা বলা হচ্ছে যে ছবি আঁকা, গান করা, নৃত্য করা অথবা লেখা, এসব আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রবেশ করে, অর্থাৎ তথাকথিত চিগোংগ অবস্থায় করা হলে, সেটাই হচ্ছে চিগোংগ, তাই কি? জিনিসগুলোকে এইভাবে বোঝা উচিত নয়। আমি বলব এটা কি চিগোংগ-এর সর্বনাশ করা হচ্ছে না? চিগোংগ হচ্ছে মানবশরীরের সাধনার জন্যে এক ধরনের বিস্তৃত এবং প্রগাঢ় শিক্ষা পদ্ধতি। ওহো, আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার অর্থই কি চিগোংগ? তাহলে আমরা আচ্ছন্ন অবস্থায় বাথরুমে গেলে তাকে কী বলা হবে? এটা কি চিগোংগ-এর সর্বনাশ করা হচ্ছে না? আমি বলব চিগোংগ-এর সর্বনাশই করা হচ্ছে। দুই বৎসর পূর্বে, প্রাচ্যের স্বাস্থ্য প্রদর্শনীতে, তথাকথিত হস্তলিপি চিগোংগ সেখানে ছিল। হস্তলিপি চিগোংগ কাকে বলে? আমি ওখানে গিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলাম, একজন ব্যক্তি তুলি কলম দিয়ে লিখে যাচ্ছে, লেখা হয়ে যাওয়ার পরে সে প্রত্যেকটা অক্ষরে হাত দিয়ে তার চি প্রদান করছিল, নির্গত হওয়া চি সবই কালো ছিল। টাকা-পয়সা এবং খ্যাতি তার মনকে অধিকার করে রেখেছিল, তুমিই বলো তার কাছে গোংগ থাকবে কি? তার চি-ও এমনকী ভালো ছিল না, তার হস্তলিপিগুলো ওখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল খুব চড়া দামে বিক্রী করার জন্যে। কিন্তু সেসব পশ্চিমের বিদেশীরাই কিনছিল। আমি বলব যারাই সেসব কিনে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ওই কালো চি কীভাবে ভালো হবে? লোকটার পুরো চেহারাটা কালচে লাগছিল। সে টাকা পয়সাতে আচ্ছন্ন ছিল এবং কেবল টাকা-পয়সারই চিন্তা করে যাচ্ছিল। তার গোংগ কী করে থাকবে? তার পরিচয়পত্রে একগাদা সম্মানসূচক উপাধির উল্লেখ ছিল যেমন ‘‘আন্তর্জাতিক হস্তলিপি চিগোংগ’’ ইত্যাদি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এসব জিনিসকে কি চিগোংগ বলা যায়?

তোমরা সবাই চিন্তা কর: যেসব লোকেরা আমার এই ক্লাস শেষ করবে, তাদের মধ্যে আশি থেকে নব্বই ভাগ লোকের শুধু যে রোগ নিরাময় হয়ে যাবে তা নয়, তাদের মধ্যে গোংগ-ও বিকশিত হবে, যা সত্যিকারের গোংগ। তোমার শরীর ইতিমধ্যে যেসব জিনিস বহন করছে তা খুবই অসাধারণ। যদি তুমি নিজে নিজে অনুশীলন কর, তাহলে এমনকী

সারাজীবন অনুশীলন করলেও তুমি এসব জিনিস পাবে না। যদি একজন অল্পবয়সি লোক এখন অনুশীলন আরম্ভ করে সারাজীবন ধরে অনুশীলন করে যায়, তাহলেও সে সেইসব জিনিস পাবে না, যা আমি তোমার মধ্যে স্থাপন করে দিয়েছি, এমনকী সে যদি একজন সত্যিকারের মহান মাস্টারের কাছ থেকেও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমাদের অনেক প্রজন্ম লেগেছে ফালুন এবং এই যন্ত্রকৌশলগুলো উদ্ভাবন করার জন্যে, এই সব জিনিস তোমার মধ্যে একবারে স্থাপন করা হয়েছে, সেইজন্যে আমি তোমাদের বলছি, সহজে পেয়েছ বলে সহজে জিনিসগুলোকে হারিয়ে ফেল না। এগুলো মহামূল্যবান এবং দাম দিয়ে বিচার করা যায় না। এই ক্লাসের পরে তোমার সঙ্গে সত্যিকারের গোংগ থাকবে, যা একটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ। যখন তুমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে কয়েকটা শব্দ লিখবে, লেখাটা ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন, তার মধ্যে গোংগ থাকবে! তাহলে আমাদের এই ক্লাস শেষ হওয়ার পরে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে কি ‘‘মাস্টার’’ শব্দ যোগ করা হবে এবং সবাই কি হস্তলিপি চিগোংগ মাস্টার হয়ে যাবে? আমি বলব ব্যাপারটাকে এইভাবে বুঝলে ঠিক হবে না। যেহেতু তোমার কাছে সত্যিকারের গোংগ এবং শক্তি রয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার এসব নির্গত করার প্রয়োজন নেই, তোমার স্পর্শ করা সব জিনিসেই শক্তি রয়ে যাবে এবং সবই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে।

আমি একটা সাময়িক পত্রিকা দেখেছিলাম, যেখানে হস্তলিপি চিগোংগ ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে এক টুকরো খবর ছাপা হয়েছিল। আমি একটু পাতাগুলো উল্টেছিলাম, তারা কীভাবে শেখাবে সেটা পড়েছিলাম। এইরকম লেখা ছিল যে, প্রথমে শ্বাস প্রক্রিয়াকে নিয়মিত কর, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ কর। এরপরে বসে ধ্যান কর পনের মিনিট থেকে তিরিশ মিনিট, সেই সময়ে দ্যান ক্ষেত্রের চি-এর প্রতি মনকে কেন্দ্রীভূত কর, এরপরে মনে মনে দ্যানক্ষেত্রের চি-কে উঠিয়ে অগ্রবাহুর মধ্যে নিয়ে আস, এরপর তুলি কলম নিয়ে কালির মধ্যে ডোবাও, চি-কে চালিত করে তুলির কলমের ডগায় নিয়ে এস। তোমার চিন্তাটা ওখানে পৌঁছে গেলেই লিখতে আরম্ভ করতে পার। এটা লোকেদের ঠকানো হচ্ছে না কি? তাহলে চি-কে উঠিয়ে নিয়ে যে জায়গায় আনবে, সেটাই একরকম চিগোংগ? সেক্ষেত্রে ভোজনের পূর্বে একটু বসে ধ্যান কর, চপস্টিক হাতে নিয়ে এবার চি-কে চপস্টিকের ডগায় সঞ্চালিত করে নিয়ে এস, এবং ভোজন কর, তাহলে এটাকে ‘‘ভোজন চিগোংগ’’ বলা হবে কি? আমরা যা ভোজন করব সেসবই শক্তি, আমি শুধু ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলাম। আমি বলব এরা

চিগোংগ-এর সর্বনাশ করছে, এরা চিগোংগ-কে এত ভাসা ভাসা জিনিস মনে করে। অতএব চিগোংগ সম্বন্ধে এইরকম ধারণা করা উচিত নয়।

তবে রণক্রীড়া চিগোংগ ইতিপূর্বেই একটা স্বতন্ত্র চিগোংগ পদ্ধতি হিসাবে পরিচিতি পেয়ে গেছে। এটা কেন? কারণ এটা কয়েক হাজার বছর ধরে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এতে সাধনার তত্ত্বগুলোর একটা সম্পূর্ণ প্রণালী আছে এবং সাধনা পদ্ধতিগুলোরও একটা সম্পূর্ণ প্রণালী আছে, সেইজন্যে এটাকে সম্পূর্ণ প্রণালী হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রণক্রীড়া চিগোংগ সবচেয়ে নীচুস্তরের আভ্যন্তরীণ সাধনা হিসাবেই রয়ে গেছে। কঠিন চিগোংগ একধরনের শক্তিযুক্ত পদার্থের সমষ্টি, যা শুধু আঘাত করার জন্যেই প্রয়োগ করা হয়। তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি, বেজিংয়ে একজন শিক্ষার্থী ছিল, সে আমাদের ফালুন দাফা-র ক্লাস শেষ করার পরে কোনো জিনিসে হাত দিয়ে চাপ দিতে পারছিল না। সে দোকানে তার বাচ্চা বহন করার জন্যে গাড়ি কিনতে গিয়েছিল, জিনিসটা শক্তপোক্ত কিনা, সেটা সে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিল। হাত দিয়ে একবার চাপ দিতেই গাড়িটা ভেঙ্গে পড়ল, তার খুব আশ্চর্য বোধ হল। যখন সে বাড়িতে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল, তখন সে হাত দিয়ে চেয়ারে চাপ দিতে পারছিল না, যদি সে চাপ দিত তাহলে চেয়ারটা ভেঙ্গে যেত। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে এসব কী হচ্ছে। আমি কিছু বলিনি, কারণ আমি চাইনি যে তার মধ্যে একটা আসক্তি সৃষ্টি হোক। আমি শুধু বলেছিলাম যে, এসবই স্বাভাবিক অবস্থা, এগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে দাও, গুরুত্ব দিও না, এসবই ভালো ব্যাপার। কেউ যদি এই অলৌকিক ক্ষমতাকে ভালোভাবে প্রয়োগ করে, তাহলে সে একটা পাথরের টুকরোকে হাতের মধ্যে চাপ দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারবে। এটাই কি কঠিন চিগোংগ নয়? কিন্তু ওই শিক্ষার্থী কোনো দিন কঠিন চিগোংগ অনুশীলন করেনি। এই সব অলৌকিক ক্ষমতা সাধারণভাবে আভ্যন্তরীণ সাধনার অনুশীলনের মাধ্যমেই বিকশিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু লোকেরা তাদের চরিত্রকে ঠিকভাবে বজায় রাখতে পারে না, সেইজন্যে প্রায়শ তাদের এই সব ক্ষমতা বিকশিত হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় না। বিশেষত নীচুস্তরের সাধনার সময়ে যখন কোনো ব্যক্তির চরিত্রের উন্নতি না হয়ে থাকে, তখন এই নীচুস্তরে অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটলে, সেগুলোকে একেবারেই প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না। সময় পেরিয়ে যেতে থাকলে, যখন তোমার স্তরের উন্নতি ঘটবে, তখন এইসব জিনিসের আর দরকার হবে না এবং ওগুলোকে তখন আর প্রকাশও করা হবে না।

রণক্রীড়া চিগোংগ নির্দিষ্টরূপে কীভাবে অনুশীলন করা হয়? রণক্রীড়া চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে চি-কে চালনা করার কথা বলা হয়, কিন্তু শুরুতে চি-কে চালনা করা সহজ নয়, তুমি ভাবছ তুমি যখন চাইবে তখনই চি-কে চালনা করতে পারবে, কিন্তু তুমি পারবেই না। তাহলে কী করা হয়? তারা হাতের অনুশীলন অবশ্যই করবে, তারা বুকের দুই পাশ, পায়ের পাতা, পা, অগ্র ও পশ্চাৎবাহু, মাথা সবকিছুরই অনুশীলন করে। তারা কীভাবে এগুলোর অনুশীলন করে? কিছু লোক হাত দিয়ে বা হাতের তালু দিয়ে গাছে আঘাত করে। কিছু লোক হাত দিয়ে একটা পাথরের চাঙরে থাপ্পড় মারে, ‘‘চটাশ চটাশ’’ করে এইভাবে তারা থাপ্পড় মারে। তুমি বলো কত ব্যথা অবশ্যই হয় যখন হাড়ে আঘাত লাগে, একটু জোরে আঘাত করলেই হাত থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। তখন পর্যন্ত চি-কে চালনা করা যায়নি। তারা তখন কী করবে? তারা তাদের বাহু দুটো ঘোরাতে শুরু করে, যাতে বাহুতে রক্ত ফিরে আসে, তাদের বাহু এবং হাত ফুলতে থাকে। এগুলো সত্যিই ফুলে ওঠে, এবার যখন হাত দিয়ে পাথরে আঘাত করে, তখন হাড়ের চারিদিকে একটা নরম গদির মতো আস্তরণ তৈরি হয়ে যায়, হাড়ের সঙ্গে পাথরের সরাসরি সংযোগ আর হয় না, এর ফলে অত ব্যথা আর লাগে না। এইভাবে তারা অনুশীলনটা বজায় রাখে এবং মাস্টার তাদের শেখাতে থাকে, এইভাবে সময় এগোতে থাকে এবং তারা চি-কে চালনা করতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র চি-কে চালনা করতে পারলেই হবে না, সত্যিকারের লড়াইয়ের সময়ে অপর ব্যক্তি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। অবশ্য চি-কে চালনা করতে পারলে সে ইতিমধ্যে আক্রমণকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তাকে খুব মোটা লাঠি দিয়ে আঘাত করা হলেও তার হয়তো ব্যথা লাগবে না, সে চি-কে চালনা করে নিজেকে ফোলাতে পারবে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে চি হচ্ছে সবচেয়ে আদিম জিনিস, কিন্তু সে নিরন্তর অনুশীলন করতে থাকলে, তার চি, উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকবে। উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে খুব উচ্চ ঘনত্ব যুক্ত শক্তির সমাহার তৈরি হবে, এই শক্তির সমাহারের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিও থাকে, সেইজন্যে এটা অলৌকিক শক্তির সমাহার----অর্থাৎ এক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা। কিন্তু এই অলৌকিক ক্ষমতা, আঘাত করা এবং আঘাত প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন, একে রোগ আরোগ্যের জন্যে ব্যবহার করলে কাজ হবে না। যেহেতু এই উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থটা অন্য মাত্রাতে থাকে এবং আমাদের এই মাত্রা দিয়ে যাতায়াত করে না, ওই মাত্রাতে সময়ের গতি আমাদের এই মাত্রার তুলনায় দ্রুততর। যখন তুমি অন্য ব্যক্তিকে আঘাত

করতে চাও, তোমার চি-কে চালনা করার প্রয়োজন নেই বা চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই, তোমার গোংগ ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবে। যখন অন্য কেউ তোমাকে আঘাত করবে এবং তুমি সেটাকে প্রতিহত করতে চাও, তখনও তোমার গোংগ ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবে। এটা কোনো ব্যাপার নয় যে তুমি কত দ্রুত ঘুসিটা ছুঁড়ছ, এটা তোমার থেকেও দ্রুত যাবে, যেহেতু দুটো মাত্রাতে সময়ের ধারণাটা ভিন্ন। সেইজন্যে রণক্রীড়া চিগোংগ-এর অনুশীলনের দ্বারা একজন ব্যক্তির মধ্যে তথাকথিত লৌহবালি পাঞ্জা, সিন্দূর পাঞ্জা, বজ্রের পা, অর্হৎ-এর চরণ[83], এই সব ক্ষমতা বিকশিত হতে পারে। এগুলো সবই সাধারণ মানুষদের দক্ষতা। একজন সাধারণ ব্যক্তি শরীরচর্চার মাধ্যমে ওই অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

রণক্রীড়া চিগোংগ এবং আভ্যন্তরীণ সাধনার মধ্যে সবচাইতে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে: রণক্রীড়া চিগোংগ গতিশীল অবস্থায় অনুশীলন করা হয়, সেইজন্যে চি চামড়ার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। যেহেতু গতির মধ্যে অনুশীলন করতে হয়, একজন ব্যক্তি শান্ত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তার চি দ্যান ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না, তার চি চামড়ার নীচ দিয়ে এবং মাংসপেশীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেইজন্যে সে জীবনের সাধনা করতে পারে না এবং সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরের গোংগ ফু বা কুংগ ফু[84] প্রাপ্ত করতে পারে না। আমাদের আভ্যন্তরীণ সাধনায় শান্ত অবস্থার মধ্যে অনুশীলন করা প্রয়োজন। সাধারণ সাধনা পদ্ধতিগুলো, দ্যান ক্ষেত্রে বা তলপেটে চি-এর প্রবেশ করার কথা বলে, তারা শান্ত অবস্থার মধ্যে সাধনা করতে বলে এবং মূল শরীরের রূপান্তরের কথা বলে। তারা শরীরের সাধনা করতে পারে এবং আরও উঁচুস্তরে সাধনা করতে পারে।

তোমরা হয়তো উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের গোংগ ফু-র কথা পড়েছ যেমন স্বর্ণঘন্টার বর্ম, লোহার জামা, একশ’ পা দূর থেকে পপলার গাছ ভেদ করতে পারা। এছাড়া লঘু গোংগ ফু-র দ্বারা লোকেরা উঁচু স্থানে বাতাসের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, কেউ কেউ এমনকী অন্য মাত্রায় প্রবেশ করতে পারে। এই ধরনের গোংগ ফু-র অস্তিত্ব আছে না নেই? আছে, এটা নিশ্চিতভাবেই আছে। কিন্তু সাধারণ লোকেদের মধ্যে এর

---

[83]লৌহবালি পাঞ্জা, সিন্দূর পাঞ্জা, বজ্রের পা, অর্হৎ-এর চরণ --- চীনদেশের রণক্রীড়া চিগোংগ-এর বিভিন্ন কলাকৌশল

[84] গোংগ ফু বা কুংগ ফু - কাজের ক্ষমতা, দক্ষতা, রণক্রীড়া-য় চমকপ্রদ দক্ষতা

অস্তিত্ব নেই। যেসব লোকেরা সত্যিকারের অনুশীলনের মাধ্যমে উচ্চস্তরের গোংগ ফু অর্জন করেছে, তারা জনসাধারণের মধ্যে এসব প্রদর্শন করতে পারে না। যেহেতু এই ধরনের ব্যক্তি শুধুমাত্র রণক্রীড়াই অনুশীলন করেনি, সে সাধারণ মানুষের স্তরকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে গেছে, অতএব তাকে অবশ্যই আভ্যন্তরীণ সাধনা পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনা করতে হয়েছে। সে অবশ্যই নিজের চরিত্রের উপরে গুরুত্ব দিয়েছে এবং নিজের চরিত্রের উন্নতি করেছে, সে অবশ্যই পার্থিব-লাভজনিত জিনিসগুলোকে নিস্পৃহ ভাবে দেখে। যদিও সে সাধনার মাধ্যমে এই ধরনের গোংগ ফু অর্জন করেছে, কিন্তু অর্জন করার পরে সে এগুলোকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ইচ্ছামতো প্রয়োগ করতে পারে না, যখন কেউ তাকে দেখছে না, একমাত্র তখনই এগুলোর কিছুটা তাকে প্রয়োগ করতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু উপন্যাসগুলো পড়তে গিয়ে দেখবে যে, একজন ব্যক্তি কোনো তরবারি চালনার নির্দেশগ্রন্থ, গুপ্তধন অথবা কোনো মহিলার জন্যে, হত্যা করছে এবং লড়াই করছে, এদের প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ ক্ষমতার অধিকারী, এদের চলাফেরা দেবতার মতো। তোমরা চিন্তা কর, একজন ব্যক্তি আভ্যন্তরীণ সাধনার মাধ্যমেই কি সত্যিকারের এইরকম গোংগ ফু অর্জন করেনি? কিন্তু চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব দিতে পারলে একমাত্র তাহলেই সে এই সব দক্ষতার সাধনা করতে পারবে, সে অনেক আগে থেকেই খ্যাতি, লাভ, এবং বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখে আসছে, সে কি মানুষকে হত্যা করতে পারবে? সে কী করে টাকাপয়সা এবং ধনসম্পদকে গুরুত্ব দেবে? এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার, এসবই সাহিত্য রচনার অতিরঞ্জন মাত্র। লোকেরা মানসিক উত্তেজনার পিছনে ছুটে বেড়ায় এবং যে কোনো উপায়ে এই তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়। সাহিত্যিকরা এই বিশেষ ব্যাপারটা অনুধাবন করে, তারা সেইরকম জিনিসই লেখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাতে তুমি তৃপ্ত হও এবং আনন্দ পাও। লেখাটা যত অবিশ্বাস্য হবে ততই সেটা তুমি পড়তে চাইবে, ওগুলো সবই সাহিত্যের অতিরঞ্জন মাত্র। যারা সত্যিকারের এই ধরনের গোংগ ফু অর্জন করেছে তারা কখনোই এইরকম কাজ করবে না, বিশেষ করে জনসাধারণের সামনে তো তারা এসবের প্রদর্শন করবেই না।

জাহির করার মানসিকতা

আমাদের বেশ কিছু শিক্ষার্থী সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকে সাধনা করে, সেই কারণে তারা অনেক আসক্তি পরিত্যাগ করতে পারেনি, ইতিমধ্যে বেশ কিছু আসক্তি তাদের মধ্যে স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছে, তারা নিজেরাও টের পায় না। এই ধরনের জাহির করার মানসিকতা সব জায়গায় প্রকটিত হতে পারে, যখন কেউ ভালো কাজ করছে তখনও এটা প্রকটিত হতে পারে। প্রায়শ নিজেদের খ্যাতি, লাভ ও কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্যে এইসব লোকেরা প্রচার এবং জাহির করতে থাকে: ''আমার ক্ষমতা আছে এবং আমি সফল ব্যক্তি।'' এই ধরণের ব্যাপার আমরাও দেখেছি, কেউ হয়তো অন্যদের থেকে অনুশীলনটা একটু ভালো করে, কেউ হয়তো দিব্যচক্ষু দিয়ে আরও একটু পরিষ্কার দেখতে পায় অথবা কারোর শারীরিক ক্রিয়া দেখতে একটু ভালো, লোকেরা এসবই জাহির করতে চায়।

কেউ কেউ বলে বেড়ায়: ''আমি শুনেছি মাস্টার লি অমুক জিনিস বলেছেন।'' সবাই সেটা শোনার জন্যে তাকে ঘিরে ধরে, সে তখন তার ধারণাপ্রসূত জিনিসগুলোকে রঙ চড়িয়ে গুজবের আকারে রটনা করতে থাকে। এর উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে জাহির করা। আবার এরকমও লোক আছে যারা খুব উৎসাহ এবং তৃপ্তির সঙ্গে একে অপরের কাছে গুজব ছড়াতে থাকে, যেন তারাই সবকিছু ভালো জানে। আমাদের এত সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউই যেন তাদের মতো বোঝে না, এবং অন্য লোকেরা কেউই যেন তাদের মতন অতটা জানে না, ব্যাপারটা তাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়, সম্ভবত তারা নিজেদের অজান্তেই এটা করছে। তাদের অবচেতন মনে এইরকম এক জাহির করার মানসিকতা রয়েছে, তা নাহলে এইরকম গুজব ছড়াবে কেন? আবার এরকমও কিছু লোক আছে যারা বলে বেড়ায় যে মাস্টার অমুক সময়ে পর্বতে ফিরে যাবেন। আমি পর্বতের থেকে আসিনি, অতএব কোন্ পর্বতে ফিরে যাব? আবার এরকম কিছু লোক আছে, যারা বলে বেড়ায় যে আমি কোনো বিশেষ দিনে কাউকে কিছু জিনিস বলেছি এবং কারোর সঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এসব জিনিস রটনা করে কী উপকার হবে? একটুও ভালো কিছু হবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে এসবই তাদের আসক্তি --- এক ধরনের জাহির করার মানসিকতা।

কিছু লোক আমার খোঁজ করে আমার হস্তাক্ষর সংগ্রহ করার জন্যে। এর উদ্দেশ্যটা কী? সাধারণ লোকেদের মধ্যে কারোর হস্তাক্ষরকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ধরে রাখার রেওয়াজ আছে। তুমি যদি সাধনা না কর, তাহলে আমার দেওয়া হস্তাক্ষর তোমার কোনো কাজে আসবে না। আমার বই-এর প্রতিটি কথায় আমার ছবি এবং ফালুন আছে, প্রত্যেকটা বাক্য আমিই বলেছি, এর ওপরে আমার হস্তাক্ষর কীসের জন্যে লাগবে? কিছু লোক ভাবে: ''এই হস্তাক্ষরের সাথে, মাস্টারের বার্তা আমাকে রক্ষা করবে।'' তারা এখনও বার্তা-র উপরে বিশ্বাস করে, আমরা বার্তার ব্যাপারে কোনো কিছু বলি না। ইতিমধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে এই বইটা অমূল্য। অথচ, তুমি এখনও কী সব জিনিসের খোঁজ করছ? এসব জিনিস ওইসব আসক্তিরই প্রতিফলন। আবার কিছু লোক আছে যারা, আমার সঙ্গে যেসব শিক্ষার্থী থাকে, তাদের কথাবার্তা ও আচরণ লক্ষ্য করে, তারা ভালো না মন্দ, সেটা না জেনেই তাদের অনুকরণ করার চেষ্টা করে। বস্তুত একজন ব্যক্তি কীরকম সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, শুধু একটাই ফা আছে, শুধু দাফা অনুযায়ী কাজ করলে, একমাত্র তাহলেই সত্যিকারের আদর্শকে পূরণ করা হবে। যেসব লোকেরা আমার সঙ্গে থাকে তারা আমার থেকে কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, অন্য সব লোকের মতোই, তারা শুধু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মাত্র, এইসব আসক্তিকে উদয় হতে দিও না। আমরা প্রায়ই এই ধরনের আসক্তি বৃদ্ধি হওয়ার ফলে, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই দাফা-র কাজে ক্ষতি করি। এমনকী তোমার তৈরি করা এইরকম আগ্রহোদ্দীপক গুজব হয়তো দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করতে পারে, অথবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা আসক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে, যার ফলে মাস্টারের আরও কাছাকাছি আসার জন্যে, তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে থাকে, যাতে তারা আরও কিছু কথা শুনতে পারে, ইত্যাদি। এসব একই বিষয় নয় কি?

এই জাহির করার মানসিকতা থেকে সহজেই আর কী হতে পারে? আমি এই সাধনা দুই বছর ধরে শেখাচ্ছি। আমাদের ফালুন দাফা-র সাধনার প্রবীণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের হয়তো খুব শীঘ্রই গোংগ উন্মোচিত হয়ে যাবে; কেউ কেউ হয়তো পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থায় প্রবেশ করবে-----তারা হঠাৎ করেই এই পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির মধ্যে প্রবেশ করবে। তাহলে কেন এদের অলৌকিক ক্ষমতা পূর্বে বিকশিত হয়নি? এর কারণ, আমি একবারে তোমাকে ওই উঁচুস্তরে তুলে দিলেও, সাধারণ মানুষদের সমস্ত আসক্তি

তোমার অন্তর থেকে দূর করা না গেলে কিছু করা যাবে না। অবশ্য তোমার চরিত্র ইতিমধ্যে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, কিন্তু এখনও বেশ কিছু আসক্তি দূর হয়নি, সেইজন্যে তোমাকে ওইসব অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। তোমার এই পর্বটা কেটে যাওয়ার পরে, এবং স্থিরতা অর্জন হলে, তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থায় প্রবেশ করানো হবে। এই পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থার মধ্যে তোমার দিব্যচক্ষু খুব উঁচু স্তরে খুলে যাবে এবং তোমার মধ্যে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হবে। বস্তুত আমি তোমাদের বলতে চাই যে, সত্যিকারের সাধনা করার সময়ে, শুরুতেই অনেক অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়ে থাকে। তোমরা ইতিমধ্যে উঁচুস্তরে প্রবেশ করেছ, সেইজন্যে তোমাদের অলৌকিক ক্ষমতাও অনেক। হয়তো আমাদের অনেকেরই সম্প্রতি এই ধরনের পরিস্থিতি ঘটেছে। আবার এরকমও কিছু লোক আছে, যারা সাধনায় উঁচু স্তরে পৌঁছাতে পারবে না, এইরকম ব্যক্তি নিজের শরীরে যেসব জিনিস বহন করছে, এবং তার নিজের যে সহনশীলতার ক্ষমতা এই দুটোর একত্রিত অবস্থাটা সুনির্দিষ্ট করা আছে। সেইজন্যে কিছু লোকের গোংগ উন্মোচন এবং আলোকপ্রাপ্তি---অর্থাৎ সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্তি খুব নীচুস্তরেই ঘটে। এইরকম লোকেরও আবির্ভাব হয়ে থাকে।

আমি তোমাদের এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করব, এটা বলার জন্যে যে, যখনই এই ধরনের ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, তোমরা অবশ্যই তাকে একজন বিস্ময়কর আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করবে না। এটা সাধনার ক্ষেত্রে খুবই গম্ভীর সমস্যা, একমাত্র দাফা মেনে কাজ করলে তবেই সেটা ঠিক। তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা, দিব্যশক্তি, অথবা অন্য কিছু দেখে, তাকে অনুসরণ করা বা তার কথা শোনা উচিত নয়। তোমরা তার ক্ষতি করে ফেলবে, তার মধ্যে আত্মসন্তুষ্টির আসক্তি সৃষ্টি হবে, শেষে তার নিজের সব জিনিস হারিয়ে যাবে, এবং তার সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে, শেষে সে নীচে নেমে যাবে। যার গোংগ উন্মোচিত হয়ে গেছে সেও নীচে নেমে যেতে পারে। একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নিজেকে সামলাতে না পারেন তাহলে তিনিও নীচে নেমে যেতে পারেন। এমনকী একজন বুদ্ধও যদি নিজেকে ঠিকভাবে সামলাতে না পারেন, তিনিও নীচে নেমে যেতে পারেন। আর তোমার ক্ষেত্রে যে কি না এই সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করছে সেখানে তো বলার-ই কিছু নেই! অতএব তোমার কতগুলো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, সেগুলো কতটা সমীহ জাগানো অথবা তোমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা কতটা বিস্ময়জনক, সেসব কোনো ব্যাপারই নয়,

তোমাকে অবশ্যই সংযত হতে হবে। সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি বসেছিল যে এই মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে পরের মুহূর্তে আবার আবির্ভূত হতে পারে, ঠিক এইরকম ক্ষমতা, এমনকী আরও শ্রেষ্ঠতর কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিকশিত হতে পারে। তুমি তখন কী করবে? আমাদের শিক্ষার্থী অথবা শিষ্য হিসাবে, ভবিষ্যতে যখনই তোমার নিজের মধ্যে বা অন্য কারোর মধ্যে এই সব জিনিসের বিকাশ ঘটবে, তখন তোমরা তার পূজা করবে না অথবা সেই সব জিনিসের পিছনে ছুটবে না। একবার তোমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটলেই, তোমার সাধনা শেষ হয়ে যাবে, এবং তুমি নীচে নেমে যাবে। সম্ভবত তুমি তার থেকে আরও উঁচু স্তরে আছ, শুধু তোমার ঐশ্বরিক ক্ষমতা এখনও প্রকটিত হয়নি। অন্তত এই বিষয়টাতে তুমি নীচে নেমে যাবে, সেইজন্যে তোমরা অবশ্যই এই বিষয়টার দিকে লক্ষ্য রাখবে। আমরা এই ব্যাপারটাতে খুব গুরুত্ব দিয়েছি কারণ এই পরিস্থিতি শীঘ্রই এসে যাবে, একবার এটা আবির্ভূত হলে, তখন তুমি যদি নিজেকে ভালোভাবে সামলাতে না পার তাহলে ঠিক হবে না।

যখন একজন সাধকের গোংগ বিকশিত হয়েছে, গোংগ উন্মোচিত হয়েছে অথবা সত্যি সত্যি আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে, তখন তার নিজেকে বিরাট কোনো কিছু ভাবা উচিত নয়, সে যেসব জিনিস দেখছে সেটা শুধু সেই স্তরেরই জিনিস। এর কারণ, তার সাধনা ওই অবস্থা পর্যন্তই পৌঁছেছে অর্থাৎ তার আলোকপ্রাপ্তির গুণ, তার চরিত্রের মান এবং প্রজ্ঞা ওই অবস্থা পর্যন্তই পৌঁছেছে। সেইজন্যে সে হয়তো আরও উঁচুস্তরের জিনিসকে বিশ্বাস করবে না। যেহেতু সে উঁচুস্তরের জিনিসকে বিশ্বাস করে না, সেইজন্যে সে ভাবে যে, সে যা দেখছে সেটাই চূড়ান্ত, ভাবে এসবই শুধু আছে। কিন্তু সেটা অনেক দূরের ব্যাপার, কারণ সেই ব্যক্তির স্তর ঠিক এটাই।

লোকেদের মধ্যে একটা অংশের এই স্তরেই গোংগ খুলে দেওয়া হয়, কারণ তারা সাধনায় উপরের দিকে আর উঠতে পারবে না। সেইজন্যে তাদের শুধু এই স্তরেই গোংগ উন্মোচিত হবে এবং আলোকপ্রাপ্তি ঘটবে। তোমাদের যারা পরবর্তীকালে সাধনায় সাফল্যলাভ করবে তাদের মধ্যে কেউ ছোট জাগতিক পথের স্তরে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করবে, কেউ বিভিন্ন স্তরে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করবে, কেউ আলোকপ্রাপ্তির সাথে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে। একমাত্র যারা আলোকপ্রাপ্তির সাথে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে তারাই সর্বাপেক্ষা মহান। তারা বিভিন্ন স্তরের সব জিনিসকে দেখতে পারবে এবং জিনিসগুলো তাদের সামনে প্রকটিত হবে। এমনকী

ছোট জাগতিক পথের সবথেকে নীচু স্তরে যাদের গোংগ উন্মোচিত হয়েছে এবং আলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে, তারাও কিছু কিছু মাত্রা এবং আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের দেখতে পারবে, তারা তাদের সাথে যোগাযোগও করতে পারবে। সেই সময়ে তুমি অবশ্যই আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগবে না, কারণ ছোট জাগতিক পথে আলোকপ্রাপ্তির মাধ্যমে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে না, এটা নিশ্চিত। তখন কী করা যায়? তাকে শুধু এই স্তরটাকেই ধরে থাকতে হবে, আরও উঁচু স্তরের সাধনা পরবর্তীকালের ব্যাপার। যেহেতু সেই ব্যক্তির সাধনা এই স্তর পর্যন্তই পৌঁছাতে পারবে, সেক্ষেত্রে তার গোংগ উন্মোচন না করার কোনো কারণ নেই? তুমি এইভাবে সাধনা করতে থাকলেও, তোমার সাধনায় কোনো অগ্রগতি ঘটবে না; সেইজন্যে তোমার গোংগ উন্মোচন করে দেওয়া হয়, যেহেতু তুমি তোমার সাধনার শেষ সীমায় ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছ, অনেক লোকেরই এইরকম হবে। পরিস্থিতি যেরকমই হোক না কেন, তোমাকে অবশ্যই চরিত্রকে ভালোভাবে বজায় রাখতে হবে, একমাত্র দাফা মেনে চললে, তবেই তুমি সত্যি সত্যি ঠিক থাকতে পারবে। তোমার অলৌকিক ক্ষমতা, তোমার গোংগ উন্মোচন এসবই দাফা-র সাধনার মধ্যে দিয়েই প্রাপ্ত হয়েছ। তুমি যদি দাফা-কে গৌণ স্থানে এবং তোমার ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে মুখ্য স্থানে রাখ, অথবা একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে তুমি যদি তোমার নিজের এই উপলব্ধি অথবা সেই উপলব্ধিকে সঠিক বলে মনে কর, এমনকী তুমি যদি নিজেকে অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং দাফা-রও উপরে মনে কর, তাহলে আমি বলব তুমি ইতিমধ্যে নীচে নামতে শুরু করেছ, অর্থাৎ ভয়ংকর ব্যাপার, তুমি আরও অধঃপাতে যাচ্ছ। সেই সময়ে তুমি সত্যিই সমস্যার মধ্যে পড়বে এবং সাধনা অসফল হবে। জিনিসগুলো ঠিকভাবে না করার ফলে তুমি নীচে নেমে যাবে, সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমি তোমাদের আরও বলতে চাই: কয়েকটা ক্লাসে আমি যে ফা শিখিয়েছি সেসব একত্রিত করে আমার এই বই-এর বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব আমারই শেখানো, প্রত্যেকটা বাক্য আমিই বলেছি। টেপ রেকর্ডিং থেকে একটার পর একটা শব্দ সংগ্রহ করে সেগুলির হুবহু প্রতিলিপি করা হয়েছে। আমার শিষ্যরা এবং শিক্ষার্থীরা টেপ রেকর্ডিং থেকে সবকিছুর প্রতিলিপি করতে সাহায্য করেছে। এরপরে আমি বইটাকে বার বার পরিমার্জনা করেছি। এসব আমারই ফা, আমিই শিখিয়েছি এই একটাই ফা।

বক্তৃতা - সাত

জীবহত্যার বিষয়

জীবহত্যা অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয়, অনুশীলনকারীদের ক্ষেত্রে আমাদের কঠোর আবশ্যকতা আছে যে তারা জীবহত্যা করতে পারবে না। বুদ্ধ মত, তাও মত অথবা চিমেন পদ্ধতি, সেটা যে কোনো মত বা পদ্ধতিই হোক না কেন, সব সৎ সাধনার পথেই জীবহত্যা পুরোপুরি নিষিদ্ধ, এটা সুনিশ্চিত। যেহেতু জীবহত্যার পরিণতি ভীষণ ভয়ংকর, আমরা অবশ্যই এই বিষয়ে বিশদে জানাবো। মূল বৌদ্ধধর্মে ''জীবহত্যা'' বলতে প্রধানত মানুষকে হত্যা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হতো, যা ছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক কাজ। পরবর্তীকালে বড়ো প্রাণী, বড়ো গৃহপালিত পশু, এবং কিছুটা বড়ো প্রাণীদের হত্যা করা, এসবই খুব সাংঘাতিক মনে করা হতো। সাধনার জগতে হত্যা করার বিষয়টাকে সবসময়ে এতটা সাংঘাতিক মনে করা হতো কেন? অতীতে বৌদ্ধধর্মে বলা হতো যে, এখন মৃত্যু হওয়া উচিত নয় এইরকম কোনো জীবকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে সে নিঃসঙ্গ অশরীরী এবং ইতস্তত বিচরণকারী প্রেত হয়ে যায়। অতীতে এই ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে, আচার-অনুষ্ঠান (শ্রাদ্ধ)-এর দ্বারা আত্মাকে যন্ত্রণাভোগের থেকে মুক্ত করার কথা বলা হতো। আচার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে মুক্ত করা নাহলে তাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালা ভোগ করতে হয় এবং খুবই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়, এটাই অতীতে বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে।

আমরা বলি যে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কারোর সঙ্গে অন্যায় কাজ করে, তাহলে এই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেশ অনেকটা সদ্‌গুণ অন্য লোকটিকে প্রদান করতে হবে। এই ব্যাপারটা আমরা সাধারণত সেখানেই ইঙ্গিত করি যেখানে কোনো ব্যক্তি অন্যের জিনিস নিয়ে নিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি অকস্মাৎ একটা জীবন শেষ করে দেওয়া হয়, সেটা পশু হতে পারে অথবা অন্য কোনো জীব হতে পারে, তাহলে অনেক বেশী কর্ম সৃষ্টি হবে। অতীতে ''জীবহত্যা'' বলতে প্রধানত মানুষকে হত্যা করার প্রতিই ইঙ্গিত করা হতো, যা অপেক্ষাকৃত বিরাট পরিমাণ কর্ম সৃষ্টি

করে, কিন্তু একটা সাধারণ জীব হত্যাও কোনো মামুলি ব্যাপার নয় এবং এতেও সরাসরি বেশ অনেকটা কর্ম উৎপন্ন হয়ে থাকে। বিশেষত একজন অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে তার সাধনার পর্বে বিভিন্ন স্তরে কিছুটা করে দুর্ভোগের ব্যবস্থা করা থাকে। সেসবই তোমার নিজের কর্ম এবং তোমার নিজেরই সব দুর্ভোগ, যেগুলোকে বিভিন্ন স্তরে বন্দোবস্ত করে রাখা থাকে তোমার নিজের উন্নতি ঘটানোর জন্যে। যত তুমি চরিত্রের উন্নতি করতে পারবে, ততই এগুলোকে অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি অকস্মাৎ এত বেশী কর্ম প্রাপ্ত হও, তাহলে তুমি সেটা কীভাবে অতিক্রম করবে? তোমার চরিত্রের স্তর অনুযায়ী তুমি কোনোভাবেই সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না, তুমি হয়তো একেবারেই সাধনা করতে পারবে না।

আমরা দেখেছি যে, যখন একজন ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন এই বিশ্বের মহাকাশের একটা বিশেষ পরিধির মধ্যে, একই সাথে অনেকগুলো সেই ব্যক্তির জন্ম হয়ে থাকে, তারা সবাই দেখতে একইরকম, তাদের নামও এক, তারা মোটামুটি একই রকম কাজকর্ম করে থাকে। অতএব এদের প্রত্যেককে তার সম্পূর্ণ সত্তার একটা অংশ বলা যেতে পারে। এখানে এইরকম একটা সমস্যা হতে পারে, যদি এদের মধ্যে একজনের (অন্য বড়ো পশুদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে) অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, অথচ অন্য বিভিন্ন মাত্রায় তার বাকি সব জীবনগুলোর পূর্ব নির্ধারিত জীবনের পর্ব তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ না হয়ে থাকে, তাদের তখনও অনেক বছর পড়ে থাকে জীবনযাপন করার জন্যে। তখন ওই মৃত ব্যক্তি একরকম আশ্রয়হীন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যায়, সে তখন এই মহাকাশে এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াতে থাকে। অতীতে বলা হতো যে, এই নিঃসঙ্গ অশরীরী ও ইতস্তত বিচরণকারী প্রেত, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার জ্বালা ভোগ করে, ভীষণ কষ্টে থাকে, হয়তো এরকমই হয়। কিন্তু আমরা সত্যিই দেখেছি যে, তাকে খুবই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয় এবং তাকে অন্তিম সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেতে হয়, যতক্ষণ না প্রতিটি মাত্রায় তার সবগুলো জীবনের পর্বের সমাপ্তি না ঘটে, একমাত্র তখনই সে স্থায়ীভাবে থাকার জায়গা খুঁজে পায়। এই সময়টা যত দীর্ঘ হয়, কষ্টটাও তত বেশী হয়। যত বেশী সে কষ্ট পায় তত বেশী করে যন্ত্রণাভোগের কর্ম সৃষ্টি হয়ে নিরন্তর সেই হত্যাকারীর শরীরে যুক্ত হতে থাকে। তুমি চিন্তা কর: ‘‘তোমার সাথে কত বেশী কর্ম যুক্ত হবে?’’ আমরা অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা এসব লক্ষ্য করেছি।

আমরা আর একরকম পরিস্থিতিও দেখেছি: যখন একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তার সম্পূর্ণ জীবনের একটা রেখাচিত্র ইতিমধ্যে একটা বিশেষ মাত্রায় বিরাজমান থাকে, অর্থাৎ তার এই জীবনে সে কোথায় থাকবে, তার কী করা উচিত সবকিছুই তার মধ্যে থাকে। কে এই ব্যক্তির জীবনটার ব্যবস্থা করল? এটা খুবই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে আরও অত্যন্ত উচ্চস্তরের জীবন এই কাজটা করেন, যেমন ধর আমাদের এই সাধারণ মানবসমাজে কেউ জন্মগ্রহণ করার পরে, সে কোনো নির্দিষ্ট পরিবারে থাকবে, কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, এবং বড়ো হয়ে যাওয়ার পরে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জায়গায় যাবে, তার কাজের মাধ্যমে, সমাজের বিভিন্ন ধরনের লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, অর্থাৎ পুরো সমাজের এইরকম একটা সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। অথচ যদি এই জীবনটার হঠাৎ মৃত্যু ঘটে যায় যা আদি বিশেষ পরিকল্পনায় ছিল না, তাহলে জিনিসগুলো সব পাল্টে যায়। সেক্ষেত্রে ওই অত্যন্ত উচ্চস্তরের জীবন এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে ক্ষমা করবেন না। তোমরা চিন্তা কর, একজন সাধক হিসাবে আমরা উঁচুস্তরে সাধনা করতে চাই, কিন্তু ওই উচ্চস্তরের জীবন যদি এই হত্যাকারীকে ক্ষমা না করেন, তাহলে তোমরাই বলো সে কি আর সাধনা করতে পারবে? এমনকী কিছু মাস্টারের স্তরও, এই সব জিনিসের পরিকল্পনা সৃষ্টিকারী, ওই অত্যন্ত উচ্চস্তরের জীবনের মতো উঁচু নয়, অতএব তার মাস্টারেরও শাস্তি হবে, এমনকী তার স্তরও নীচে নেমে যাবে। তুমি চিন্তা কর, এটা কি কোনো সাধারণ বিষয়? সেইজন্যে একবার যে এই কাজ করেছে, তার পক্ষে সাধনা করা খুবই কঠিন।

ফালুন দাফা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধের সময় লড়াই করেছে। এই লড়াইগুলো হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর মহাজাগতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হওয়া এক ধরনের পরিস্থিতি, আর তুমি শুধু সেই পরিস্থিতির একটা উপাদান মাত্র। মহাজাগতিক পরিবর্তনের সময়ে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া, সাধারণ মানবসমাজে এই ধরনের পরিস্থিতির উদয় হতো না, এবং সেক্ষেত্রে সেটাকে মহাজাগতিক পরিবর্তনও বলা হতো না। ওই পরিবর্তনগুলো ঘটেছিল আরও বড়ো পরিবর্তনের উপরে ভিত্তি করে। সেইজন্যে ওই জিনিসের জন্যে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না। আমরা এখানে বলতে চাই যে, যদি কেউ ব্যক্তিগত লাভের পিছনে ছোটার জন্যে, তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে অথবা নিজে কোনো জিনিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, নিজেই নাছোড়বান্দা হয়ে খারাপ কাজ

করতে চায়, সেক্ষেত্রে অবধারিতভাবে কর্ম সৃষ্টি হবে। অতএব যখন সামগ্রিকভাবে বিশাল মহাশূন্য জুড়ে পরিবর্তন ঘটছে এবং যখন সামাজিক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলো তোমার দোষ নয়।

জীবহত্যা প্রচুর কর্ম সৃষ্টি করে, কেউ কেউ আশ্চর্য বোধ করছ: ‘‘তাহলে আমি আর জীবহত্যা করতে পারব না, কিন্তু আমি তো বাড়ির রান্না করি, আমি যদি কোনো কিছু হত্যা না করি, তাহলে আমার পরিবারের লোকেরা খাবে কী?’’ আমি এই নির্দিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। আমি অনুশীলনকারীদের ফা শিক্ষা দিচ্ছি, সাধারণ মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করবে সে ব্যাপারে আমি ইচ্ছামতো কোনো কিছু বলতে চাই না। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় যখন সামনে আসবে, তখন তুমি দাফা-র সাহায্যে তাকে বিচার করবে এবং যেটা ঠিক মনে হবে, সেটাই করবে। সাধারণ লোকেরা যা করতে চায় তাই করতে পারে, সেটা সাধারণ লোকেদের ব্যাপার, প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে সত্যিকারের সাধনা করা সম্ভব নয়। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে উঁচু আদর্শ ধরে রাখা উচিত। সেইজন্যে আমি অনুশীলনকারীদের জন্যে আবশ্যিক শর্তগুলি এখানে উপস্থাপন করলাম।

শুধুমাত্র মানুষ এবং পশুদেরই জীবন আছে তা নয়, উদ্ভিদেরও জীবন আছে। অন্য মাত্রার মধ্যে সব পদার্থই জীবনের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে আছে। যখন তোমার দিব্যচক্ষু ফা দৃষ্টিশক্তির স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন তুমি আবিষ্কার করবে যে, পাথর, দেওয়াল, সমস্ত কিছুই তোমার সাথে কথা বলছে, তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছে। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আশ্চর্য বোধ করবে: ‘‘তাহলে দানাশস্য এবং শাকসবজি যা আমরা ভোজন করি, এদের সবারই জীবন আছে। আবার আমাদের বাড়িতে মাছি এবং মশাও আছে, আমরা কী করব? গরমকালে এরা যখন কামড়ায়, তখন বেশ অস্বস্তি হয়, এরা যখন এসে কামড়াবে আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব নড়াচড়া করব না, যখন দেখব মাছি খাবারের উপরে বসছে এবং নোংরা করছে, আর মারতে পারব না।’’ আমি তোমাদের বলতে চাই যে, আমরা ইচ্ছামতো এবং কোনো কারণ ছাড়া কারোর জীবন নিয়ে নিতে পারি না। কিন্তু আবার আমাদের অতি সাবধানি ভদ্রলোকও হওয়া উচিত নয়, যে সর্বদা ছোট-খাট ব্যাপারেই লক্ষ্য রাখে, এমনকী হাঁটার সময়েও সে ভয় পায় যদি পিঁপড়েকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলে, সেই কারণে সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে থাকে। আমি বলব

তোমার এইরকম জীবনযাপন করা ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে, এটাও কি আর একটা আসক্তি নয়? তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটলে, হয়তো পিঁপড়ে পায়ে মাড়িয়ে মেরে ফেললে না, কিন্তু অনেক আণুবীক্ষণিক জীবাণুকে তুমি হয়তো পায়ের তলায় মাড়িয়ে মেরে ফেলেছ। আণুবীক্ষণিক স্তরে আরও ক্ষুদ্রতর জীব প্রচুর আছে, যেমন ছত্রাক ও রোগজীবাণু, হয়তো তুমি এদের অনেকগুলোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলেছ, সেক্ষেত্রে আমাদের জীবনযাপন করাই উচিত নয়। আমাদের এইরকম লোক হওয়া উচিত নয়, এইভাবে সাধনা করা যাবে না। আমাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে, খোলা মনে এবং মর্যাদার সাথে সাধনা করা উচিত।

মানুষ হিসাবে আমাদের জীবনযাপনের অধিকার বজায় রাখা উচিত। সেইজন্যে আমাদের জীবনযাপনের পরিবেশও মানব জীবনের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যই মেনে চলবে। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জীবের ক্ষতি করতে পারি না, কিন্তু ওইসব সামান্য জিনিস নিয়ে আমাদের আবার খুব বেশী খুঁতখুঁতে হওয়াও উচিত নয়। যেমন শাকসবজি এবং দানাশস্যের জীবন আছে, কিন্তু এই কারণে আমরা খাওয়া এবং পান করা বন্ধ করতে পারি না, তাহলে আমরা অনুশীলন কীভাবে করব? সবকিছু আরও উদারভাবে দেখতে হবে। যেমন তুমি যখন হাঁটাচলা করছ, কিছু পিঁপড়ে অথবা পোকামাকড় তোমার পায়ের তলায় চলে আসতে পারে এবং পায়ের চাপে মারা যেতে পারে, হয়তো এদের মৃত্যু হওয়ারই ছিল, যেহেতু তুমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে এদের ক্ষতি করতে চাওনি। এই জীবজগতের মধ্যে এবং জীবাণুদের মধ্যে একটা পরিবেশগত ভারসাম্যের বিষয় আছে, কোনো একটা প্রজাতি খুব বেশী হয়ে গেলে সেটা সমস্যার সৃষ্টি করে। আমরা সেইজন্যে খোলা মনে এবং মর্যাদার সাথে সাধনার কথা বলি। বাড়ির মধ্যে মাছি মশা থাকলে আমরা সেগুলোকে তাড়িয়ে দিতে পারি, সরু জালের পর্দা লাগাতে পারি যাতে এরা ঢুকতে না পারে। কিন্তু যদি কোনো সময়ে তাড়াতে না পার, তাহলে মারার দরকার হলে মারতে হবে। যদি মানুষের বসবাসের জায়গায় এরা মানুষকে কামড়ায় এবং ক্ষতি করে, তাহলে এদের অবশ্যই তাড়ানো উচিত। যদি এগুলোকে না তাড়ানো যায়, সেক্ষেত্রে আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি না যে এগুলো লোকেদের কামড়াচ্ছে। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমার ভয় নেই, কারণ তোমার কাছে এগুলোকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তোমার পরিবারের লোকেরা অনুশীলন করে না, তারা সাধারণ মানুষ, এর উপরে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর একটা সমস্যা আছে, সেইজন্যে যখন

এগুলো তোমার বাচ্চার মুখে বসে কামড়াচ্ছে তখন কোনো কিছু না করে শুধু তাকিয়ে দেখা যায় না।

আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দেব। শাক্যমুনির জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলো নিয়ে একটা গল্পকথা প্রচলিত আছে। একদিন বনের মধ্যে শাক্যমুনি স্নান করতে চাইলেন, এবং তাঁর এক শিষ্যকে স্নানের গামলাটাকে পরিষ্কার করতে বললেন। তাঁর শিষ্য গিয়ে দেখল যে স্নানের বড়ো গামলাটা পোকামাকড়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে এবং পরিষ্কার করতে গেলে পোকামাকড়গুলো মরে যাবে। শিষ্য ফিরে এসে শাক্যমুনিকে বলল: ‘‘স্নানের গামলাটা পোকামাকড়ে ভর্তি হয়ে আছে।’’ তার দিকে না তাকিয়েই শাক্যমুনি বললেন: ‘‘তুমি যাও এবং স্নানের গামলাটা পরিষ্কার কর।’’ শিষ্য স্নানের গামলার কাছে গিয়ে বুঝতে পারল না কীভাবে পরিষ্কার করবে, কারণ সেটা করতে গেলে পোকামাকড়গুলো মারা পড়বে। সে গামলাটার চারিদিকে এক পাক ঘুরে আবার শাক্যমুনির কাছে ফিরে এসে বলল ‘‘শ্রদ্ধেয় মাস্টার, স্নানের গামলাটা পোকামাকড়ে ভর্তি হয়ে আছে, আমি যদি পরিষ্কার করি তাহলে ওগুলো মারা পড়বে।’’ শাক্যমুনি একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন: ‘‘আমি তোমাকে স্নানের গামলাটা পরিষ্কার করতে বলেছি,’’ শিষ্য অকস্মাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্নানের গামলাটা পরিষ্কার করল। এখানে একটা বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যেহেতু পোকামাকড় আছে সেইজন্যে আমরা স্নান করা বন্ধ রাখতে পারি না; একইভাবে যেহেতু মশা আছে, সেইজন্যে আমাদের বসবাসের জন্যে অন্য কোনো স্থান খোঁজার প্রয়োজন নেই; একইভাবে যেহেতু দানাশস্য ও শাকসবজির মধ্যে জীবন আছে, সেইজন্যে আমরা গলায় দড়ি বেঁধে খাওয়া এবং পান করা বন্ধ রাখতে পারি না। ব্যাপারটা এইরকম নয়, আমাদের উচিত এই সম্পর্কগুলিকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা, আমরা খোলা মনে এবং মর্যাদার সাথে সাধনা করব, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য জীবের ক্ষতি না করলেই ব্যাপারটা ঠিক থাকবে। একই সাথে মানুষের জীবনযাপন করার জন্যে জায়গা ও অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন, এসব সুরক্ষিতভাবে বজায় রাখাও দরকার। লোকেদের নিজেদের জীবন নিরাপদে রাখা উচিত এবং জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখা উচিত।

অতীতে কিছু নকল চিগোংগ মাস্টার বলতো: ‘‘প্রত্যেক চান্দ্রমাসের প্রথমদিনে এবং পঞ্চদশ দিনে জীবহত্যা করা যায়,’’ এদের কেউ কেউ

দাবি করত: ‘‘দুই পা যুক্ত জন্তুদের হত্যা করা যায়,’’ যেন এই দুই পা যুক্ত জন্তুগুলো কোনো জীবনই নয়। যদি প্রথম এবং পঞ্চদশ দিনে জীবহত্যা করলে সেটাকে জীবহত্যা বলে গণ্য না করা হয়, তাহলে সেটাকে কি মাটি খোঁড়া বলে? কিছু নকল চিগোংগ মাস্টারের কথাবার্তা এবং চালচলনেই তাদের পুরোপুরি চিনতে পারা যায়, যেমন তারা কী বলছে এবং কীসের পিছনে ছুটছে। সাধারণত যে সমস্ত চিগোংগ মাস্টার ওইসব বলে এবং ওইসব করে, অশুভ আত্মা তাদের ভর করে থাকে। শুধু একবার তাকিয়ে দেখবে যে ওইসব শিয়ালের আত্মা ভর করা চিগোংগ মাস্টাররা কীভাবে মুরগির মাংস গপগপ করে খায়, এমনকী মুরগির হাড়গুলোকেও থু করে বাইরে ফেলতে চায় না।

জীবহত্যা শুধু যে প্রচুর কর্ম সৃষ্টি করে তা নয়, এর মধ্যে করুণাপূর্ণ হৃদয়ের প্রশ্নটাও জড়িয়ে আছে। সাধক হিসাবে আমাদের করুণাপূর্ণ হৃদয় থাকা উচিত নয় কি? যখন আমাদের মধ্যে করুণাপূর্ণ হৃদয়ের আবির্ভাব ঘটবে, তখন আমরা সম্ভবত দেখব যে সমস্ত জীবসত্তা কষ্ট পাচ্ছে, প্রত্যেকেই কষ্ট পাচ্ছে, এই ব্যাপার ঘটবে।

মাংস খাওয়ার বিষয়

মাংস খাওয়াও অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয়, কিন্তু মাংস খাওয়াটা জীবহত্যা নয়। যদিও তোমরা অনেকদিন ধরে ফা শিখছ, কিন্তু মাংস খাওয়া যাবে না এই দাবি কখনো করা হয়নি। বেশ কিছু চিগোংগ মাস্টারের ক্লাসে যখনই তুমি প্রবেশ করবে তারা তোমাকে বলবে যে, এরপরে আর মাংস খেতে পারবে না। তুমি হয়তো চিন্তা করবে: ‘‘হঠাৎ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেব, আমার এখনও সেই মানসিক প্রস্তুতি নেই।’’ আজ বাড়িতে হয়তো মুরগির মাংস সিদ্ধ বা মাছ ভাজা হয়েছে, গন্ধটাও পরম উপাদেয়, কিন্তু খাওয়া যাবে না। ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, মাংস না খাওয়ার জন্যে জোর করা হয়, বুদ্ধ মতের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোতে এবং তাও মতের কিছু পদ্ধতিতে একইভাবে বলা হয় যে মাংস খেতে পারবে না। আমরা এখানে তোমাকে এইরকম করতে বলব না, কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষাটা দেব। তাহলে আমরা এ ব্যাপারে কী বলব? যেহেতু আমাদের এই চিগোংগ পদ্ধতিতে ফা একজন অনুশীলনকারীর সাধনা করে দেয়, সেক্ষেত্রে ফা দ্বারা অনুশীলনকারীর সাধনা

হওয়ার এই পদ্ধতিতে, সেই ব্যক্তির গোংগ এবং ফা-এর থেকে কিছু অবস্থার সৃষ্টি হবে। অনুশীলন পর্বের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থার আবির্ভাব হবে। সেইজন্যে কোনো একদিন, অথবা আমার আজকের এই ক্লাস শেষ হওয়ার পরে, কিছু লোক এই অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবে: তারা মাংস খেতে পারবে না, মাংসের গন্ধটা তাদের কাছে বিচ্ছিরি লাগবে, যদি মাংস খায়ও, তাহলে বমি করে ফেলতে চাইবে। এখানে কেউ তোমাকে মাংস না খাওয়ার জন্যে জোর করছে না এবং তুমি নিজে জোর করে মাংস খাচ্ছ না তা নয়, এটা তোমার নিজের মনের থেকে আসছে। এই স্তরে পৌঁছানোর পরে গোংগ-এর কার্যকারিতার প্রতিফলন দেখা যাবে, তুমি মাংস খেতে পারবে না, এমনকী তুমি যদি সত্যিই মাংস গলাধঃকরণ কর, তাহলে সত্যিই বমি করে ফেলবে।

আমাদের প্রবীণ শিক্ষার্থীরা সবাই জানে যে ফালুন দাফা-র সাধনায় এই অবস্থাটা আসবে, সাধনার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন দেখা দেবে। আবার কিছু শিক্ষার্থীর মাংস খাওয়ার জন্যে ইচ্ছাটা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং মাংস খাওয়ার প্রতি আসক্তিটা অত্যন্ত তীব্র, এরা সাধারণত প্রচুর মাংস খায়। যখন অন্যদের মাংস খেতে অপ্রীতিকর বোধ হয়, এদের সেইরকম অপ্রীতিকর বোধ হয় না, এরা তখনো মাংস খেতে পারে। সেক্ষেত্রে এদের এই আসক্তিটা দূর করার জন্যে কী করা যায়? এরা যদি মাংস খায় তাহলে পাকস্থলিতে যন্ত্রণা বোধ করবে, মাংস না খেলে যন্ত্রণাটা হবে না। এই ধরনের অবস্থার উদ্ভব হবে, এর অর্থ এদের মাংস খাওয়া উচিত নয়। তাহলে কি আজকের পর থেকে আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে মাংস খাওয়ার কোনো ব্যাপার থাকবে না? না, সেরকম নয়। তাহলে আমরা কীভাবে এই বিষয়টার মোকাবিলা করব? তুমি যখন মাংস খেতে পারছ না, সেটা সত্যি সত্যি তোমার নিজের অন্তরের মধ্যে থেকে আসছে। এর উদ্দেশ্যটা কী? মন্দিরের সাধনায় জোর করে মাংস খাওয়া ছাড়তে বাধ্য করার এবং আমাদের সাধনা পদ্ধতিতে মাংস খেতে অপারগ হওয়ার যে ব্যাপার প্রতিফলিত হয়ে থাকে, সেসবেরই লক্ষ্য হচ্ছে মাংস খাওয়ার প্রতি মানুষের ইচ্ছা এবং আসক্তি দূর করা।

যদি খাওয়ার থালায় মাংস না থাকে কিছু লোক খাবার খাবেই না, সেটা সাধারণ মানুষের ইচ্ছা। একদিন সকালবেলা আমি ছ্যাংগছুন-এর বিজয় পার্কের পিছনের প্রবেশদ্বার দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনটে লোক পিছনের প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, চিৎকার করে কথা বলছিল, এদের মধ্যে

একজন বলছিল: ‘‘এটা কীরকম চিগোংগ অনুশীলন যে মাংস খাওয়া যাবে না? আমি বরঞ্চ মাংস খাওয়ার জন্যে আমার জীবনের দশটা বছর ছেড়ে দিতেও রাজি!’’ কীরকম তীব্র ইচ্ছা। তোমরা চিন্তা কর, এইরকম ইচ্ছা দূর করা উচিত নয় কি? এটা অবশ্যই দূর করা উচিত। লোকেদের সাধনার পর্বে, বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছা এবং আসক্তি দূর করা হয়। পরিষ্কার করে বলা যায় যে, যদি মাংস খাওয়ার প্রতি ইচ্ছাটা দূর না করা হয়, তাহলে সেটা কি একটা আসক্তি নয় যা দূর করা যাচ্ছে না? সে কি সাধনা সম্পূর্ণ করতে পারবে? অতএব যতক্ষণ এটা একটা আসক্তি, একে দূর করতেই হবে। কিন্তু এটা এরকম নয় যে তুমি আর কোনোদিনই মাংস খেতে পারবে না। মাংস খেতে না দেওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আসক্তিটা দূর করা। যদি মাংস না খেতে পারার এই সময়কালের মধ্যে, তোমার এই আসক্তিটা দূর হয়ে যায়, পরবর্তীকালে আবার হয়তো মাংস খেতে পারবে, তখন এর গন্ধটা আর খারাপ লাগবে না এবং মাংস খেলেও ততটা অসুবিধা হবে না। সেই সময়ে তুমি মাংস খেলেও, সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

তুমি যখন আবার মাংস খেতে পারছ, তখন এই আসক্তিটা ইতিমধ্যে দূর হয়ে গেছে এবং মাংসের প্রতি ইচ্ছাটা ইতিমধ্যে দূর হয়ে গেছে। কিন্তু একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে, আবার ওই মাংস খাওয়ার সময়ে সেটা আর অতটা সুস্বাদু লাগবে না। যখন বাড়িতে রান্না করবে, তুমি সেটা পরিবারের সাথে খেতে পারবে, যদি বাড়িতে রান্না না করে তুমি সেটার অভাব অনুভব করবে না, যখন তুমি খাবে তখন স্বাদটা খুব ভালো আর লাগবে না, এই অবস্থার উদ্ভব হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করা অত্যন্ত জটিল, তোমার পরিবার যদি সব সময়েই মাংস রান্না করে, সেক্ষেত্রে একটা সময় কেটে যাওয়ার পরে, তুমি আবার এটা খেলে সুস্বাদু মনে হবে, এইরকম পুনরাবৃত্তি পরবর্তীকালে ঘটবে এবং পুরো সাধনার পর্বে এই পুনরাবৃত্তি অনেকবার ঘটবে। হঠাৎ তুমি আবার মাংস খেতে পারবে না, যখন খেতে পারবে না তখন খাবে না, সেই সময়ে সত্যিই তুমি খেতে পারবে না, খেলে বমি করে ফেলবে; মাংস না খেতে পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপরে খাবে, প্রকৃতির কার্যধারাকে মেনে চলবে। মাংস খাওয়া বা না খাওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, এই আসক্তিটা দূর করাই হচ্ছে প্রধান ব্যাপার।

আমাদের এই ফালুন দাফা-র সাধনা পথে অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়, যত তোমার চরিত্রের উন্নতি হতে থাকবে, তুমি প্রত্যেকটা স্তরকে বেশ দ্রুত ভেদ করে এগোতে পারবে। কিছু লোকের প্রথম থেকেই মাংসের প্রতি অতটা আসক্তি নেই, খাবারে মাংস আছে না নেই সে ব্যাপারে খেয়াল করে না, এই লোকেদের ক্ষেত্রে দু এক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পরে তাদের আসক্তিটা দূর হয়ে যাবে। কিছু লোকের ক্ষেত্রে এটা, এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অথবা হয়তো অর্ধেক বছর লাগতে পারে। অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া এক বছরের আগেই আবার তারা মাংস খেতে পারবে। এর কারণ মাংস ইতিমধ্যে লোকেদের খাবারের একটা প্রধান অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু মন্দিরে থাকা সাধকরা মাংস খেতে পারবে না।

আমরা মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বৌদ্ধধর্মের ধারণাটা বলব। মূল বৌদ্ধধর্মে একেবারে গোড়ার দিকে মাংস খেতে নিষেধ করা হতো না। যে সময়ে শাক্যমুনি বনের মধ্যে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গিয়ে কষ্টের মধ্যে সাধনা করাতেন, সেই সময়ে এমন কোনো অনুশাসন ছিল না যা মাংস খেতে নিষেধ করে। কেন এইরকম অনুশাসন ছিল না? এর কারণ যখন শাক্যমুনি দুই হাজার পাঁচশ’ বছর আগে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সেই সময়ে মানবসমাজ খুবই অনুন্নত অবস্থায় ছিল। সেই সময়ে কিছু অঞ্চলে কৃষিকার্য করা হতো এবং কিছু অঞ্চলে কৃষিকার্য করা হতো না, সেই সময়ে কৃষিজমি খুব অল্প ছিল, সর্বত্র বনজঙ্গলে ছেয়ে ছিল। দানাশস্যের সরবরাহ খুব কম ছিল, এমনকী নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। লোকেরা তখন সবেমাত্র আদিম সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তারা প্রধানত জীবজন্তু শিকারের দ্বারা জীবননির্বাহ করত, অনেক অঞ্চলেই লোকেরা প্রধানত মাংসই খেত। মানবীয় আসক্তিগুলোকে যতটা সম্ভব দূর করার জন্যে শাক্যমুনি তাঁর শিষ্যদের ধনসম্পত্তি, বস্তুগত জিনিস ইত্যাদির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে খাবারের জন্যে ভিক্ষা করতে বেরোতেন। লোকেরা যা দিত, শিষ্যরা তাই ভোজন করত, একজন সাধক হিসাবে তাঁরা ভিক্ষার খাবারকে বাছাই করতে পারত না, খাবারের মধ্যে হয়তো মাংসও থাকত।

কিছু খাদ্যকে মূল বৌদ্ধধর্মেই নিষিদ্ধ খাদ্য (হুন) [85] ঘোষনা করা হয়েছিল। অতএব নিষিদ্ধ খাদ্যের ব্যাপারটা মূল বৌদ্ধধর্ম থেকেই শুরু

[85] হুন - নিষিদ্ধ খাদ্য, বুদ্ধ মতে যেসব খাদ্য ভোজন করা নিষেধ।

হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মাংস খাওয়াকেও নিষিদ্ধ বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে নিষিদ্ধ খাদ্য বলতে মাংসকে ইঙ্গিত করা হতো না, ইঙ্গিতটা করা হতো পেঁয়াজ, আদা, রসুন এইসব জিনিসকে। ওগুলোকে নিষিদ্ধ খাদ্য কেন বলা হতো? বর্তমানে অনেক ভিক্ষুও এসব পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ এদের অনেকেই সত্যিকারের সাধনা করে না, এবং অনেক কিছুই এরা জানে না। শাক্যমুনি যা শিখিয়েছিলেন সেগুলো হল, ‘‘অনুশাসন’’, ‘‘সমাধি’’ এবং ‘‘প্রজ্ঞা।’’ অনুশাসন হচ্ছে, সাধারণ মানুষের সমস্ত ইচ্ছাগুলিকে ত্যাগ করা, সমাধি হচ্ছে পুরোপুরি গভীর ধ্যানের অবস্থায় সাধনা করা, এবং পদ্মাসনে বসে সাধনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্থির অবস্থায় প্রবেশ করা। যা কিছু একজন ব্যক্তিকে স্থির অবস্থায় প্রবেশ করতে এবং সাধনা করতে বিঘ্ন ঘটায় সেগুলিকে গুরুতর বাধা হিসাবেই গণ্য করা হতো। কেউ যদি পেঁয়াজ, আদা, এবং রসুন খেত তাহলে প্রচন্ড ঝাঁঝালো গন্ধ বের হতো। সেই সময়ে ভিক্ষুরা বনের মধ্যে বা পাহাড়ের গুহার ভিতরে সাত-আট জন ব্যক্তি মিলে এক একটা বৃত্ত তৈরি করে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করত। যদি কেউ এই সব জিনিস খেত তাহলে খুব তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বের হতো যা বসে ধ্যান করার ক্ষেত্রে, স্থির অবস্থায় প্রবেশের ক্ষেত্রে, অন্যদের উপরে প্রভাব ফেলত এবং অন্যদের সাধনায় গুরুতর বাধা সৃষ্টি করত, সেই কারণে এই অনুশাসনটা তৈরি হয়েছিল, এই খাদ্যগুলোকে নিষিদ্ধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল এবং এসব জিনিস খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না। সাধনার ফলে মানব শরীরে উৎপন্ন হওয়া অনেক সত্তার কাছে এগুলোর তীব্র গন্ধ খুবই বিরক্তিকর। পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন মানুষের ইচ্ছাগুলোকে উত্তেজিত করে, এগুলো বেশী খেলে একটা অভ্যাস তৈরি হয়ে যেতে পারে, সেই কারণে এগুলোকে নিষিদ্ধ খাদ্য বলা হতো।

অতীতে অনেক ভিক্ষু সাধনায় খুব উঁচু স্তরে পৌছানোর পরে, এবং গোংগ-এর উন্মোচন অথবা আধা-উন্মোচন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরে, উপলব্ধি করেছিলেন যে সাধনার পর্বে ওই অনুশাসনগুলো কোনো ব্যাপারই নয়। যদি ওই আসক্তিটা দূর করা যায়, তাহলে বস্তুটার নিজের কোনো কার্যকারিতা আর থাকে না, আর সত্যিকারের বাধাটা একজন ব্যক্তির ওই আসক্তির থেকেই আসে। সেইজন্যে অতীতে উচ্চস্তরের ভিক্ষুরা দেখেছিলেন যে মাংস খাওয়ার প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে সে আসক্তিটা ছাড়তে পারছে কি পারছে না। আসক্তিটা না থাকলে, যা কিছু দিয়ে পেটটাকে ভর্তি করলে, সব ঠিক আছে। যেহেতু লোকেরা মঠের মধ্যে

সর্বদা এইভাবেই সাধনা করে এসেছে, অনেক লোক ইতিমধ্যে এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর উপরে মাংস খাওয়ার প্রতি নিষেধটা শুধু অনুশাসন মাত্র নয়, ইতিমধ্যে এখন এটা আশ্রমবিধি হিসাবে মঠগুলোতে চালু হয়ে গেছে, অতএব মাংস একেবারেই খাওয়া যাবে না, লোকেরা ইতিমধ্যে এইভাবেই সাধনা করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। এবারে আমরা ভিক্ষু জিগোংগ[86]-এর ব্যাপারে উল্লেখ করব যিনি সাহিত্য সংক্রান্ত রচনার মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছিলেন, ভিক্ষুদের মাংস খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু তিনি মাংস খেয়েছিলেন, এবং তিনি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বস্তুত তাঁকে যখন লিঙ্গয়িন মন্দির থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তখন খাবারের ব্যাপারটা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং জীবন একটা সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। সেইজন্যে তিনি যে খাবার পেয়েছিলেন তাই দিয়ে পেট ভর্তি করেছিলেন, তিনি শুধু উদরপুর্তি করতে চেয়েছিলেন, কোনো বিশেষ খাবারের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না, তিনি এ ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন। সাধনার ওই অবস্থায় এই তত্ত্বটা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে জিগোংগ কদাচিৎ মাংস খেয়েছিলেন, হয়তো একবার বা দুইবার শুধু খেয়েছিলেন। ভিক্ষু মাংস খেয়েছে এই কথা শুনে সাহিত্যিকরা কৌতূহলী হয়েছিল, বিষয়টা যত বেশী উত্তেজনাপূর্ণ হয়, পাঠকরাও তত বেশী উৎসাহী হয়ে সেটা পড়তে চায়, জীবনের উপরে ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হওয়ার পরে জীবনকে ছাড়িয়ে যায়, সেটারই প্রচার করা হয়। বস্তুত ওই আসক্তিকে যদি সত্যি সত্যি দূর করা যায়, তাহলে যা কিছু খেয়েই পেটটা ভর্তি করা হোক না কেন, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে অথবা চীনের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষত গুয়াংগদংগ এবং গুয়াংগশী প্রদেশে কিছু গৃহী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আছে, যারা বাক্যালাপের সময়ে বুদ্ধের সাধনার কথা বলে না, তারা মনে করে ‘‘বুদ্ধের সাধনা,’’ এই কথাটা খুবই সেকেলে, তারা বলে যে তারা নিরামিষাশী, তারা মাংস খায় না অর্থাৎ তারা এটাই বোঝাতে চায় যে তারা নিরামিষাশী এবং এটাই বুদ্ধের সাধনা। তারা বুদ্ধের সাধনাকে এতই সরল জিনিস মনে করে। তারা শুধু নিরামিষাশী হয়েই বুদ্ধের সাধনা কীভাবে করবে? তোমরা জান যে মাংস খাওয়াটা শুধু এক ধরনের আসক্তি এবং একটা ইচ্ছা----অর্থাৎ শুধু

[86]জিগোংগ -দক্ষিণের সংগ রাজবংশের সময়কালের (1127 A.D. -1279 A.D.) একজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু।

এই একটা আসক্তি মাত্র, তুমি নিরামিষাশী হয়ে কেবল একটাই আসক্তি দূর করলে মাত্র। এছাড়াও আছে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব, অত্যুৎসাহী মনোভাব, নিজেকে জাহির করার মনোভাব, বিভিন্ন ধরনের আসক্তি--- লোকেদের আসক্তি প্রচুর আছে। এই সব আসক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাকে অবশ্যই দূর করতে হবে, একমাত্র তখনই তুমি সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে। অতএব শুধুমাত্র এই মাংস খাওয়ার আসক্তি দূর করে বুদ্ধের সাধনা কীভাবে হবে? এই ধারণা সঠিক নয়।

লোকেদের খাবারের প্রশ্নে, শুধুমাত্র মাংস খাওয়ার ব্যাপারই নয়, একজন লোকের কোনো খাবারের প্রতিই আসক্তি রাখা উচিত নয়। অন্য জিনিসগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিছু কিছু লোক বলে যে তারা একটা বিশেষ খাবার খেতে পছন্দ করে----এটাও একটা ইচ্ছা। সাধনার একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে সাধকের এই আসক্তিও থাকবে না। অবশ্য, আমাদের ফা খুব উঁচু স্তরে শেখানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন স্তরকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে শেখানো হচ্ছে। একজন ব্যক্তির পক্ষে এই ধাপটা একবারে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তুমি বলছ যে তুমি ওই বিশেষ খাবারটা খেতে চাও, কিন্তু যখন তুমি সাধনায় সত্যি সত্যি সেই সময়টাতে পৌঁছে যাবে যখন তোমার সেই আসক্তিটা অবধারিতভাবে চলে যাচ্ছে, তুমি তখন সেই খাবারটা আর খেতে পারবে না, যদি তুমি খাও স্বাদটা ঠিক লাগবে না এবং স্বাদটা হয়তো অন্য কোনোরকম লাগবে। যখন আমি একটা কর্মস্থলে কাজ করতে যেতাম, তখন সেই কর্মস্থলের ক্যান্টিনটা সব সময়ে ঘাটতিতে চলত, পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, সবাই নিজের খাবার নিজেই নিয়ে আসত, সকালবেলায় কাজে আসার আগে তাড়াতাড়ি করে খাবার বানানো খুবই অসুবিধাজনক এবং ঝামেলার ব্যাপার। কখনো কখনো আমি দুটো ভাপানো বান পাউরুটি এবং সয়া চাটনিতে ভেজানো বিনের তৈরি এক টুকরো থফু খাওয়ার জন্যে কিনতাম, সাধারণভাবে এটা খুবই হাল্কা খাবার, অথচ এটা সবসময়ে খাওয়াও ঠিক নয়। এই আসক্তিকে অবশ্যই ত্যাগ করা উচিত। আমি যেই বিনের তৈরি থফুর দিকে তাকাতাম, আমার পেটের ভিতরে অম্বলের মতো বোধ হতো। আবার খেতে চাইলেও খেতে পারতাম না। এটা হতো যাতে আমার মধ্যে আসক্তির উদ্ভব না হয়, অবশ্য যখন কেউ সাধনায় একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাবে, তখনই এটা ঘটতে পারে, যে সবে সাধনা আরম্ভ করেছে তার ক্ষেত্রে এইরকম ঘটবে না।

বুদ্ধ মতে মদ্যপান করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তুমি কি কখনোও কোনো বুদ্ধকে মদের পাত্র ধরা অবস্থায় দেখেছ? কখনোই না। আমি বলেছি: তুমি এখন মাংস খেতে পারছ না, কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনার মাধ্যমে তোমার ওই আসক্তিটা দূর হয়ে যাওয়ার পরে, ভবিষ্যতে মাংস খেতে তোমার কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু মদ্যপান ছেড়ে দেওয়ার পরে আবার মদ্যপান করতে পারবে না। অনুশীলনকারীদের শরীরে গোংগ বিরাজ করছে না কি? বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন আকারের গোংগ, কিছু অলৌকিক ক্ষমতা তোমার শরীরের উপরিতলে প্রকটিত হয়ে আছে, এগুলো সবই বিশুদ্ধ। তুমি যেই মদ্যপান করবে, এরা সবাই তৎক্ষণাৎ ''হুশ'' করে তোমার শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে, তোমার শরীরে আর কোনো কিছুই থাকবে না, এরা সবাই ওই গন্ধকে ভয় পায়। তুমি যদি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়, সেটা খুবই জঘন্য ব্যাপার, কারণ মদ্যপান একজন ব্যক্তিকে অপ্রকৃতিস্থ করে ফেলে। তাহলে কিছু মহান তাও সাধনার পদ্ধতিতে মদ্যপানের প্রয়োজন কেন হয়? কারণ তাদের মুখ্য আত্মার সাধনার ব্যাপার নেই, তারা মদ্যপান করে মুখ্য আত্মাকে অচেতন করার জন্যে।

কোনো কোনো লোক নিজের জীবনকে যেরকম ভালোবাসে, মদ্যপানকেও সেইরকম ভালোবাসে, কিছু লোকের মদের প্রতি লোভটা প্রচন্ড; কিছু লোক এতই মদ্যপান করেছে যে, তারা ইতিমধ্যে মদ্যপানজনিত বিষক্রিয়ায় ভুগতে শুরু করেছে। তারা মদ না থাকলে এমনকী ভাতের থালাটাও পর্যন্ত তুলে ধরবে না, তাদের মদ ছাড়া চলবেই না। অনুশীলনকারী হিসাবে আমাদের এইরকম হওয়া উচিত নয়। মদ্যপান নিশ্চিতভাবে একটা নেশা বিশেষ, এটা একটা ইচ্ছা এবং লোকেদের নেশার স্নায়ুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে, সে যত বেশী মদ্যপান করে ততই সে আরও বেশী করে মদের নেশায় ডুবতে থাকে। অতএব একজন অনুশীলনকারী হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে এই ধরনের আসক্তি দূর করা উচিত নয় কি? এই ধরনের আসক্তি অবশ্যই দূর করা উচিত। কেউ কেউ ভাবছ: ''এটা অসম্ভব, আমাকে গ্রাহকদের আপ্যায়ন করে তাদের মনোরঞ্জনের দিকটা দেখতে হয়'' অথবা ''আমাকে ব্যবসা-সংক্রান্ত সম্পর্কগুলোকে বজায় রাখতে হয় এবং মদ্যপান ছাড়া একটা সমঝোতায় পৌঁছান সহজ নয়।'' আমি বলব এটা কখনোই অবধারিত নয়। সাধারণত একটা ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তার সময়ে, বিশেষত বিদেশিদের সঙ্গে ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তার সময়ে অথবা বাণিজ্যিক চুক্তির সময়ে, তুমি হয়তো

নরম পানীয় চাইতে পার, তাদের কেউ হয়তো খনিজ জল চাইতে পারে, আবার অন্য কেউ হয়তো বিয়ার চাইতে পারে, কেউই তোমার গলার মধ্যে মদ ঢেলে দেবে না, তোমার পানীয় তুমি নিজেই পছন্দ করে নেবে, তুমি যতটা পারবে ততটাই পান করবে। বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে সেইরকম পরিস্থিতি আরও কম ঘটে এবং ব্যাপারটা সচরাচর এইরকমই হয়ে থাকে।

ধূমপান করাও একটা আসক্তি। কেউ কেউ বলে ধূমপান তাদের পুনরুজ্জীবিত করে। আমি বলব যে সে নিজেকে ঠকাচ্ছে এবং অন্যদেরও ঠকাচ্ছে। কেউ কেউ কাজ করতে করতে বা কোনো কিছু লিখতে লিখতে ক্লান্তি বোধ করলে, একটু বিশ্রামের জন্যে একটা সিগারেট টানে। সে ধূমপানের পরে সতেজ ভাব বোধ করে, আসলে এটা ঠিক নয়। এর কারণ হচ্ছে সে ওইভাবে কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছে। তখন মানুষের মন একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে এবং বিভ্রান্তির উদয় হয়। সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সত্যি সত্যিই এইরকম ধারণা তৈরি হতে পারে এবং চিত্তবিভ্রম ঘটতে পারে, যার ফলে তার বোধ হতে পারে যে ধূমপানের দ্বারা সতেজ ভাব আসে। কিন্তু এটা একেবারেই সেরকম করতে পারে না, এর সেরকম কার্যকারিতা নেই। ধূমপান মানুষের শরীরের একটুও উপকার করে না। যদি কোনো ব্যক্তি অনেকদিন ধরে ধূমপান করে থাকে, তাহলে তার শরীরের ময়না তদন্তের সময়ে ডাক্তার দেখতে পায় যে, তার শ্বাসনালির পুরোটা কালো হয়ে গেছে, এমনকী তার ফুসফুসের ভিতরটাও কালো হয়ে গেছে।

আমরা অনুশীলনকারীরা শরীরকে কি শোধন করতে চাই না? আমাদের শরীরকে নিরন্তর শোধন করে যেতে হবে এবং নিরন্তর উঁচুস্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর তুমি এখনও ওইসব জিনিস শরীরের মধ্যে নিয়ে আসছ? তুমি আমাদের থেকে ঠিক বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছ না কি?. এছাড়া এটা একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষাও। কিছু লোক জানেও যে এটা খারাপ, কিন্তু ছাড়তে পারে না। বস্তুত আমি বলব যে, তাদের নিজেদের পরিচালনা করার মতো সঠিক চিন্তাধারা নেই, সেইজন্যে তারা চাইলেও অত সহজে এটাকে ছাড়তে পারে না। একজন সাধক হিসাবে আজ থেকে তুমি এটাকে একটা আসক্তি মনে করে ত্যাগ কর, দেখো যে তুমি ত্যাগ করতে পারছ কি পারছ না। আমি প্রত্যেককে উপদেশ দেব যে, যদি সত্যিই সাধনা করতে চাও, তাহলে তুমি এখন থেকেই ধূমপান ছেড়ে দিতে পারবে, এটা নিশ্চিত যে তুমি এটা ছাড়তে পারবে। এই

সভাকক্ষের এলাকার মধ্যে কেউই সিগারেট টানার কথা চিন্তা করতে পারে না, তুমি যদি ধূমপান ছাড়তে চাও, তুমি নিশ্চিতভাবে সেটা ছাড়তে পারবে, তুমি যখন এরপরে একটা সিগারেট হাতে নিয়ে টানবে, তখন স্বাদটা সঠিক বোধ হবে না। তুমি বই-এর এই বক্তৃতাটা পড়, তাহলেও এই ফল পাবে। অবশ্য তুমি যদি সাধনা না করতে চাও, তাহলে আমরা বাধা দেব না, যেহেতু তুমি একজন সাধক, আমি মনে করি যে তোমার ধূমপান ত্যাগ করাই উচিত। আমি একবার এই উদাহরণটা দিয়েছিলাম, তোমরা কি কোথাও দেখেছ যে একজন বুদ্ধ বা তাও মুখে সিগারেট নিয়ে বসে আছেন? সেটা কীভাবে সম্ভব? একজন সাধক হিসাবে তোমার লক্ষ্য কী? তোমার কি এটা ছাড়া উচিত নয়? সেইজন্যে আমি বলব, তুমি যদি সাধনা করতে চাও, তাহলে তোমাকে ধূমপান ছাড়তেই হবে, এটা তোমার শরীরের ক্ষতি করছে এবং এটা এক ধরনের আকাঙ্ক্ষাও যা আমাদের সাধকদের আবশ্যকতার ঠিক বিপরীত।

ঈর্ষা

ফা শেখানোর সময়ে আমি সাধারণত ঈর্ষা সম্পর্কে আলোচনা করি। এটা কেন করি? কারণ চীনদেশে এই ঈর্ষা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে, এটা এতই প্রবল যে ইতিমধ্যে স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এমনকী তারা নিজেরাও এটা অনুভব করতে পারে না। চীনের লোকেদের ঈর্ষা এত প্রবল কেন.? এরও একটা মূল কারণ আছে। চীনের লোকেরা অতীতে কনফুসিয়াসের মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল, সেইজন্যে তাদের স্বভাব অনেকটাই অন্তর্মুখী, তারা ক্রুদ্ধ হলে সেটা প্রকাশ করে না এবং খুশি হলেও সেটা প্রকাশ করে না, তারা আত্মসংযম এবং সহনশীলতার উপরে বিশ্বাসী। এইভাবে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন আমাদের পুরো জাতির মধ্যে অত্যন্ত অন্তর্মুখী একটা স্বভাব ফুটে উঠেছে। অবশ্য এর ভালো দিকও আছে যেমন, এই ধরনের ব্যক্তিরা নিজেদের প্রকাশ করে না এবং বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও বিনয়ী হয়। কিন্তু এর অসুবিধার দিকও আছে, যা অনেক খারাপ পরিস্থিতি নিয়ে আসতে পারে, বিশেষত এই ধর্মের শেষ পর্বে এর খারাপ দিকগুলো আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠছে এবং লোকেদের ঈর্ষার বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। কারোর সম্বন্ধে ভালো খবর প্রচারিত হলে, অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবে যে এটা ঠিক নয়। কর্ম ক্ষেত্রে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পুরস্কার লাভ করলে বা কোনো

সুবিধা প্রাপ্ত হলে, লোকেরা সেসব উল্লেখ করতে ভয় পায়, কারণ অন্যেরা এই খবরটা শুনলেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পশ্চিমের লোকেরা একেই বলে ‘‘প্রাচ্যের ঈর্ষা’’ অথবা ‘‘এশিয়ার ঈর্ষা।’’ এশিয়ার এই সমগ্র অঞ্চলটাই কনফুসিয়াসের মতবাদের দ্বারা বেশ প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, এখানে সব জায়গাতেই ঈর্ষা কম বেশী করে আছে, কিন্তু শুধু আমাদের এই চীনদেশে এর অভিব্যক্তি এত বেশী তীব্র।

এই ঈর্ষা কিছুটা চরম সাম্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত যা আমরা আগে চর্চা করতাম। ‘‘যত যাই হোক, যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সবাই একসাথেই মারা পড়ব; কোনো কিছু ভালো হলে, প্রত্যেকের সমান ভাগ পাওয়া উচিত; শতকরা হিসাবে যতটা বেতন বৃদ্ধিই হোক না কেন, সকলের যেন সমান বেতন বৃদ্ধি হয়।’’ এই মানসিকতা বেশ ভালো মনে হতে পারে, যেখানে সবার সাথে সমান আচরণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লোকেরা কীভাবে এক হবে? তারা যে কাজ করে সেটা ভিন্ন, তাদের দায়িত্ব পালনের সীমাও ভিন্ন ভিন্ন। এই বিশ্বে একটা নীতি আছে ‘‘ক্ষতি নেই তো লাভ নেই’’ লাভ করতে হলে, অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সাধারণ লোকেরা বলে, ‘‘পরিশ্রম না করলে লাভ পাবে না। বেশী পরিশ্রম করলে বেশী লাভ করবে, কম পরিশ্রম করলে কম লাভ করবে,’’ বেশী প্রচেষ্টা ব্যয় করলে, প্রাপ্তিও বেশী হওয়া উচিত। আগে যে চরম সাম্যবাদ পালন করা হতো, সেখানে বলা হতো যে সবাই সমানভাবে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু জন্মের পরের জীবন তাকে পাল্টে দিচ্ছে। আমি এই বক্তব্যকে খুবই চরম বলব, কোনো কিছু খুবই চরম হওয়ার অর্থ সেটা ভুল। কেন কিছু লোক পুরুষ এবং কিছু লোক নারী হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছে? সবাই একইরকম দেখতে নয় কেন? কিছু লোক অসুস্থতা এবং শারীরিক বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং সবাই একরকম নয়। আমরা যখন উঁচু স্তর থেকে দেখি, একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ জীবনের অস্তিত্ব অন্য মাত্রায় সাজানো থাকে। কীভাবে সবাই সমান হবে? প্রত্যেকে সমান হতে চায়, কিন্তু কিছু জিনিস একজন ব্যক্তির জীবনে যদি অন্তর্ভুক্ত না করা থাকে, তাহলে তারা কীভাবে সমান হবে? লোকেরা সমান হতে পারে না।

পশ্চিমের দেশের লোকেদের স্বভাব অপেক্ষাকৃত বহির্মুখী। তারা খুশি হলে দেখে বোঝা যায়, তারা ক্রুদ্ধ হলেও দেখে বোঝা যায়। এর ভালো দিক যেমন আছে, এর মন্দ দিকও আছে যেমন, সহনশীলতার অভাব।

দুই ধরনের স্বভাবজাত চিন্তাধারা ভিন্ন হয়, তার ফলে কোনো কাজ সম্পন্ন করলে তার পরিণতিও এই দুটো ক্ষেত্রে দুই ধরনের হয়ে থাকে। চীন দেশের কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি প্রশংসা করে অথবা সে কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তাহলে অন্য লোকেরা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যখন কোনো ব্যক্তি বড়ো বোনাস প্রাপ্ত হয়, সে সেটা চুপচাপ নিজের পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে এবং অন্যদের জানতে দেয় না। বর্তমানে আদর্শ কর্মচারী হওয়াও কঠিন: ‘‘তুমি আদর্শ কর্মচারী, তুমি ভালো করে কাজ করতে পার, তোমার সকালবেলায় তাড়াতাড়ি কাজে আসা উচিত এবং রাত্রে দেরিতে বাড়ি ফেরা উচিত, সব কাজ তুমি করলেই ভালো হয়, কারণ তুমি ভালো করে করতে পার, আমরা ভালো করে করতে পারি না।’’ লোকেরা এইরকম বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে থাকে। এমনকী ভালো মানুষ হওয়াও কঠিন।

যদি অন্য কোনো দেশে এইরকম হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা হবে। যেমন, কোনো ব্যক্তির উপরওয়ালা দেখল যে সে ভালো কাজ করেছে, উপরওয়ালা তখন তাকে অতিরিক্ত বোনাস দিতে পারে, সেই ব্যক্তি তখন সকলের সামনে টাকাটা একটা একটা করে গুণবে: ‘‘বাঃ, উপরওয়ালা আজ আমাকে এত টাকা বোনাস দিয়েছে।’’ সে টাকাটা গোনার সময়ে কোনো নেতিবাচক পরিণাম ছাড়াই আনন্দের সঙ্গে অন্যদের এই কথাটা বলবে। যদি এটা চীনদেশে ঘটে এবং কেউ অতিরিক্ত বোনাস পায়, সেক্ষেত্রে তার উপরওয়ালাই তাকে টাকাটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখতে বলবে এবং অন্যদের দেখতে দেবে না। অন্য দেশে কোনো বাচ্চা যদি স্কুলে একশ’ নম্বর পায় তাহলে সে উৎফুল্ল হয়ে দৌড়ে বাড়িতে ফিরবে এবং চিৎকার করে বলতে থাকবে: ‘‘আমি আজ একশ’ নম্বর পেয়েছি! আমি একশ’ নম্বর পেয়েছি!’’ সে স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত পুরো রাস্তাটা দৌড়ে এসেছে, একজন প্রতিবেশী দরজা খুলে বলবে: ‘‘শাবাশ টম, খুব ভালো ছেলে,’’ অন্য প্রতিবেশী জানলা খুলে বলবে: ‘‘ধন্য জ্যাক, ভালো কাজ করেছ, ভালো ছেলে।’’ এটা যদি চীনদেশে ঘটে তাহলে বেশ খারাপ: ‘‘আমি একশ’ নম্বর পেয়েছি, আমি একশ’ নম্বর পেয়েছি!’’ বাচ্চাটা বিদ্যালয় থেকে বাড়িতে দৌড়ে চিৎকার করতে করতে আসছে, এমনকী দরজা খোলার আগেই একজন প্রতিবেশী ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকবে: ‘‘এটা কী এমন বিরাট ব্যাপার, একশ’ নম্বর কি পাওয়া যায় না? এতে লোকেদের দেখানোর কী আছে! আগে যেন কেউ একশ’ নম্বর পায়নি!’’ এই দুটো আলাদা ধরনের মানসিকতা থেকে ভিন্ন

ভিন্ন পরিণতির উদ্ভব হয়। এটা লোকেদের মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ কেউ ভালো করলে অন্যেরা খুশি হওয়ার বদলে নিজেদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এর থেকে এই ধরনের সমস্যার উদয় হতে পারে।

কয়েক বৎসর পূর্বে চরম সাম্যবাদের চর্চা করা হতো যা লোকেদের চিন্তা এবং ধারণায় নিশ্চিতরূপে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল। আমি একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি, একজন ব্যক্তি তার কাজের জায়গায় মনে করে যে, তাদের কারখানায় অন্য কেউ তার মতো অত ভালো নয়, সে যা করে ভালোই করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে অসাধারণ মনে করে, সে নিজের মনে ভাবে: ''আমাকে কারখানার নির্দেশক বা প্রবন্ধক হিসাবে কাজ করতে বললে আমি করতে পারব; এমনকী আমাকে আরও উঁচু আধিকারিকের কাজ করতে বললেও, আমি সামলাতে পারব; আমার মনে হয় আমি এমনকী প্রধানমন্ত্রীও হতে পারি।'' হয়তো তার উপরওয়ালাও মনে করে যে, এই ব্যক্তি সত্যিই যোগ্য এবং যে কোনো কাজ করতে সক্ষম। হয়তো তার সহকর্মীরাও বলে যে সে সত্যিই একজন যোগ্য লোক, সে তার কাজটা জানে এবং সহজাতগুণসম্পন্ন। কিন্তু তার সাথে একই কর্মচারী বর্গের মধ্যে অথবা একই দফতরে একজন লোক আছে, যে কোনো কাজ করতে পারে না, সবকিছুতেই অযোগ্য। অথচ একদিন সেই অযোগ্য ব্যক্তির পদোন্নতি হয়ে গেল, তার পদোন্নতি হল না, এমনকী সেই অযোগ্য ব্যক্তি তার উপরওয়ালা হয়ে গেল। সে তখন তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, সে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে এই ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা করল। সে এই অবিচার দেখে ক্রুদ্ধ হল এবং ঈর্ষায় জ্বলতে থাকল।

আমি তোমাদের এই সত্যটা বলব যা সাধারণ লোকেরা ধারণা করতে পারে না: তুমি হয়তো ভাবছ যে তুমি সবকিছু ভালো পার, কিন্তু তোমার জীবনে এটা নেই; কিন্তু ওই লোকটা, যে কোনো কিছুই ভালো করে করতে পারে না, তার জীবনে এটা আছে, সেইজন্যে ওই লোকটা উপরওয়ালা হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ যাই চিন্তা করুক না কেন সেটা সাধারণ মানুষেরই চিন্তাধারা। যদি উচ্চতর জীবনসত্তাদের দিক দিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র বিকাশের বিশেষ নিয়ম অনুযায়ীই এই বিকাশ ঘটে থাকে। সেইজন্যে একজন ব্যক্তি তার জীবনে যা করছে সেটার বন্দোবস্ত তার যোগ্যতা অনুযায়ী করা হয় না। বৌদ্ধধর্মে কর্মের ফলভোগ-এর ব্যাপারে বলা হয় যে, তোমার জীবনের সবকিছু তোমার কর্ম অনুযায়ী সাজানো হয়ে থাকে,

অতএব তোমার যোগ্যতা অনেক থাকলেও যদি সদ্‌গুণ না থাকে, তাহলে এই জীবনে তুমি কোনো কিছুই পাবে না। তুমি দেখছ একজন ব্যক্তি হয়তো কোনো কিছুই ভালোভাবে করতে পারে না, কিন্তু অনেক সদ্‌গুণ আছে, তাহলে সে একজন উঁচুপদাধিকারী অথবা একজন ধনী ব্যক্তি হয়ে যেতে পারে। সাধারণ লোকেরা বিষয়টা দেখতে পারে না, সবসময়ে ভাবে, একজন ব্যক্তির যে ব্যাপারে যোগ্যতা আছে, তার ঠিক সেটাই করা উচিত। সেইজন্যে সে সারা জীবন, জিনিসগুলোর জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই করে যায়, তার হৃদয় আঘাতে আঘাতে খুবই জর্জরিত হয়ে যায়। সে ভীষণ তিক্ততা এবং ক্লান্তি বোধ করে, সর্বদা ভাবে যে তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে, সে ভালো করে খেতে পারে না, ভালো করে ঘুমাতে পারে না, সে হতাশ এবং আশাহীন হয়ে পড়ে, তার বয়স হয়ে গেলে, পুরো শরীরটা ভেঙ্গে পড়ে এবং বিভিন্ন ধরনের অসুখের আবির্ভাব হয়।

সেইজন্যে আমাদের সাধকদের তো আরও এইরকম করা উচিত নয়, সবকিছু স্বাভাবিকভাবে হতে দেওয়ার উপরেই আমাদের সাধকদের বিশ্বাস থাকা উচিত, যে জিনিসটা তোমার, সেটা হারিয়ে যাবে না আবার যে জিনিসটা তোমার নয়, সেটার জন্যে তুমি লড়াই করলেও সেটা তোমার কাছে থাকবে না। অবশ্য এটা অবশ্যম্ভাবী নয়। কারণ সবই সেইরকম অবশ্যম্ভাবী হলে, খারাপ কাজ করার প্রশ্নটাই থাকত না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে, কিছু অনিশ্চিত বিষয়ও এখানে আছে। কিন্তু আমরা অনুশীলনকারী হিসাবে সাধারণভাবে মাস্টারের ফা-শরীরের দ্বারা সুরক্ষিত, অন্যেরা তোমার জিনিস নিতে চাইলেও নিতে পারবে না। সেইজন্যে আমরা সবকিছু স্বাভাবিকভাবে হতে দেওয়ার উপরে বিশ্বাস করি, কোনো সময়ে একটা জিনিসকে তুমি নিজের মনে করছ, অন্য লোকেরাও বলছে যে জিনিসটা তোমার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তোমার নয়। তুমি হয়তো তখন ভাবছ যে এটা তোমার, কিন্তু শেষে এটা আর তোমার থাকবে না। এর মধ্যে দিয়ে দেখা হয় যে তুমি এটা ত্যাগ করতে পারছ কি পারছ না, তুমি যদি এটা ত্যাগ করতে না পার, তাহলে এটা একটা আসক্তি। এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেই দূর করা হয় তোমার লাভের প্রতি আসক্তি, অর্থাৎ এই সমস্যাটা। যেহেতু সাধারণ মানুষ এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারে না, সেইজন্যে কোনো লাভের ব্যাপার সামনে এলে তারা সবাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংগ্রাম করতে থাকে।

সাধারণ মানুষদের মধ্যে ঈর্ষার প্রতিফলন সত্যিই খুব প্রবল, সাধক সমুদায়ের মধ্যেও সর্বদা এটা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের চিগোংগ পদ্ধতিগুলো একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভাব পোষণ করে না। তোমার পদ্ধতি ভালো, তার পদ্ধতি ভালো, তারা এইরকম বিভিন্ন রকমের মন্তব্য করে। আমার মতে এরা সবাই রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার স্তরেই আছে। এইরকম পরস্পরবিরোধী সব পদ্ধতিগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে ভর করা সত্তা চালিত বিভ্রান্তিকর চিগোংগ পদ্ধতি, এরা এমনকী চরিত্রের প্রতিও গুরুত্ব দেয় না। কোনো একজন ব্যক্তি কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে চিগোংগ অনুশীলন করে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটেনি, অন্য আর একজনের ক্ষেত্রে অনুশীলন শুরু করার পরে পরেই, অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। তখন এই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না: ‘‘আমি কুড়ি বছরেরও বেশী সময় ধরে অনুশীলন করে যাচ্ছি কিন্তু আমার মধ্যে কোনো অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটেনি, অথচ ওর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে, ও কিরকম অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে?’’ এই ব্যক্তি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে: ‘‘ওকে কোনো সত্তা ভর করেছে এবং ওর চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে!’’ যখন একজন চিগোংগ মাস্টার বক্তৃতা দিচ্ছে, কোনো এক ব্যক্তি তখন হয়তো তার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব রেখে সেখানে বসে ভাবছে: ‘‘এ কীরকম চিগোংগ মাস্টার? আমি এর বলা কোনো কথাই শুনতে চাই না।’’ হয়তো এটা সত্যিই যে, ওই চিগোংগ মাস্টার এই ব্যক্তির মতো এত ভালো করে বলতে পারে না, কিন্তু ওই চিগোংগ মাস্টার তার নিজের পদ্ধতির কথাই আলোচনা করছিল। আর এই ব্যক্তি সব জায়গায় গিয়ে শিখেছে, তার কাছে অনেক চিগোংগ পাঠক্রম সম্পূর্ণ করার প্রশংসাপত্র জমা হয়েছে, যে কোনো চিগোংগ মাস্টার বক্তৃতা দিলেই সে সেখানে যোগদান করে, সে প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশী জানে এবং ওই চিগোংগ মাস্টারের থেকে বেশীই জানে। কিন্তু কী কাজে লাগবে? এগুলো সবই শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার ব্যাপার। সে যত বেশী এসব দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করবে, তার বার্তাগুলো তত বেশী বিভ্রান্তিকর এবং জটিল হয়ে যাবে, ততই তার পক্ষে সাধনা করা কঠিন হয়ে যাবে, সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাবে। সত্যিকারের সাধনার শিক্ষা হচ্ছে কোনো একটা পথকে অনুসরণ করা এবং কোনোভাবে বিপথে না যাওয়া। সত্যিকারের সাধকদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে, যদি এরা পরস্পরের মধ্যে অশ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখে এবং নিজেদের মধ্যে

প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসক্তি দূর করতে না পারে, তাহলে এদের মধ্যে সহজেই ঈর্ষা জাগ্রত হতে পারে।

আমরা একটা গল্প বলব: *দেবত্ব প্রদানের অনুষ্ঠান* [87] গল্পতে, শেন গোংগবাও[88] মনে করেন যে জিয়াংগ জিয়া[89] বৃদ্ধ এবং অক্ষম, অথচ স্বর্গের সম্মানীয় আদি ভগবান দেবতাদের উপাধি প্রদান করার জন্যে জিয়াংগ জিয়াকে বললেন। তখন শেন গোংগবাও এটাকে অন্যায় মনে করলেন: ‘‘দেবতাদের উপাধি প্রদান করার জন্যে ওনাকে কেন ডাকা হল? তোমরা দেখ, আমি কত শক্তিশালী, আমার মাথাটা কেটে ফেলার পরেও আমি সেটাকে আবার আমার কাঁধের উপর জুড়ে দিতে পারি। দেবতাদের উপাধি প্রদান করার জন্যে আমাকে কেন ডাকা হল না?’’ শেন গোংগবাও এতই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন যে সর্বদা জিয়াংগ জিয়ার জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করতেন।

শাক্যমুনির সময়ে আদি বৌদ্ধধর্মে অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে আলোচনা করা হতো, কিন্তু বর্তমানে বৌদ্ধধর্মে কেউই এসব নিয়ে আলোচনা করতে সাহস পায় না। তুমি যদি অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে উল্লেখ কর, তারা বলবে যে তোমার চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে। কিসের অলৌকিক ক্ষমতা? তারা এটা একেবারেই স্বীকার করবে না। কেন করবে না? বর্তমানে এমনকী ভিক্ষুরাও জানে না যে, অলৌকিক ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়। শাক্যমুনির দশজন প্রধান শিষ্য ছিল, যাদের মধ্যে মৌদগল্যায়ন[90]-কে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে এক নম্বর বলতেন। শাক্যমুনির মহিলা শিষ্যাও ছিল, যাদের মধ্যে উপ্পলাবন্য [91] -কে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাপারে এক নম্বর বলতেন। যখন বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচলন করা হয়েছিল, তখনও এইরকম ছিল, পুরো ইতিহাস জুড়ে অনেক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটেছিল, যখন বোধিধর্ম চীন দেশে এসেছিলেন তখন একটা নলখাগড়ার ডাঁটির উপরে বসে নদী পার

---

[87]দেবত্ব প্রদানের অনুষ্ঠান - চীনা সাহিত্যের এক কল্পিত কাহিনী।

[88]শেন গোংগবাও - দেবত্ব প্রদানের অনুষ্ঠান গল্পের এক ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্র।

[89]জিয়াংগ জিয়া - দেবত্ব প্রদানের অনুষ্ঠান গল্পের এক চরিত্র।

[90]মৌদগল্যায়ন - বুদ্ধ শাক্যমুনির দশজন প্রধান পুরুষশিষ্যদের মধ্যে একজন।

[91]উপ্পলাবন্য - বুদ্ধ শাক্যমুনির দশজন প্রধান মহিলা শিষ্যদের মধ্যে একজন।

হয়েছিলেন। কিন্তু যত সময় পার হয়েছে, ততই এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে আরও বেশী করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এর প্রধান কারণ মন্দিরের বরিষ্ঠ ভিক্ষু, মোহান্ত অথবা মঠাধ্যক্ষ হওয়ার ক্ষেত্রে এটা আবশ্যক নয় যে তাদের জন্মগত সংস্কার বিরাট হবেই। যদিও তারা মঠাধ্যক্ষ অথবা বরিষ্ঠ ভিক্ষু, কিন্তু ওগুলো সবই সাধারণ মানুষদের পদমর্যাদা মাত্র। তারাও সাধনা করে যাচ্ছে, শুধু তারা সাধনা করে পূর্ণ সময়ের জন্যে এবং তুমি নিজের বাড়িতে সাধনা করছ আংশিক সময়ের জন্যে। তুমি সাধনায় সাফল্যলাভ করতে পারবে কি পারবে না সেটা অবশ্যই নির্ভর করে তোমার মনের সাধনা করার উপরে, সবার ক্ষেত্রে একই ব্যাপার, এ ব্যাপারে একটুও কম থাকলে কাজ হবে না। কিন্তু অল্পবয়সি ভিক্ষু যে আগুন জ্বালিয়ে খাবার রান্না করে, তার জন্মগত সংস্কার হয়তো কম নয়। এই অল্পবয়সি ভিক্ষু যত বেশী দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যায়, ততই তার গোংগ উন্মোচন সহজতর হয়ে যায়, অপর দিকে বরিষ্ঠ ভিক্ষু যত আরামের মধ্যে থাকে ততই তার গোংগ উন্মোচন কঠিন হয়ে যায়, কারণ এখানে কর্মের রূপান্তরের প্রশ্নটা রয়েছে। অল্পবয়সি ভিক্ষু সর্বদা কষ্ট করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, সেইজন্যে তার কর্ম তাড়াতাড়ি শোধ হয়ে যায়, তার আলোকপ্রাপ্তিও তাড়াতাড়ি ঘটে, হয়তো একদিন তার গোংগ অকস্মাৎ উন্মোচিত হয়ে যায়। এই গোংগ-এর উন্মোচন, আলোকপ্রাপ্তি অথবা আধা-আলোকপ্রাপ্তি-র মধ্যে তার অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব ঘটে, মন্দিরের সব ভিক্ষুরা তার কাছে আসে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতে থাকে। কিন্তু মঠাধ্যক্ষ এটা সহ্য করতে পারে না: ''আমি এখন কীভাবে মঠাধ্যক্ষ থাকব? কিসের আলোকপ্রাপ্তি? ওর চিগোংগ মনোবিকার হয়েছে, ওকে এখান থেকে বের করে দাও।'' মন্দির থেকে অল্পবয়সি ভিক্ষুকে বের করে দেওয়া হয়। যত সময় পার হতে থাকে, আমাদের এই হান অধ্যুষিত অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কেউ-ই আর অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করতে সাহস করে না। তোমরা দেখেছ জিগোংগ কত ক্ষমতাশালী ছিলেন, তিনি এমি পর্বত[92] থেকে গাছের গুঁড়িগুলোকে নিয়ে আসতেন এবং একটা পর একটা গাছের গুঁড়িকে, একটা কুয়োর থেকে বের করে বাইরে ফেলতেন, কিন্তু শেষে তাঁকেও লিংগয়িন মঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

---

[92]এমি পর্বত - লিংগয়িন মঠ, যেখানে কুয়োটা ছিল, সেখান থেকে এমি পর্বতের দূরত্ব প্রায় এক হাজার মাইল।

ঈর্ষার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একজন ব্যক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে কি পারবে না তার সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক থাকে। ঈর্ষাকে অবশ্যই দূর করতে হবে, তা নাহলে তুমি চরিত্রের যেসব দিক নিয়ে সাধনা করেছ সেসবই ভঙ্গুর হয়ে যাবে। এখানে একটা নিয়ম আছে: একজন ব্যক্তির সাধনার পর্বে যদি ঈর্ষা দূর না করা হয়, তাহলে সে সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে না, নিশ্চিতভাবেই সে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে না। সম্ভবত তোমরা আগে শুনে থাকবে যে, বুদ্ধ অমিতাভ কর্ম নিয়েও স্বর্গলোকে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ঈর্ষা ত্যাগ না করলে সেটা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুমি অল্প পিছিয়ে থাকলেও, তুমি অল্প কর্ম নিয়ে স্বর্গে যেতে পার, এবং সেখানে সাধনা চালিয়ে যেতে পার, সেটা সম্ভব, কিন্তু ঈর্ষা ত্যাগ না করলে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। আজ আমি অনুশীলনকারীদের বলছি: তোমরা এই বিষয়ে নিজেদের এইভাবে অন্ধকারে রেখ না, তুমি যে লক্ষ্য অর্জন করতে চাও, সেটা হচ্ছে উঁচু স্তরে সাধনা করা, অতএব ঈর্ষার আসক্তিকে অবশ্যই দূর করতে হবে। সেইজন্যে আমি শুধু এই বিষয়ে আলাদা করে বললাম।

রোগ নিরাময়ের বিষয়

রোগ নিরাময়ের বিষয়ে আলোচনার সময়ে আমি তোমাদের রোগ নিরাময় করা শেখাব না। সত্যিকারের ফালুন দাফা-র শিষ্যরা কেউই রোগ নিরাময় করবে না, একবার তুমি রোগের চিকিৎসা করলেই, তোমার শরীরে ফালুন দাফা-র যে সমস্ত জিনিস আছে, সেসবই আমার ফা-শরীর ফিরিয়ে নেবে। কেন এই প্রশ্নটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে? কারণ এটা একরকম ব্যাপার যা দাফা-র ক্ষতি করে। তুমি তোমার শরীরের অনেক ক্ষতি করে ফেলবে, কেউ কেউ রোগ নিরাময় করতে পারলেই আবার সেটা করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, সে যাকে পারে তাকে ধরেই চিকিৎসা করে এবং নিজেকে জাহির করতে চায়। এটা কি একটা আসক্তি নয়? এটা লোকেদের সাধনাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে।

সাধারণ লোকেদের চিগোংগ শিখে রোগ নিরাময় করার যে ইচ্ছা আছে, অনেক নকল চিগোংগ মাস্টার সেটাকে সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে, এই সব জিনিস শেখায়। তারা দাবি করে যে চি নির্গত করে রোগের নিরাময় সম্ভব, এটা একটা হাসির কথা হল না কি? তোমার চি আছে

আবার অন্য ব্যক্তিরও চি আছে, তোমার নির্গত করা চি কীভাবে ওই ব্যক্তির রোগের চিকিৎসা করবে? হয়তো সেই ব্যক্তির চি তোমার রোগ সারিয়ে তুলবে! একটা চি অপর একটা চি-কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। উঁচুস্তরের সাধনায় একজন ব্যক্তির শরীরে গোংগ বিকশিত হয়, সে উচ্চশক্তিযুক্ত পদার্থ নির্গত করে, যা প্রকৃতপক্ষে রোগ নিরাময় করতে পারে এবং দমিয়ে রাখতে পারে, রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো কার্যকারিতা এর আছে, কিন্তু রোগটাকে মূল থেকে উচ্ছেদ করতে পারে না। সত্যিকারের রোগ নিরাময় করতে হলে, অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, একমাত্র তাহলেই রোগটাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব। প্রত্যেকটা রোগের নিরাময়ের জন্যে নির্দিষ্ট একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে, রোগ নিরাময় করার অলৌকিক ক্ষমতাগুলো সম্বন্ধে আমি এটাই বলব: প্রায় একহাজারেরও বেশী এই ধরনের ক্ষমতা আছে----যত রকমের রোগ আছে, তত রকমেরই রোগ নিরাময় করার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। এই অলৌকিক ক্ষমতা না থাকলে যত রকমের কায়দা কৌশলই প্রয়োগ করা হোক না কেন, কোনো কাজ হবে না।

কিছু লোক এই কয়েক বৎসরে সাধনার জগতে খুবই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। যেসব সত্যিকারের চিগোংগ মাস্টার লোকেদের রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে জনগণের মধ্যে এসেছিলেন এবং শুরুর দিকের রাস্তাটা প্রশস্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ‘ক’জন, লোকেদের রোগের চিকিৎসা করা শিখিয়েছিলেন? তাঁরা সবসময়েই তোমার রোগটাকে দূর করে দিতেন অথবা তোমাকে শিখিয়ে দিতেন যে সাধনা কীভাবে করতে হয় এবং শরীরের চর্চা কীভাবে করতে হয়, তারা শারীরিক ক্রিয়ার একটা প্রণালী শিখিয়ে দিতেন, তখন তুমি নিজে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের রোগ নিরাময় করতে পারতে। পরবর্তীকালে নকল চিগোংগ মাস্টাররা জনগণের মধ্যে এল এবং ভীষণ বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল, যারা চিগোংগ-এর সাহায্যে লোকেদের রোগের চিকিৎসা করতে চাইত, তারা কোনো সত্তাকে আকর্ষণ করত, যেগুলো তাদের শরীরে ভর করত, এটা একরকম নিশ্চিত। সেই সময়ে, ওই পরিস্থিতিতে কিছু চিগোংগ মাস্টার লোকেদের রোগ নিরাময় করেছিলেন, যা তখনকার মহাজাগতিক ঘটনাক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘটেছিল। কিন্তু সেটা কোনো সাধারণ লোকেদের দক্ষতা নয় এবং চিরকাল রয়ে যেতে পারে না। সেটা সেই সময়কার মহাজাগতিক ঘটনাক্রমের পরিবর্তন অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছিল, অর্থাৎ সেই সময়ের অবদান। পরবর্তীকালে কিছু ব্যক্তি নিজেদের বিশেষজ্ঞ বানিয়ে লোকেদের রোগের

চিকিৎসা করার শিক্ষা দিতে থাকল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল। একজন সাধারণ মানুষ এটা তিন দিন বা পাঁচ দিন শিখে লোকেদের রোগ নিরাময় করতে পারবে কি? কিছু লোক এইরকম দাবি করে: ‘‘আমি এই রোগ সারাতে পারি, সেই রোগ সারাতে পারি।’’ আমি তোমাদের এটা বলতে চাই: ওইসব লোকেদের কোনো সত্তা ভর করে আছে। তারা কি জানে তাদের শরীরের পিছনে কী লেগে আছে? সত্তা তাদের শরীরে ভর করে আছে, কিন্তু তারা এটা অনুভব করতে পারে না এবং জানেও না। তারা খুব ভালো বোধ করে, ভাবে যে তাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে।

একজন সত্যিকারের চিগোংগ মাস্টারকে অনেক বৎসর ধরে কঠিন সাধনার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়, একমাত্র তাহলেই তার লক্ষ্যটা পূরণ হয়। যখন তুমি কোনো ব্যক্তির রোগের চিকিৎসা করছ, তখন তুমি ভেবে দেখো যে তোমার কাছে ওই রকম শক্তিশালী অলৌকিক ক্ষমতা আছে কি যা দিয়ে তুমি সেই ব্যক্তির এই কর্মকে দূর করতে পার? তুমি কখনো সত্যিকারের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছ কি? তুমি তিনদিন বা পাঁচদিন শিখেই কারোর রোগ নিরাময় করতে পারবে কি? তোমার সাধারণ মানুষের হাত দিয়ে রোগ নিরাময় করতে পারবে কি? যাই হোক, ওই নকল চিগোংগ মাস্টাররা তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে, তারা লোকেদের আসক্তির সুযোগ নিচ্ছে। তোমরা রোগের চিকিৎসা করতে চাও কি? বেশ, তারা রোগের চিকিৎসা শেখানোর জন্যে ক্লাসের আয়োজন করবে, যেখানে তোমাদের চিকিৎসার কৌশলগুলি বিশেষভাবে শেখানো হবে, যেমন চি সুঁচ, আলোর পদ্ধতি, চি নির্গত করা, চি পূরণ করা, তথাকথিত আকুপ্রেসার পদ্ধতি এবং তথাকথিত হাতের মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরা পদ্ধতি----- এইরকম বিভিন্ন ধরনের সব পদ্ধতি আছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার থেকে টাকাটা নেওয়া।

আমরা হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে বলব। আমরা এইরকম পরিস্থিতি দেখেছি: লোকেরা অসুস্থ হয় কেন? লোকেদের রোগ সৃষ্টি হওয়ার এবং সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ হচ্ছে কর্ম, অর্থাৎ ওই কালো পদার্থ হচ্ছে কর্মের ক্ষেত্র। এর প্রকৃতিটা য়িন এবং এটা একটা খারাপ পদার্থ। ওই অশুভ সত্তাগুলোর প্রকৃতিও য়িন, এগুলো সবই কালো, সেই কারণে এগুলো সেই শরীরে আসতে পারে যেখানে পরিবেশটা অনুকূল। এটাই লোকেদের রোগ হওয়ার মূল কারণ এবং এটাই রোগের সর্বপ্রধান উৎস। অবশ্য আরও দুই প্রকারের হতে পারে: একরকম হচ্ছে

অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং খুব উচ্চঘনত্বযুক্ত এক ক্ষুদ্র সত্তা, ঠিক যেন কর্মের সমষ্টি; আর একরকম হচ্ছে ঠিক যেন নলের মধ্যে দিয়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এটা খুবই কম দেখা যায়, এর সবটাই বংশপরম্পরায় সঞ্চিত হয়ে আসে, এরকম পরিস্থিতিও হয়ে থাকে।

সবচেয়ে বেশী যেসব রোগ সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, যখন কোনো ব্যক্তির শরীরে কোনো অংশ স্ফীত হয়, কোনো জায়গায় প্রদাহ দেখা দেয়, কোনো জায়গায় হাড় বৃদ্ধি ঘটে, অথবা যা কিছু হোক না কেন, অন্য মাত্রাতে ওই জায়গায় একটা সত্তা লুকিয়ে থাকে, একটা খুব গভীর মাত্রাতে ওই সত্তাটা থাকে, একজন সাধারণ চিগোংগ মাস্টার একে দেখতে পায় না, একটা সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে একে দেখা যাবে না, তারা শুধু ওই ব্যক্তির শরীরে কালো চি দেখতে পায়। এই কথাটা ঠিক যে, যেখানে কালো চি আছে, সেখানেই রোগটা আছে। কিন্তু রোগ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কালো চি নয়, আরও গভীর মাত্রায় ওই সত্তাটা একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কিছু লোক এই কালো চি-কে নিষ্কাশন করার এবং দূর করার কথা বলে, তুমি কালো চি নিষ্কাশন করে দেখো! এক মুহূর্ত কাটতে না কাটতেই এটা আবার তৈরি হয়ে যায়, সত্তাগুলো খুবই বলশালী হয়, কালো চি দূর করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবার সেটাকে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, তারা নিজেরাই এটা ফিরিয়ে আনতে পারে, যেভাবেই চিকিৎসা করা হোক না কেন রোগটাকে নিরাময় করাই যায় না।

অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে দেখলে, যে জায়গায় কালো চি আছে, সেখানে মনে করা হয় যে রোগগ্রস্ত চি আছে। চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রের ডাক্তার দেখতে পায় যে ওই জায়গার শক্তিনাড়ী অবরুদ্ধ হয়ে আছে, চি এবং রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না, শক্তিনাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমী চিকিৎসা শাস্ত্রের ডাক্তার ওই জায়গায় ক্ষত, স্ফীতি, হাড়বৃদ্ধি অথবা প্রদাহ ইত্যাদি লক্ষণ দেখতে পারে। এই মাত্রাতে এটা এইসব রূপ নিয়েই প্রকটিত হয়। তুমি, ওই সত্তাকে দূর করে দেওয়ার পরে দেখবে যে এখানকার শরীরের ওই জায়গায় আর কোনো কিছু নেই। তুমি দেখবে যে কটিদেশের দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী কোমলাস্থির স্থানচ্যুতি হওয়া অথবা হাড়বৃদ্ধির সমস্যা, ওই সত্তাকে দূর করার পরে এবং ওই ক্ষেত্রকে পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হয়ে গেছে। তুমি আবার একটা এক্স-রে করাতে পার, হাড়বৃদ্ধি আর দেখা যাবে না। মূল কারণ ছিল ওই সত্তা, যেটা কাজ করছিল।

কেউ কেউ দাবি করে যে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরা পদ্ধতি শিখিয়ে দিলে, তুমি তিনদিনে বা পাঁচদিনের মধ্যে রোগ সারাতে পারবে। আমাকে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরাটা দেখাও তো! মানুষ সবার চেয়ে দুর্বল, অথচ ওই সত্তাটা খুবই ভয়ংকর। এ তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, এমনকী ইচ্ছা করলে তোমার জীবনকেও খুব সহজেই শেষ করে দিতে পারে। আর তুমি দাবি করছ তুমি এটাকে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে পারবে। তুমি একে কীভাবে ধরবে? তোমার সাধারণ মানুষের হাত দিয়ে একে ছুঁতেও পর্যন্ত পারবে না, তুমি এখানে সেখানে হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করতে পার, কিন্তু এটা তোমাকে পাত্তা দেবে না, এমনকী তোমার পিছনে তোমাকে লক্ষ্য করে হাসতে থাকবে। লক্ষ্যহীন ভাবে তোমার এই ধরার চেষ্টাটাই তার কাছে বেশ মজার মনে হয়। তুমি যদি সত্যিই একে স্পর্শ করতে পার, তাহলে তৎক্ষণাৎ এটা তোমার হাতের ক্ষতি করে দেবে, এবং সেটা একটা সত্যিকারের আঘাত! আমি কিছু মানুষকে পূর্বে দেখেছি, যাদের হাত দুটোতে কোনো চোট-আঘাত ছিল না। যে পরীক্ষাই করা হচ্ছিল না কেন, তাদের শরীরে এবং হাতে কোনো অসুস্থতা দেখা যায়নি, কিন্তু তারা তাদের হাত দুটো উপরে ওঠাতে পারছিল না, হাত দুটো নিস্তেজ অবস্থায় ঝুলছিল। এইরকম অসুস্থ লোকেদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাদের শরীর অন্য মাত্রাতে আহত হয়েছিল, সেটা কিন্তু সত্যিকারের পক্ষাঘাত ছিল। অতএব তোমার সেই শরীর যদি আহত হয়, তাহলে তুমিও কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে না? কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে: ''মাস্টার আমি কি চিগোংগ অনুশীলন করতে পারব? আমার বন্ধ্যাকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে'' অথবা ''আমার শরীর থেকে অমুক জিনিসটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।'' আমি উত্তর দিয়েছিলাম: এসবের কোনো প্রভাব পড়ে না, যেহেতু অন্য মাত্রাতে তোমার শরীরে কোনো অস্ত্রোপচার করা হয়নি, আর তোমার চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে সেই শরীরটাই ক্রিয়াশীল থাকে। সেইজন্যে আমি এইমাত্র বলছিলাম: তুমি যখন একে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করবে, তুমি একে ছুঁতেও পারবে না এবং এ তোমাকে পাত্তাই দেবে না; যদি তুমি একে স্পর্শ করতে পার, তাহলে এ হয়তো তোমার হাতের ক্ষতি করে দেবে।

দেশজুড়ে বিরাট আকারে আয়োজিত চিগোংগ কর্মকান্ডকে সমর্থন করার জন্যে আমি আমার কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে বেজিংয়ে প্রাচ্যদেশীয় স্বাস্থ্যপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ওখানে দুটো প্রদর্শনীতে আমরাই

সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অংশগ্রহণকারী ছিলাম। প্রথম প্রদর্শনীতে আমাদের ফালুন দাফা-কে, চিগোংগ পদ্ধতিগুলির মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে আমাদের স্টলে এত ভিড় হয়েছিল যে আমরা ঠিক সামলাতেই পারছিলাম না। অন্য স্টলগুলোতে বেশী লোক যাচ্ছিল না। কিন্তু আমাদের স্টলের চারিদিকে ঠাসা ভিড় হয়েছিল। অপেক্ষা করার তিনটে লাইন ছিল, প্রথম লাইনটা ছিল সকালবেলায় চিকিৎসার জন্যে নাম নথিভুক্ত করার জন্যে এবং তালিকাটা খুব সকালেই ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় লাইনে লোকেরা অপেক্ষা করছিল বিকালবেলায় চিকিৎসার ব্যাপারে নাম নথিভুক্ত করার জন্যে, অন্য আর একটা লাইনে লোকেরা অপেক্ষা করছিল আমার হস্তাক্ষর নেবার জন্যে। আমরা রোগের চিকিৎসা করি না, তাহলে আমরা ওইরকম করেছিলাম কেন? কারণ হচ্ছে, এটা আমরা করেছিলাম দেশজুড়ে বিরাট আকারে আয়োজিত চিগোংগ কর্মকান্ডকে সমর্থন করার জন্যে, এবং ওই কার্যকলাপকে সহযোগিতা করার জন্যে। সেইজন্যে আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আমি আমার গোংগ শিষ্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলাম, যারা আমার সাথে ছিল তারা প্রত্যেকে একটা করে অংশ পেয়েছিল যা ছিল একশ'টারও বেশী অলৌকিক ক্ষমতা একত্রিত করে প্রস্তুত করা একটা শক্তিপুঞ্জ। আমি তাদের হাত গোংগ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কারোর কারোর হাতের চামড়া কামড়ে দেওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ফলে ফোসকা পড়েছিল অথবা রক্ত বের হয়েছিল, এইরকম অনেকবার ঘটেছিল। এই জিনিসগুলি এতই ভয়ংকর, তুমি চিন্তা করো, একটা সাধারণ মানুষের হাত দিয়ে একে স্পর্শ করার সাহস তোমার হবে কি? এছাড়া তুমি এর কাছে পৌঁছাতেই পারবে না, ওই রকম অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া তুমি কিছুই করতে পারবে না। এর কারণ, তুমি কী করতে চাও, এটা অন্য মাত্রাতে জানতে পারে, তুমি যখনই এটাকে নিয়ে চিন্তা করবে, সঙ্গে সঙ্গে এটা জেনে যাবে। তুমি যখন একে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরতে চাইবে, এটা আগেই দৌড়ে পালিয়ে যাবে। রোগী যেই দরজা পেরিয়ে বাইরে যাবে, তৎক্ষণাৎ এটা রোগীর কাছে আবার ফিরে আসবে এবং রোগটাও আবার ফিরে আসবে। এর মোকাবিলা করার জন্যে একধরনের অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজন, যার সাহায্যে তুমি হাতটাকে প্রসারিত করে, ‘‘ বম্‌! ’’ ওখানেই এটাকে স্থির করে ফেলবে। স্থির করার পরে, আমরা আরও একটা অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করি, যাকে বলা

হতো "আত্মা ধরার বিস্ময়কর পদ্ধতি," এই অলৌকিক ক্ষমতাটা আরও শক্তিশালী, যা একজন ব্যক্তির পুরো মুখ্য আত্মাকে ধরে টেনে আনে এবং সেই মুহূর্তেই ওই ব্যক্তি আর নড়াচড়া করতে পারে না। এই অলৌকিক ক্ষমতার বিশেষ লক্ষ্য থাকে। আমরা একটা সত্তাকে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরার সময়ে ওটার প্রতি নিশানা করে এর প্রয়োগ করি। তোমরা সবাই জান যে সুন য়ু খুংগ[93] (বানর রাজা)-কে দেখতে এত বিশাল, কিন্তু তথাগত বুদ্ধ হাতের ভিক্ষাপাত্র দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে একটা বিন্দুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই অলৌকিক ক্ষমতার এইরকমই কার্যকারিতা। সত্তাটা যত বড়ো অথবা যত ছোটই হোক না কেন, মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে খুব ছোট্ট জিনিসে রূপান্তরিত করা যায়।

অন্য দিকে, তুমি একজন অসুস্থ লোকের ভৌতিক শরীরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, এটাকে ধরে বের করে আনতে পার, কিন্তু সেটা করতে দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটা সাধারণ মানবসমাজে লোকেদের মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে, এরকম একেবারেই করতে দেওয়া যাবে না, এমনকী তুমি করতে পারলেও এরকমভাবে করতে পার না। তুমি যে হাতটাকে প্রসারিত করে শরীরের ভিতরে ঢোকাবে, সেটা অন্য মাত্রাতে করবে। ধরা যাক, কারোর হৃৎপিন্ডের রোগ আছে, যখন তুমি তোমার হাতটাকে হৃৎপিন্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ সত্তাটাকে ধরার জন্যে, তখন তোমার অন্য মাত্রার হাতটা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ধরে ফেলবে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একে ধরার পরে, তোমার বাইরের হাতটা একে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরবে, তোমার দুটো হাত মিলে এক হয়ে যাবে, তখন সত্তাটা তোমার হাতের মধ্যে থাকবে। এটা অত্যন্ত ভয়ংকর, কখনো কখনো এটা তোমার হাতের মধ্যে ছটফট করবে, তোমার হাতের মধ্যে ফুটো করার চেষ্টা করবে, আবার কোনো কোনো সময়ে কামড়ে দেবে এবং কোনো কোনো সময়ে চিৎকার করবে। তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা অবস্থায় এটাকে ছোট্ট মনে হবে, তুমি যদি ছেড়ে দাও তখন এটা খুব বিশাল হয়ে যাবে। এটা এরকম নয় যে কেউ একে কিছু করতে পারবে, ওই অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া তুমি একে কোনো কিছুই করতে পারবে না, আমরা এটাকে যেরকম সরল মনে করি, এটা কিন্তু একেবারেই সেরকম নয়।

---

[93]সুন য়ু খুংগ - বানর রাজা হিসাবেও পরিচিত, চীনা সাহিত্যে কল্পিত কাহিনী *পশ্চিমে ভ্রমণ* এর একটা চরিত্র।

অবশ্য এই ধরনের চিগোংগ চিকিৎসা পদ্ধতিকে হয়তো ভবিষ্যতে থাকতে দেওয়া যেতে পারে, অতীতেও সবসময়ে এর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এখানে অবশ্যই একটা শর্ত থাকবে, সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই একজন সাধক হতে হবে, সাধনার পর্বে তার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হওয়ার ফলে সে কিছু ভালো মানুষের জন্যে এই কাজ করতে পারে। কিন্তু সে তাদের কর্মকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারবে না, কারণ তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে মহৎ সদ্‌গুণ নেই, সেইজন্যে তাদের দুর্ভোগগুলো রয়েই যাবে, শুধু নির্দিষ্ট রোগটা সেরে যাবে। একজন সাধারণ চিগোংগ মাস্টার সাধনায় তাও প্রাপ্ত হওয়া কোনো ব্যক্তি নয়, সে কেবল রোগটাকে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র, সে হয়তো রোগটাকে রূপান্তরিত করে দিতে পারে, হয়তো অন্য কোনো দুঃখদুর্দশাতে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে হয়তো এই বিলম্বিত করার প্রক্রিয়াটা জানেই না, যদি তার সাধনা পদ্ধতিতে সহ চেতনার সাধনা করা হয়ে থাকে তাহলে সহ চেতনাই এই কাজটা করে থাকে। কিছু সাধনা পদ্ধতিতে অনুশীলনকারীকে দেখে খুব বিখ্যাত মনে হতে পারে, কিন্তু অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিগোংগ মাস্টারেরই গোংগ নেই, কারণ তাদের সব গোংগ তাদের সহ আত্মার শরীরের উপরেই বিকশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যাপারটা এইভাবেও বলা যায় যে, কিছু কিছু লোকের সাধনার পর্বে এইরকম করতে অনুমতি দেওয়া হয়, কারণ তারা এই একটা স্তরেই নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে, তারা এক দশকেরও বেশী অথবা কয়েক দশক ধরে অনুশীলন করলেও এই স্তরকে অতিক্রম করতে পারে না, সেইজন্যে তারা সারা জীবন ধরে সর্বদা রোগীদের চিকিৎসাই করে যেতে থাকে। যেহেতু তারা এই স্তরেই থেকে যায়, সেইজন্যে তাদের এইরকম করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ফালুন দাফা-র শিষ্যদের ক্ষেত্রে এটা সুনিশ্চিত যে তারা রোগীর চিকিৎসা করতে পারবে না। তোমরা রোগীর সামনে এই বইটা পড়তে পার, যদি রোগী এটা স্বীকার করে, তাহলে তার রোগটা সেরে যেতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক লোকের কর্মের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্যে ফলও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

হাসপাতালের চিকিৎসা এবং চিগোংগ চিকিৎসা

আমরা হাসপাতালের চিকিৎসা এবং চিগোংগ চিকিৎসার মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেই বিষয়ে আলোচনা করব। পাশ্চাত্য চিকিৎসার কিছু চিকিৎসক চিগোংগ-কে স্বীকার করে না, তুমি বলতে পার যে তাদের মধ্যে

অধিকাংশই এই প্রকারের। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ‘‘যদি চিগোংগ রোগ নিরাময় করতে পারে তাহলে হাসপাতালের আর কী প্রয়োজন? তোমরা আমাদের হাসপাতালগুলোকে প্রতিস্থাপন করে দাও! তোমাদের চিগোংগ শুধু হাতের দ্বারা লোকেদের রোগ নিরাময় করতে পারে, ইঞ্জেকশন দেওয়ার, ওষুধ খাওয়ার, এবং হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন হয় না, সেইজন্যে আমাদের হাসপাতালগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে দিলে খুব ভালো হয় না কি?’’ ওই ধারণাগুলো খুবই অবিবেচনাপ্রসূত এবং অত্যন্ত অযৌক্তিক। কিছু লোক চিগোংগ সম্বন্ধে জানেই না, প্রকৃতপক্ষে চিগোংগ দিয়ে রোগ নিরাময় করা, সাধারণ লোকেদের রোগ নিরাময় করার পদ্ধতিগুলোর মতো নয়, কারণ এটা সাধারণ লোকেদের দক্ষতার ব্যাপার নয়, এটা একরকম অতিপ্রাকৃত জিনিস। সেইজন্যে একটা অতিপ্রাকৃত জিনিস দিয়ে সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া যাবে কি? একজন বুদ্ধের অসীম ক্ষমতা, একজন বুদ্ধ একবার হাতটাকে আন্দোলিত করেই সমগ্র মানবজাতির সব রোগ দূর করে দিতে পারেন। তিনি এইরকম করছেন না কেন? বিশেষত যেখানে এত বুদ্ধ আছেন, তাঁরা কেন করুণা প্রদর্শন করে তোমার রোগ নিরাময় করছেন না? এর কারণ সাধারণ মানবসমাজ এই ভাবেই চলবে। জন্ম, বার্ধক্য, ব্যাধি এবং মৃত্যু হচ্ছে এর এক একটা অবস্থা, এসবেরই পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক রয়েছে, এসবই কর্মের ফলভোগ, তোমার ঋণ থাকলে সেটাকে অবশ্যই শোধ করতে হবে।

তুমি যদি কোনো ব্যক্তির রোগ নিরাময় কর, তাহলে সেটা হবে ওই নিয়মটা ভঙ্গ করার সমান, যার ফলে কেউ খারাপ কাজ করলেও, সে সেটা শোধ না করেও পার পেয়ে যাবে, এটা কীভাবে সম্ভব? একজন সাধক হিসাবে, যখন তোমার সেই বিরাট ক্ষমতার উদয় হয়নি, যা দিয়ে এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে পার, সেক্ষেত্রে তুমি করুণাবশত একজন অসুস্থ লোকের চিকিৎসা করতে চাইলে সেটার অনুমতি আছে, তুমি এটা করতে পার যেহেতু তোমার করুণার উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু তোমার যদি সত্যিই এই ধরনের সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে ব্যাপকভাবে এই সমস্যার সমাধান করার অনুমতি তোমাকে দেওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে তুমি সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থার গুরুতর ক্ষতি করে ফেলবে, সেইজন্যে এর অনুমতি দেওয়া যাবে না। সেইজন্যে সাধারণ মানুষের হাসপাতালগুলোকে চিগোংগ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা একেবারেই ঠিক হবে না, যেহেতু চিগোংগ হচ্ছে একটা অতিপ্রাকৃত ফা।

যদি চীনদেশের চারিদিকে চিগোংগ হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, ধরা যাক তার অনুমতিও দেওয়া হয়, এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিগোংগ মাস্টাররা এসে চিকিৎসা করতে শুরু করে, তুমি চিন্তা কর ব্যাপারটা কীরকম হবে? এর সম্মতি দেওয়া যাবে না, কারণ লোকেরা সবাই সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থাকে বজায় রাখছে। যদি চিগোংগ হাসপাতাল, চিগোংগ চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্র, স্বাস্থ্যনিবাস এইসব স্থাপন করা হয়, তাহলে চিগোংগ মাস্টারদের রোগ নিরাময় করার ক্ষমতা বিরাটভাবে হ্রাস পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ফলও আর ভালো হবে না। কেন এটা হবে? কারণ তারা এই সব জিনিস সাধারণ মানুষদের মধ্যে করছে। অতএব তাদের ফা-এর উচ্চতা অবশ্যই সাধারণ মানুষদের মতোই হবে, তাদের স্তরও সাধারণ মানুষদের অবস্থা অনুযায়ী একই হয়ে যাবে, তাদের চিকিৎসার ফলও, হাসপাতালের মতো একইরকম হবে। সেইজন্যে তাদের চিকিৎসায় ভালো কাজ হবে না, তারাও রোগ নিরাময়ের জন্যে তথাকথিত চিকিৎসাটা কতকগুলি পর্বে করবে। এসব সচরাচর এইরকমই হয়।

চিগোংগ হাসপাতাল স্থাপন করা হোক বা না হোক, চিগোংগ রোগ নিরাময় করতে পারে এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। চিগোংগ এত লম্বা সময় ধরে সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে আছে, প্রচুর লোক এর অনুশীলনের মাধ্যমে রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার লক্ষ্যটা সত্যিই অর্জন করতে পেরেছে। রোগটা চিগোংগ মাস্টার দ্বারা বিলম্বিত করা হয়েছে অথবা যে-কোনো ভাবে নিরাময় করা হয়েছে, সেটা যাই হোক না কেন, বর্তমানে রোগটা আর নেই, অর্থাৎ চিগোংগ রোগ নিরাময় করতে পারে এটা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। অধিকাংশ লোক যারা চিগোংগ মাস্টারকে দিয়ে তাদের রোগের চিকিৎসা করিয়েছিল সেগুলো সবই কঠিন এবং জটিল, হাসপাতালে এদের রোগ নিরাময় করা যায়নি, সেইজন্যে তারা ভাগ্যটাকে একবার পরীক্ষা করার জন্যে চিগোংগ মাস্টারের কাছে গিয়েছিল, শেষে রোগটা নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। যেসব লোকেদের রোগ হাসপাতালেই ঠিক হয়ে যায় তারা আর চিগোংগ মাস্টারের খোঁজ করে না, বিশেষত লোকেরা প্রথমদিকে এইরকমই ধারণা করত, সুতরাং চিগোংগ রোগ নিরাময় করতে পারে। শুধু এটাই খেয়াল রাখতে হবে যে এটাকে সাধারণ মানবসমাজের অন্য ব্যাপারগুলোর মতো করে করা যাবে না। কারণ ব্যাপকভাবে মানবসমাজে বিঘ্ন ঘটানোর অনুমতি একেবারেই দেওয়া যাবে না, কিন্তু ছোট আকারে এবং খুব বেশী প্রভাব সৃষ্টি না করে একান্তে এটা করতে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে

রোগ নিরাময় করতে পারবে না, এটাও নিশ্চিত। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিজে নিজে চিগোংগ-এর ক্রিয়াগুলির অনুশীলনের মাধ্যমে রোগ দূর করা।

এরকমও কিছু চিগোংগ মাস্টার আছে যারা দাবি করে: ‘‘হাসপাতালে রোগ নিরাময় করা সম্ভব নয় এবং হাসপাতালের চিকিৎসার পরিণাম কীরকম খারাপ।’’ আমরা এটাকে কীভাবে বলব? অবশ্য এর অনেক রকম কারণ আছে। আমার দৃষ্টিতে প্রধান কারণ হচ্ছে, মানবজাতির নৈতিকতার মান একেবারে নীচে নেমে গেছে, তার ফলে বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব রোগের সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলোকে হাসপাতালে নিরাময় করা যায় না, ওষুধ খেলেও কাজ করে না, কারণ নকল ওষুধ চারিদিকে ছেয়ে গেছে, এসব হচ্ছে তার কারণ মানবসমাজ এতটা ব্যাপকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। কেউই এই ব্যাপারে অন্যের উপর দোষ দিতে পারবে না, কারণ প্রত্যেকেই আগুনে ঘি ঢালার কাজটা করছে, সেইজন্যে প্রত্যেকেই সাধনার সময়ে দুর্ভোগের সম্মুখীন হবে।

হাসপাতালে পরীক্ষা করে অসুস্থ লোকেদের কিছু ব্যাধিকে নির্ণয় করা যায় না, যদিও তাদের সত্যিই ব্যাধি রয়েছে, কিছু লোকের রোগ নির্ণয় করা গেলেও, সেগুলোর কোনো নাম নেই কারণ আগে কখনো সেগুলোকে দেখা যায়নি, হাসপাতালে এই সব রোগের নাম দেওয়া হয়েছে ‘‘আধুনিক রোগ।’’ হাসপাতালে রোগ নিরাময় সম্ভব কি? অবশ্যই সম্ভব। যদি হাসপাতালে রোগ নিরাময় না হতো, তাহলে লোকেরা সেগুলোকে বিশ্বাস করছে কেন এবং সেখানে চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছে কেন? হাসপাতালে এখনও রোগ নিরাময় করা সম্ভব, শুধু হাসপাতালের চিকিৎসা করার পদ্ধতিগুলো সাধারণ মানুষের স্তরের, কিন্তু রোগগুলো অতিপ্রাকৃত, এবং কিছু রোগ খুবই গুরুতর। সেইজন্যে হাসপাতালে এইরকম রোগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করার কথা বলা হয়, রোগটা খুব গুরুতর হলে হাসপাতাল সেটার চিকিৎসা করতে পারবে না, ওষুধের পরিমাণ অতিরিক্ত হলে মানব শরীর বিষাক্ত হয়ে যাবে। বর্তমানে ডাক্তারি চিকিৎসার মান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মান একইরকম, এগুলো সবই সাধারণ মানুষের স্তরে আছে, সেইজন্যে তাদের রোগ নিরাময়ের কার্যকারিতাও একই রকম। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই যে সাধারণ চিগোংগ চিকিৎসায় এবং হাসপাতালের চিকিৎসায়, রোগের মূল কারণ যে দুর্ভোগ,

সেটাকে বাকি অর্ধেক জীবনে, অথবা তারও পরে ঠেলে পাঠানো হয়, কর্মকে একেবারেই দূর করা হয় না।

আমরা এখন চীনের চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করব। চীনের চিকিৎসার সঙ্গে চিগোংগ চিকিৎসার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রাচীন চীন দেশের প্রায় সব চিকিৎসকই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মহান চিকিৎসকেরা যেমন সুন সিমিয়াও, হুয়াথুয়ো, লি শিঝেন, বিয়েন চু[94] ইত্যাদি, এরা সবাই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, যা চিকিৎসাশাস্ত্রের বইগুলিতে নথিভুক্ত করা আছে। অথচ বর্তমানে ওই জিনিসগুলোর এবং তাদের সারবস্তুগুলির সমালোচনা করা হয়। চীনের চিকিৎসা উত্তরাধিকারসূত্রে যা লাভ করেছে তা শুধু ঔষধীয় নির্দেশ সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। প্রাচীন চীনের চিকিৎসা শাস্ত্র খুবই উন্নত ছিল এবং উন্নতির স্তরটা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু লোক ভাবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কত উন্নত যেখানে সিটি স্ক্যান শরীরের ভিতরটা দেখতে পারে, এবং আমরা আল্ট্রাসাউন্ড, আলোকচিত্র গ্রহণ এবং এক্সরে এসবও করতে পারি। আধুনিক চিকিৎসার উপকরণগুলি খুবই উন্নত, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে সেগুলো প্রাচীন চীনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো অতটা ভালো নয়।

চিকিৎসক হুয়াথুয়ো, সম্রাট সাওসাও[95]-এর মস্তিষ্কের মধ্যে একটা টিউমার দেখতে পেয়েছিলেন এবং মাথার খুলির ভিতরে অস্ত্রোপচার করে টিউমারটা বাদ দিতে চেয়েছিলেন। সাওসাও এটা শুনে মনে করেছিলেন যে হুয়াথুয়ো তাঁর মাথাটাই নিয়ে নিতে চাইছেন, সেইজন্যে হুয়াথুয়োকে বন্দি করেছিলেন, শেষে হুয়াথুয়োর জেলের ভিতরে মৃত্যু হয়েছিল। যখন সাওসাও পরে অসুস্থ হয়েছিলেন, তখন হুয়াথুয়োর কথা স্মরণ করেছিলেন এবং তাঁর খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে হুয়াথুয়োর মৃত্যু হয়েছিল। পরবর্তীকালে সাওসাও-এর সত্যিই ওই অসুখে মৃত্যু হয়েছিল। হুয়াথুয়ো কীভাবে জানতে পেরেছিলেন? কারণ তিনি ওটা দেখতে পেরেছিলেন, এটা আমাদের মানুষেরই অলৌকিক ক্ষমতা যা অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ

---

[94]সুন সিমিয়াও, হুয়াথুয়ো, লি শিঝেন, বিয়েন চু - চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রের সব বিখ্যাত চিকিৎসক

[95]সাওসাও - তিন রাজ্যের মধ্যে একটার সম্রাট ছিলেন (220 A.D. – 265 A.D.)।

চিকিৎসকদের অধিগত ছিল। কোনো লোকের দিব্যচক্ষু উন্মোচিত হওয়ার পরে সে একজন ব্যক্তিকে একটা দিক দিয়ে দেখার সময়ে, একই সাথে তার চার দিক দেখতে পারে----তাকে সামনের দিক থেকে দেখার সময়ে, পিছন দিক, বাঁ দিক এবং ডান দিকও দেখতে পারে; সে শরীরকে একটার পর একটা স্তরে ভাগ করে দেখতে পারে এবং সে এই মাত্রার মধ্যে দিয়ে রোগের মূল কারণকেও দেখতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোর দ্বারা এটা করা সম্ভব কি? অনেক দূরের ব্যাপার। এর জন্যে আরও এক হাজার বছর কেটে যেতে পারে! সিটি স্ক্যান, আলট্রাসোনোগ্রাফি, এক্স-রে মানুষের শরীরের ভিতরটা দেখতে পারে। কিন্তু উপকরণগুলি খুব ভারী এবং বড়ো, অত বড়ো বড়ো জিনিস সহজে বহনযোগ্য নয়, এছাড়া এগুলো বিদ্যুতের সংযোগ ছাড়া কাজ করে না। অন্যদিকে, ওই ব্যক্তি যেখানে যাবে সেখানেই এই দিব্যচক্ষু চলে যাবে, কোনো শক্তি সরবরাহের প্রয়োজন নেই, কীভাবে এদের মধ্যে তুলনা করবে?

কিছু লোক বলে বর্তমানের ওষুধ কত উৎকৃষ্ট। আমি ঠিক এইরকম দেখি না, প্রাচীন চীনের ওইসব ভেষজগুণ সম্পন্ন লতাপাতাজাত ঔষধি প্রয়োগ করে সত্যিই রোগ দূর করা যেত। প্রচুর জিনিস হস্তান্তরিত হওয়ার সময়ে হারিয়ে গেছে, আবার বেশ কিছু জিনিস হারিয়ে যায়নি এবং লোকেদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে। আমি যখন চিচিহার[96] শহরে ক্লাস নিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম যে একজন ব্যক্তি রাস্তার উপরে একটা স্টল খাড়া করে সেখানে লোকেদের দাঁত তুলছিল। একবার দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে লোকটি দক্ষিণের কোনো অঞ্চল থেকে এসেছে, কারণ লোকটির পোশাক উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকেদের মতো নয়। তার কাছে যারা আসছিল, তাদের কাউকেই সে ফিরিয়ে দিচ্ছিল না, তার কাছে যে আসছিল তারই দাঁত তুলে দিচ্ছিল। তার কাছে একগাদা তোলা দাঁত জমা করে রাখা ছিল। লোকেদের দাঁত তোলা তার উদ্দেশ্য ছিল না, একটা তরল ওষুধ বিক্রি করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তরল ওষুধ থেকে খুব ঘন হলুদ বাষ্প বের হচ্ছিল। একটা লোকের দাঁত তোলার সময়ে সে তরল ওষুধের শিশির ছিপিটা খুলে, তার গালের পাশে খারাপ দাঁতের কাছে ধরে রাখল এবং তাকে হলুদ রঙের তরল ওষুধের বাষ্পকে কয়েকবার মুখের ভিতরে টেনে নিতে বলল। তরল ওষুধটা তেমন কিছু খরচ হওয়ার আগেই, সে শিশির

[96]চিচিহার - উত্তরপূর্ব চীনের একটি শহর

ছিপিটা আটকে পাশে রেখে দিল। লোকটা পকেট থেকে একটা দেশলাই কাঠি বের করল, যখন সে তরল ওষুধটা সম্বন্ধে কথা বলছিল, সেই সময়ে সে দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁতটাকে টোকা মেরে নাড়িয়ে দিল এবং দাঁতটা বেরিয়ে এল, কোনো ব্যথা হল না, দাঁতটাতে সামান্য রক্তের দাগ লেগেছিল, কিন্তু রক্তপাত হল না। তোমরা চিন্তা কর, একটু বেশী শক্তি প্রয়োগ করলে দেশলাই কাঠিটাই ভেঙ্গে যেতে পারত, অথচ সে এটা দিয়ে একটা টোকা মেরে দাঁতটা তুলে দিল।

আমি বলেছিলাম যে চীনদেশে কিছু জিনিস জনগণের মধ্যে প্রচলিত আছে যেগুলোর সাথে পশ্চিমী সূক্ষ্ম নির্দেশী যন্ত্রপাতিগুলোও তুলনীয় নয়। দেখা যাক কোন্ চিকিৎসা পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত ভালো, ওই লোকটি দেশলাই কাঠি দিয়ে টোকা মেরে দাঁত তুলে দিয়েছে। পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্রের ডাক্তার কোনো ব্যক্তির দাঁত তোলার আগে, সুঁই দিয়ে অনুভূতিনাশক ওষুধ, দাঁতের এদিকে সেদিকে ঢোকায়, সুঁই-এর প্রয়োগে বেশ ব্যথা লাগে, অনুভূতিনাশক ওষুধের কাজ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর ডাক্তার সাঁড়াশির মতো একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে দাঁতটাকে ধরে টেনে বের করে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে ভালো করে দাঁতটা তুলতে না পারলে, দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে ভিতরেও থেকে যেতে পারে। তখন ডাক্তার বড়ো হাতুড়ি এবং বাটালি দিয়ে সেটা খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করে। হাতুড়ির আঘাতে সেই ব্যক্তি ভয়ে শিঁটিয়ে থাকে। এরপরে সে তুরপুন জাতীয় সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিদ্র করার জন্যে প্রয়োগ করে। কিছু লোক এটাকে দেখলে ভয়ে লাফ দিয়ে ওঠে, খুব ব্যথা হয়, বেশ কিছুটা রক্ত বের হয় এবং রোগীর থুতুতে কিছুক্ষণ ধরে রক্ত বের হতে থাকে। তুমিই বলো কার চিকিৎসাটা ভালো? তুমিই বলো কার চিকিৎসাটা উন্নততর? যন্ত্রপাতির বাহ্যিক রূপটা দেখলেই চলবে না, সেটার কার্যকারিতাও আমাদের দেখা উচিত। প্রাচীন চীনদেশের চিকিৎসাশাস্ত্র খুবই উন্নত ছিল, আধুনিক পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্র সামনের অনেক বছর পর্যন্ত এর নাগাল পাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান যা আমরা পশ্চিমের থেকে শিখেছি, তার থেকে প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান অন্যরকম ছিল, তাদের পথ আলাদা ছিল, সেটা অন্য ধরনের অবস্থা নিয়ে আসতে পারত, সেইজন্যে আমরা আধুনিক জ্ঞানবুদ্ধিজাত পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে বুঝতে পারব না। যেহেতু প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান লক্ষ্যটা রেখেছিল মানুষের

শরীর, জীবন এবং এই বিশ্বের উপরে, সেইজন্যে এই জিনিসগুলোকে সরাসরি অধ্যয়ন করেছিল, এবং অন্য রাস্তা গ্রহণ করেছিল। সেই সময়ে যখন শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেত, তখন তারা সবাই বসে ধ্যান করার উপরে লক্ষ্য রাখত, সঠিক মুদ্রায় বসার উপরে গুরুত্ব দিত। যখন তারা তুলি-কলম হাতে নিত তখন তারা তাদের শ্বাস এবং চি-কে নিয়ন্ত্রণ করত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে লোকেরা মনকে পরিষ্কার রাখার জন্যে চর্চা করত, আর শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখত, পুরো সমাজের এইরকমই অবস্থা ছিল।

কিছু লোকের বক্তব্য: ‘‘আমরা যদি প্রাচীন চীনের বিজ্ঞানের পথ গ্রহণ করতাম, তাহলে আজকের মতো গাড়ি, রেলগাড়ি আমাদের কাছে থাকত কি? আজকের মতো আমাদের আধুনিকীকরণ হতে পারত কি?’’ আমি বলব যে তুমি এই পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্য একটা পরিস্থিতিকে ধারণা করতে পারবে না। তোমার চিন্তা ও ধারণার মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটা উচিত। টি ভি-র দরকার নেই, লোকেদের সেটা নিজেদের কপালের সামনেই থাকত, তারা যা দেখতে চাইত, সবই দেখতে পারত। তাদের অলৌকিক ক্ষমতাও থাকত। রেলগাড়ি এবং উড়োজাহাজ ছাড়াই লোকেরা বসা অবস্থায় উপরে ভেসে উঠতে পারত, এমনকী চলন্ত সিঁড়িরও প্রয়োজন হতো না। অন্যভাবে বিকশিত হওয়া একটা সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হতো, যা সম্ভবত এই কাঠামোটার মধ্যেও সীমিত থাকত না। বহির্জাগতিক জীবদের উড়ন্ত চাকতিগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে সামনে পিছনে ভ্রমণ করতে পারে, এবং আকারে বড়ো অথবা ছোট হয়ে যেতে পারে। তারা যে বিকাশের রাস্তাটা গ্রহণ করেছিল সেটা এমনকী আরও আলাদা, সেটা অন্য এক ধরনের বৈজ্ঞানিক পন্থা।

বক্তৃতা - আট

বিগু[97]

তোমাদের কয়েকজন বিগুর বিষয়টা উত্থাপন করেছ। বিগু ব্যাপারটার অস্তিত্ব আছে। এটা শুধু যে আমাদের সাধক সমুদায়ের মধ্যে বিরাজমান তা নয়, আমাদের পুরো মানবসমাজে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে এই অবস্থা দেখা গেছে। কিছু লোক কয়েক বৎসর অথবা এক দশকের বেশী সময় ধরে কিছুই খায়নি এবং পান করেনি, অথচ বেশ ভালোভাবে বেঁচে আছে। কিছু লোক বিগুকে এক বিশেষ স্তরের প্রতিফলন হিসাবে উল্লেখ করেছে, অন্য লোকেরা বিগুকে শরীর শোধনের একটা চিহ্ন হিসাবে উল্লেখ করেছে; আবার কিছু লোক এটাকে একটা উঁচুস্তরের সাধনা প্রক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করেছে।

বাস্তবে এগুলোর কোনোটাই নয়। তাহলে এটা কী? বিগু বস্তুত এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত একটা সুনির্দিষ্ট সাধনা পদ্ধতি। কী ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা ব্যবহৃত হয়েছিল? আমাদের প্রাচীন চীন দেশে, বিশেষত ধর্মগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে, অনেক সাধক এক ধরনের গোপন এবং একান্ত সাধনা পদ্ধতি ব্যবহার করত, তারা লোকালয় থেকে অনেক দূরে, নির্জন পর্বতে গিয়ে অথবা পর্বতের গুহার মধ্যে গিয়ে সাধনা করত। একবার এটা করার পরেই, খাবার সরবরাহের প্রশ্নটা এসে যেত। যদি তারা বিগু পদ্ধতি গ্রহণ না করত, তাহলে তারা একেবারেই সাধনা করতে পারত না, তখন ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করতে হতো। আমি ছোংগচিংগ[98] শহর থেকে উহান শহরে ফা শেখানোর জন্যে গিয়েছিলাম, যখন নৌকা করে ইয়াঙ্গৎজে নদীর পূর্ব দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমি তিন গিরিসংকটের দুই ধারের পর্বতগুলোর মধ্যবর্তী অংশগুলিতে কিছু গুহা দেখেছিলাম, অনেক বিখ্যাত পর্বতেই এই গুহা আছে। অতীতে সাধকরা দড়ির সাহায্যে গুহায় উঠত, তারপরে দড়িটা কেটে ফেলে গুহার ভিতরে

---

[97] বিগু - উপবাস; খাদ্যশস্য ত্যাগ; খাদ্য এবং জল ত্যাগ।

[98]ছোংগচিংগ - দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সবচেয়ে জনবহুল শহর।

সাধনা করত। যদি কেউ সাধনায় সফল না হতো, তাহলে সেখানেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেখানে কোনো জল বা খাবার থাকত না, ওই রকম অত্যন্ত বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা এই নির্দিষ্ট সাধনা পদ্ধতি ব্যবহার করত।

অনেক সাধনা পদ্ধতিতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এইরকম একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, সেইজন্যে তাদের মধ্যে বিগু আছে; কিন্তু অনেক সাধনা পদ্ধতিতে বিগু নেই, আমাদের আজকের সমাজে প্রচলিত অধিকাংশ সাধনা পদ্ধতিতেই বিগু নেই। আমরা বলেছি যে সাধনায় একটা পদ্ধতিতে একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার না। তুমি ভাবছ এটা বেশ ভালো, সেইজন্যে তুমিও বিগু করতে চাইছ, কিন্তু তুমি বিগু করতে চাইছ কেন? কিছু লোক ভাবে এটা খুব ভালো, এ ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে পড়ে, অথবা তারা ভাবে তারা খুব পারদর্শী এবং এইভাবে নিজেদের জাহির করতে চায়, বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার সব লোক আছে। এমনকী কেউ যদি সাধনায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, তাহলে তার নিজের শক্তিকে ব্যয় করে এই শরীরকে বজায় রাখতে হবে, অতএব লাভের থেকে ক্ষতিই বেশী। তোমরা জান যে বিশেষ করে ধর্মগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে, তুমি যখন মন্দিরের মধ্যে বসে ধ্যান করছ অথবা একান্তে সাধনা করছ, তখন তোমাকে চা এবং খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, অতএব ওই সমস্যাটা আর নেই। বিশেষত আমরা যখন সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে সাধনা করছি, তখন তোমার এই ধরনের পদ্ধতির একেবারেই প্রয়োজন নেই। এর উপরে, তোমার সাধনা পদ্ধতিতে যদি এটা অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তাহলে তুমি ইচ্ছামতো এটার উপযোগ করতে পার না। কিন্তু তুমি যদি সত্যিই বিগু পালন করতে চাও, তুমি সেটা দ্বিধাহীনভাবে করতে পার। আমি যতদূর জানি, যখন একজন মাস্টার খুব উঁচুস্তরের শিক্ষা দেন এবং শিষ্যকে সত্যি সত্যি পথনির্দেশ করতে চান, সেক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতিতে বিগু অন্তর্ভুক্ত থাকলে, তাহলে সম্ভবত এই ব্যাপার ঘটতে পারে, কিন্তু তিনি সেটাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে পারেন না, তিনি সাধারণত শিষ্যকে গোপনে এবং একান্তে নিয়ে গিয়ে এই সাধনা করান।

বর্তমানে চিগোংগ মাস্টাররাও বিগু শেখাচ্ছে। বিগু কি পালিত হয়েছে? শেষ পর্যন্ত, বিগু সত্যিই পালিত হয়নি। কে এই বিগু পালন করতে পেরেছে? আমি অনেক লোককে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখেছি,

এবং অনেকের জীবন সংকটের মধ্যে পড়েছে। তাহলে এইরকম পরিস্থিতি হল কেন? বিগু ব্যাপারটার কি অস্তিত্ব নেই? বিগুর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে, কোনো ব্যক্তিকেই সহজে আমাদের এই সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থার ক্ষতি করতে দেওয়া যাবে না-----তাকে বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে সারা দেশে কত লোকের খাওয়ার বা পান করার প্রয়োজন হবে না, ধরা যাক, ছ্যাংগছুন অঞ্চলের কেউ খাবে না এবং পান করবে না, আমি বলব আমরা বিশাল সমস্যা থেকে বেঁচে যাব! খাবার রান্না করার দুশ্চিন্তা আর থাকবে না। কৃষকরা কঠিন পরিশ্রম করে জমি চাষ করে, যদি কেউ না খায় তাহলে তারাও অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে, লোকেরা শুধু কাজ করে যাবে, অথচ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেটা কী করে ঠিক হবে? সেটা কি মানবসমাজ? সেটা নিশ্চিতই ঠিক হবে না। এই ধরনের জিনিসের দ্বারা সাধারণ মানবসমাজে ব্যাপকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

যখন কিছু চিগোংগ মাস্টার বিগু শেখাচ্ছিল, অনেক লোকের জীবন সংকটে পড়েছিল। কিছু লোক আসক্তির সঙ্গে বিগুর জন্যে প্রয়াসী হয়; কিন্তু তাদের আসক্তিগুলো দূর হয়নি, সাধারণ মানুষের অনেক আসক্তি তারা এখনও ত্যাগ করতে পারেনি, সেইজন্যে যখন তারা সুস্বাদু খাবার দেখে, সেটা না খেতে পারলে, মুখে জল এসে যায়, তাদের আসক্তিটা জেগে ওঠে, তারা এটা সামলাতে পারে না। ওই খাবারটা খাওয়ার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, খাওয়ার ইচ্ছা জেগে ওঠায় খেতে চায়, তা নাহলে ক্ষুধা বোধ করে। কিন্তু তারা সেটা খেলেই বমি করে ফেলে, খাবারটা খেলেও ভিতরে রাখতে পারে না, স্নায়ুচাপে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং বেশ ভীত হয়ে পড়ে। অনেক লোক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, বাস্তবে অনেক লোকের জীবন সংকটের মধ্যে পড়েছে। আবার কিছু লোক আমার খোঁজ করেছে এবং এইরকম গণ্ডগোল সামলানোর জন্যে অনুরোধ করেছে, আমি এইসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি নই। কিছু চিগোংগ মাস্টার একেবারে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে কাজ করে। এইসব গোলমেলে সমস্যার নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব নিতে কেউই রাজি নয়।

এছাড়া যদি তুমি বিগুর চর্চা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়, তাহলে সেটা কি তোমার নিজের প্রচেষ্টার জন্যেই ঘটেনি? আমরা বলেছি যে এই ঘটনার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এটা কোনো উচ্চতর স্তরের অবস্থা নয় এবং এটা বিশেষ কোনো কিছুর প্রতিফলনও নয়। এটা শুধু এক বিশেষ

পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত একটা অনুশীলন পদ্ধতি, কিন্তু এটাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করা যাবে না। অনেক লোক বিগুর জন্যে প্রয়াসী হয়, তারা একে তথাকথিত বিগু এবং আধা-বিগু হিসাবেও ভাগ করে, এমনকী তারা একে বিভিন্ন স্তরে ক্রমবিভক্ত করে। কেউ কেউ দাবি করে সে শুধু জল পান করে, আবার অন্য কেউ দাবি করে সে শুধু ফল খায়, এগুলো সবই মেকি বিগু। এটা নিশ্চিত যে সময় পেরোতে থাকলে, এরা সবাই অসফল হবে। একজন সত্যিকারের সাধক পর্বতের গুহার মধ্যে থাকবে, সে কিছুই খাবে না এবং পান করবে না, সেটাই সত্যিকারের বিগু।

চি চুরি করা

চি চুরির ব্যাপারে উল্লেখ করলে কিছু লোকের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়; যেন বাঘ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তারা চিগোংগ অনুশীলন করতে খুবই ভয় পায়। যেহেতু সাধনার জগতে চিগোংগ মনোবিকার, চি চুরি করা ইত্যাদি ঘটনার কথা প্রচলিত আছে, সেইজন্যে প্রচুর লোক চিগোংগ অনুশীলন করতে এবং চিগোংগ-এর কাছাকাছি আসতেও ভীষণ ভয় পায়। যদি এই সমস্ত কথা প্রচলিত না থাকত, তাহলে হয়তো আরও অনেক লোক চিগোংগ অনুশীলন করত। আবার কিছু চিগোংগ মাস্টার যাদের চরিত্রে ঘাটতি আছে, তারা বিশেষভাবে এইসব জিনিস শিখিয়ে, সাধনার জগতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে, বস্তুত এটা এইরকম ভয়ের ব্যাপার নয়, যেরকম তারা বর্ণনা করে। আমরা বলেছি যে, চি হচ্ছে শুধু চি-ই, যদিও তুমি একে ''মিশ্রিত আদি চি,'' এইরকম চি, সেইরকম চি-ও বলতে পার। যতক্ষণ একজন ব্যক্তির শরীরে চি আছে, সেই ব্যক্তি রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার স্তরেই রয়ে গেছে। সুতরাং তাকে এখনও অনুশীলনকারী হিসাবে গণ্য করা যাবে না। যতক্ষণ তার কাছে চি বিদ্যমান, এর অর্থ এখনও তার শরীরের উচ্চস্তরে শোধন হয়নি এবং এটা নিশ্চিত যে, তার কাছে এখনও অসুস্থ চি রয়ে গেছে। যে ব্যক্তি চি চুরি করছে, সেও চি-এর স্তরেই রয়েছে, আমাদের অনুশীলনকারীদের মধ্যে কে এই অত্যন্ত নোংরা চি চাইবে? যে অনুশীলন করে না, তার শরীরের চি খুব নোংরা হয়, চিগোংগ অনুশীলন করতে করতে হয়তো এটা উজ্জ্বল হতে থাকবে। রোগের স্থানটাতে খুব উচ্চ ঘনত্বযুক্ত কালো পদার্থের একটা খুব বড়ো পুঞ্জের দেখা মিলবে। সে অনুশীলন চালিয়ে যেতে যেতে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে যখন সত্যি

সত্যি তার রোগ দূর হয়ে যাচ্ছে এবং শরীর সুস্থ হয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে তার চি ধীরে ধীরে এবং একটু একটু করে হলুদ হতে থাকবে, সে আরও অনুশীলন চালিয়ে যেতে থাকলে তখন তার রোগটা সত্যিই দূর হয়ে যাবে, তার কাছে কোনো চি থাকবে না, সে দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থায় প্রবেশ করবে।

অর্থাৎ এইভাবে বলা যায় যে, চি থাকলে, রোগও থাকবে। আমরা সাধক, একজন সাধক কীসের জন্যে চি চাইবে? আমাদের নিজেদের শরীরের শোধন হওয়া প্রয়োজন, এখনও তুমি নোংরা চি কেন চাইছ? অবশ্যই চাইবে না। যে ব্যক্তি চি চাইছে সে এখন চি-এর স্তরেই রয়ে গেছে। এই চি-এর স্তরে থেকে সে প্রভেদ করতে পারে না যে কোন্টা ভালো চি এবং কোন্টা মন্দ চি, তার এই ক্ষমতাটা নেই। তোমার শরীরের দ্যান ক্ষেত্রের সত্যিকারের চি-কে কেউ কিছু করতে পারবে না, কারণ একজন উচ্চস্তরের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিই কেবল ওই আদি চি-কে দূর করতে পারে। তোমার শরীরে যে নোংরা চি আছে, কেউ চাইলে, তাকে এটা চুরি করতে দাও, এটা কী এমন বড়ো ব্যাপার। যখন আমি অনুশীলন করার সময়ে নিজেকে চি দিয়ে ভর্তি করতে চাই, শুধু একবার চিন্তা করলেই আমার পেটটা তৎক্ষণাৎ চি দিয়ে ভর্তি হয়ে ফুলে উঠবে।

তাও মতের *থিয়ানজি ঝুয়াংগ*[99] *ক্রিয়া*-তে দাঁড়িয়ে চিগোংগ ব্যায়াম করার একটি পদ্ধতি শেখানো হয়ে থাকে, আর বুদ্ধ মতে ‘‘দুই হাত দিয়ে চি ধরে মাথার উপরে ঢেলে দেওয়া’’ শেখানো হয়। এই বিশ্বে প্রচুর চি আছে, তুমি প্রত্যেক দিন নিজেকে সেই চি দিয়ে ভর্তি করতে পার। তোমার হাতের তালুর লাওগোংগ আকুপাংচার বিন্দু এবং মাথার উপরের *বাইহুই*[100] আকুপাংচার বিন্দু খুলে যাওয়ার পরে, তুমি দ্যান ক্ষেত্রে মনকে কেন্দ্রীভূত করে হাত দিয়ে চি-কে ধরে দেহের ভিতরে ঢেলে দিতে পার, মুহূর্তের মধ্যে তুমি চি দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে। তুমি যতই চি ঢেলে নিজেকে ভর্তি কর না কেন, এটা কোন্ কাজে লাগবে? যখন কেউ চি-এর অনুশীলন খুব বেশী করে, তখন তার হাতের আঙ্গুলগুলোর ডগা ফুলে গেছে বোধ হয়, এবং শরীরটাও ফুলে গেছে বোধ হয়। অন্য কেউ ওই

---

[99] থিয়ানজি ঝুয়াংগ - তাও মতের সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিগোংগ ব্যায়াম করার একটি পদ্ধতি।

[100]বাইহুই - মাথার উপরে অবস্থিত একটি আকুপাংচার বিন্দু।

ব্যক্তির সামনে গেলে, অনুভব করতে পারবে যে একটা ক্ষেত্র ওই ব্যক্তিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে: ‘‘বাঃ, তুমি সত্যিই ভালোভাবে চিগোংগ অনুশীলন করেছ।’’ আমি বলব, এটা কিছুই নয়, তোমার গোংগ কোথায়? এটা কেবল চি-এরই অনুশীলন মাত্র। তোমার চি যতই থাকুক না কেন, এটা গোংগ-এর বিকল্প নয়। চি-এর অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমার শরীরের ভিতরের চি-কে দূর করে দিয়ে, সেই জায়গাটা শরীরের বাইরের ভালো চি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা, এবং তোমার শরীরকে শোধন করা, এই চি সঞ্চয় করা কী কাজে লাগবে? তুমি যখন এই স্তরে আছ, কোনো মূলগত রূপান্তর না ঘটলে, চি কখনোই গোংগ হবে না। তুমি যত চি-ই চুরি করে থাক না কেন, তুমি চি-এর একটা বড়ো থলি ছাড়া আর কিছু নও, এটার কী প্রয়োজন আছে? এটা এখনও উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়নি। অতএব তোমার কীসের ভয়, সে যদি সত্যিই চি চুরি করতে চায়, তাহলে তাকে চি চুরি করতে দাও।

তোমরা সবাই চিন্তা কর, যদি তোমার শরীরে চি থাকে তাহলে তার মধ্যে রোগও আছে। সেইজন্যে যখন কেউ তোমার চি চুরি করছে, তাহলে সে কি একই সাথে তোমার রোগগ্রস্ত চি-ও চুরি করছে না? সে এই জিনিসটাকে একেবারেই আলাদা করে চিনতে পারবে না? কারণ যে লোকেরা চি চায়, তারা এই চি-এর স্তরেই থাকে, তাদের সেসব ক্ষমতা নেই। যার গোংগ আছে, সে চি চাইবে না, এটা নিশ্চিত। তুমি যদি বিশ্বাস না কর, আমরা একটা পরীক্ষা করতে পারি। যদি কোনো লোক সত্যিই তোমার চি চুরি করতে চায়, তাহলে তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাক এবং তাকে তোমার চি চুরি করতে দাও। তুমি এদিকে মনে মনে এই বিশ্বের চি দিয়ে নিজেকে ভর্তি করার কথা চিন্তা করতে থাক, আর সে তোমার পশ্চাতে তোমার থেকে চি চুরি করছে। তুমি দেখো এটা কত ভালো হল, সে তোমার শরীরের শোধনটা দ্রুত নিষ্পন্ন করে দিচ্ছে, সে তোমাকে শরীরের মধ্যে চি ভর্তি করা এবং শরীর থেকে চি নির্গত করার ঝামেলা থেকে অব্যহতি দিচ্ছে। যেহেতু তার মনের উদ্দেশ্যটা খারাপ, সেইজন্যে সে অন্যের জিনিস চুরি করছে। যদিও সে খারাপ জিনিস চুরি করছে, কিন্তু সে সদ্‌গুণ-এর হানিকারক কাজ করছে, সেইজন্যে সে তোমায় সদ্‌গুণ প্রদান করবে। একটা দ্বিমুখী প্রবাহের সৃষ্টি হবে, যখন সে এখানে তোমার থেকে চি নিয়ে নিচ্ছে, তখন সে ওখানে তোমাকে সদ্‌গুণ প্রদান করছে। যে ব্যক্তি চি চুরি করছে, সে এটা জানে না, যদি সে জানত, তাহলে সে এটা করতে সাহস করত না।

যেসব লোকেরা চি চুরি করে তাদের চেহারা নীলাভ হয়, তারা সবাই এইরকমই হয়। যারা পার্কে চিগোংগ অনুশীলন করতে যায়, তাদের অনেক লোকই রোগ দূর করার জন্যে যায়, তাদের সব নানান ধরনের অসুস্থতা থাকে। লোকেরা রোগ নিরাময় করার সময়ে অসুস্থ চি-কে আবশ্যিকভাবে দূর করে দিতে চায়, কিন্তু যে লোকটি চি চুরি করে সে এমনকী এটা দূর করতে তো চায়ই না, পরিবর্তে সারা শরীরে এটা প্রাপ্ত হয়, সব ধরনের অসুস্থ চি এর মধ্যে থাকে, এমনকী তার শরীরের ভিতরটা পর্যন্ত কুচকুচে কালো হয়ে যায়। তার সদ্‌গুণ-এর সর্বদা হানি হচ্ছে, তার শরীরের বাইরেটাও সব কালো হয়ে যায়, যখন তার কর্মের ক্ষেত্রটা বিরাট হয়ে যায় এবং প্রচুর সদ্‌গুণ-এর হানি হয়, তখন তার শরীরের ভিতরটা এবং বাইরেটা সবই কালো হয়ে যায়। যে লোকেরা চুরি করছে তারা যদি জানত যে, তাদের নিজেদের এইরকম পরিবর্তন ঘটছে, লোকেদের সদ্‌গুণ প্রদান করছে এবং এত বোকার মতো কাজ করছে, সেক্ষেত্রে তারা কখনোই এটা করত না।

কিছু লোক চি সম্বন্ধে অবিশ্বাস্যজনক ভাবে বলে থাকে: ‘‘আমি যখন চি পাঠাবো, তুমি সেটা আমেরিকাতে থাকলেও প্রাপ্ত হবে;’’ ‘‘আমি চি পাঠালে, তুমি দেওয়ালের অন্য ধারে অপেক্ষা করলেও সেটা প্রাপ্ত হবে।’’ কিছু লোক খুব সংবেদনশীল হয়, চি নির্গত হলে তারা সেটা অনুভব করতে পারে। কিন্তু চি এই মাত্রাতে ভ্রমণ করে না, এটা অন্য মাত্রাতে ভ্রমণ করে এবং ওই মাত্রাতে সেই জায়গায় কোনো দেওয়াল নেই। যখন কোনো চিগোংগ মাস্টার বাধাহীন জায়গায় চি নির্গত করে তখন তুমি কেন সেটা অনুভব করতে পার না? কারণ অন্য মাত্রার মধ্যে সেই জায়গাটাতে বিভাজক আছে। অতএব চি-এর অত বেশী ভেদন ক্ষমতা নেই যেরকম আমরা বলে থাকি।

যেটা সত্যি সত্যি কাজ করে, সেটা হচ্ছে গোংগ। যখন একজন অনুশীলনকারী গোংগ নির্গত করতে পারে, তার কাছে তখন কোনো চি থাকে না, সে যা নির্গত করছে সেটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন একটা পদার্থ। দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখলে এটাকে একধরনের আলোর মতো লাগে। এটা যখন অন্য লোকের শরীরে যায়, সেই লোকটি গরম অনুভব করে এবং এটা অন্য লোকেদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে রোগ নিরাময় করার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না, এ শুধু দমিয়ে রাখতে পারে। সত্যি সত্যি রোগ নিরাময় করতে চাইলে, অবশ্যই অলৌকিক ক্ষমতা থাকা

দরকার, প্রত্যেকটা রোগের জন্যে একটা করে নির্দিষ্ট অলৌকিক ক্ষমতা আছে। অত্যন্ত আণুবীক্ষণিক স্তরে তোমার গোংগ-এর প্রতিটি আণুবীক্ষণিক কণা তোমারই মতো রূপ ধারণ করে। এটা মানুষকে চিনতে পারে, এর বুদ্ধিমত্তা আছে এবং এটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ। অন্য ব্যক্তি যদি এটাকে চুরি করে, এটা সেখানে থাকতে পারবে কি? এটা ওখানে থাকবেই না, ওই ব্যক্তি তার কাছে রাখলেও এটা ওখানে থাকবে না, কারণ এটা তার নিজস্ব জিনিস নয়। যারা সত্যিকারের অনুশীলনকারী তাদের সবার গোংগ বিকশিত হওয়ার পরে, তাদের মাস্টার তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তুমি কী করছ, সেটা সেই মাস্টার দেখছেন, তুমি তাদের কারোর জিনিস নিতে চাইলে, সেই ব্যক্তির মাস্টারই সেটা ঘটতে দেবেন না।

চি সংগ্রহ করা

আমরা যখন উচ্চস্তরের সাধনা শেখাচ্ছি তখন তোমাদের জন্যে চি চুরি করা এবং চি একত্রিত করার বিষয়গুলির সমাধান করার প্রয়োজন নেই। এর কারণ আমার এখনও একটা উদ্দেশ্য আছে: সাধনা পদ্ধতিগুলোর সুনাম পুনরুদ্ধার করতে চাই, কিছু ভালো কাজ করতে চাই, এবং আমি ওইসব খারাপ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, যার ব্যাখ্যা অতীতে অন্য কোনো ব্যক্তি করেনি। আমি তোমাদের সবাইকে এসব জানাতে চাই যাতে কিছু লোক সবসময়ে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, এবং কিছু লোক যারা চিগোংগ সম্বন্ধে সত্যটা জানে না, তারা এর উল্লেখ মাত্রই ভয়ে আর ফ্যাকাশে হয়ে যাবে না।

এই বিশ্বে প্রচুর চি আছে, কিছু লোক স্বর্গীয় য়িয়াংগ চি এবং পার্থিব য়িন চি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। তুমিও এই বিশ্বেরই একটা অংশ, অতএব তুমি খুশি মতো চি সংগ্রহ করতে পার। কিন্তু কিছু লোক এই বিশ্ব থেকে চি সংগ্রহ করে না, তারা উদ্ভিদের থেকে চি সংগ্রহের ব্যাপারে লোকেদের বিশেষ ভাবে শিখিয়ে থাকে, এমনকী তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে সংক্ষেপ করে বলেছে: ‘‘ঝাউ গাছের চি সাদা হয়, পাইন গাছের চি হলুদ হয়, কীভাবে এই চি সংগ্রহ করতে হয়, এবং কোন্ কোন্ সময়ে এটা সংগ্রহ করতে হয়।’’ কেউ একজন এইরকমও দাবি করেছিল: ‘‘আমাদের বাড়ির সামনে একটা গাছ ছিল, আমি সেটার চি সংগ্রহ করার পরে, সেটা মরে গিয়েছিল।’’ এটা কী ধরনের দক্ষতা? সে

কি খারাপ কাজ করছে না? তোমরা জান যে, আমাদের সত্যিকারের সাধনায় ইতিবাচক বার্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তুমি কি করুণার বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রাখবে না? বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার জন্যে, করুণার অনুশীলনও আবশ্যক। তুমি সর্বদা খারাপ কাজ করলে তোমার গোংগ বৃদ্ধি হবে কি? তোমার রোগ দূর করতে পারবে কি? আমরা সাধকরা যা করি, এটা তার বিপরীত নয় কি? এটাকে একটা জীবকে হত্যা করার মতো খারাপ কাজ হিসাবেই গণ্য করা হবে! কিছু লোক সম্ভবত এই রকমও বলবে: ''আপনি যত বলছেন, ততই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, আপনি বলছেন একটা প্রাণীকে হত্যা করা হচ্ছে জীব হত্যা, আবার বলছেন গাছের মৃত্যু ঘটালে, সেটাও জীব হত্যা।'' প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা এইরকমই, বৌদ্ধধর্মে পুনর্জন্মের ছয় পথের কথা বলা হয়ে থাকে, পুনর্জন্মের সময়ে তুমি হয়তো বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে পার, বৌদ্ধধর্মে এইরকমই উল্লেখ করা আছে। আমরা এখানে এইরকম বলছি না। কিন্তু আমরা তোমাদের বলছি: গাছেদেরও জীবন আছে, তাদের শুধু যে জীবন আছে তা নয়, তাঁদের উঁচুস্তরের চিন্তাজনিত কার্যকলাপও আছে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমেরিকাতে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি বৈদ্যুতিন সংক্রান্ত পদার্থ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং অন্য লোকেদের মিথ্যাভাষণ চিহ্নিত করার যন্ত্রের ব্যবহার শেখান। একদিন হঠাৎ তাঁর মনে একটা ধারণার উদয় হল। তিনি মিথ্যাভাষণ চিহ্নিত করার যন্ত্রের দুটো প্রান্তকে একটা টবের ড্রাগন গাছের সঙ্গে যুক্ত করলেন এবং গাছের গোড়ায় জল দিলেন। তিনি দেখলেন যে মিথ্যাভাষণ চিহ্নিত করার যন্ত্রের বৈদ্যুতিন কলমটি ক্ষীপ্র গতিতে একধরনের বক্ররেখা এঁকে দিল, ঠিক এইরকম রেখা মানুষের মস্তিষ্কও অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে যখন সে উত্তেজিত হয় অথবা খুশি হয়। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন যে উদ্ভিদের কীভাবে অনুভবশক্তি থাকতে পারে! তিনি প্রায় রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করে বলতে চাইছিলেন, ''উদ্ভিদের অনুভবশক্তি আছে!'' এই ঘটনার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শীঘ্রই গবেষণায় এই ক্ষেত্রটার উন্মোচন করে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করতে থাকলেন।

একবার তিনি দুটো গাছকে একসাথে রাখলেন এবং তাঁর এক ছাত্রকে একটা গাছের সামনে আর একটা গাছকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মেরে

ফেলতে বললেন। এরপরে তিনি অন্য গাছটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের মধ্যে রাখলেন এবং মিথ্যাভাষণ চিহ্নিত করার যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন, এবার তিনি তাঁর পাঁচজন ছাত্রদের বাইরে থেকে ওই ঘরটার মধ্যে একজন করে প্রবেশ করতে বললেন। প্রথম চারজন ছাত্র ওই ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে গাছটা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। পঞ্চম ছাত্রটি, যে গাছটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে মেরে ফেলেছে, সে যখনই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে, এমনকী সে গাছটার কাছে যাওয়ার পূর্বেই, বৈদ্যুতিন কলমটা ক্ষিপ্রগতিতে একটা বক্ররেখা এঁকে দিল, যেরকম রেখা, শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তির ভয় পাওয়ার সময়েই দেখা যায়। তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করলেন! এই ঘটনাটি একটা খুব বড়ো বিষয়ের উপরে আলোকপাত করল: এতকাল আমরা ভাবতাম যে মানুষ হচ্ছে উচ্চস্তরের জীবন, এবং তার মধ্যে ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলির ক্ষমতা রয়েছে যা জিনিসগুলোকে পৃথক করতে পারে এবং মস্তিষ্ক থাকার জন্যে সে বিচারবিশ্লেষণ করতে পারে। অতএব গাছ কীভাবে জিনিসগুলোকে আলাদা করতে পারল? তাদের ইন্দ্রিয়যন্ত্র আছে না কি? অতীতে যদি কেউ বলতো যে গাছপালার ইন্দ্রিয়যন্ত্র আছে, তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, তাদের অনুভূতি আছে, এবং তারা মানুষ চিনতে পারে, তাহলে লোকেরা তাকে অন্ধবিশ্বাসী বলতো। এসব ছাড়াও কয়েকটা বিশেষ ক্ষেত্রে গাছপালা যেন আজকের মানুষকেও অতিক্রম করে গেছে।

একদিন তিনি মিথ্যা-ধরার যন্ত্রটাকে একট গাছের সঙ্গে যুক্ত করে, তারপরে চিন্তা করছিলেন: ‘‘কী পরীক্ষা করা যায়? আমি এর পাতা আগুনে পোড়াবো, দেখব যে এর প্রতিক্রিয়া কীরকম হয়?’’ এই চিন্তাটার সাথে সাথে এবং এমনকী পাতা পোড়ানোর আগেই বৈদ্যুতিন কলমটা দ্রুত একধরনের বক্ররেখা আঁকল, যা শুধুমাত্র তখনই দেখা যায় যখন কেউ জীবনের সংকটময় মুহূর্তে সাহায্যের জন্যে আর্তনাদ করে ওঠে। এই অতিন্দ্রিয় ক্ষমতা, যাকে অতীতে বলা হতো মনকে পড়তে পারা, এটা মানুষের লুক্কায়িত ক্ষমতা এবং সহজাত ক্ষমতা, অথচ আজকের মানবজাতির অধঃপতন হয়েই যাচ্ছে, সেইজন্যে তোমাকে নতুন করে সাধনা শুরু করতে হবে। তোমার মূলে এবং নিজস্ব সত্যে ফিরে যেতে হবে, তোমার মূল প্রকৃতিতে ফিরে যেতে হবে, একমাত্র তখনই তুমি ওগুলো প্রাপ্ত হবে। অথচ গাছের এইসব আছে, তুমি কী চিন্তা করছ, সেটা সে জানে, শুনে বেশ অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু এগুলো সব সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। ওই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেছিলেন, যার

মধ্যে একটা ছিল দূর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপরে। তাঁর এই প্রবন্ধ ছেপে প্রকাশিত হওয়ার পরে সারা পৃথিবী জুড়ে হৈ চৈ সৃষ্টি হয়েছিল।

বিভিন্ন দেশের উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এই ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করে দিলেন; আমাদের দেশেও তাঁরা এ ব্যাপারে কাজ করতে থাকলেন, এটাকে এখন আর অন্ধবিশ্বাস বলে গণ্য করা হচ্ছে না। আমি আগে একদিন এইরকম বলেছিলাম যে আজকের মানবজাতি যেসব ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা যা উদ্ভাবন করেছে এবং যা যা আবিষ্কার করেছে সেসব আমাদের বর্তমানের পাঠ্যপুস্তকগুলিকে পাল্টানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রভাবের ফলে লোকেরা এখনও এগুলোকে স্বীকার করতে অনীহা প্রকাশ করছে, কেউই এগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে সংঘবদ্ধ করছে না।

চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক উদ্যানে আমি একটা পাইন গাছের বন-এর মরে যাওয়া দেখেছিলাম। কেউ জানে না কিছু লোক ওখানে কী ধরনের চিগোংগ অনুশীলন করছিল, তারা সমস্ত জায়গাটায় মাটিতে গড়াগড়ি দিত এবং গড়াগড়ি শেষ হলে, তারা তাদের পা দুটো একদিকে রেখে এবং হাত দুটো অন্য দিকে রেখে চি সংগ্রহ করত, শীঘ্রই পাইন গাছগুলো সব হলুদ হয়ে গেল এবং মরে গেল। তাহলে তুমি কি ভালো কাজ করলে না খারাপ কাজ করলে? আমাদের অনুশীলনকারীদের দৃষ্টিতে, এটা জীব হত্যা। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমাকে অবশ্যই ভালো মানুষ হতে হবে, ধীরে ধীরে বিশ্বের প্রকৃতির সাথে সম্মিলিত হতে হবে, তোমার ওই খারাপ জিনিসগুলোকে পরিত্যাগ করতে হবে। এমনকী একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেও, এটা ভালো কাজ নয়, এটা হচ্ছে জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করা, সবুজায়ন ধ্বংস করা, জীবকুলের এবং তাদের পরিবেশের মধ্যেকার ভারসাম্যের ক্ষতি করা, ব্যাপারটাকে যে দিক দিয়েই দেখা হোক না কেন, এটা একটা খারাপ কাজ। এই বিশ্বে প্রচুর চি আছে, তুমি খুশি মতো এটা সংগ্রহ করতে পার। কিছু লোকের কাছে প্রচন্ড পরিমাণ শক্তি থাকে, তারা অনুশীলন করার সময় একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে, হাতটাকে একবার আন্দোলিত করেই একটা বড়ো বাগানের গাছগুলির সব চি তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করে ফেলতে পারে। কিন্তু সেটা চি ছাড়া কিছুই নয়, যত চি-ই সংগ্রহ করা হোক না কেন, সেটা কোন্ কাজে লাগবে? কিছু লোক উদ্যানে যায় এবং অন্য কোনো কিছু করে না, তারা বলে: ‘‘আমার চিগোংগ অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না,

আমি যখন চলাফেরা করি তখন হাত দুটো দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটি, এতেই ঠিক হয়ে যায় এবং আমার অনুশীলন শেষ হয়ে যায়।'' সে চি প্রাপ্ত করে ভাবে এটাই ঠিক, সে মনে করে চি হচ্ছে গোংগ। যখন অন্য লোকেরা তার কাছে যাবে তখন তার শরীরটাকে তাদের কাছে বেশ ঠান্ডা বোধ হবে। গাছপালার চি য়িন প্রকৃতির হয় না কি? একজন অনুশীলনকারী য়িন এবং য়িয়াংগ-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু এই ব্যক্তির সারা শরীর থেকে পাইন তেলের গন্ধ বের হতে থাকে, সে নিজে মনে করে যে, তার অনুশীলনটা ভালোই হচ্ছে।

যে অনুশীলন করবে সেই গোংগ প্রাপ্ত হবে

যে অনুশীলন করবে সেই গোংগ প্রাপ্ত হবে, এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে যখন কেউ ফালুন দাফা-র সুবিধার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, আমি বলি এই ফালুন দাফা-য়, ''গোংগ অনুশীলনকারীর সাধনা করে,'' যা শারীরিক ক্রিয়া করার সময়টা কমিয়ে দেয়; এটা শারীরিক ক্রিয়া করার জন্যে সময় না থাকার সমস্যাটার সমাধান করে দেয়, যেহেতু গোংগ-এর দ্বারা সারাক্ষণ তোমার সাধনা করা হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে আমাদের এই পদ্ধতিতে মন এবং শরীর, এই দুটোরই সত্যিকারের যুগ্ম সাধনা করা হয়, সেইজন্যে আমাদের এই ভৌতিক শরীরের খুব বড়ো পরিবর্তন ঘটে। ফালুন দাফাতে আরও একটা সবথেকে বড়ো সুবিধা রয়েছে, এটা সম্বন্ধে আমি আগে কখনোও বলিনি, শুধু আজ আমরা এটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করব। কারণ এটা ইতিহাসগতভাবে উদ্ভব হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে জড়িয়ে আছে, সাধনার জগতে এর খুব বিশাল প্রভাব রয়েছে, পুরো ইতিহাসে কেউ এই বিষয়টা প্রকাশ করতে সাহসী হয়নি, তাদের এটা প্রকাশ করার অনুমতিও দেওয়া হয়নি, কিন্তু আমি এটা না বললে ঠিক হবে না।

কিছু শিষ্য বলে যে: ''মাস্টার লি হোংগ জি যা কিছু বলেন সবই স্বর্গীয় গোপন রহস্য, অর্থাৎ স্বর্গীয় গোপন রহস্য ফাঁস করা।'' কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি লোকেদের উচ্চস্তরে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছি, অর্থাৎ লোকেদের উদ্ধার করছি। আমরা তোমাদের প্রতি দায়বদ্ধ এবং আমরা এই দায়িত্বটা পালন করতে সক্ষম, অতএব আমরা স্বর্গীয় গোপন রহস্য ফাঁস করছি না। কিন্তু কেউ যদি দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে এইসব কথা

বলে, সেটা হচ্ছে স্বর্গীয় গোপন রহস্য ফাঁস করা। আজ আমরা এই বিষয়টা প্রকাশ করব: অর্থাৎ যে অনুশীলন করে সে গোংগ প্রাপ্ত হয়। আমি যেরকম দেখছি, আজকের সমস্ত সাধনা পদ্ধতিগুলো, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বুদ্ধ-মত, তাও-মত এবং চিমেন-মত, এসব ক্ষেত্রে সহ আত্মাই (সহ চেতনা)-ই সাধনা করে এবং সহ আত্মাই গোংগ প্রাপ্ত হয়। আমরা এখানে যে মুখ্য আত্মার আলোচনা করছি, সেটা আমাদের নিজেদের মনকেই ইঙ্গিত করে, তোমার নিজের জানা উচিত যে তুমি নিজে কী চিন্তা করছ, তুমি কী করছ, সেটাই হচ্ছে সত্যিকারের তুমি নিজে। আর সহ আত্মা কী করছে সে ব্যাপারে তুমি একেবারেই কিছু জান না, যদিও সে এবং তুমি একই সাথে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমাদের একই নাম, তোমরা একই শরীর নিয়ন্ত্রণ করছ, তোমাদের দেখতেও একই রকম, কিন্তু যথাযথভাবে বললে, সেটা তুমি নও।

এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে, যার ক্ষতি হবে তারই লাভ হবে, যে সাধনা করবে সেই গোংগ প্রাপ্ত হবে। পুরো ইতিহাসে সমস্ত সাধনা পদ্ধতিতেই এটা শেখানো হয়েছে যে সাধনা করার সময়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবে, কোনো কিছু চিন্তা করবে না, এরপরে গভীর ধ্যানাবস্থায় প্রবেশ করবে, শেষে কোনো কিছু সম্বন্ধে নিজের কোনো জ্ঞান থাকবে না। কিছু লোকের কাছে তিন ঘন্টা বসে ধ্যান করার পরে সেটাকে এক মুহূর্তের মতো মনে হবে, অন্য লোকেরা হয়তো তার এই ধ্যানের ক্ষমতাকে প্রশংসার চোখে দেখবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কি অনুশীলন করেছে? সে নিজে এই ব্যাপারে একেবারেই কিছু জানে না। বিশেষত তাও মতে, যেখানে তারা বলে যে: ‘‘সচেতন আত্মার মৃত্যু হবে এবং আদি আত্মার জন্ম হবে।’’ তারা যেটাকে সচেতন আত্মা বলছে সেটাকে আমরা মুখ্য আত্মা বলি এবং তারা যেটাকে আদি আত্মা বলছে সেটাকে আমরা সহ আত্মা বলি। যদি তোমার সচেতন আত্মার সত্যিই মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তোমারও সত্যিই মৃত্যু হয়েছে এবং মুখ্য আত্মা সত্যিই আর নেই। অন্য পদ্ধতিতে সাধনা করা একজন ব্যক্তি আমায় বলেছিল: ‘‘মাস্টার, আমার অনুশীলনের সময়টাতে, আমি বাড়ির কাউকেই চিনতে পারি না।’’ আবার অপর একজন আমাকে বলেছিল: ‘‘আমি অন্যদের মতো অনুশীলন করি না যারা খুব ভোরে ওঠে অথবা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অনুশীলন করে, আমি বাড়িতে ফেরার পরে সোফায় শুয়ে থাকি, আমি তখন আমার মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অনুশীলন করি, আমি

শুয়ে শুয়ে তার অনুশীলন দেখি।'' আমার মনে খুব দুঃখ হয়েছিল, আবার অন্য দিক দিয়ে এটা ততটা দুঃখজনক নয়!

সবাই সহ আত্মাকে উদ্ধার করে কেন? দেবতা লু দংগবিন[101] একবার এই মন্তব্যটা করেছিলেন: ''আমি মানুষকে উদ্ধার না করে বরঞ্চ একটা পশুকে উদ্ধার করব।'' বস্তুত লোকেদের আলোকপ্রাপ্তি লাভ করা খুবই কঠিন। কারণ সাধারণ লোকেরা সাধারণ মানবসমাজের মায়ায় জড়িয়ে রয়েছে, লোকেরা ব্যবহারিক লাভ-এর সামনে, তাদের আসক্তিকে ছাড়তে পারে না। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু কিছু লোক এই ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরেই বাইরে যাওয়ার সময়ে আবার সাধারণ মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, কেউ যদি তাদের অপমান করে বা তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করে তারা সেটা সহ্য করবে না। কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পরে তারা নিজেদের অনুশীলনকারী হিসাবে একেবারেই গণ্য করবে না। ইতিহাসে অনেক কৃতবিদ্য সাধকের এই উপলব্ধি হয়েছে: ''মানুষকে উদ্ধার করা কঠিন, কারণ তার মুখ্য আত্মা অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে।'' কিছু লোকের আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো থাকে, তাদের একটু আভাস দিলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। আবার কিছু লোক আছে তাদের যে ভাবেই বলো না কেন, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না, তারা মনে করে তুমি বড়ো বড়ো কথা বলছ। আমরা তাকে চরিত্রের সাধনার ব্যাপারে এত বুঝিয়েছি, অথচ যখনই সে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাচ্ছে তখনই সে পূর্বের মতন যেমন খুশি আচরণ করছে। তারা মনে করে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বাস্তবধর্মী, স্পর্শগ্রাহ্য ও আয়ত্তসাধ্য এই সব ছোট ছোট স্বার্থগুলো সত্যিই বস্তুগতভাবে সুবিধাজনক, তারা এখনও এসব পেতে চায়। মাস্টার যে ফা ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা শুনে যুক্তিসংগত লাগে, কিন্তু অনুসরণ করা যায় না। মানুষের মুখ্য আত্মাকে উদ্ধার করা সবচেয়ে কঠিন, অন্যদিকে সহ আত্মা অন্য মাত্রার দৃশ্য দেখতে পারে। সেইজন্যেই তারা চিন্তা করে: ''আমি তোমার মুখ্য আত্মাকে কেন উদ্ধার করব? তোমার সহ আত্মাও তুমি, আমি যদি একে উদ্ধার করি তাহলে ব্যাপারটা একই হল না কি? এর সবই তুমি। সেইজন্যে যারই এটা প্রাপ্তি হোক না কেন সেসব তোমারই পাওয়া হল।''

---

[101]লু দংগবিন - তাও মতের আটজন দেবতার মধ্যে একজন।

আমি তাদের সাধনার পদ্ধতিগুলো বিশেষভাবে বর্ণনা করব। যদি কেউ অলোকদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে সে হয়তো এই দৃশ্যটা দেখতে পারবে: যখন তুমি ধ্যানে বসেছ এবং যেই তুমি আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করছ, ‘‘হুঁশ’’ তোমারই মতন দেখতে একজন, মুহূর্তের মধ্যে তোমার শরীর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তুমি কী সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আলাদা করে চিনতে পারছ? তুমি ঠিক এখানেই বসে আছ। তুমি তাকে তোমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখলে, তারপরে মাস্টার তাকে পরিচালিত করে সাধনা করার জন্যে মাস্টারের দ্বারাই রূপান্তরিত একটা মাত্রায় নিয়ে যাবে, সেটা অতীতের সমাজব্যবস্থা বা আজকের সমাজব্যবস্থা বা অন্য কোনো মাত্রার সমাজব্যবস্থার রূপ নিয়ে প্রকটিত হবে। সেখানে তাকে অনুশীলন শেখানো হবে, তাকে প্রত্যেকদিন একঘন্টা বা দুই ঘন্টা ধরে, প্রচুর দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যখন সে অনুশীলন থেকে ফিরে আসবে, তুমিও ধ্যানের আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠবে, এটা হচ্ছে যখন তুমি দেখতে পারছ।

যখন দেখা যাচ্ছে না, সেটা আরও দুঃখজনক, ওই ব্যক্তি কিছুই জানতে পারে না। সে গভীর ধ্যানের মধ্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় কয়েক ঘন্টা বসে থাকে এবং তারপরে তার থেকে বেরিয়ে আসে। কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ে এবং দু-তিন ঘন্টা ঘুমায় তারা মনে করে যে তারা অনুশীলন করেছে, কিন্তু তারা নিজেদের পুরোপুরি অন্যদের হাতে সঁপে দেয়। তারা প্রত্যেকদিন একটা নির্দিষ্ট সময় বসে ধ্যান করে এবং এইরকম বিরাম নিয়ে নিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে সাধনা সম্পূর্ণ করে। আবার এরকম লোক আছে যারা একবারে অনুশীলনের মাধ্যমে সাধনা সম্পূর্ণ করে, তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে, বোধিধর্ম নয় বছর ধরে একটা দেওয়ালের সামনে বসে ছিলেন, অতীতে অনেক ভিক্ষু ছিলেন যারা কয়েক দশক ধরে বসেছিলেন, ইতিহাসে নব্বই বছরেরও বেশী সময় ধরে বসে থাকার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত নথিভুক্ত করা আছে, কেউ কেউ এর থেকেও বেশী সময় বসেছিলেন, তাদের চোখের পাতার উপরে ধুলোর একটা খুব পুরু আস্তরণ জমে যেত, এমনকী শরীরে ঘাসও গজিয়ে যেত, তবুও তারা ওখানে বসেই থাকত। তাও মতেও এরকম শেখানো হতো, বিশেষত চিমেন মতের কিছু পদ্ধতিতে ঘুমানোকে এক ধরনের অনুশীলন হিসাবে শেখানো হতো, তারা ধ্যানাবস্থা থেকে বেরিয়ে না এসে কয়েক দশক ধরে ঘুমিয়ে থাকত এবং ঘুম থেকে জেগে উঠত না। কিন্তু কে অনুশীলন করত? ওই ব্যক্তির সহ আত্মা বাইরে বেরিয়ে যেত অনুশীলন করার জন্যে, যদি সে দেখতে পারত

তাহলে দেখত যে মাস্টার তার সহ আত্মাকে অনুশীলন করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। সহ আত্মার হয়তো খুব বেশী কর্মের ঋণ থাকতে পারে এবং সম্পূর্ণ কর্মকে দূর করার ক্ষমতা মাস্টারের নেই। সেইজন্যে তাকে বলেন: ‘‘তোমাকে এখানে ভালোভাবে অনুশীলন করতে হবে। আমি এখন বাইরে যাব, কিছু সময় পরে ফিরে আসব, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।’’

মাস্টার পুরোপুরি জ্ঞাত যে এখন কী ঘটবে, কিন্তু কাজটা এইভাবেই করতে হবে। শেষে অসুর এসে তাকে ভয় দেখাবে অথবা একজন সুন্দরীতে রূপান্তরিত হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করবে, বিভিন্ন ধরনের সব জিনিস ঘটবে। অসুর একবার দেখে বুঝতে পারবে যে সে সত্যিই প্রভাবিত হচ্ছে না। এর কারণ সহ আত্মার পক্ষে সাধনা করা অপেক্ষাকৃত সহজতর, যেহেতু সে জিনিসগুলির সত্যটা জানে। অসুর তখন মরিয়া হয়ে তাকে হত্যা করতে চায়, সে বিদ্বেষটা প্রকাশ করার জন্যে এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে সত্যিই তাকে হত্যা করে, এর দ্বারা তার সব ঋণ একবারে শোধ হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে সহ আত্মা নির্গত হয়ে একটা ধোঁয়ার রেখা হয়ে উড়তে থাকে। তখন তার পুনর্জন্ম হয়, এবার সে খুব গরীব একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ছোট থেকেই তার কষ্ট সহ্য করা শুরু হয়ে যায়, বড়ো হয়ে সে যখন সবকিছু বুঝতে পারে তখন তার মাস্টার আসেন, অবশ্য সে তাঁকে চিনতে পারে না। মাস্টার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে তার সঞ্চিত স্মৃতির উন্মোচন ঘটান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সবকিছু মনে পড়ে যায়: ‘‘ইনিই আমার মাস্টার নন কি’’? মাস্টার তাকে বলেন: ‘‘এখনই ঠিক সময়, অনুশীলন শুরু কর,’’ অতএব মাস্টার এইভাবে অনেক বছর ধরে তাকে শিক্ষাগুলো হস্তান্তরিত করতে থাকেন।

শিক্ষা প্রদান শেষ হওয়ার পরে মাস্টার আবার তাকে বলেন: ‘‘তোমার মধ্যে এখনও অনেক আসক্তি আছে যেগুলোকে দূর করতে হবে, তুমি পরিব্রাজন করতে যাও।’’ পরিব্রাজন করা বেশ কষ্টকর, সমাজের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, খাবারের জন্যে ভিক্ষা করতে হয়, বিভিন্ন ধরনের লোকেদের সম্মুখীন হতে হয়, তারা তাকে বিদ্রুপ করে, অপমান করে, তার থেকে সুযোগ গ্রহণ করে, তাকে নানান ধরনের সব ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয়। সে নিজেকে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে মনে করে এবং লোকেদের সঙ্গে সম্পর্কগুলো ঠিক ভাবে বজায় রাখে, নিজের চরিত্রকে সুরক্ষিত রাখে এবং নিরন্তর তার চরিত্রের উন্নতি করতে থাকে, সে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার

প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এইভাবে অনেক বছর পরিব্রাজনের পরে সে ফিরে আসে। মাস্টার তাকে বলেন: ‘‘তুমি ইতিমধ্যে তাও প্রাপ্ত হয়েছ এবং তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমার যদি আর কোনো কিছু করার না থাকে, তুমি ফিরে চলো, সবকিছু গুছিয়ে নাও, যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও। যদি তোমার কোনো কিছু করার বাকি থাকে, তাহলে সাধারণ মানুষের কাজকর্মগুলো শেষ করে ফেল।’’ এইভাবে এত বছর বাদে সহ আত্মা ফিরে এল, যেই সে ফিরে এল, তার মুখ্য আত্মা ধ্যানাবস্থা থেকে বেরিয়ে এল এবং তার মুখ্য চেতনা ঘুম থেকে জেগে উঠল।

কিন্তু সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধনা করেনি, তার সহ আত্মা সাধনাটা করেছে, অতএব সহ আত্মা গোংগ প্রাপ্ত হয়। তবে মুখ্য আত্মাও কষ্ট সহ্য করেছে, যাই হোক তার সম্পূর্ণ যৌবনের সবটাই এখানে বসে কেটে গেছে এবং সাধারণ মানুষ হিসাবে তার জীবনকালের সবই শেষ হয়ে গেছে। তাহলে কী হবে? ধ্যানাবস্থা থেকে জেগে ওঠার পরে ওই ব্যক্তির বোধ হয় যেন অনুশীলন করার ফলে তার মধ্যে গোংগ বিকশিত হয়েছে এবং সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, যদি সে রোগীদের চিকিৎসা করতে চায় বা অন্য কিছু করতে চায় তাহলে সে করতে পারে, যেহেতু সহ আত্মা তাকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। যত যাই হোক এই ব্যক্তিই মুখ্য আত্মা, মুখ্য আত্মাই শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এছাড়া সে এতগুলো বছর এখানে বসে কাটিয়েছে, তার পুরো জীবনকালটাই পার হয়ে গেছে। এই ব্যক্তির জীবন শেষ হয়ে গেলে, সহ আত্মাও চলে যায়, তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নিজস্ব পথে এগিয়ে যায়। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী ওই ব্যক্তিকে আবারও সংসার চক্রের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। যেহেতু তার শরীরে একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা সাধনা করে গেছে, সেইজন্যে তার মধ্যে প্রচুর সদ্‌গুণ সঞ্চিত হয়, তাহলে কী ঘটবে? পরবর্তী জীবনে সে হয়তো একজন উঁচু পদের আধিকারিক হবে অথবা অনেক ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে। এটা শুধু এইভাবেই ঘটবে, অতএব তার সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল না কি?

এই বিষয়টা ব্যাখ্যা করার সম্মতি পাওয়ার জন্যে আমাদের অনেক প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হয়েছে। আমি চিরকালীন এক রহস্যের উন্মোচন করলাম। গোপন থেকেও গোপনীয় এই রহস্যের উদঘাটন করা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব ছিল। আমি পুরো ইতিহাসের বিভিন্ন ধরনের সব সাধনা পদ্ধতির মূল বিষয়টা প্রকাশ করলাম। আমি কি বলেছিলাম না যে

ইতিহাসের উৎপত্তির সঙ্গে এটা গভীর ভাবে যুক্ত রয়েছে? এগুলিই সব কারণ। তোমরা চিন্তা কর: কোন্ সাধনা মতে বা পদ্ধতিতে এইভাবে সাধনা করা হয়নি? তুমি সাধনা করেই যাচ্ছ, করেই যাচ্ছ, অথচ গোংগ প্রাপ্ত হচ্ছ না, তোমার দুঃখ হবে না! তুমি কাকে দোষ দেবে? লোকেরা এতটাই মায়ার মধ্যে হারিয়ে গেছে যে, তারা উপলব্ধি করতে পারে না, তুমি যেভাবেই ইঙ্গিত দাও না কেন কাজ হবে না। উঁচুস্তরের কথা বললে এদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়, আবার নিম্নস্তরের কথা বললে উপরের ব্যাপার উপলব্ধি করতে পারে না। এমনকী আমি জিনিসগুলো এইভাবে ব্যাখ্যা করার পরেও, কিছু লোক চায় আমি যেন তাদের রোগ নিরাময় করে দিই, আমি সত্যিই জানি না তাদের কী বলব। আমরা সাধনার কথা বলি, যদি উচ্চস্তরে সাধনা কর, একমাত্র তাহলেই আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারব।

আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে মুখ্য চেতনাই গোংগ প্রাপ্ত হবে, সেক্ষেত্রে তুমি বললেই কি মুখ্য চেতনা গোংগ প্রাপ্ত হবে? কে অনুমতি দিয়েছে? এটা এরকম নয়, এর জন্যে আবশ্যিক পূর্বশর্তাবলি রয়েছে। তোমরা জান যে, আমাদের এই পদ্ধতিতে সাধনার সময়ে সাধারণ মানব সমাজকে এড়িয়ে যাওয়া হয় না, আমরা মতবিরোধের থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই না অথবা পালিয়ে যেতেও চাই না; সাধারণ মানুষের জটিল পরিস্থিতির মধ্যে তুমি নিজে বিচক্ষণ থাকবে এবং জেনে বুঝে নিজের স্বার্থের হানি সহ্য করবে; যখন অন্যেরা তোমার লাভটা নিয়ে নিচ্ছে, তখন তুমি অন্য লোকেদের মতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লড়াই করবে না; বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের বাধার মধ্যেও তুমি ক্ষতি স্বীকার করবে; তুমি এই ধরনের খুবই কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যেও তোমার সংকল্পকে দৃঢ় করবে, তোমার চরিত্রের উন্নতিসাধন করবে, এখানে সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন ধরনের খারাপ চিন্তার প্রভাবের মধ্যে থেকেও, তুমি এসবের থেকে মুক্ত হয়ে উপরে উঠতে পারবে।

অতএব তোমরা চিন্তা কর, তুমিই কি জেনে বুঝে কষ্টটা সহ্য করছ না? তোমার মুখ্য আত্মাই কি ত্যাগ করছে না? সাধারণ মানুষদের মধ্যে তোমার যেসব জিনিসের ক্ষতি হচ্ছে, তুমি জেনেবুঝেই সেসব ক্ষতি সহ্য করছ না কি? তাহলে এই গোংগ তোমারই প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যেহেতু যার ক্ষতি হয়, তারই লাভ হয়। সুতরাং কেন আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে, সাধারণ মানুষদের এই জটিল পরিবেশের থেকে নিজেদের

আলাদা করে নিয়ে সাধনা করতে হয় না, এটাই হচ্ছে কারণ। সাধারণ মানুষদের এইরকম সংঘর্ষপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কেন আমরা সাধনা করতে চাই? কারণ আমরা নিজেরাই গোংগ পেতে চাই। ভবিষ্যতে কিছু বিশেষ শিষ্য যারা মঠে-মন্দিরে সাধনা করবে, তাদের অবশ্যই সাধারণ লোকেদের মধ্যে পরিব্রাজন করে বেড়াতে হবে।

কিছু লোক জিজ্ঞাসা করে: ''বর্তমানে অন্য চিগোংগ পদ্ধতিগুলোকে কি সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনুশীলনের জন্যে প্রচার করা হয় না?'' কিন্তু সেগুলো শুধুমাত্র জনসাধারণের রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, সত্যিকারের উঁচুস্তরের সাধনায় শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই শিষ্য হিসাবে শেখানো হয়ে থাকে, জনগণের মধ্যে কেউই এর প্রচার করেন না। যাঁরা শিষ্যদের সত্যিকারের পথনির্দেশ করেন, তাঁরা ইতিমধ্যে শিষ্যদের একান্তে নিয়ে গিয়ে শেখাচ্ছেন। এত বছরের মধ্যে, কে এইরকম ভিড়ে ভর্তি জনগণের সামনে এই সব জিনিস ব্যাখ্যা করেছে? কেউই বলেনি। আমরা এই পদ্ধতিটা এইভাবেই শিখিয়ে থাকি, কারণ আমরা এইভাবেই সাধনাটা করি এবং এইভাবেই আমরা গোংগ প্রাপ্ত হই। একই সঙ্গে আমাদের এই পদ্ধতিতে দশ হাজারেরও বেশী জিনিস সবই তোমার মুখ্য আত্মাকে প্রদান করা হয়, যাতে তুমি নিজে সত্যি সত্যি গোংগ প্রাপ্ত হতে পার। আমি বলব আমি যা করলাম, ইতিপূর্বে কেউ কখনো করেনি, আমি দরজাটা সবচেয়ে বড়ো করে খুলে দিয়েছি। আমার এই কথাগুলো শোনার পরে কিছু মানুষ বুঝতে পেরেছে যে আমি যা বলেছি তা সত্যিই অবিশ্বাস্য নয়। মানুষ হিসাবে আমার একটা অভ্যাস আছে, আমার কাছে দশ ফুট থাকলেও, আমি এক ফুটের কথাই বলি, এমনকী তা সত্ত্বেও তুমি বলবে আমি বড়াই করে বলছি। বস্তুত আমি যা বলেছি, সেটা শুধু অল্প একটু অংশ মাত্র, যেহেতু স্তরের বৈষম্য বিরাট, সেইজন্যে মূলগতভাবে আরও উচ্চতর এবং মহান দাফা-র সামান্য অংশও আমি তোমাদের কাছে বলতে পারব না।

আমাদের এই পদ্ধতিতে এইভাবেই সাধনা করা হয়, যাতে তুমি নিজে সত্যি সত্যি গোংগ প্রাপ্ত হও, স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে এই প্রথম এইরকম হল, তুমি ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পার। এটা ভালো, কারণ তুমি নিজে গোংগ লাভ করছ, কিন্তু এটা খুবই কঠিন। এইরকম সাধারণ লোকেদের জটিল পরিবেশের মধ্যে এবং লোকেদের পারস্পরিক চরিত্রগত মতবিরোধের মধ্যে নিজেকে এসবের ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে, এটাই সবচেয়ে

কঠিন। এটা কঠিন এই কারণে যে তুমি জেনে বুঝে সাধারণ মানুষদের স্বার্থের মধ্যে নিজের ক্ষতি স্বীকার করছ, তোমার নিজস্ব কায়েমি স্বার্থ বিপন্ন হলে তোমার মন বিচলিত হয়ে পড়ে কি? লোকেদের পারস্পরিক গোপন ষড়যন্ত্র এবং সংঘর্ষের মধ্যে তোমার মন বিচলিত হয়ে পড়ে কি? তোমার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব কষ্ট সহ্য করলে তোমার মন বিচলিত হয়ে পড়ে কি? তুমি কীভাবে এসবের বিচার করবে? একজন অনুশীলনকারী হওয়া এইরকমই কঠিন! কেউ একজন আমাকে বলেছিল: ‘‘মাস্টার, সাধারণ লোকেদের মধ্যে একজন ভালো মানুষ হওয়াটাই যথেষ্ট, সাধনায় কে সফল হতে পারে?’’ এটা শুনে আমি সত্যিই আশাহত হয়েছিলাম! আমি তাকে আর একটা কথাও বলিনি। কত রকমের চরিত্রই না আছে, একজন ব্যক্তি যতটা উঁচু পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবে ততটাই আলোকপ্রাপ্ত হবে, যে আলোকপ্রাপ্ত হবে সেই লাভবান হবে।

লাও জি বলেছিলেন: ‘‘তাও পথ অনুসরণ করা সম্ভব, কিন্তু এটা কোনো সাধারণ পথ নয়,’’ যদি এটা মাটিতে সব জায়গায় পড়ে থাকত এবং যে কেউ সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এর সাধনা করে সফল হতে পারত, তাহলে তাও এত মূল্যবান হতো না। আমাদের এই অনুশীলন পদ্ধতিতে মতভেদজনিত পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তুমি নিজে গোংগ প্রাপ্ত হবে, সেইজন্যে যতটা সম্ভব সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চলতে হবে, বস্তুগতভাবে তুমি সত্যি সত্যিই কোনো কিছু হারাবে না। কিন্তু এই বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে তোমার চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে হবে। এর সুবিধাটা ঠিক এখানেই, আমাদের এই অনুশীলন পদ্ধতি সবচাইতে সুবিধাজনক যেহেতু এখানে সাধারণ মানুষদের মধ্যে থেকেই সাধনা করা যায় এবং পরিবার ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। আবার এটাই সবচেয়ে কঠিন, যেহেতু এখানে সাধারণ মানুষদের সবথেকে জটিল পরিবেশের মধ্যে থেকেই তোমাকে সাধনা করে যেতে হবে। কিন্তু এটাই সবচেয়ে ভালো, যেহেতু এর দ্বারা তুমি নিজে গোংগ প্রাপ্ত হবে, এটাই আমাদের অনুশীলন পদ্ধতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, আজ আমি সকলের কাছে সেটা প্রকাশ করলাম। অবশ্য যখন মুখ্য আত্মা গোংগ প্রাপ্ত হচ্ছে, তখন সহ আত্মাও গোংগ প্রাপ্ত হবে। কেন এইরকম হবে? যখন তোমার শরীরের সমস্ত বার্তা, সমস্ত জীবিত সত্তা, এমনকী তোমার শরীরের কোষগুলিও গোংগ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাহলে তোমার সহ আত্মাও গোংগ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কোনো সময়েই তার গোংগ তোমার মতো উঁচু হবে না, তুমিই কর্তা, আর সে ফা-এর রক্ষক।

এতটা বলার পরে, আমি আরও কিছু কথা বলব। আমাদের এই সাধনার জগতে এইরকম লোক অনেক আছে যারা সর্বদা উঁচু স্তরে সাধনা করতে চেয়েছে। তারা সব জায়গায় এই ফা-এর খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং অনেক টাকাও খরচ করেছে, তারা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেও কোনো বিখ্যাত মাস্টারের খোঁজ পায়নি। কেউ বিখ্যাত হলেও এটা নিশ্চিত নয় যে সে সত্যিই জিনিসটা ভালো জানে। লোকেরা বৃথাই এখানে সেখানে ভ্রমণ করেছে, অনেক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে এবং প্রচুর অর্থ নষ্ট করেছে, শেষে তারা কোনো কিছুই পায়নি। আজ আমি এত মহৎ একটা সাধনা পদ্ধতিকে তোমাদের জন্যে সার্বজনিক করে দিলাম, আমি ইতিমধ্যে তোমাকে প্রদান করার জন্যে এটা নিয়ে এসেছি এবং তোমার ঠিক দরজার সামনে রেখেছি। এখন এটাই দেখার আছে যে তুমি সাধনা করতে পারছ কি না এবং তুমি সফল হতে পারছ কি না। তুমি যদি এটা করতে পার তাহলে সাধনাটা চালিয়ে যাও। তুমি যদি এটা করতে না পার এবং সাধনা করতে না পার, তাহলে এখন থেকে সাধনা করার কথা ভুলে যাও। কেবল মাত্র অসুর যারা তোমাকে ঠকাবে, তারা ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু শেখাবে না, এর পরে আর তুমি সাধনা করতে পারবে না। আমি যদি তোমাকে উদ্ধার করতে না পারি, আর কেউই তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। বস্তুত বর্তমানে তোমাকে শেখানোর জন্যে সৎ সাধনা পদ্ধতির একজন সত্যিকারের মাস্টারের খোঁজ পাওয়া স্বর্গে ওঠার থেকেও কঠিন, মূলত এসব দিকে কেউই এখন আর নজর দেয় না। ধর্মের বিনাশকালে এমনকী খুব উঁচু স্তরগুলিও কল্পশেষের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, অতএব সাধারণ লোকেদের প্রতি কেউই আর নজরদারি করছে না। এই পদ্ধতিটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক, এছাড়া এই পদ্ধতির অনুশীলন সরাসরি এই বিশ্বের প্রকৃতি অনুযায়ী করা হয়, অতএব আমাদের এই সাধনায় সবচেয়ে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায় এবং এই পথই সবথেকে সোজা, এটা সরাসরি তোমার মনকেই নিশানা করে।

ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ

তাও মতে বৃহৎ এবং ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ শেখানো হয়, আমরা ব্যাখ্যা করব: ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ কী? ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ বলতে

আমরা সাধারণত বলি, রেন এবং দু এই দুটো শক্তিনাড়ী[102] কে যুক্ত করা, এই ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ হচ্ছে উপরিস্তরের ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ, কোনো হিসাবের মধ্যে আসে না, যা শুধুমাত্র রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, এটাকে বলে ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ। আরও একটা ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ আছে যাকে ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ বলে না এবং বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথও বলে না, সেটা হচ্ছে গভীর ধ্যানের মধ্যে সাধনা করার জন্যে এক প্রকারের ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ। এটা শরীরের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে প্রথমে নিওয়ানের চারিদিকে এক পাক ঘোরার পরে, শরীরের অভ্যন্তরে নীচের দিকে নেমে যায়, এটা দ্যান ক্ষেত্রে পৌঁছে সেটার চারিদিকে একপাক ঘোরে এবং উপরের দিকে ওঠে, এটা শরীরের একটা আভ্যন্তরীণ প্রবাহ, এটা হচ্ছে গভীর ধ্যানের মধ্যে সাধনা করার জন্যে সত্যিকারের ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ। এই ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ তৈরি হওয়ার পরে একটা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হয় যার ফলে একটা শক্তিনাড়ী দ্বারা একশ'টা শক্তিনাড়ী গতিশীল হয়, যা অন্য সমস্ত শক্তিনাড়ীকে খুলে দেয়। তাও মতে ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের কথা বলা হয়, বৌদ্ধধর্মে ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের উল্লেখ নেই। তাহলে বৌদ্ধধর্মে কী শেখানো হয়? যখন শাক্যমুনি তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন উনি শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলনের উল্লেখ করেননি এবং সেসব শিক্ষা প্রদানও করেননি, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতেও তাঁর নিজস্ব একপ্রকারের সাধনার দ্বারা রূপান্তরের প্রক্রিয়া আছে। বৌদ্ধধর্মে শক্তিনাড়ী কীভাবে গতিশীল হয়? এটা বাইহুই আকুপাংচার বিন্দুতে শুরু হয়ে তার মধ্যে দিয়ে যায়, তারপরে এটা মাথার উপর থেকে শরীরের নীচের অংশ পর্যন্ত পাক খাওয়া কুন্ডলীর আকারে বিকশিত হয়, শেষে এইরকমভাবে শত শত শক্তিনাড়ীকে গতিশীল করে খুলে দেয়।

তন্ত্রধর্মে, মধ্য শক্তিনাড়ীও এই উদ্দেশ্যটা সাধন করে। কিছু লোক বলে, মধ্য শক্তিনাড়ী বলে কিছু নেই, তাহলে তন্ত্রধর্মে কীভাবে সাধনার দ্বারা মধ্য শক্তিনাড়ী বিকশিত হয়? প্রকৃতপক্ষে মানব শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীকে একত্রিত করে যুক্ত করা হয়, যেগুলো সংখ্যায় দশ হাজারেরও বেশী, এগুলো ঠিক রক্তনালীর মতো অনুভূমিক ভাবে এবং

[102] শক্তিনাড়ী - চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় যে চি (প্রাণশক্তি) এগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় শক্তি প্রবাহের জন্যে, এগুলোর বিন্যাস পরস্পরছেদী জালের মতো।

উল্লম্বভাবে একে অপরকে ছেদ করে, এদের সংখ্যা এমনকী রক্তনালীর থেকেও বেশী। শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির মাঝে কোনো রক্তনালী থাকে না কিন্তু শক্তিনাড়ী থাকে। মাথার উপর থেকে শুরু করে শরীরের সমস্ত অংশে শক্তিনাড়ীগুলো পরস্পরের সঙ্গে অনুভূমিক ভাবে এবং উল্লম্বভাবে থাকে, তন্ত্র সাধনার দ্বারা এগুলোকে যুক্ত করা হয়। সম্ভবত এগুলো শুরুতে সোজা থাকে না, এগুলোকে যুক্ত করার জন্যে খুলে দেওয়া হয়। পরে এগুলো ধীরে ধীরে চওড়া হতে থাকে, আস্তে আস্তে একটা বক্রতাহীন সরল শক্তিনাড়ী তৈরি হয়। এই শক্তিনাড়ীটা অক্ষদন্ড হিসাবে থেকে নিজে নিজেই আবর্তিত হতে থাকে এবং চিন্তার দ্বারা অনুভূমিকভাবে ঘূর্ণায়মান কয়েকটা চক্র সৃষ্টি করে, এর আরও উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীকে খুলে দেওয়া।

আমাদের ফালুন দাফা-র সাধনায় একটা শক্তিনাড়ীর দ্বারা শত শত শক্তিনাড়ীকে চালিত করে গতিশীল করার ব্যাপারটা পরিহার করা হয়, একেবারে প্রথমেই শত শত শক্তিনাড়ীর একই সাথে খুলে যাওয়াটা আবশ্যক এবং একই সাথে শত শত শক্তিনাড়ী আবর্তিত হতে থাকে। আমরা একবারে খুব উঁচু স্তর থেকে অনুশীলন শুরু করি এবং নীচুস্তরের জিনিসগুলোকে পরিহার করি। একটা শক্তিনাড়ী দ্বারা শত শত শক্তিনাড়ীকে চালিত করে তুমি যদি এই সব শক্তিনাড়ীকে সম্পূর্ণ খুলতে চাও, হয়তো পুরো জীবনও তার জন্যে যথেষ্ট নয়; কিছু লোকের কয়েক দশক ধরে সাধনা করা আবশ্যক; এটা সত্যিই কঠিন। অনেক অনুশীলন পদ্ধতিতেই এটা বলা হয়ে থাকে যে সাধনায় সাফল্যলাভের জন্যে একটা জীবন যথেষ্ট নয়, অন্য দিকে অনেক উচ্চস্তরের মহান সাধনা পথের সাধক জীবনকাল বৃদ্ধি করতে পারেন, তাঁরা কি জীবনের সাধনার কথা বলেন না? তাঁরা সাধনা করার জন্যে তাঁদের জীবনকাল বৃদ্ধি করতে পারেন এবং বেশ দীর্ঘকাল ধরে সাধনা করতে পারেন।

ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ মূলত রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ-এর অনুশীলন করা হয় গোংগ-এর জন্যে, অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি সত্যি সত্যি সাধনা করছে। তাও মত অনুযায়ী যে বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের কথা বলা হয়, সেটা আমাদের মতো এতটা শক্তিশালী নয় যা শত শত শক্তিনাড়ীকে একবারে খুলে দেয়। তাও মতের বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথে কয়েকটা শক্তিনাড়ীর আবর্তনের কথা বলা হয়, যেখানে হাতের তিনটে য়িন এবং তিনটে

য়িয়াংগ[103] শক্তিনাড়ী একবারে প্রবাহিত হয়ে পায়ের তলায় যায়, তারপরে দুটো পা হয়ে সোজা মাথার চুল পর্যন্ত যায়, অর্থাৎ পুরো শরীরের মধ্যে দিয়ে যায়, এটাকেই বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের প্রবাহ হিসাবে গণ্য করা হয়। যখন বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের প্রবাহ শুরু হয় সেটাই সত্যিকারের সাধনা, সেইজন্যে কিছু চিগোংগ মাস্টার বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ শেখায় না, তারা যা শেখায় সেটা শুধু রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জিনিস। কিছু লোক বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের কথা বলে, কিন্তু তারা তোমার শরীরে কোনো জিনিস স্থাপন করে না, তুমি নিজে নিজে এটাকে খুলতেই পারবে না। যদি তারা কোনো প্রণালী তোমার শরীরে স্থাপন না করে, তাহলে তোমাকে তোমার মানসিক ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে এটা খুলতে হবে, বলা সহজ করা খুবই কঠিন! এটা ঠিক যেন শরীরের ব্যায়াম চর্চার মতো, কেমন করে এটা খুলবে? সাধনা নির্ভর করে তোমার নিজের উপরে, এবং গোংগ নির্ভর করে মাস্টার-এর উপরে। আভ্যন্তরীণ এই যন্ত্রকৌশল তোমার শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা হলে, একমাত্র তাহলেই এটা কাজ করতে শুরু করবে।

চিরকাল তাও মতের লোকেরা এই মানব দেহকে ছোট বিশ্ব হিসাবে গণ্য করে আসছে। তারা বিশ্বাস করে বহির্বিশ্ব যতটা বড়ো, অন্তর্বিশ্বও ঠিক ততটা বড়ো এবং বাইরেটা যেরকম এর ভিতরটাও সেইরকম। এই বক্তব্যটাকে অবিশ্বাস্য মনে হয় এবং খুব সহজে বোঝা যায় না। ‘‘এই বিশ্ব এত বিশাল, কীভাবে একে মানব দেহের সঙ্গে তুলনা করবে?’’ আমরা এখানে একটা তত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করব। বর্তমানে আমাদের ভৌত বিজ্ঞান বস্তুর উপাদানের উপরে গবেষণায়, অণু থেকে শুরু করে পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ার্ক, শেষ পর্যন্ত নিউট্রিনো পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে। এরও নীচে কোন্ আকারটা আছে? এই ধাপে পৌঁছানোর পরে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আর দেখা যাবে না। এরও নীচে অত্যন্ত ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কণা আর কী আছে? এটা জানা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত আমাদের পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমে যতটুকু জানতে পারা গেছে, তা আমাদের এই বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কণার থেকে খুবই দূরে। একজন ব্যক্তির পার্থিব শরীরটা না থাকলে তার চোখ জিনিসগুলোকে বড়ো

[103]তিনটে য়িন এবং তিনটে য়িয়াংগ--দুই হাত এবং দুই পায়ের তিনটে য়িন এবং তিনটে য়িয়াংগ শক্তি নাড়ীর সমষ্টিগত নাম।

করে দেখতে পারে, সে আণুবীক্ষণিক স্তর দেখতে পারে, যার স্তর যত বেশী উঁচু সে তত বেশী আণুবীক্ষণিক স্তর দেখতে পারবে।

শাক্যমুনি তাঁর স্তর থেকে, তিন হাজার সীমাহীন বিশ্বের তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন যে এই ছায়াপথে ঠিক আমাদের মতোই ভৌতিক শরীরযুক্ত মানুষ আরও আছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে একটা বালির দানার মধ্যে তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব আছে এবং এটা আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইলেকট্রন যেভাবে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে এবং পৃথিবী যেভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এই দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কী? সেইজন্যে শাক্যমুনি বলেছিলেন যে আণুবীক্ষণিক স্তরে একটা বালির দানার মধ্যে তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব আছে। সেগুলো আমাদের এই বিশ্বেরই মতন, যেখানে জীবনও আছে আবার পদার্থও আছে। যদি এই বক্তব্যটা সত্যি হয়, তাহলে তোমরা চিন্তা কর, ওই বালির দানার মধ্যে অবস্থিত বিশ্বের মধ্যে কি বালি নেই? সেক্ষেত্রে ওই বালির দানার মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি বালির দানার মধ্যে কি আরও তিন হাজার সীমাহীন বিশ্ব নেই? তাহলে ওই বালির দানার মধ্যে থাকা প্রতিটি বালির দানার মধ্যে অবস্থিত তিন হাজার বিশ্বের মধ্যে কি বালি নেই? এরও পরে খোঁজ করে যেতে থাকলে এটা অন্তহীন। সেইজন্যে এমনকী তথাগত স্তরে শাক্যমুনি মন্তব্য করেছিলেন, ''এটা এতই বিশাল যে এর বাহির বলে কিছু নেই, এবং এটা এতই ক্ষুদ্র যে এর ভিতর বলে কিছু নেই।'' এটা এতই বিশাল যে, তিনি এর সীমারেখা দেখতে পাননি অথচ এটা এতই ক্ষুদ্র যে মূল পদার্থের সবচেয়ে আণুবীক্ষণিক কণাও তিনি দেখতে পাননি।

কোনো একজন চিগোংগ মাস্টার বলেছিলেন: ''একটা ঘর্মছিদ্রের মধ্যে নগর আছে, যেখানে রেলগাড়ি এবং গাড়ি চলছে।'' শুনে খুব অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমরা যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সত্যি সত্যি এটাকে বোঝার চেষ্টা করি অথবা অধ্যয়ন করি তাহলে দেখব যে ওই বক্তব্যটা ঠিক অতটা অবিশ্বাস্য নয়। অন্য একদিন আমি যখন দিব্যচক্ষু নিয়ে বলেছিলাম, তখন অনেক লোক তাদের দিব্যচক্ষু খোলার সময় এই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেছে: তারা দেখেছে যে তারা যেন তাদের কপালের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে দৌড়াচ্ছে, এবং তাদের মনে হচ্ছিল যেন এর শেষ প্রান্তে আর কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। প্রত্যেকদিন অনুশীলনের সময়ে তাদের মনে হতো তারা যেন এই

বড়ো রাস্তা ধরে বাইরের দিকে দৌড়াচ্ছে, দুই দিকে পাহাড় ও নদী থাকত, দৌড়ানোর সময়ে যখন শহরের মধ্যে দিয়ে যেত তখন তারা অনেক মানুষকে দেখতে পেত। তাদের কাছে এটা মায়া মনে হতো। তাহলে এসব কী? তারা জিনিসগুলোকে খুব স্পষ্ট দেখেছে, অতএব এসব মায়া নয়। আমি বলব, যদি এই মানব শরীর আণুবীক্ষণিক স্তরে সত্যিই এত বিশাল হয়, তাহলে এটা মায়া নয়। কারণ তাও মতের অনুশীলন পদ্ধতিতে মানব শরীরকে চিরকাল একটা বিশ্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, যদি এটা সত্যিই বিশ্ব হয়, তাহলে কপাল থেকে পিনিয়াল গ্রন্থির দূরত্বটা একশ' আট হাজার লি-র থেকে বেশী, তুমি বাইরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু এটা খুবই দূর।

যদি সাধনার পর্বে বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ সম্পূর্ণ খুলে যায়, তাহলে অনুশীলনকারীর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা আসবে। সেটা কোন্ অলৌকিক ক্ষমতা? তোমরা জান যে বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথকে ''শক্তিনাড়ীর ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ,'' ''স্বর্গ-মর্ত্যের আবর্তন,'' ''নদীর জলযানের ঘূর্ণন''ও বলা হয়ে থাকে। খুব অগভীর স্তরের মধ্যে বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের আবর্তন, একটা শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি করে। এটা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে আরও উঁচুস্তরের দিকে রূপান্তরিত হতে থাকে এবং একটা খুব উচ্চঘনত্বযুক্ত শক্তির বেল্ট সৃষ্টি হয়, এই শক্তির বেল্টটা আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তন প্রক্রিয়ার সময়ে তুমি যদি দিব্যচক্ষুর সাহায্যে খুব নীচু স্তরে দেখো তাহলে দেখবে যে এর দ্বারা শরীরের ভিতরের চি-র অবস্থানের অদল-বদল হয়ে যাচ্ছে: হৃৎপিন্ড থেকে চি অন্ত্রে যেতে পারে, যকৃৎ থেকে চি পাকস্থলীতে যেতে পারে------যদি আণুবীক্ষণিক স্তরে দেখতে পারি, তাহলে দেখব যে এটা যে জিনিসগুলোকে স্থানান্তর করছে সেগুলো খুব বড়ো বড়ো। যদি এই শক্তির বেল্টকে শরীরের বাইরে পাঠানো হয়, তাহলে সেটা হবে দূর স্থানান্তরণের ক্ষমতা। যেসব লোকের গোংগ খুব শক্তিশালী, তারা খুব বড়ো বস্তু স্থানান্তর করতে পারে, এটা হচ্ছে বড়ো মাপের স্থানান্তরণ, যেসব লোকের গোংগ খুব দুর্বল, তারা খুব ছোট বস্তু স্থানান্তর করতে পারে, সেটা হচ্ছে ছোট মাপের স্থানান্তরণ। এসবই হচ্ছে দূর স্থানান্তরণের প্রকারভেদ এবং তার উৎপত্তি।

বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ সরাসরি সাধনার অনুশীলনের সঙ্গে জড়িত, সেইজন্যে এটা নানান ধরনের সাধনাজনিত পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন প্রকার গোংগ সৃষ্টি করে, এটা আমাদের জন্যে একটা বিশেষ পরিস্থিতি

নিয়ে আসে। সেটা কোন্ পরিস্থিতি? তোমরা হয়তো কিছু প্রাচীন বই যেমন, *অমর দেবতাদের জীবনী, দ্যান জিংগ, তাও জাংগ, মন এবং শরীরের সাধনার নির্দেশগ্রন্থ* পড়েছ, যেখানে এইরকম একটা কথা ‘‘প্রকাশ্য দিবালোকে বায়ুমন্ডলে উত্থান’’ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এর অর্থ একজন ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে বাতাসে ভাসমান থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমি এটাই বলতে চাই: বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ যখনই খুলে যাবে, তখনই সেই ব্যক্তি শূন্যে ভাসমান থাকতে পারবে, এটা এতটাই সরল। কেউ কেউ ভাবছ: ‘‘লোকেরা এত বছর ধরে অনুশীলন করে আসছে, অতএব বেশ অনেক লোকেরই এখন বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খুলে গেছে।’’ আমি বলব: এইরকম স্তরে পৌঁছে যাওয়া লোকের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী যা অবিশ্বাস্য নয়, তার কারণ বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ আসলে সাধনার একেবারে প্রারম্ভিক ধাপ মাত্র।

তাহলে আমরা কেন ঐসব লোকেদের শূন্যে ভাসমান থাকতে দেখি না? তাদেরকে বায়ুমন্ডলে উত্থান করতেও কেন দেখি না? সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না, সাধারণ মানবসমাজ যেভাবে চলছে সেখানে তুমি ইচ্ছামতো কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পার না অথবা কোনো পরিবর্তন করতে পার না। লোকেদের সবাইকে বায়ুমন্ডলে উড়ে বেড়ানোর অনুমতি কীভাবে দেওয়া যাবে? তখন সেটাকে কি সাধারণ মানবসমাজ বলা যাবে? এটা একটা প্রধান দিক; আর একটা দিক হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা লোকেরা মানুষ হিসাবে থাকার জন্যে জীবনযাপন করছে না, তারা তাদের আদিতে এবং নিজস্ব সত্যে ফেরার জন্যে এখানে আছে। সেইজন্যে আলোকপ্রাপ্তির গুণের প্রশ্নও এখানে রয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি দেখে যে প্রচুর লোক সত্যি সত্যি বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাহলে সেও সাধনা করতে চাইবে, অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্তির গুণের প্রশ্নটা আর থাকবে না। সুতরাং, তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেও, ইচ্ছামতো অন্যদের সেটা দেখতে দিতে পার না এবং লোকেদের কাছে সেটা প্রদর্শন করতে পার না, কারণ অন্য লোকেদের এখনও সাধনা করার আবশ্যকতা রয়েছে। অতএব তোমার বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খুলে যাওয়ার পরে, যতক্ষণ তোমার হাতের আঙ্গুলের ডগা, পায়ের আঙ্গুলের ডগা, অথবা শরীরের কোনো বিশেষ অংশ তালাবন্ধ করা থাকবে, ততক্ষণ তুমি বায়ুমন্ডলে ভেসে উঠতে পারবে না।

যখন আমাদের বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খুলবে, সেইসময়ে একটা সাধনাজনিত পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটে, কিছু লোকের ক্ষেত্রে বসে ধ্যান করার সময়ে, তাদের শরীর সর্বদা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর কারণ শরীরের পিছন দিকের প্রদক্ষিণ পথ অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে খুলেছে, বিশেষ করে শরীরের পিছন দিকটা হাল্কা বোধ হতে থাকে এবং সামনের দিকটা ভারী বোধ হতে থাকে। কিছু লোকের শরীর পিছন দিকে ঝুঁকে থাকে, তাদের কাছে পিছন দিকটা ভারী বোধ হতে থাকে এবং সামনের দিকটা হাল্কা বোধ হতে থাকে। তোমার পুরো শরীর যদি খুব ভালোভাবে খুলে যায়, তাহলে তোমার ধারণা হবে উপরে উঠে যাচ্ছ, বোধ হবে যেন তোমাকে উপরে উত্তোলন করা হচ্ছে, ভূমি ছেড়ে উপরে উঠে যাওয়ার অনুভূতি হতে থাকবে। কিন্তু একবার তুমি সত্যি সত্যি বায়ুমন্ডলে উত্থান করতে সক্ষম হলেই তোমাকে আর উত্থান করতে দেওয়া হবে না, তবে এটাও নিশ্চিত নয়। অলৌকিক ক্ষমতা বয়সের দুটো প্রান্তে বিকশিত হয়, বাচ্চাদের কোনো আসক্তি থাকে না, বয়স্ক লোকেদের বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদেরও কোনো আসক্তি থাকে না, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা সহজেই বিকশিত হয়, তারা সহজে এই ক্ষমতা ধরেও রাখতে পারে। পুরুষদের, বিশেষত যুবকদের, একবার অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হলেই, তারা সেটাকে প্রদর্শন করার মানসিকতাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। একই সাথে তারা হয়তো সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে এটাকে একটা উপায় হিসাবে ব্যবহার করবে। সেইজন্যে তাদের এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না, এমনকী সাধনার দ্বারা তাদের মধ্যে এই অলৌকিক ক্ষমতার আবির্ভাব হলেও সেটাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। যদি শরীরের একটা স্থানকে আটকে রাখা হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি বায়ুমন্ডলে উত্থান করতে পারবে না। কিন্তু এটাও অবশ্যম্ভাবী নয় যে তোমার মধ্যে এই অবস্থাটা কখনোই বিকশিত হবে না, তোমাকে হয়তো এটা চেষ্টা করতে অনুমতি দেওয়া হতে পারে, কারণ কেউ কেউ এটাকে ধরে রাখতে পারে।

যেখানেই আমি বক্তৃতা দিয়েছি, সেখানেই এইরকম পরিস্থিতি ঘটেছে। আমি যখন শানদংগ প্রদেশে ক্লাসে শেখাচ্ছিলাম সেখানে জিনান[104] এবং বেজিং শহরের শিক্ষার্থীরাও হাজির ছিল। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘মাস্টার, আমার কীরকম সব হচ্ছে? আমি যখন হাঁটাচলা

[104]জিনান - শানদংগ প্রদেশের রাজধানী।

করছি, তখন আমি যেন সবসময়েই মাটি ছেড়ে উপরে উঠে আছি, যখন আমি বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছি তখনও আমি যেন বাতাসে ভেসে থাকছি, বিছানা ঢাকার চাদর, এমনকী বিছানার তোষক সবই বাতাসে ভেসে থাকছে, আমি সর্বদা যেন বেলুনের মতো বাতাসে ভেসে থাকছি।'' যখন আমি গুইয়াংগ[105] শহরে ক্লাস নিয়েছিলাম তখন সেখানে গুইঝউ প্রদেশের একজন বয়স্ক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল, যে ছিল একজন বয়স্ক মহিলা, তার ঘরে দুটো বিছানা ছিল, ঘরের দুই দিকের দুটো দেওয়ালের পাশে একটা করে বিছানা রাখা ছিল। সে বিছানায় বসে ধ্যান করছিল, তার অনুভূতি হল যে সে বাতাসে ভেসে আছে, চোখ মেলে একবার তাকিয়ে দেখল যে সে বাতাসে ভেসে অন্য বিছানায় চলে এসেছে; সে একবার চিন্তা করল: ''আমি অবশ্যই আমার বিছানায় ফিরে যাব,'' সে তখনই বাতাসে ভেসে আবার তার বিছানায় ফিরে এল।

চিংগদাও[106] শহরের একজন শিক্ষার্থী ছিল, সে মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের বিরতির সময়ে তার অফিসের একটা ঘরে বিছানায় বসে ধ্যান করছিল, তখন ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না, সে বসে ধ্যান শুরু করা মাত্র বায়ুমন্ডলে ভেসে উঠল, সে খুব জোরের সঙ্গে এক মিটারের মতো উঁচুতে উত্থিত হল। উপরে ওঠার পরে আবার নীচে নেমে এল, উপরে ওঠা এবং নীচে নামা চলতে থাকলো, ''ধপ! ধপ!'' এমনকী বিছানা ঢাকার চাদরটাও উপরে উড়ে গিয়ে ঘরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল। সে কিছুটা উত্তেজিত হল, আবার কিছুটা ভয়ও পেল। পুরো মধ্যাহ্নকালীন বিরতিতে সে এইভাবে ওঠা-নামা করতে থাকল। শেষে কাজ শুরু করার ঘন্টা বেজে উঠল, এবং সে চিন্তা করল: ''আমি অন্যদের এটা দেখতে দিতে পারি না, তারা আশ্চর্য বোধ করবে যে কীসব হচ্ছে? আমার এক্ষুনি থেমে যাওয়া উচিত।'' সে থেমে গেল। অর্থাৎ বয়স্ক লোকেরা এইভাবেই নিজেদের সংযত রাখতে পারে। এটাই যদি কোনো অল্পবয়সি লোকের ক্ষেত্রে ঘটত, তাহলে কাজের ঘন্টা বেজে ওঠা মাত্রই সে ভাবত, ''সবাই এসে দেখ, আমি বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছি।'' ঠিক এখানেই লোকেরা নিজেদের জাহির করার আকাঙ্ক্ষাটাকে সহজে সংযত রাখতে পারে না: ''দেখো আমি কত ভালো অনুশীলন করেছি, আমি শূন্যে উড়তে পারি।'' একবার এইভাবে জাহির করা মাত্র তার ক্ষমতাটা চলে যাবে, যেহেতু এটাকে এইভাবে

[105]গুইয়াংগ - গুইঝউ প্রদেশের রাজধানী।

[106]চিংগদাও - শানডংগ প্রদেশের এক সমুদ্রতটবর্তী শহর।

থাকতে দেওয়ার অনুমতি নেই। এইরকম ঘটনা প্রচুর, সব জায়গার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

আমরা চাই শত শত শক্তিনাড়ীর সব যেন একবারে প্রথমেই খুলে যায়, আজ পর্যন্ত আমাদের আশি থেকে নব্বই ভাগ অনুশীলনকারী সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে, যেখানে তাদের শরীর খুব হাল্কা হয়ে গেছে এবং রোগমুক্ত হয়ে গেছে। একই সাথে আমরা যেরকম বলেছি যে, এই ক্লাসে তোমাদের উপরে ঠেলে ওই অবস্থায় পৌঁছে দেব, তোমাদের শরীর সম্পূর্ণরূপে শোধন করব। এরও উপরে আমরা তোমাদের শরীরের ভিতরে অনেক জিনিস স্থাপন করব, যার ফলে এই ক্লাসেই তোমাদের মধ্যে গোংগ বিকশিত হবে। তোমাদের আমি যেন উপরের দিকে টেনে তুলে আনছি এবং সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রত্যেককে এই ক্লাসে ফা শেখাচ্ছি এবং তোমাদের চরিত্রের অবিরাম রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। যখন এই সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে যাবে তোমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হবে তুমি যেন একজন আলাদা ব্যক্তি, এমনকী জগতের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গিও নিশ্চিতভাবে বদলে যাবে। তুমি জানতে পারবে যে ভবিষ্যতে নিজেকে কীভাবে সামলাতে হবে, তুমি আর পূর্বের মতো নির্বোধ থাকবে না, এটা নিশ্চিতভাবে এইরকমই হবে, সেইজন্যে তোমার চরিত্রও ইতিমধ্যে ঘাটতিটা পূরণ করে ফেলবে।

বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের বিষয়ে এবার আলোচনা করব, যদিও তোমাকে শূন্যে উড়তে দেওয়া যাবে না, কিন্তু তুমি অনুভব করবে যে তোমার পুরো শরীর যেন হাল্কা হয়ে গেছে, তুমি যখন হাঁটবে মনে হবে যেন হাওয়ায় ভর করে হাঁটছ। পূর্বে তুমি কিছুটা হাঁটাচলা করলেই ক্লান্ত বোধ করতে, আর এখন তুমি যতদূরেই হেঁটে যাও না কেন বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তুমি যখন সাইকেলে চড়ে যাবে তখনও মনে হবে কেউ যেন তোমাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়ে যত উঁচুতেই উঠতে হোক না কেন তুমি ক্লান্ত বোধ করবে না, এটা নিশ্চিত যে এরকমই হবে। যারা এই বইটা পড়ে, নিজে নিজে সাধনা করে যাবে, তারাও এই অবস্থাটা প্রাপ্ত হবে, যা তার প্রাপ্য। আমি যে কথা বলতে চাই না, আমি সেটা বলি না, আমি এইরকমই ব্যক্তি, কিন্তু আমি যা বলি সেটা অবশ্যই সত্য। বিশেষত এইরকম পরিস্থিতিতে, আমার এই ফা শেখানোর সময়ে আমি যদি সত্যি কথা না বলি, যদি আমি অবিশ্বাস্য মন্তব্য করি, অথবা আমি নির্দিষ্ট লক্ষ্য না রেখে ইচ্ছামতো বক্তব্য রাখি,

তাহলে আমার দ্বারা অশুভ ফা শেখানো হয়ে যাবে। আমার পক্ষে এটা করা এত সহজ নয়, সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে দেখছে, তুমি বিপথগামী হয়ে যাবে সেটা হতে দেওয়া যাবে না।

একজন সাধারণ মানুষ শুধু জানে যে এই বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের অনুশীলনেই সাধনার সমাপ্তি, কিন্তু আসলে এটাই যথেষ্ট নয়। যদি তুমি এই শরীরটাকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দ্বারা যতটা শীঘ্র সম্ভব পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত বা রূপান্তরিত করতে চাও, তাহলে সেখানে অবশ্যই আর এক ধরনের ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের আকারে একটা চালিকা শক্তি আছে, যা তোমার শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীকে প্রবাহিত করার জন্যে চালনা করে। সেটাকে বলে, ‘‘মাওইয়ো[107](সীমান্ত রেখা) ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ,’’ সম্ভবত খুব কম লোকই এটা জানে। বই-এর মধ্যে কোনো কোনো সময়ে এই শব্দটার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু কেউই এটার ব্যাখ্যা করেনি বা তোমার কাছে বলেনি। তারা শুধু তত্ত্ব হিসাবেই এর আলোচনা করে গেছে, যেহেতু এটা গোপন থেকেও গোপনীয়। আমরা এখানে এর সবকিছু নিয়েই বলব। এটা বাইহুই আকুপাংচার বিন্দু (অথবা হুইইন আকুপাংচার বিন্দু) থেকে আরম্ভ হয়ে শরীরের য়িন এবং য়িয়াংগ-এর মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা বরাবর এগোতে থাকে, নীচে নেমে কানের ধার হয়ে নীচে আসে, এরপরে কাঁধ হয়ে নীচে নামতে থাকে। হাতের প্রতিটা আঙ্গুল ধরে ধরে এগোতে থাকে, তারপরে শরীরের ধার দিয়ে যেতে থাকে এবং পায়ের তলা অতিক্রম করে উরুর ভিতরের দিক বরাবর উঠতে থাকে। এরপরে অন্য উরুর ভিতরের দিক বরাবর নীচে নামতে থাকে এবং অন্য পায়ের তলা অতিক্রম করে, শরীরের অন্য দিক বরাবর উপরে উঠতে থাকে। আবার একটার পর একটা হাতের আঙ্গুল অতিক্রম করে তারপরে মাথার উপরে পৌঁছে গিয়ে একটা আবর্তন সম্পূর্ণ করে, এটাই মাওইয়ো (সীমান্ত রেখা) ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ। অন্যেরা এটা নিয়ে একটা বই লিখে ফেলতে পারে, আর আমি শুধু কয়েকটা বাক্যে এটা বললাম। আমি মনে করি এটাকে কোনো স্বর্গীয় গোপন ব্যাপার হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। কিন্তু অন্য লোকেরা মনে করে এই জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান, বস্তুত কোনো কিছুই এটা নিয়ে বলবে না, তারা যখন শিষ্যদের সত্যিকারের শিক্ষা দেয়, শুধুমাত্র তখনই এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করে। যদিও আমি তোমাদের এটা নিয়ে বললাম, কিন্তু তোমরা কেউই অনুশীলনের সময়ে মানসিক ইচ্ছার দ্বারা এটাকে

[107]মাওইয়ো - শরীরের য়িন এবং য়িয়াংগ ভাগের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা।

পরিচালিত করবে না অথবা নিয়ন্ত্রণ করবে না, যদি কর, তাহলে তোমরা আমাদের ফালুন দাফা-র অনুশীলন করছ না। উচ্চস্তরের সত্যিকারের সাধনাটা করা হয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায়, কোনোরকম মানসিক ক্রিয়া থাকে না, সমস্ত কিছুই তোমার মধ্যে পূর্বে নির্মিত অবস্থায় স্থাপন করা হবে। এই সব জিনিসগুলি নিজে নিজেই তৈরি হয়ে যাবে, এই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রকৌশলগুলি সাধনার মাধ্যমে তোমার বিবর্তন ঘটাবে এবং সময় এলে পরে এরা নিজেরাই আবর্তিত হতে থাকবে। একদিন তুমি যখন অনুশীলন করবে, তোমার মাথা পাশাপাশিভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে, যখন তোমার মাথা এইদিকে আন্দোলিত হবে, তখন যন্ত্রকৌশলগুলি এই দিকেই আবর্তিত হতে থাকবে, যখন তোমার মাথা ওই দিকে আন্দোলিত হবে, তখন সেগুলো ওই দিকেই আবর্তিত হতে থাকবে, যন্ত্রকৌশলগুলি দুটো দিকেই আবর্তিত হতে থাকবে।

বৃহৎ এবং ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খুলে যাওয়ার পরে, বসে ধ্যান করার সময়ে মাথা নড়তে থাকলে, এটা শক্তি প্রবাহের লক্ষণ। আমাদের ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের অনুশীলনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে, যদিও আমরা ওইভাবে অনুশীলন করি, বস্তুত আমরা যখন অনুশীলন করি না তখন এটা নিজে নিজেই আবর্তিত হতে থাকে। সাধারণভাবে এটা চিরকাল এইভাবে ঘুরতেই থাকবে, যখন তুমি অনুশীলন করছ তখন যন্ত্রকৌশলকে সুদৃঢ় করছ। আমরা কি আলোচনা করিনি যে ফা অনুশীলনকারীর সাধনা করে দিচ্ছে? সাধারণভাবে তুমি দেখতে পারবে যে তোমার ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ সর্বদাই ঘুরে যাচ্ছে, যদিও তুমি তখন অনুশীলন করছ না, তোমার শরীরের বাইরে স্থাপন করা চি যন্ত্রকৌশলের এই স্তরটা হচ্ছে বাহ্যিকভাবে স্থিত বড়ো বড়ো শক্তিনাড়ীর একটা স্তর, যেগুলো অনুশীলনের সময়ে তোমার শরীরকে চালনা করছে এবং এসবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। এটা বিপরীত দিকেও ঘুরতে পারে, এটা দুই দিকেই ঘোরে এবং নিরন্তর তোমার শক্তিনাড়ীগুলোকে খুলতে থাকে।

সুতরাং ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খোলার লক্ষ্য কী? ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের নিজের খুলে যাওয়াটা অনুশীলনের লক্ষ্য নয়। এমনকী যদি তোমার ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ খুলেও যায় আমি বলব সেটাও কিছু নয়। যদি তুমি আরও সাধনা চালিয়ে যেতে থাক তাহলে তোমার লক্ষ্য হবে এইরকম ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের মাধ্যমে একটা শক্তিনাড়ীর দ্বারা শত শত শক্তিনাড়ীকে খুলে দেওয়া এবং এইভাবে শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীকে

পুরোপুরি খুলে দেওয়া। আমরা ইতিমধ্যে এটা করতে শুরু করে দিয়েছি। আরও অনুশীলন চালিয়ে গেলে একজন ব্যক্তি বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের প্রবাহের মধ্যে দেখতে পারবে যে শক্তিনাড়ীগুলি খুব চওড়া হয়ে হাতের আঙ্গুলের মতো হয়ে গেছে এবং নাড়ীগুলির ভিতরটাও খুব প্রশস্ত। যেহেতু শক্তিটা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে, শক্তির প্রবাহটা তৈরি হওয়ার পরে, সেটা খুব চওড়া এবং উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু এটাও কোনো হিসাবের মধ্যে আসে না। তাহলে কতটা স্তর পর্যন্ত সাধনা করে যেতে হবে? মানব শরীরের শত শত শক্তিনাড়ীর সবগুলিকে ধীরে ধীরে অবশ্যই চওড়া করা প্রয়োজন, শক্তিটা প্রবল থেকে আরও প্রবলতর এবং উজ্জ্বল থেকে আরও উজ্জ্বলতর হতে থাকে। শেষে দশ হাজারেরও বেশী শক্তিনাড়ী জুড়ে এক হয়ে গিয়ে, একধরনের অবস্থা প্রাপ্ত হয় যেখানে কোনো শক্তিনাড়ী থাকে না, কোনো আকুপাংচার বিন্দুও থাকে না, সমগ্র শরীর জুড়ে গিয়ে এক হয়ে যায়, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে শক্তিনাড়ীগুলির খুলে যাওয়ার সর্বশেষ উদ্দেশ্যপূরণ। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানব শরীরকে সম্পূর্ণরূপে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত করা।

যখন সাধনার এই ধাপে পৌঁছে যাবে, তখন মানব শরীর মূলগতভাবে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে, সেই ব্যক্তি অনুশীলনের দ্বারা ইতিমধ্যে ত্রিলোক ফা সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে এবং তার ভৌতিক শরীর ইতিমধ্যে সাধনার অন্তিম শিখরে পৌঁছে গেছে। যখন এই ধাপে পৌঁছে যাবে, তখন সেই ব্যক্তির কাছে একধরনের সাধনাজনিত পরিস্থিতি এসে যাবে, সেটা কোন্ ধরনের পরিস্থিতি? তার মধ্যে যে গোংগ ইতিমধ্যে বিকশিত হয়ে থাকবে, সেটা খুবই সমৃদ্ধ এবং প্রচুর। সাধারণ মানুষের শরীরের সাধনায় অথবা ত্রিলোক ফা সাধনার পর্বে, মানবীয় সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা (সহজাত ক্ষমতা) এবং সবকিছুই তার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করার সময়ে তার অধিকাংশ ক্ষমতাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। এছাড়া সেই ব্যক্তির গোংগ স্তম্ভ ইতিমধ্যে বেশ উঁচু হয়ে যায়, পরাক্রমশালী গোংগ-এর দ্বারা, সব ধরনের গোংগ-এর শক্তিবৃদ্ধির ফলে সেগুলো বেশ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। কিন্তু সেগুলো শুধু আমাদের এই মাত্রাতেই কার্যকরী, অন্য মাত্রার কোনো কিছুর উপরে কার্যকরী নয়, যেহেতু এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলো শুধুমাত্র আমাদের এই সাধারণ মানুষের ভৌতিক শরীরের সাধনার মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছে। যাই হোক এগুলো খুবই সমৃদ্ধ এবং প্রচুর, এগুলোকে প্রতিটি মাত্রার মধ্যে দেখতে

পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন মাত্রার মধ্যে বিরাজমান শরীরের বিভিন্ন রূপের বেশ অনেকটা পরিবর্তন ঘটে যাবে। সেই শরীরে যেসব জিনিস থাকবে এবং প্রতিটি মাত্রায় অবস্থিত সেই শরীরে যেসব জিনিস থাকবে সেগুলি খুবই সমৃদ্ধ এবং প্রচুর, লোকেরা এসব দেখলে ভয় পেয়ে যেতে পারে। কিছু লোকের সারা শরীরে চোখ থাকবে, এমনকী তাদের শরীরের সমস্ত ঘর্মছিদ্র চোখ হয়ে যাবে, তাদের সম্পূর্ণ মাত্রার ক্ষেত্রের মধ্যেও চোখ থাকবে। যেহেতু বুদ্ধ মতের থেকে গোংগ এসেছে, অতএব কিছু লোকের সারা শরীরে বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের প্রতিকৃতি থাকবে। ইতিমধ্যে তোমার গোংগ-এর বিভিন্ন রূপগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং প্রচুর হয়ে যাবে, এছাড়া অনেক জীবন সত্তা নিজেদের প্রকটিত করতে থাকবে।

সাধনার এই ধাপে পৌঁছে গেলে এক ধরনের অবস্থার আবির্ভাব হয় যাকে বলে, ‘‘মাথার উপরে একত্রে তিনটি ফুল।’’ সেটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান একটা অবস্থা এবং খুবই দৃষ্টিনন্দন, এমনকী যাদের দিব্যচক্ষুর স্তর উঁচুতে নয় তারাও এটা দেখতে পারবে। মাথার উপরে তিনটি ফুল থাকবে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পদ্মফুল, কিন্তু সেটা আমাদের এই ভৌতিক মাত্রার পদ্মফুল নয়, আরও যে দুটো ফুল থাকবে, সেগুলোও অন্যমাত্রার, ফুলগুলি অতীব সুন্দর এবং বিস্ময়কর। তিনটে ফুল মাথার উপরে পালাক্রমে ঘুরতে থাকবে, ফুলগুলো ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী দক্ষিণাবর্তে অথবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমূখী বামাবর্তে ঘুরতে থাকবে, প্রত্যেকটা ফুল নিজে নিজেও ঘুরতে থাকবে। প্রতিটা ফুলের একটা করে বিরাট স্তম্ভ রয়েছে যা ফুলের ব্যাসের মতোই চওড়া। এই তিনটে বড়ো স্তম্ভ সোজা পথে আকাশের উপরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু এগুলো গোংগ স্তম্ভ নয়, এগুলোর এইরকমই আকার, অত্যন্ত রহস্যময় এবং বিস্ময়কর, তুমি নিজে দেখলে ভয়ে লাফিয়ে উঠবে। যখন কোনো ব্যক্তির সাধনা এই ধাপে পৌঁছাবে তখন শরীর শুভ্র ও শুদ্ধ হয়ে যাবে, ত্বক মসৃণ এবং কোমল হয়ে যাবে। সাধনার এই ধাপে সে ত্রিলোক ফা সাধনার উচ্চতম রূপ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এটাই সর্বোচ্চ চূড়া নয়, তাকে এখনও সাধনা চালিয়ে যেতে হবে এবং অবশ্যই সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

সে আরও সামনে এগোতে থাকলে ত্রিলোক ফা সাধনা এবং ত্রিলোক ফা-র ওপারের সাধনার অন্তর্বর্তীকালীন স্তরে প্রবেশ করবে যাকে বলে শুদ্ধ শুভ্র শরীর (এটাকে স্ফটিক শুভ্র শরীরও বলে)। যেহেতু শরীরের সাধনা ত্রিলোক ফা-র উচ্চতম রূপে পৌঁছে যাবে, তখন শুধু রক্তমাংসের মানব

শরীরটা উচ্চতম রূপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যখন তার শরীর সত্যি সত্যি সেই অবস্থায় প্রবেশ করবে, তখন তার পুরো শরীরটাই সম্পূর্ণরূপে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দ্বারা নির্মিত হয়ে যাবে। এটাকে শুদ্ধ শুভ্র শরীর কেন বলা হয়? তার কারণ এই শরীর ইতিমধ্যে নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে। দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখলে, সম্পূর্ণ শরীরকে স্বচ্ছ মনে হবে, ঠিক যেন স্বচ্ছ কাঁচের মতন, কোনো কিছুই দেখা যাবে না, এই ধরনের অবস্থার আবির্ভাব হবে, সরলভাবে বললে, এই শরীর ইতিমধ্যে বুদ্ধ শরীর হয়ে গেছে। এর কারণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দ্বারা নির্মিত এই শরীর ইতিমধ্যে আমাদের নিজেদের শরীরের থেকে অন্যরকম হয়ে গেছে। সাধনার এই ধাপে পৌঁছালে তোমার শরীরে আবির্ভূত হওয়া সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা এবং অতিপ্রাকৃত দক্ষতা সবই একবারে পরিত্যাগ করতে হবে, এগুলোকে খুবই গভীর একটা মাত্রার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হবে, যেহেতু এগুলোর আর প্রয়োজন নেই, এর পরে এগুলো আর কোনো কাজে লাগবে না। শুধুমাত্র একদিন ভবিষ্যতে তুমি যখন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে এবং তাও প্রাপ্ত হবে, তখন তুমি একবার পিছনে ফিরে দেখবে এবং তোমার সাধনার পর্বকে দেখার জন্যে হয়তো এগুলোকে বের করে এনে একবার তাকাবে। এই সময়ে শুধুমাত্র দুটো জিনিস রয়ে যাবে: গোংগ স্তম্ভ তখনো থাকবে এবং সাধনাজাত অমরশিশু বাড়তে বাড়তে ইতিমধ্যে অনেক বড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু এই দুটো জিনিসই খুব গভীর মাত্রায় থাকবে, সাধারণ স্তরের দিব্যচক্ষুসম্পন্ন কোনো মানুষ এগুলোকে দেখতে পারবে না, সে শুধু এটাই দেখতে পারবে যে, এই ব্যক্তির শরীরটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

যেহেতু এই শুদ্ধ শুভ্র শারীরিক অবস্থা একটা অন্তর্বর্তীকালীন স্তর মাত্র, সেই ব্যক্তি আবার সাধনা করে, সত্যি সত্যি ত্রিলোক ফা-র ওপারের সাধনায় প্রবেশ করবে, যাকে বুদ্ধশরীরের সাধনাও বলা যায়। তার সম্পূর্ণ শরীরটা গোংগ দিয়ে নির্মিত হবে, এই সময়ে ইতিমধ্যে তার চরিত্রে স্থিরতা আসবে। সেই ব্যক্তি আবার নতুন করে সাধনা শুরু করলে, পুনরায় নতুন করে অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে, সেগুলোকে আর ‘‘অলৌকিক ক্ষমতা’’ বলা হবে না, সেগুলোকে বলা হবে ‘‘বুদ্ধ ফা-এর ঐশ্বরিক ক্ষমতা,’’ সে তার সীমাহীন শক্তির দ্বারা সমস্ত মাত্রার জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ভবিষ্যতে তুমি যখন নিজে নিরন্তর সাধনা চালিয়ে যেতে থাকবে, আরও উচ্চস্তরের জিনিসগুলো জানতে পারবে, তুমি নিজে

নিজেই জানতে পারবে যে কীভাবে সাধনা করতে হবে, সাধনার প্রচলিত রীতিও জানতে পারবে।

অত্যুৎসাহজনিত আসক্তি

আমি একটা সমস্যার ব্যাপারে বলব, সেটা হচ্ছে অত্যুৎসাহজনিত আসক্তি। প্রচুর লোক বেশ অনেকদিন ধরে চিগোংগ অনুশীলন করে যাচ্ছে, আবার কিছু লোক কোনোদিনই চিগোংগ অনুশীলন করেনি, কিন্তু সত্য জানার জন্যে, মানবজীবনের সত্যিকারের অর্থ জানার জন্যে সারা জীবন ধরে প্রয়াস করে গেছে এবং চিন্তা করে গেছে। একবার আমাদের ফালুন দাফা শেখার পরে হঠাৎ সে জীবনের অনেক প্রশ্ন বুঝতে পেরে যায়, যেগুলোর সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে পূর্বে জানতে পারেনি। সম্ভবত তার চিন্তার উন্নতি হওয়ার ফলে, সে মনে মনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে, এটা একেবারে নিশ্চিত। আমি জানি সত্যিকারের সাধক এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং এটাকে অমূল্য জ্ঞান করবে। কিন্তু প্রায়শ এই সমস্যাটার আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি খুব খুশি হওয়ার ফলে তার মধ্যে অত্যুৎসাহজনিত আসক্তির সৃষ্টি হয়, যা অপ্রয়োজনীয়। এর কারণে, সাধারণ মানবসমাজের পারস্পরিক আদান-প্রদানের সময়ে অথবা সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে, তার কাজকর্মের রীতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে ওঠে, আমি বলব এটা ঠিক নয়।

আমাদের এই সাধনা প্রণালীর বেশীর ভাগ সাধনা করা হয় সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে, অতএব তুমি নিজেকে সাধারণ মানবসমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পার না, তুমি অবশ্যই পরিষ্কার মনে সাধনা করে যাবে। অন্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক এখনও স্বাভাবিক রাখবে, অবশ্যই তোমার চরিত্র খুব উঁচু রাখবে, তোমার মানসিকতা খুব সৎ রাখবে, তুমি চরিত্রের উন্নতিসাধন করতে থাকবে, তুমি নিজের স্তর উন্নত করতে থাকবে, তুমি খারাপ কাজ না করে ভালো কাজ করবে, শুধু এরকমই তোমার আচরণ হবে। কিছু লোক আছে যারা এরকম আচরণ করে যেন তারা মানসিকভাবে স্বাভাবিক নয়, তারা যেন পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তারা যা বলে অন্যেরা সেটা বুঝতেও পারে না। সেইজন্যে অন্য লোকেরা বলে যে, ‘‘এই লোকটা ফালুন দাফা শেখার পর কীভাবে এইরকম হয়ে গেল? মনে হয় সে যেন মানসিকভাবে অসুস্থ।’’ প্রকৃতপক্ষে এটা সেরকম

নয়, সে শুধু অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে পড়েছে, তাকে দেখে কান্ডজ্ঞানহীন এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির অভাব আছে মনে হবে। সবাই চিন্তা কর, তোমার এইরকম আচরণও ঠিক নয়, তুমি একেবারে বিপরীত প্রান্তে চলে গেছ, এটাও একটা আসক্তি। তোমার এটাকে পরিত্যাগ করা উচিত, তুমি সাধারণ লোকেদের মধ্যে অন্য সবার মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে এবং সাধনা করতে থাকবে। তুমি যখন সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকবে, তারা সবাই যদি তোমাকে মোহগ্রস্ত দেখে এবং যদি তোমাকে নিজেদের লোক হিসাবে না দেখে, তখন তারা তোমার থেকে দূরে সরে থাকবে। কেউই তোমাকে চরিত্রের উন্নতিসাধনের সুযোগ প্রদান করবে না এবং কেউই তোমাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে গণ্য করবে না, আমি বলব এটা ঠিক নয়! সেইজন্যে তোমরা প্রত্যেকে এই বিষয়টাতে নিশ্চয়ই মনোযোগ দেবে এবং নিজেকে অবশ্যই ভালোভাবে সামলাবে।

আমাদের এই পদ্ধতি অন্য সাধারণ পদ্ধতিগুলোর মতো নয়, যেখানে লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এবং মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আমাদের এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে তোমার জানা আবশ্যক যে তুমি নিজেই সাধনা করছ। একজন লোক সর্বদা আমাকে বলতো: ‘‘মাস্টার, আমি চোখ বন্ধ করলেই আমার শরীর দুলতে থাকে।’’ আমি বলব যে, এটা হওয়া আবশ্যক নয়, তুমি ইতিমধ্যে তোমার মুখ্য চেতনাকে ছেড়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত করেছ, তুমি যেই চোখ বন্ধ করছ তখন মুখ্য চেতনাকে ছেড়ে দিচ্ছ, এটা অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, তুমি ইতিমধ্যে এই ধরনের অভ্যাস রপ্ত করেছ। তুমি এখানে বসে আছ, অথচ এখন কেন দুলছ না? যখন তুমি চোখ খুলে আছ, সেই অবস্থা যদি বজায় রাখ এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর, তাহলে তোমার শরীর দুলবে কি? নিশ্চিত-ই দুলবে না। তুমি মনে করছ, চিগোংগ এইভাবেই অনুশীলন করা উচিত এবং তুমি এইরকমই ধারণা তৈরি করেছ। চোখ বন্ধ করলেই তুমি আর নেই, কোথায় তুমি গেছ, সেটাও তুমি জান না। আমরা বলেছি যে তোমার মুখ্য চেতনার সচেতন থাকা আবশ্যক, কারণ এই পদ্ধতিতে তোমার নিজের সাধনা করা হয়, তুমি অবশ্যই সচেতনভাবে নিজের উন্নতিসাধন করবে। আমাদের একটা ধ্যানের ক্রিয়াও আছে, আমাদের এই প্রণালীতে কীভাবে ধ্যানের অনুশীলন করা হয়? তোমাদের কাছে আমাদের আবশ্যকতা হচ্ছে এই যে, তুমি যত গভীরভাবেই ধ্যান কর না কেন তুমি অবশ্যই জানবে যে তুমিই এখানে চিগোংগ অনুশীলন করছ। তোমাকে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করা হচ্ছে যে, তুমি কখনোই সেই ধরনের অবস্থার

মধ্যে প্রবেশ করবে না যেখানে তুমি কিছুই জানতে পারছ না। তাহলে কীরকম বিশেষ অবস্থার আবির্ভাব হবে? তুমি যখন ওখানে বসে থাকবে, তখন তোমার বোধ হবে যে তুমি নিজে ঠিক যেন ডিমের খোলসের মধ্যে বসে আছ, চমৎকার এবং অত্যন্ত আরাম অনুভব করবে, তুমি জানবে যে তুমি নিজে সাধনা করছ, কিন্তু তুমি অনুভব করবে যে তোমার পুরো শরীরটাকে নড়াতে পারছ না। আমাদের পদ্ধতিতে এই সব অবশ্যই ঘটবে। আরও এক ধরনের সাধনার অবস্থা আছে, যখন তুমি ধ্যানে বসে আছ, তখন তুমি বসে থাকতে থাকতে আবিষ্কার করবে যে তোমার পা দুটো নেই, তুমি ভাবতেও পারছ না যে পা দুটো কোথায় চলে গেছে, তারপরে দেখবে তোমার শরীরও নেই, তোমার বাহুদুটোও নেই, হাতদুটোও নেই, শুধু তোমার মাথাটাই পড়ে আছে। ধ্যান আরও চালিয়ে যেতে থাকলে তুমি আবিষ্কার করবে যে তোমার মাথাটাও আর নেই, শুধু তোমার নিজের মন আছে, এটুকু চিন্তা থাকবে যে তুমি নিজে এখানে অনুশীলন করছ। তুমি যদি এই অবস্থাটা অর্জন করতে পার, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। কেন এই রকম? যখন একজন ব্যক্তি এই অবস্থায় অনুশীলন করছে, তখন তার শরীরের সম্পূর্নরূপে বিবর্তন ঘটছে, এটাই সর্বোত্তম অবস্থা, সেইজন্যে আমরা চাই তুমি এইরকম শান্ত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ কর। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড়বে না বা আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকবে না, তা নাহলে হয়তো অন্য কেউ অনুশীলন করে ভালো জিনিসটা প্রাপ্ত হবে।

আমাদের সমস্ত অনুশীলনকারী এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে, সাধারণ লোকেদের মধ্যে তোমরা খুব অস্বাভাবিক আচরণ করবে না। তাহলে সাধারণ লোকেদের মধ্যে তোমার খারাপ কাজের প্রভাবটা ইতিবাচক হবে না, লোকেরা বলবে: ‘‘ফালুন দাফা শেখার পরে লোকেরা এইরকম কেন হয়ে যায়?’’ এটা ঠিক ফালুন দাফা-র সুনামের হানি করার মতো একই ব্যাপার, অতএব এই বিষয়টাতে অবশ্যই মনোযোগ দেবে। সাধনার অন্য দিকগুলোতে এবং সাধনার পর্বের মধ্যে লক্ষ্য রাখবে যেন অত্যুৎসাহজনিত আসক্তির সৃষ্টি না হয়। এইরকম আসক্তি থাকলে, অসুররা খুব সহজেই সেই সুযোগটা কাজে লাগাবে।

বাক্ সাধনা

বাক্ সাধনা অতীতে ধর্মগুলিতে শেখানো হতো। কিন্তু এই সাধনা প্রধানত কিছু বিশেষ ধরনের সাধকদের যেমন বৌদ্ধভিক্ষু এবং তাও পুরোহিতদেরই শেখানো হতো, যারা মুখ বন্ধ রাখত এবং কথা বলতো না। যেহেতু তারা বিশেষত সাধনাই করে যেত, সেইজন্যে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানবীয় আসক্তিগুলোকে যত দূর সম্ভব পরিত্যাগ করা, তারা বিশ্বাস করত যে একবার চিন্তা করাও কর্ম। ধর্মগুলিতে কর্মকে পুণ্য কর্ম এবং পাপ কর্ম হিসাবে শ্রেণীবিভাজন করা হয়েছে। পুণ্য কর্ম অথবা পাপ কর্ম, সেটা যাই হোক না কেন বুদ্ধ মতের শূন্যবাদ অথবা তাও মতের অনস্তিত্ববাদ অনুযায়ী, কর্ম সৃষ্টি করা উচিত নয়। সেইজন্যে তারা বলতো, ''আমি কোনো কিছুই করব না।'' কারণ তারা কোনো কাজ-এর পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক দেখতে পারত না, অর্থাৎ এই কাজ করলে শেষমেশ ভালো কাজ করা হবে না খারাপ কাজ করা হবে সেটা নির্ধারণ করতে পারত না, অথবা কোনো কাজের যেসব পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে সেগুলিকে দেখতে পারত না। একজন সাধারণ সাধক, যার স্তর অতটা উঁচু নয়, সে এই জিনিসগুলো দেখতে পারত না, সেইজন্যে সে ভয়ে ভয়ে থাকত যে কোনো কিছু উপরে উপরে ভালো দেখতে হলেও, একবার করলেই সেটা হয়তো খারাপ কাজ করা হয়ে যাবে। সেইজন্যে সে, যথা সম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকার দিকে মনোযোগ দিত, সে কোনো কিছুই করত না। এইভাবে সে আরও কর্ম সৃষ্টি করাকে এড়াতে পারত। কারণ কর্ম সৃষ্টি হলেই তাকে অবশ্যই দূর করতে হবে এবং অবশ্যই কষ্ট সহ্য করতে হবে। যেমন ধর, আমাদের একজন সাধকের ক্ষেত্রে সে কোন্ ধাপে পৌঁছালে আলোকপ্রাপ্ত হবে, সেটা ইতিমধ্যে নির্ধারিত করা আছে। এখন তুমি যদি সাধনার মাঝপথে কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঢুকিয়ে দাও, তাহলে সেটা তোমার সম্পূর্ণ সাধনার প্রক্রিয়াকে কঠিন করে ফেলবে, সেইজন্যে সে নিষ্ক্রিয়তার অনুশীলন করত।

বুদ্ধ মতে যে বাক্ সাধনার কথা বলা হয় তার অর্থ, একজন ব্যক্তির কথাবার্তা তার সচেতন মনের দ্বারা পরিচালিত। সেই সচেতন মনেরও উদ্দেশ্য আছে। যদি একজন ব্যক্তির সচেতন মন নিজে কোনো একটা চিন্তা করতে চায়, কিছু কথা বলে, কিছু কাজ করে, অথবা নিজের সংবেদনশীল অঙ্গগুলিকে এবং চার হাত-পা কে নির্দেশ দেয়, তাহলে

এগুলোও হয়তো সাধারণ মানুষদের মধ্যে একধরনের আসক্তি। উদাহরণস্বরূপ, লোকেদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ থাকে, ‘‘তুমি ভালো,’’ ‘‘সে ভালো নয়,’’ ‘‘তোমার সাধনা ভালো,’’ ‘‘তার সাধনা ভালো নয়,’’ এই কথাগুলো নিজে থেকে মতবিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। আমরা এবার কিছু সাধারণ ব্যাপার নিয়ে বলব, ‘‘আমি এই এই কাজ করতে চাই’’ অথবা ‘‘এখন এই ব্যাপারটা এইভাবে এইভাবে করা উচিত,’’ এটা হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে কারোও মনে আঘাত করবে। যেহেতু লোকেদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধগুলি সবই ভীষণ জটিল, সেইজন্যে হয়তো অনিচ্ছাকৃতভাবে কর্ম সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এই কারণে সে নিজের মুখ একেবারে বন্ধ রাখে যাতে কথা বলতে না হয়। অতীতে ধর্মগুলির মধ্যে বাক্ সাধনাকে সব সময়েই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো, এবং ধর্মগুলিতে এইভাবেই শেখানো হতো।

আমাদের ফালুন দাফা-র অধিকাংশ সাধকই সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করবে (শুধুমাত্র বিশেষ শিষ্যরা ছাড়া), অতএব আমরা সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা এবং সামাজিক আদান-প্রদানকে এড়িয়ে যেতে পারি না। লোকেদের সবারই নিজস্ব একটা কাজ আছে, সেটা অবশ্যই ভালো করে করবে; কিছু লোকের কাজ করার জন্যে কথা বলা আবশ্যক, তাহলে এটা কি মতবিরোধ? না, এটা মতবিরোধ নয়। এটা মতবিরোধ কেন নয়? আমরা যে বাক্ সাধনার কথা বলি সেটা অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যেহেতু সাধনার পথ আলাদা, অতএব আমাদের আবশ্যকতাও আলাদা, আমরা যখন কথা বলব তখন একজন সাধকের চরিত্র অনুযায়ী কথা বলব, আমরা মতভেদ সৃষ্টি করব না এবং অনুচিত কথা বলব না। একজন সাধক হিসাবে কোনো কথা বলার সময়ে আমরা অবশ্যই ফা-এর আদর্শ অনুযায়ী নিজে বিচার করব যে, এই কথাগুলি বলা উচিত কি উচিত নয়। কোনো উচিত কথা বলার ক্ষেত্রে ফা-এর বিচার প্রয়োগ করে যদি দেখা যায় যে সেটি সাধকের চরিত্রের মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তাহলে কোনো সমস্যা হবে না, এছাড়া আমাদের অবশ্যই ফা সম্বন্ধে বলতে হবে এবং ফা-এর প্রচার করতে হবে, অতএব কথা না বললে সেটা ঠিক হবে না। আমরা যে বাক্ সাধনার শিক্ষা প্রদান করি, সেটা ইঙ্গিত করে সাধারণ মানুষদের খ্যাতি ও লাভ সম্বন্ধীয় সেইসব জিনিসকে, যা তুমি ত্যাগ করতে পারনি এবং যার সঙ্গে এই সমাজের মধ্যে একজন সাধকের বাস্তবিক কাজের কোনো সম্পর্ক নেই; অথবা একই সাধনা পদ্ধতির শিষ্যদের নিজেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে গল্পগুজব

করা; অথবা আসক্তির কারণে নিজেকে জাহির করা; অথবা আড্ডার মধ্যে দিয়ে গুজব রটনা করা; অথবা সমাজের অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে ভীষণ উত্তেজিতভাবে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আলোচনা করা, আমি মনে করি এগুলো সবই সাধারণ মানুষদের আসক্তি। আমার মনে হয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে, আমাদের বাক্ সাধনা প্রয়োগ করা উচিত---এটাই হচ্ছে আমাদের বলা বাক্ সাধনা। অতীতে ভিক্ষুরা এইসব জিনিসকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখত, কারণ তার একবার চিন্তা করার অর্থ কর্ম সৃষ্টি হওয়া, সেইজন্যে সে ‘‘শরীর, বাক্ এবং মন’’ এর সাধনার কথা বলতো। শরীরের সাধনার অর্থ হচ্ছে সে খারাপ কাজ করবে না; বাক্ সাধনা-র অর্থ হচ্ছে সে কোনো কথা বলবে না; মনের সাধনার অর্থ হচ্ছে সে এমনকী কোনো চিন্তাও করবে না। অতীতে এই সব ক্ষেত্রে মঠের বিশেষ সাধকদের জন্যে আবশ্যকতাগুলিও অত্যন্ত কঠোর ছিল। আমাদের নিজেদের আচরণ একজন সাধকের চরিত্রের মান অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক, কোন্ কথা বলা উচিত এবং কোন্ কথা বলা উচিত নয়, সেটা যদি কেউ ভালোভাবে বুঝতে পারে তাহলেই ব্যাপারটা ঠিক আছে।

বক্তৃতা - নয়

চিগোংগ এবং শারীরিক ব্যায়াম

সাধারণ স্তরে লোকেরা সহজেই ভেবে নেয় যে চিগোংগ-এর সাথে শারীরিক ব্যায়ামের সরাসরি সম্পর্ক আছে। অবশ্য যদি নীচু স্তর অনুযায়ী বলতে হয় তাহলে সুস্থ শরীর অর্জনের দিকটা দেখলে, চিগোংগ এবং ব্যায়াম একই। কিন্তু চিগোংগ-এর অনুশীলনপদ্ধতিগুলি এবং গৃহীত প্রয়োগকৌশলগুলি নির্দিষ্ট ভাবে শারীরিক ব্যায়ামের থেকে অনেকটাই আলাদা। শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে যদি কেউ সুস্থ শরীর প্রাপ্ত করতে চায় তাহলে তাকে ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হয় এবং তার শারীরিক প্রশিক্ষণ তীব্র করতে হয়; কিন্তু চিগোংগ সাধনায় এর ঠিক বিপরীত, তাকে গতিশীল হতে হয় না, যদি কোনো গতি থাকেও সেটা স্বচ্ছন্দ, মন্থর এবং বৃত্তাকার; কখনো কখনো এমনকী গতিহীন এবং স্থির। শারীরিক ব্যায়ামের যে রীতি তার থেকে এটা অনেকটাই আলাদা। তাহলে উঁচুস্তরের দিক দিয়ে বলা যায় যে চিগোংগ শুধুমাত্র রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার ব্যাপার নয়, এর মধ্যে আরও উচ্চস্তরের জিনিস আছে এবং এর অর্থ আরও গভীর। চিগোংগ কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের স্তরের সামান্য জিনিস নয়, এটা অতিপ্রাকৃত, এছাড়া বিভিন্ন স্তরে এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন, এটা মানুষের স্তর পার করে যাওয়া অনেক অনেক দূরের একরকম জিনিস।

এখন শরীর চর্চার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে ফারাকটা খুবই বিশাল। আধুনিক কালের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার স্তরে নিজের শরীরকে উপযুক্ত রাখার জন্যে এবং সেই ধরনের আবশ্যকতাগুলি পূরণ করার জন্যে, ক্রীড়াবিদকে বিশেষত বর্তমান কালের একজন ক্রীড়াবিদের ক্ষেত্রে, তার ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, সেইজন্যে সর্বদা তার শরীরকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখা আবশ্যক। এই লক্ষ্যটা অর্জন করার জন্যে তাকে অবশ্যই ব্যায়ামের মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে যার তাড়নায় যথেষ্ট রক্ত শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে, সেটা তার বিপাকক্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সর্বদা শরীরের উন্নতির দিকটাকে ধরে রাখে। সে তার বিপাকক্রিয়ার ক্ষমতা কেন বৃদ্ধি করতে

চায়? এর কারণ ক্রীড়াবিদের শরীরকে সর্বদা উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া আবশ্যক যাতে প্রতিযোগিতার সময়ে সর্বোত্তম অবস্থায় থাকে। মানব শরীর অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরি, এই সব কোষের এইরকম একটা প্রক্রিয়া আছে: কোষ-বিভাজনের ফলে তৈরি হওয়া নতুন কোষ প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকে এবং বিকাশ হওয়ার দিকটা প্রদর্শন করে। কোষগুলি বিকাশের শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পরে আর বিকশিত হবে না, তখন কোষগুলির কেবল ক্ষয় হতে থাকে, ক্ষয় হতে হতে শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গেলে, নতুন কোষগুলি এদের প্রতিস্থাপিত করে। উদাহরণস্বরূপ, দিনের বারো ঘন্টা দিয়ে এটা বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন ভোর 'ছ'টার সময়ে কোষ-বিভাজনের ফলে একটা নতুন কোষ তৈরি হয় তখন থেকে এর বিকাশ চলতে থাকে, সকাল 'আট'টার সময়, 'ন'টার সময় এবং 'দশ'টা পর্যন্ত বেশ ভালো সময়। সময়টা দুপুর 'বার'টায় পৌঁছে গেলেই এর বিকাশের ঊর্ধ্বগতি আর থাকে না, তখন সেটা শুধু নীচের দিকেই গড়াতে থাকে। এই সময়টাতে কোষের মধ্যে আরও অর্ধেক জীবনীশক্তি পড়ে থাকে, কিন্তু এই অর্ধেক জীবনীশক্তি একজন ক্রীড়াবিদের প্রতিযোগিতাকালীন অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

তাহলে কী করা উচিত? প্রশিক্ষণ আরও তীব্র করা প্রয়োজন এবং রক্তের প্রবাহকে আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যার ফলে নতুন কোষের উৎপত্তি হবে যেগুলো পুরানো কোষকে প্রতিস্থাপন করবে, এরা এই পথ গ্রহণ করে। অর্থাৎ বলা যায় যে, কোষগুলি তাদের জীবনের পুরো পর্ব শেষ করার আগেই, যখন তারা জীবনের অর্ধেকটা পর্ব সবেমাত্র অতিক্রম করেছে, তখনই তাদের নিষ্কাশন করে দেওয়া হয়, সেইজন্যে শরীরে সবসময়ে শক্তিটা বজায় থাকে এবং উন্নতিও হতে থাকে। কিন্তু মানবকোষের এইরকম বিভাজন অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না, একটা কোষের কতবার বিভাজন হবে তারও একটা সীমা আছে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তির জীবনকালে কোষ বিভাজন একশ'বার হয়, প্রকৃতপক্ষে কোষ বিভাজন দশলাখেরও বেশী বার হতে পারে। এবার ধরা যাক, একজন সাধারণ লোকের কোষ বিভাজন একশ'বার হলে সে একশ' বছর বেঁচে থাকতে পারবে, কিন্তু এখন তার কোষগুলি কেবল অর্ধেক জীবন অতিবাহিত করেছে, তাহলে সে আরও পঞ্চাশ বছর কেবল জীবিত থাকতে পারবে। অথচ আমরা ক্রীড়াবিদদের জীবনে খুব বড়ো সমস্যা দেখতে পাই না, এর কারণ বর্তমানে ক্রীড়াবিদরা তিরিশ বছরে পৌঁছানোর আগেই ছাঁটাই হয়ে যায়, বিশেষত বর্তমানে প্রতিযোগিতার মান খুবই উঁচু হয় এবং ছাঁটাই হয়ে যাওয়া ক্রীড়াবিদদের সংখ্যাও প্রচুর, সুতরাং তারা

পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় এবং তাদের দেখে মনে হয় না যে খুব বেশী প্রভাব পড়েছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটা প্রকৃতপক্ষে এইরকমই ঘটে, শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা একজন ব্যক্তি সুস্থ শরীর বজায় রাখতে সক্ষম হয়, কিন্তু তার আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাইরে থেকে একজন কুড়ি বছরের নীচের কৈশোর অবস্থার ক্রীড়াবিদকে দেখলে তার বয়স কুড়ির কোঠায় মনে হবে; আবার কুড়ির কোঠায় যাদের বয়স, তাদের বয়স ত্রিশের কোঠায় মনে হবে; সাধারণত একজন ক্রীড়াবিদকে দেখলে লোকেদের বোধ হয় যেন প্রত্যাশিত সময়ের আগেই তাদের মধ্যে বয়সের ছাপ পড়ে গেছে এবং তাড়াতাড়ি বার্ধক্য এসে গেছে, অতএব দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যেখানে সুবিধা আছে, সেখানে অসুবিধাও থাকবে, প্রকৃতপক্ষে এরা এই পথই গ্রহণ করেছে।

চিগোংগ সাধনা হচ্ছে শারীরিক ব্যায়ামের ঠিক বিপরীত এবং এতে প্রচন্ড গতির প্রয়োজন হয় না, যখন গতির প্রয়োজন হয় সেটা স্বচ্ছন্দ, মন্থর এবং বৃত্তাকার; কখনো কখনো অত্যন্ত মন্থর, এমনকী গতিহীন এবং স্থিরও হয়ে যায়। তোমরা জান যে বসে ধ্যান করার সাধনা পদ্ধতিতে স্থির অবস্থায় থাকতে হয়, এমনকী হৃৎস্পন্দনের গতিও কমতে থাকে, এমনকী রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই মন্থর হতে থাকে। ভারতবর্ষে অনেক যোগাচার্য আছেন, যাঁরা জলের ভিতরে অনেকদিন বসে থাকতে পারেন, মাটির নীচে চাপা অবস্থায় অনেকদিন থাকতে পারেন, তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্থির করে ফেলতে পারেন, এমনকী হৃৎস্পন্দনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ধরা যাক, মানব কোষ দিনে একবার বিভাজিত হয়, তাহলে একজন অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে যদি তার শরীরের কোষ দুই দিনে একবার, এক সপ্তাহে একবার, অর্ধেক মাসে একবার, এমনকী আরও দীর্ঘ সময়ে একবার বিভাজিত হয়, তাহলে সে ইতিমধ্যে তার পরমায়ু বৃদ্ধি করে ফেলেছে। এটা শুধু সেই ধরনের সাধনা পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করে যেখানে লোকেরা শরীরের সাধনা না করে শুধু মনের সাধনা করে, তারাও এটা অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের পরমায়ু বৃদ্ধি করতে পারে। কেউ কেউ হয়তো ভাবছ: ‘‘মানুষের জীবন এবং জীবনকাল পূর্বনির্ধারিত নয় কি? শরীরের সাধনা না করে সেই ব্যক্তি কীভাবে বেশীদিন বাঁচবে?’’ সত্যিই বাঁচবে, যেহেতু সাধকের স্তর ত্রিলোক ভেদ করলে তার জীবনকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব, কিন্তু উপর থেকে তাকে দেখে খুবই বৃদ্ধ মনে হবে।

সত্যিকারের শরীরের সাধনা পদ্ধতিতে, সংগৃহীত হওয়া উচ্চশক্তি-সম্পন্ন পদার্থগুলি নিরন্তর মানব শরীরের কোষের মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে, নিরন্তর এদের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সময়ে, ক্রমশ সাধারণ মানুষের কোষগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কোষগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে থাকে। সেইসময়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটে, সেক্ষেত্রে এই ব্যক্তি চিরকাল যুবাবস্থায় রয়ে যাবে। অবশ্য সাধনার পর্বে এটা অত্যন্ত মন্থর একটা প্রক্রিয়া এবং এর জন্যে বেশ অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে কষ্ট সহ্য করা খুবই কঠিন। লোকেদের মধ্যে পারস্পরিক চরিত্রগত মতভেদের সময়ে তুমি কি অবিচলিত থাকতে পারবে? যখন তোমার ব্যক্তিগত কায়েমি স্বার্থ সংকটাপন্ন হবে, তখন কি তুমি অবিচলিত থাকতে পারবে? এসব করা খুবই কঠিন, অতএব এটা এইরকম নয় যে তুমি চাইলেই লক্ষ্যটাকে ঠিক অর্জন করতে পারবে। যখন তুমি সাধনার দ্বারা তোমার চরিত্র এবং সদ্‌গুণ-এর উন্নতিসাধন করতে পারবে, একমাত্র তখনই তুমি লক্ষ্যটাকে অর্জন করতে পারবে।

চিরকাল অনেক লোকই চিগোংগ-কে সাধারণ শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে, প্রকৃতপক্ষে তফাৎটা খুবই বিরাট, এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। শুধুমাত্র সর্বনিম্ন স্তরে চি-এর অনুশীলন করা হয় রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার জন্যে, যার ফলে স্বাস্থ্যবান শরীর প্রাপ্ত করা যায়। চিগোংগ-এর সর্বনিম্ন স্তরের এই লক্ষ্যটা, শারীরিক ব্যায়ামের মতো একই প্রকারের, কিন্তু উচ্চস্তরে এরা একেবারেই আলাদা জিনিস। চিগোংগ-এ দেহ শোধনের একটা উদ্দেশ্য আছে, এছাড়া চিগোংগ অনুশীলনকারীদের অতিপ্রাকৃত নীতি মেনে চলা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষদের নীতি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শারীরিক ব্যায়াম শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদেরই জিনিস।

মানসিক ইচ্ছা

মানসিক ইচ্ছা বললে সেটা আমাদের মানব মনের সক্রিয়তাকেই ইঙ্গিত করে। সাধনার জগতে লোকেরা একজন ব্যক্তির মস্তিষ্কের মধ্যে মনের সক্রিয়তার দ্বারা উৎপন্ন মানসিক ইচ্ছাগুলোকে কী চোখে দেখে? মানুষের চিন্তার (মানসিক ইচ্ছা) বিভিন্ন রূপগুলোকে তারা কীভাবে দেখে? এগুলো

কীভাবে প্রকটিত হয়? মানব মস্তিষ্কের উপরে অনেক প্রশ্ন আছে, আধুনিক চিকিৎসার গবেষণার দ্বারা সেগুলোর উত্তর জানা এখনও বেশ কঠিন, কারণ আমাদের শরীরের উপরিতলে অবস্থিত জিনিসগুলোর মতন এত সহজে এটাকে জানা যায় না। গভীর স্তরে এবং বিভিন্ন মাত্রায় এর বিভিন্ন রূপ, কিন্তু কিছু চিগোংগ মাস্টার যেরকম বলেছে, এটা সেরকমও নয়। কিছু চিগোংগ মাস্টার নিজেরাও জানে না যে ঠিক কী ঘটছে, এবং তারা এ সম্বন্ধে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যাও করতে পারে না। তারা ভাবে যে তাদের নিজেদের মস্তিষ্ক একটু সক্রিয় হলে, এবং একটা চিন্তার সৃষ্টি হলেই তারা কোনো কিছু করতে পারে, তারা তখন বলে যে এটা তাদের চিন্তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, অথবা তাদের মানসিক ইচ্ছার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের মানসিক ইচ্ছার দ্বারা মোটেই সম্পাদিত হয়নি।

প্রথমে আমরা চিন্তার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রাচীনকালে চীন দেশে একটা কথা প্রচলিত ছিল: ''হৃদয় চিন্তা করছে''। কেন তারা বলতো যে, হৃদয় চিন্তা করছে? প্রাচীনকালে চীনের বিজ্ঞান অত্যন্ত উন্নত ছিল, কারণ তারা সরাসরি মানব শরীর, জীবন এবং এই বিশ্বকে লক্ষ্য করে গবেষণা করেছিল। কিছু লোক সত্যি সত্যি অনুভব করে যে তাদের হৃদয় চিন্তা করছে, আবার কিছু লোক অনুভব করে যে মস্তিষ্ক চিন্তাটা করছে। কেন এইরকম পরিস্থিতির আবির্ভাব হয়? যারা বলে যে হৃদয় চিন্তা করছে তারও কারণ আছে, এর কারণ আমরা দেখেছি যে সাধারণ মানুষের মুখ্য আত্মা খুবই ক্ষুদ্র এবং তার মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়ে আসা সত্যিকারের বার্তাটা মস্তিষ্কের নিজের দ্বারা সম্পাদিত নয়, মস্তিষ্ক নিজে এটা পাঠায়নি, তার মুখ্য আত্মা এটা পাঠিয়েছে। একজন ব্যক্তির মুখ্য আত্মা শুধু যে নিওয়ান মহলেই থাকে তা নয়। তাও মতে যে নিওয়ান মহলের কথা বলা হয় সেটাকে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে পিনিয়াল গ্রন্থি বলা হয়। যদি তার মুখ্য আত্মা নিওয়ান মহলে থাকে, তাহলে সে সত্যি সত্যি অনুভব করে যে মস্তিষ্ক চিন্তাটা করছে এবং বার্তাগুলো পাঠাচ্ছে; যদি সেটা তার হৃদয়ে থাকে, তাহলে সে সত্যি সত্যি অনুভব করে যে হৃদয় কোনো বিষয়ে চিন্তা করছে।

মানব শরীর একটা ছোট বিশ্ব, মানব শরীরের মধ্যে প্রচুর জীবিত সত্তা আছে, তারা তাদের অবস্থানের অদল-বদল ঘটাতে পারে। যদি মুখ্য আত্মা তার অবস্থান পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে যখন এটা তার পেটে যায় তখন সত্যি সত্যি বোধ হবে যেন পেট চিন্তা করছে, যখন তার মুখ্য

আত্মা পায়ের ডিম অথবা পায়ের গোড়ালিতে যায়, তখন সে বোধ করবে যেন তার পায়ের ডিম অথবা পায়ের গোড়ালি চিন্তা করছে, এটা নিশ্চিত-ই এইরকম, যদিও এটা শুনে খুব অবিশ্বাস্য মনে হবে। তোমার সাধনার স্তর খুব উঁচু না হলেও তুমি এইরকম ঘটনার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারবে। যদি একজন ব্যক্তির শরীরে মুখ্য আত্মা না থাকে, যদি তার প্রকৃতি, স্বভাব এবং ব্যক্তিত্ব না থাকে, যদি তার এই ধরনের জিনিসগুলি না থাকে, তাহলে মানব শরীর কেবল একটা মাংসপিন্ড মাত্র, সে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত একজন স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ মানুষ কখনোই নয়। তাহলে কোন্ কাজ করার জন্যে মানব মস্তিষ্কের প্রয়োজন? তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে বলব এই বস্তুগত মাত্রার রূপ অনুযায়ী মানুষের মস্তিষ্ক কেবল একটা প্রক্রিয়া সম্পাদন করার কারখানা মাত্র। সত্যিকারের বার্তাটা মুখ্য আত্মাই পাঠিয়ে থাকে, কিন্তু সে যা পাঠায় সেটা কোনো ভাষা নয়, সেটা বিশ্বের একরকম বার্তা, যা বিশেষ একটা অর্থ বহন করে। আমাদের মস্তিষ্ক নির্দেশটা গ্রহণ করার পরে, এটার উপরে বিশেষ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে আধুনিক কালের ভাষায়, এই প্রকারে প্রকাশ করে। আমরা সেটা হাতের সংকেত দ্বারা, চোখের ইশারায় অথবা পুরো দেহটার অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করি, মানুষের মস্তিষ্ক শুধু এইভাবে কাজটা সম্পন্ন করে। সত্যিকারের নির্দেশ এবং সত্যিকারের চিন্তা মানুষের মুখ্য আত্মাই পাঠিয়ে থাকে। লোকেরা সাধারণত মনে করে যে মানব মস্তিষ্ক সরাসরি এবং স্বাধীনভাবে এই কাজগুলি করে, প্রকৃতপক্ষে মুখ্য আত্মা কোনো কোনো সময়ে হৃদয়ের মধ্যে থাকে, কেউ কেউ সত্যিই অনুভব করে যে হৃদয় চিন্তাটা করছে।

বর্তমানে যারা মানবশরীরের উপরে গবেষণা করছে, তারা বিশ্বাস করে যে মানুষের মস্তিষ্ক, বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো এক ধরনের জিনিস প্রেরণ করে, বাস্তবে কী জিনিস প্রেরণ করে সে সম্বন্ধে আমরা প্রথমে কোনো কিছু বলব না, কিন্তু তারা স্বীকার করেছে যে এটা এক ধরনের অস্তিত্বশীল বস্তু, অতএব এটা কোনো অন্ধবিশ্বাস নয়। প্রেরিত হওয়া এই জিনিসগুলি কী কাজ করে? কিছু চিগোংগ মাস্টার দাবি করে: ‘‘আমি মানসিক ইচ্ছার দ্বারা কোনো জিনিসকে দূরে স্থানান্তর করতে পারি,’’ অথবা ‘‘আমি মানসিক ইচ্ছার দ্বারা তোমার দিব্যচক্ষু খুলে দিতে পারি,’’ অথবা ‘‘আমি মানসিক ইচ্ছার দ্বারা রোগ নিরাময় করতে পারি’’ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে কিছু চিগোংগ মাস্টার নিজেরাও এমনকী একেবারেই জানে না যে তারা কোন্ কোন্ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের কাছে

সেটা স্পষ্টও নয়। তারা শুধু জানে যে তারা যা কিছু করতে চায় তাই করতে পারে, শুধু সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করলেই হবে। বস্তুত তাদের মানসিক ইচ্ছা কাজ করতে থাকে, একজন ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা তার নিজের মস্তিষ্কের মানসিক ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং মানসিক ইচ্ছার নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজটা সম্পন্ন করে, তার মানসিক ইচ্ছা নিজে কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে না। একজন চিগোংগ অনুশীলনকারী যখন কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে, তখন তার অলৌকিক ক্ষমতাই সেই কাজটা সম্পন্ন করে।

অলৌকিক ক্ষমতাগুলি মানব শরীরের সহজাত ক্ষমতা, মানবসমাজের বিকাশের সাথে সাথে, লোকেদের মনের চিন্তাগুলি রূপান্তরিত হয়ে উত্তরোত্তর জটিল হয়ে গেছে, তারা ব্যবহারিক জিনিসের প্রতি আরও বেশী করে গুরুত্ব দিয়েছে, লোকেরা তথাকথিত আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রতি অধিকতরভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং এইভাবে তদের সহজাত ক্ষমতাগুলি অধিকতরভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাও মতে শিক্ষা দেয় যে তোমাকে তোমার মূলে এবং নিজস্ব সত্যে ফিরে যেতে হবে, সাধনার পর্বে তুমি সত্যের জন্যে অবশ্যই প্রয়াসী হবে, শেষে তোমার মূলে এবং নিজস্ব সত্যে ফিরে যাবে। তুমি তোমার মূল প্রকৃতিতে ফিরে গেলে, তাহলেই তোমার এইসব সহজাত ক্ষমতা প্রকটিত হবে। আমরা এখন এগুলিকে অলৌকিক ক্ষমতা বলি, প্রকৃতপক্ষে এগুলি সবই মানুষের সহজাত ক্ষমতা। মানবসমাজকে দেখে আমাদের মনে হচ্ছে যেন সামনের দিকে এগোচ্ছে, বস্তুত এটা পিছনের দিকে যাচ্ছে এবং বিশ্বের প্রকৃতি থেকে উত্তরোত্তর দূরে চলে যাচ্ছে। আমি সেদিন বলেছিলাম যে, মাস্টার ঝাংগ গুয়ো লাও গাধার পিঠে চড়ে পিছনের দিকে গিয়েছিলেন, লোকেরা সম্ভবত এর অর্থটা বুঝতেই পারেনি। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে সামনের দিকে এগোনোর অর্থ পিছনের দিকে যাওয়া, মানবজাতি বিশ্বের প্রকৃতি থেকে উত্তরোত্তর দূরে চলে যাচ্ছে। বিশ্বের বিবর্তনের পর্বে, বিশেষত বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের অর্থনীতির বিশাল ঢেউ-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দরুন অনেক মানুষ ভীষণভাবে নীতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতা থেকে উত্তরোত্তর দূরে চলে যাচ্ছে, যারা সাধারণ লোকেদের এই স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে তারা এখনও এটা বুঝতে পারছে না যে মানবজাতির নৈতিকতার অধঃপতন ঠিক কতটা হয়েছে, সেইজন্যে কিছু লোক এরকমও মনে করে যে এটা ভালো জিনিস। শুধুমাত্র সেইসব লোকেরা, যারা সাধনার মাধ্যমে চরিত্রের উন্নতিসাধন করেছে, তারা পিছন

ফিরে তাকালে তাহলেই জানতে পারে যে, মানবজাতির নৈতিকতার অধঃপতন এততা ভয়ংকর অবস্থায় পৌঁছেছে।

কিছু চিগোংগ মাস্টার দাবি করে: ‘‘আমি তোমার অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত করতে পারি।’’ কোন্ অলৌকিক ক্ষমতা তারা বিকশিত করতে পারবে? শক্তি না থাকলে, একজন ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করতে পারবে না, এটার উদয় নাহলে তুমি কীভাবে এটাকে বিকশিত করবে? কোনো ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা তার নিজস্ব শক্তির দ্বারা শক্তিশালী রূপ ধারণ না করলে, তুমি কীভাবে সেটা বিকশিত করবে? এটা একেবারেই সম্ভব নয়। তারা তোমার অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত করার সম্বন্ধে যা বলছে সেটা শুধু তোমার মধ্যে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া অলৌকিক ক্ষমতার সাথে তোমার মস্তিষ্কের একটা সংযোগ স্থাপন করা, তখন সেটা তোমার মস্তিষ্কের চিন্তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। তারা এটাকেই অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারা তোমার কোনো অলৌকিক ক্ষমতাই বিকশিত করেনি, তারা শুধু এই সামান্য কাজটুকু করে।

একজন অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে তার মানসিক ইচ্ছা অলৌকিক ক্ষমতাকে কিছু করার নির্দেশ দিতে পারে; একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তার মানসিক ইচ্ছা তার চার হাত-পা এবং সংবেদনশীল অঙ্গগুলিকে কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে। এটা ঠিক যেন একটা কারখানার উৎপাদন কার্যালয়ের মতো, যেখানে পরিচালকের কার্যালয় নির্দেশাবলি পাঠাচ্ছে এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট কাজের বিভাগগুলি কর্মসূচি রূপায়ণ করে যাচ্ছে। অর্থাৎ এটা ঠিক যেন সৈন্যবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মতো, যেখানে সেনাপতির কার্যালয় আদেশ দিচ্ছে এবং সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে একটা বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে নির্দেশ জারি করছে। যখন আমি অন্যান্য অঞ্চলে বক্তৃতা দিতে যেতাম তখন প্রায়ই স্থানীয় চিগোংগ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। তারা সবাই ভীষণ অবাক হয়ে যেত: ‘‘আমরা সর্বদা গবেষণা করছি যে মানব মনের সুপ্ত শক্তি কতটা এবং সুপ্ত চেতনা কতটা।’’ আসলে এটা এরকম নয়, শুরু থেকেই তারা ভুল পথে চলেছে। আমি বলেছি যে মানব শরীরের বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হলে মানুষের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক। অতিপ্রাকৃত জিনিস জানার জন্যে সাধারণ

মানুষদের যুক্তিবিচার পদ্ধতি এবং তাদের জানার পদ্ধতির প্রয়োগ করা যাবে না।

মানসিক ইচ্ছার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটা কয়েক প্রকারের হয়। যেমন কিছু লোক বলে সুপ্ত চেতনা, অবচেতনা, প্রেরণা, স্বপ্ন ইত্যাদি। স্বপ্ন নিয়ে বলার ব্যাপারে কোনো চিগোংগ মাস্টারই এটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ তুমি যখন জন্মগ্রহণ করেছ, একই সাথে বিশ্বের অনেক মাত্রার প্রত্যেকটাতে একটা করে ‘‘তুমি’’ জন্মগ্রহণ করেছে, এবং এই অন্য ‘‘তুমি’’ গুলোর সাথে তুমি মিলে হয় এক সম্পূর্ণ তুমি, এদের সবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, এদের সবার চিন্তাগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে। এছাড়া তোমার মুখ্য আত্মা আছে, সহ আত্মা আছে, অন্য আরও বিভিন্ন ধরনের জীবনসত্তা তাদের রূপ নিয়ে তোমার দেহের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিটি কোষ এবং তোমার প্রত্যেকটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ, তোমার অন্য মাত্রাগুলিতে বিরাজমান সেই রূপটা পরিগ্রহ করে যার মধ্যে তোমার প্রতিমূর্তি এবং বার্তা রয়েছে, সুতরাং এটা অত্যন্ত জটিল। তুমি যখন স্বপ্ন দেখছ তখন, এই মুহূর্তে জিনিসগুলো একভাবে ঘটছে, আবার পর মুহূর্তে অন্যভাবে ঘটছে, আসলে এগুলো কোথা থেকে আসছে? চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হচ্ছে যে আমাদের গুরুমস্তিষ্কে পরিবর্তন ঘটার জন্যে এটা হয়ে থাকে। বস্তুগতভাবে প্রতিক্রিয়াটা এভাবেই প্রকটিত হয়, প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য মাত্রা থেকে আসা বার্তাগুলি তোমার সত্তাকে প্রভাবিত করার ফলে এইরকম হয়ে থাকে। সেইজন্যে স্বপ্ন দেখার সময়ে তুমি হতভম্ব অবস্থা বোধ কর, কিন্তু এসবের সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্কই নেই এবং এগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে একধরনের স্বপ্ন আছে যার সাথে তোমার সরাসরি সম্পর্ক আছে, এই ধরনের স্বপ্নকে আমরা ঠিক ‘‘স্বপ্ন’’ বলতে পারি না। তোমার মুখ্য চেতনা অর্থাৎ মুখ্য আত্মা স্বপ্নের সময়ে দেখছে যে তোমার পরিবারের কেউ তোমার কাছে আসছে অথবা তুমি একটা ঘটনা বাস্তবিকই অনুভব করলে, যেমন তুমি কোনো জিনিস দেখলে অথবা কোনো কিছু করলে। সেক্ষেত্রে তোমার মুখ্য আত্মা, অন্য মাত্রার মধ্যে সত্যি সত্যি কোনো কিছু করেছে অথবা কোনো জিনিস দেখেছে, এটা করার সময়ে তোমার চেতনা পরিষ্কার ছিল এবং ঘটনাটা প্রাণবন্তভাবে অনুভব করেছ, এ সমস্ত জিনিসের সত্যি সত্যি অস্তিত্ব আছে, তবে এটা কেবল অন্য ভৌতিক মাত্রার মধ্যে এবং অন্য সময়-মাত্রার মধ্যে ঘটেছে। তুমি এগুলোকে স্বপ্ন বলতে পার কি? বলতে পার না। কিন্তু তোমার ভৌতিক

শরীর বাস্তবিকই এখানে ঘুমাচ্ছিল, শুধু সেইজন্যে তুমি এটাকে স্বপ্ন বলতে পার, শুধুমাত্র এই ধরনের স্বপ্নের সঙ্গেই তোমার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

মানুষের প্রেরণা, অবচেতনা এবং সুপ্ত চেতনার সম্বন্ধে বলার ব্যাপারে আমি বলব যে এই সব নামগুলো বৈজ্ঞানিকরা ব্যবহার করেনি। এই সব নাম সাহিত্যিকরা সাধারণ মানুষদের স্বভাবগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বানিয়েছে, এই নামগুলি অবৈজ্ঞানিক। সাধারণ লোকেরা যে সুপ্ত চেতনার কথা বলে সেটা আসলে কী? এটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা কঠিন এবং খুবই অস্পষ্ট। যেহেতু মানুষের বিভিন্ন বার্তাগুলি খুবই জটিল এবং ঠিক যেন একধরনের টুকরো টুকরো সব আবছা স্মৃতি। এখন অবচেতন অবস্থা সম্বন্ধে লোকেরা যা বলে, আমাদের পক্ষে এটা ব্যাখ্যা করা বেশ সহজ। অবচেতন অবস্থার সংজ্ঞা যেভাবে নিরূপণ করা হয়েছে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী সাধারণত কোনো ব্যক্তি হতভম্ব অবস্থায় কোনো কার্য সম্পন্ন করে। সেক্ষেত্রে লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে যে সে এই কাজটা অবচেতন অবস্থায় করেছে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে করেনি। এই অবচেতনা এবং আমাদের বলা সহ চেতনা একই। যখন মুখ্য চেতনা বিশ্রাম নেওয়ার অবস্থায় থাকে, মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে না, হতভম্ব অবস্থায় থাকে, ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে অথবা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে, অর্থাৎ যখন অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে, তখন সহ চেতনা অর্থাৎ সহ আত্মা সহজেই মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই সময়ে সহ চেতনা কিছু বিশেষ জিনিস করতে পারে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে, যখন তুমি হতভম্ব অবস্থায় থাক তখনই সে ওই জিনিসগুলো করে। কিন্তু এই জিনিসগুলি প্রায়শ ভালোভাবে করে, যেহেতু সহ চেতনা অন্য মাত্রায় কোনো কিছুর মূল প্রকৃতিটা দেখতে পারে, এবং সাধারণ মানবসমাজের মায়ার দ্বারা সে বিভ্রান্ত হয় না। সেইজন্যে কাজটা করার পরে, তুমি প্রকৃতিস্থ হয়ে, কাজটাকে যখন আবার ফিরে দেখবে, তখন বলবে: ‘‘এই কাজটা আমি এতটা খারাপ কীভাবে করলাম? আমি বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজটা করলে এইরকম করতাম না।’’ কিন্তু তুমি এখন কাজটা খারাপ বললেও, দশদিন অথবা অর্ধেক মাস কেটে যাওয়ার পরে তুমি আবার যখন কাজটা ফিরে দেখবে, তখন তুমিই বলবে: ‘‘বাঃ, এই কাজটা আমি এত ভালোভাবে করেছিলাম! তখন কীভাবে এই কাজটা করেছিলাম?’’ এইরকম প্রায়ই ঘটে। এর কারণ সহ চেতনা কাজটার তাৎক্ষণিক ফলের প্রতি লক্ষ্য রাখে না কিন্তু ভবিষ্যতে ফলটা ভালোই হয়। কিছু কাজ আছে যেগুলোর ভবিষ্যতে কোনো প্রভাব নেই, কিন্তু

তাৎক্ষণিক কার্যকারিতা আছে, এক্ষেত্রেও সহ চেতনা হয়তো সেইসময়ে অত্যন্ত ভালোভাবেই সেই কাজটা করবে।

আরও এক প্রকার আছে: অর্থাৎ জন্মগত সংস্কার যাদের খুব ভালো, উন্নত জীবন সত্তারা তাদের সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কিছু কাজ করাতে পারে। অবশ্য এটা অন্য ব্যাপার এবং এটা সম্বন্ধে এখানে বলব না, আমরা প্রধানত এক ধরনের চেতনার কথা বলব যা মানুষের নিজের মধ্যে থেকে উৎপন্ন হয়।

প্রেরণা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটাও সাহিত্যিকদের দেওয়া নাম। প্রেরণা বলতে সাধারণভাবে লোকেরা বিশ্বাস করে যে, একজন ব্যক্তি সারা জীবন ধরে যেসব জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, এক মুহূর্তে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো সেটা ফেটে ছড়িয়ে পড়ে। আমি বলব যে তুমি যদি বস্তুবাদ[108]-এর তত্ত্ব অনুযায়ী এর প্রতি লক্ষ্য কর, সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সারাজীবন ধরে জ্ঞান আহরণ করে, সে যত বেশী জ্ঞান আহরণ করবে এবং সে তার মস্তিষ্ককে যত বেশী ব্যবহার করবে তার মস্তিষ্কও তত বেশী ক্ষুরধার হবে। যখন সে এটা প্রয়োগ করবে তখন ধারাবাহিকভাবে তার জ্ঞানের উন্মেষ হতে থাকা উচিত, সেখানে প্রেরণার কোনো প্রশ্নই নেই। যখন লোকেরা কোনো কিছুকে প্রেরণা বলছে অথবা যখন প্রেরণা আসছে, সেটা এই অবস্থায় ঘটে না। এটা সাধারণত ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি মস্তিষ্ককে ব্যবহার করার সময়ে, ব্যবহার করতে করতে, শেষে বোধ করে যেন তার জ্ঞান নিঃশেষিত অবস্থায় পৌঁছে গেছে এবং মনে করে সে যেন আর কোনো কিছু করে উঠতে পারছে না অথবা সে একটা প্রবন্ধ লেখা আর চালিয়ে যেতে পারছে না অথবা সে একটা গান রচনা করার সময়ে চিন্তার ধারাটা বজায় রাখতে পারছে না অথবা সে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিকল্পনা নিয়ে কিছুতেই আর অগ্রসর হতে পারছে না। সাধারণত এই সময়ে সে এত ক্লান্ত হয়ে যায় যে তার রগের নীল শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে, সিগারেটের টুকরোগুলো মেঝেতে ছড়ানো থাকে, মানসিক চাপের ফলে মাথায় ব্যথা হতে থাকে, অথচ সে এখনও ঠিক কোনো কিছু করে উঠতে পারেনি। শেষে কোন্ অবস্থায় প্রেরণার উদয় হয়? যখন সে

---

[108]বস্তুবাদ - একটা দার্শনিক তত্ত্ব যার মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে সক্রিয় এবং গতিশীল এই পার্থিব বস্তুগুলিই একমাত্র সত্য; বিশ্বের সমস্ত কিছু এমনকী আবেগ এবং চিন্তাও এই তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

ক্লান্ত হয়ে যায় এবং ভাবে: ‘‘যথেষ্ট হয়েছে, এবার বিশ্রাম নেব।’’ মুখ্য চেতনা যত বেশী করে তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, ততই অন্য জীবনগুলি এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। অতএব একবার সে বিশ্রাম নিলেই তার মন কিছুটা নিস্তেজ হয়ে যায়, এটা নিয়ে আর চিন্তা করে না, তখন এই উদ্দেশ্যহীন অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একটা চিন্তার উদয় হয়, যা তার মস্তিস্ক থেকেই বেরিয়ে আসে। বেশীরভাগ প্রেরণা এইভাবেই আসে।

তাহলে এইসময়ে প্রেরণা কেন আসে? যেহেতু একজন ব্যক্তির মুখ্য চেতনা তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, সে যত বেশী মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে, তত তার নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হতে থাকে, তখন সহ চেতনা ততই এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সেইসময়ে খুব চিন্তা করার ফলে তার মাথায় যন্ত্রণা হতে থাকে এবং চিন্তার দ্বারা কোনো উপায় না বের হওয়ায় বেশ কষ্টও হতে থাকে। যেহেতু একজন ব্যক্তির সহ চেতনা তার শরীরেরই একটা অংশ, একই সময়ে এবং একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে, সহ চেতনাও এই শরীরের একটা অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইজন্যে এই ব্যক্তির সাথে সাথে তারও কষ্ট হতে থাকে, তারও মাথায় ব্যথা হয় এবং ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে। যখন মুখ্য চেতনা শিথিলভাব গ্রহণ করে তখন সহ চেতনা বিষয়টা সম্বন্ধে যা জানে সেটাকে মস্তিষ্কে প্রতিফলিত করে, কারণ সে বিষয়টার মূল প্রকৃতিকে অন্য মাত্রায় দেখতে পারে, অতএব এইভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়ে যায়, প্রবন্ধটা লেখা হয়ে যায়, অথবা সংগীতটা রচনা করা হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলে: ‘‘তাহলে আমরা সহ চেতনাকে কাজে ব্যবহার করব।’’ এইমাত্র একজন আমাকে একটা চিরকুটে যে প্রশ্নটা করেছে এটা ঠিক সেইরকম: ‘‘সহ চেতনার সঙ্গে কীভাবে আমরা যোগাযোগ করব?’’ তুমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না, কারণ তুমি সবেমাত্র সাধনা শুরু করেছ এবং তোমার কোনো ক্ষমতাও নেই, তুমি যোগাযোগ করবেই না, কারণ তোমার উদ্দেশ্যটা অবশ্যই একটা আসক্তি। কেউ কেউ হয়তো ভাবছ: ‘‘সহ চেতনাকে ব্যবহার করে আমাদের জন্যে প্রচুর ধনসম্পদ সৃষ্টি করে মানবসমাজের অগ্রগতিকে আরও দ্রুততর করতে পারি কি?’’ না! কেন নয়? কারণ তোমার সহ চেতনা যা কিছু জানে সেটাও খুব সীমিত। মাত্রাগুলি এত জটিল, স্তরগুলিও এত প্রচুর, এবং এই বিশ্বের গঠন প্রণালী বেশ জটিল, সহ চেতনা শুধু তার মাত্রার জিনিসগুলিই জানে, তার মাত্রার বাইরের জিনিস সম্বন্ধে সে কোনো কিছু জানে না। এরও ওপরে আছে

প্রচুর উল্লম্ব স্তরের বিভিন্ন মাত্রা, কেবল অত্যন্ত উচ্চস্তরের উচ্চতর জীবনসত্তারাই মানবজাতির বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই বিকাশের নিয়মানুযায়ী মানবজাতি সামনে এগোতে থাকে।

ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সাধারণ মানবসমাজের বিকাশ ঘটে আসছে, তুমি কোনো বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটাতে চাইছ অথবা কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছ, কিন্তু সেই উচ্চতর জীবনসত্তারা হয়তো সেইভাবে চিন্তা করছেন না। প্রাচীন কালের লোকেরা কি আজকের উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি এবং সাইকেলের কথা চিন্তা করেনি? আমি বলব যে এটা নিশ্চিত নয় যে তারা চিন্তা করেনি। তারা ওগুলো উদ্ভাবন করতে পারেনি, তার কারণ সেই সময়ে ইতিহাসের ততদূর পর্যন্ত বিকাশ ঘটেনি। সাধারণ মানুষদের পরিচিত তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ওপর থেকে দেখলে অথবা বর্তমানের মানবজাতির অর্জিত জ্ঞানের দৃষ্টিতে, তারা ওইসব জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেনি, তার কারণ মানবজাতির বিজ্ঞান তখনও সেই স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির বিজ্ঞানের কতটা বিকাশ ঘটবে সেটাও ইতিহাসের পরিকল্পনা অনুসারেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। তুমি মানুষ হিসাবে একটা বিশেষ লক্ষ্য অর্জন করতে চাইলে, সেটা অর্জন করতে পারবে না। অবশ্য কিছু লোকের ক্ষেত্রে সহ চেতনা সহজেই কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন লেখক দাবি করেছিল: ‘‘আমি আমার বই-এর জন্যে একটুও ক্লান্ত না হয়ে দশ হাজারেরও বেশী শব্দ একদিনে লিখতে পারি, আমি চাইলে খুব তাড়াতাড়ি লিখে ফেলতে পারি, তা সত্ত্বেও অন্য লোকেরা পড়ে বলবে লেখাটা সত্যিই খুব ভালো।’’ এটা এইরকম কেন? এটা হচ্ছে তার মুখ্য চেতনা এবং সহ চেতনার যৌথ প্রচেষ্টার ফল, সহ চেতনা অর্ধেক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এটা সবসময় এইরকম নয়। বেশীর ভাগ সহ চেতনাই এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকতে চায় না, তুমি যদি একে দিয়ে কিছু করাতে চাও, সেটা ভালো হবে না, তুমি বিপরীত ফল প্রাপ্ত হবে।

পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মন

অনেক লোক অনুশীলনের সময়ে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে না, তারা সর্বত্র চিগোংগ মাস্টারদের খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করে: ‘‘মাস্টার আমি যে ভাবেই অনুশীলন করি না কেন, শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারি না?

একবার শান্ত হতে গেলেই সমস্ত চিন্তা চলে আসে, মন কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে থাকে।'' এটা ঠিক যেন নদী এবং সমুদ্র তোলপাড় করার মতো, সবকিছু মনের মধ্যে উঠে আসে, তুমি একেবারেই শান্ত হতে পার না। কেন তুমি শান্ত হতে পার না? সেটা কিছু লোক বুঝতেই পারে না। তারা ভাবে এর জন্যে কোনো গুপ্ত বিধি আছে। তারা বিখ্যাত চিগোংগ মাস্টারদের খোঁজ করে: ''অনুগ্রহ করে আমাকে কোনো উন্নত কৌশল শেখান, যার দ্বারা আমার মন শান্ত হতে পারে।'' আমার দৃষ্টিতে তুমি বাইরের সাহায্য চাইছ, তুমি যদি নিজের উন্নতি করতে চাও তাহলে তোমার নিজের অন্তরে এর সন্ধান করতে হবে, তোমার মনের উপরে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একমাত্র তাহলেই তুমি সত্যি সত্যি উন্নতি করতে পারবে, একমাত্র তাহলেই তুমি ধ্যানে বসে শান্ত হতে পারবে। শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারাটাই হচ্ছে দক্ষতা, এবং ডিংগ (ধ্যানের একটা অবস্থা) - এর গভীরতা একজন ব্যক্তির স্তর নির্দেশ করে।

একজন সাধারণ মানুষ ইচ্ছামতো কীভাবে শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হবে? জন্মগত সংস্কার খুব ভালো নাহলে সে একেবারেই শান্ত হতে পারবে না। অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় যে একজন ব্যক্তির শান্ত হতে না পারার মূল কারণ কোনো কৌশলের বিষয় নয়, কোনো গূঢ় পন্থাও এর কারণ নয়, বরঞ্চ তোমার চিন্তা অথবা মন বিশুদ্ধ নয়। তুমি যখন সাধারণ মানবসমাজের মধ্যে আছ, যেখানে লোকেদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ রয়েছে, সেখানে ব্যক্তিগত লাভের জন্যে, নানান ধরনের আবেগ এবং ইচ্ছার জন্যে, বিভিন্ন রকমের আকাঙ্ক্ষাজনিত আসক্তির জন্যে, তুমি অন্য লোকেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সংঘর্ষ করছ, তুমি যদি এইসব জিনিস না ছাড়তে পার এবং এগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখতে না পার, তাহলে তুমি শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত করতে চাইলেও, কীভাবে সহজেই এটা প্রাপ্ত হবে? চিগোংগ অনুশীলনের সময়ে কেউ একজন দাবি করেছিল: ''আমি এটা বিশ্বাস করি না, আমি অবশ্যই শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত করব এবং বাজে চিন্তা করব না।'' এই কথাগুলি বলার ঠিক পরেই তার সমস্ত চিন্তাগুলো আবার ভেসে উঠেছিল, তোমার মনই বিশুদ্ধ নয়, অতএব তুমি মনকে শান্ত করতে পারবে না।

কিছু লোক হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হবে না: কোনো কোনো চিগোংগ মাস্টার লোকেদের কিছু কৌশল প্রয়োগ করা শেখায় না কি? যেমন, কোনো জিনিসে মনঃসংযোগ করা, মনশ্চক্ষে দেখার চেষ্টা করা,

মনকে দ্যান ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত করা, দ্যান ক্ষেত্রকে অন্তর থেকে দেখার চেষ্টা করা, বুদ্ধের নাম জপ করা ইত্যাদি। এগুলো বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি, কিন্তু এগুলো শুধু পদ্ধতি মাত্র নয়, এগুলো একজন ব্যক্তির দক্ষতারও প্রতিফলন। সেক্ষেত্রে এই সব দক্ষতার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের সাধনার এবং আমাদের স্তরের উন্নতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে, শুধুমাত্র পদ্ধতিগুলোকে মনোযোগ সহকারে ব্যবহার করেও তুমি শান্ত অবস্থা অর্জন করতে পারবে না। বিশ্বাস নাহলে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার, তোমার বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি এতই প্রবল ও প্রভাবশালী যে, এগুলোর কোনোটাই তুমি ছাড়তে পারছ না, তুমি নিজেই চেষ্টা করে দেখো তো শান্ত হতে পারছ কি পারছ না। কিছু লোক বলে: ‘‘বুদ্ধের নাম জপ করলে কাজ হবে।’’ তুমি বুদ্ধের নাম জপ করে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে কি? কেউ কেউ বলে: ‘‘বুদ্ধ অমিতাভর পদ্ধতি অনুশীলন করা সহজ, শুধু বুদ্ধের নাম জপ করলেই হবে।’’ তুমি চেষ্টা করে দেখেছ কি? আমি বলব সেটাও একটা দক্ষতা, তুমি বলছ এটা সহজ, আমি বলব এটা সহজ নয়, কোনো সাধনা পদ্ধতিই সহজ নয়।

তোমরা সবাই জান যে শাক্যমুনি ‘‘সমাধি’’ শিখিয়েছিলেন, সমাধির আগে তিনি কী শিখিয়েছিলেন? তিনি শিখিয়েছিলেন অনুশাসন, সব আকাঙ্ক্ষা ও মোহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা, শেষে কোনো কিছুই আর থাকবে না, একমাত্র তখনই সমাধি আসবে। এটাই কি নিয়ম নয়? কিন্তু সমাধি-ও একরকমের দক্ষতা, তুমি একবারে সমস্ত অনুশাসন পুরোপুরি পালন করার মতো অবস্থা অর্জন করতে পারবে না, ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত খারাপ জিনিসগুলি দূর করার সাথে সাথে ধ্যানের ক্ষমতাও অগভীর থেকে গভীর হতে থাকবে। বুদ্ধের নাম এক মনে জপ করে যেতে হবে যাতে কোনোরকম চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা না আসে, মনের মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা যেন না থাকে, মস্তিষ্কের অন্য সব অংশগুলি অসাড় হয়ে যায়, অন্য কোনো কিছু সম্বন্ধে সে আর জ্ঞাত থাকে না, একটা চিন্তাই দশ হাজার চিন্তার জায়গা নিয়ে নেয়, ‘‘বুদ্ধ অমিতাভ’’-এর প্রত্যেকটি শব্দ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এটা কি একটা দক্ষতা নয়? একেবারে শুরুতে কি তুমি এটা অর্জন করতে পারবে? তুমি পারবে না, যদি না পার তাহলে নিশ্চিতভাবেই শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে না, তুমি যদি বিশ্বাস না কর তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। যখন তুমি মুখ দিয়ে বার বার বুদ্ধের নাম জপ করে যাচ্ছ, তখন তোমার মন সমস্ত কিছু নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছে: ‘‘আমাদের কর্মস্থলে আমার উপরওয়ালা কেন আমাকে পছন্দ

করছে না? সে আমাকে এই মাসে এত কম বোনাস দিয়েছে।’’ যত তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করবে তত তুমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠবে, অথচ মুখে এখনও বুদ্ধের নাম জপ করে যাচ্ছ, তুমিই বলো চিগোংগ-এর অনুশীলন কি করতে পারছ? এটা কি একটা দক্ষতার বিষয় নয়? এটা তোমার নিজের মনের বিশুদ্ধ না হওয়ার বিষয় নয় কি? কিছু লোকের দিব্য চক্ষু খুলে গেছে, তারা শরীরের ভিতরে দ্যান ক্ষেত্রকে দেখতে পারে। যেহেতু লোকেদের তলপেটে দ্যান জমা হতে থাকে, ওই শক্তিশালী পদার্থটা যত খাঁটি হবে ততই উজ্জ্বল হতে থাকবে, যত কম খাঁটি হবে ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবে এবং কালো হয়ে যাবে। তুমি শরীরের অভ্যন্তরে দ্যান ক্ষেত্রে দ্যান-কে দেখে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে কি? তুমি শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে না, এটা শুধুমাত্র পদ্ধতির উপরেই নির্ভর করে না, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে লোকেদের মন এবং চিন্তা, পরিষ্কার নয় ও বিশুদ্ধ নয়। যদি তুমি শরীরের অভ্যন্তরের দ্যান ক্ষেত্রে তাকাও তাহলে দেখবে দ্যান-কে দেখতে উজ্জ্বল এবং সুন্দর, মুহূর্তের মধ্যে দ্যান একটা বাড়িতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে: ‘‘এই ঘরটা আমার ছেলের জন্যে তার বিয়ের পরে লাগবে, এই ঘরটাতে আমার মেয়ে থাকবে, আমরা দুই বুড়োবুড়ি এই ঘরটাতে থাকব, আর মাঝখানের ঘরটা বসবার ঘর, এটা খুব দারুণ হবে! এই বাড়িটা আমাকে দেওয়া হবে কি.? আমাকে এটা পাওয়ার জন্যে চিন্তা করে অবশ্যই একটা উপায় বের করতে হবে। আমার কী করা উচিত?’’ লোকেদের শুধু এই সমস্ত জিনিসেই আসক্তি আছে, তুমিই বলো তুমি এইভাবে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে কি? অনেকেই বলে: ‘‘আমি এই সাধারণ মানবসমাজে এসেছি, এটা ঠিক যেন হোটেলে এসে থাকার মতো, কয়েকদিন থেকে তারপরেই তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে যাব।’’ কিছু লোকের এই জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছাই হয় না, তারা তাদের নিজেদের বাড়ির কথা ভুলেই গেছে।

সত্যিকারের সাধনায় তোমাকে অবশ্যই মনের সাধনা করতে হবে, নিজের অন্তরের সাধনা করতে হবে, নিজের অন্তরে অনুসন্ধান করতে হবে, বাইরে অনুসন্ধান করলে হবে না। কিছু সাধনা পদ্ধতিতে বলা হয় যে তোমার মনের মধ্যে বুদ্ধ থাকেন, এর মধ্যে কিছুটা সত্যি আছে। কিন্তু কিছু লোক এই বক্তব্যটাকে ভুল বুঝেছে, তারা বলে যে বুদ্ধ তাদের মনের মধ্যে আছেন, ঠিক যেন তারা নিজেরাই বুদ্ধ অথবা ঠিক যেন তাদের মনের ভিতরে একজন বুদ্ধ আছেন। তারা এইরকমই বুঝেছে, সেটা ভুল নয় কি? তুমি এটা এইভাবে কী করে বুঝলে? এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে মনের

সাধনা করতে হবে, একমাত্র তাহলেই তুমি সাধনায় সাফল্যলাভ করবে, এটাই মূল নীতি। তোমার শরীরে বুদ্ধ কীভাবে আসবেন? তুমি অবশ্যই সাধনা করে যাবে একমাত্র তাহলেই সাফল্যলাভ করবে।

তুমি শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারছ না, তার কারণ হচ্ছে তোমার মন শূন্য নয়, এবং তোমার স্তর ততটা উঁচু নয়। তোমার শান্ত অবস্থাটা অগভীর থেকে প্রগাঢ় হতে থাকবে, এটা তোমার স্তরের উন্নতির সাথে সাথে হতে থাকবে। তুমি আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে পারলে, তোমার স্তরও উঁচুতে উঠবে এবং ধ্যানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তুমি যদি কোনো কৌশল বা পদ্ধতির মাধ্যমে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে চাও, সেক্ষেত্রে আমি বলব এসবই হচ্ছে সাহায্য পাওয়ার জন্যে বাইরের দিকে অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ অনুশীলন একেবারে বিপথে চালিত হচ্ছে এবং অশুভ পথে যাচ্ছে, এটা তাদের ইঙ্গিত করছে যারা সাধনার সময়ে বাইরের সাহায্যের জন্যে অনুসন্ধান করছে। বিশেষত বৌদ্ধধর্মে তুমি যদি বাইরের সাহায্যের জন্যে অনুসন্ধান কর, তাহলে তারা বলবে যে তুমি আসুরিক পথ গ্রহণ করেছ। সত্যিকারের সাধনায় তোমাকে অবশ্যই মনের সাধনা করতে হবে, শুধু যখন তোমার চরিত্রের উন্নতি হবে, তখনই তোমার মন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হবে, তুমি একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হবে; শুধু যখন তোমার চরিত্রের উন্নতি হবে, তখনই তুমি বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারবে এবং মানবীয় বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও খারাপ জিনিস ত্যাগ করতে পারবে, তাহলেই তুমি নিজের খারাপ জিনিসগুলোকে বাইরে ফেলে দিতে পারবে, একমাত্র তখনই তুমি উপরে উঠতে পারবে। বিশ্বের প্রকৃতি আর তোমাকে বাধা দেবে না, একমাত্র তখনই তোমার সদ্‌গুণ যা এক ধরনের পদার্থ, গোংগ-এ রূপান্তরিত হয়ে যাবে, অতএব এরা একই সাথে কাজ করল না কি? এটা ঠিক এইরকমই নিয়ম!

একজন অনুশীলনকারীর মান অনুযায়ী আবশ্যকতা পূরণ করতে না পারার এটাই হচ্ছে নিজস্ব দিক এবং এর ফলে উদ্ভুত কারণেই তুমি শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারছ না। বর্তমানে বাহ্যিক দিক দিয়েও বস্তুগতভাবে এইরকম এক ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে যা উচ্চস্তরে সাধনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করছে এবং অনুশীলনকারীকে গম্ভীরভাবে প্রভাবিত করছে। তোমরা সবাই জান যে অর্থনীতির সংস্কার সাধন এবং উদারীকরণের সাথে সাথে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে,

সরকারি বাধা-নিষেধও শিথিল করা হয়েছে। অনেক নতুন প্রযুক্তি বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে, লোকেদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে, সাধারণ লোকেরা সবাই মনে করছে এটা ভালো জিনিস। কিন্তু একটা জিনিসের দুটো দিক থাকে, দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যাবে যে, সংস্কার এবং উদারীকরণের সাথে সাথে খারাপ জিনিসও আমদানি হয়েছে, সেগুলো সব নানান ধরনের জিনিস। একটা সাহিত্যের রচনায় যদি কিছুটা যৌনতার বিষয় লেখা না হয় তাহলে হয়তো বইটা বিক্রিও করা যাবে না, যেহেতু এখানে বই বিক্রির সংখ্যার প্রশ্নটা জড়িয়ে আছে। সিনেমা এবং দূরদর্শনের অনুষ্ঠান বোধ হয় কোনো লোকই দেখবে না যদি কয়েকটা শয়নকক্ষের দৃশ্য না দেখানো হয়, এখানে দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয়তার সূচকের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। শিল্প কর্মের মধ্যে কেউই জানে না যে এটা সত্যিকারের শিল্প না কি অন্য কোনো জিনিস, আমাদের চীনদেশের প্রাচীনকালের শিল্পকর্মের মধ্যে এই সমস্ত জিনিস ছিল না। আমাদের চীনদেশের জাতিগত এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কোনো একজন মানুষ উদ্ভাবন করেনি বা সৃষ্টি করেনি। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে আমি বলেছিলাম যে সমস্ত জিনিসেরই উৎপত্তি আছে। কিন্তু বর্তমানে মানবজাতির নৈতিক আদর্শ ইতিমধ্যে বিকৃত হয়ে গেছে এবং বদলে গেছে, এমনকী ভালো-খারাপ বিচার করার মাপকাঠিও বদলে গেছে, সেগুলো সাধারণ মানুষের জিনিস। এই বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতার আদর্শ, যা ভালো মানুষ এবং খারাপ মানুষ বিচার করার একমাত্র মাপকাঠি, সেটা কিন্তু পাল্টায়নি। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তুমি যদি এসব ছেড়ে উপরে উঠতে চাও, তাহলে তুমি অবশ্যই এই মাপকাঠি দিয়ে সবকিছু বিচার করবে, সাধারণ মানুষের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে না, অতএব বাহ্যিক দিক দিয়ে বস্তুগতভাবে এইরকম বাধা বিরাজ করছে। ব্যাপারটা শুধু এই জিনিসগুলোতেই সীমিত নয়, তথাকথিত সমকামিতা, যৌন স্বাধীনতা, নেশার ওষুধ সেবন করা ইত্যাদি নানান ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বাধার উদ্ভব হয়েছে।

মানবসমাজ বিকশিত হয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, সবাই চিন্তা কর, এইভাবে আরও এগোতে দেওয়া হলে কী ঘটবে? এইভাবে চিরকাল এটাকে বিরাজ করতে দেওয়া যায় কি? যদি মানুষ এর জন্যে কিছু না করে তাহলে স্বর্গ এর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রত্যেকবার যখনই মানবজাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে সেটা সর্বদা এই ধরনের পরিস্থিতিতেই হয়েছে। এতগুলো বক্তৃতা হয়ে গেল, আমি কোনো সময়েই

মানবজাতির ধ্বংসের বিষয়টা উল্লেখ করিনি। ধর্মগুলি এবং অনেক লোকই এইরকম একটা আগ্রহপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছে। আমি এই প্রশ্ন সব জায়গায় উত্থাপন করেছি, তোমরা চিন্তা কর আমাদের এই সাধারণ মানবসমাজে মানুষের নৈতিক আদর্শের এতটা পরিবর্তন ঘটেছে! লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেয়ে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে! তোমাদের কি মনে হয় না যে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে? সেইজন্যে বর্তমানে বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এই পরিবেশটাও আমাদের অনুশীলনকারীদের উচ্চস্তরে সাধনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করছে। নগ্ন ছবিগুলো ঠিক ওখানেই প্রদর্শিত হচ্ছে, বড়ো রাস্তার মাঝখানে উপর থেকে ঝোলানো আছে, তুমি মাথাটা তুললেই দেখতে পারবে।

লাও জি অতীতে এইরকম একটা কথা বলেছিলেন: ''উচ্চতম গুণসম্পন্ন লোকেরা তাও-এর কথা শুনলে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে।'' যখন এই উচ্চতম গুণসম্পন্ন লোকেরা তাও-এর কথা শোনে তখন মনে করে: ''অবশেষে আমি একটা সৎ সাধনার পদ্ধতি পেয়েছি যা পাওয়া খুবই কঠিন, আজ সাধনা না করলে আর কবে করব?'' আমার মনে হয়, জটিল পরিবেশ বরঞ্চ ভালো জিনিস, পরিবেশ যত জটিল হবে ততই উচ্চতর গুণসম্পন্ন লোকেদের আবির্ভাব হবে, যদি এই পরিস্থিতিতে কেউ উপরে উঠে আসতে পারে, তাহলে তার সাধনা সবচেয়ে দৃঢ় হবে।

একজন অনুশীলনকারী হিসাবে কেউ যদি সত্যি সত্যি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সাধনা করতে পারে, তাহলে আমি বলব পক্ষান্তরে এটা ভালোই হবে। মতবিরোধ সৃষ্টি নাহলে, অথবা তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্যে সুযোগ সৃষ্টি নাহলে, তুমি উপরের দিকে উঠতেই পারবে না। যদি তুমি ভালো হও এবং আমিও ভালো হই তাহলে সাধনা কীভাবে করবে? একজন সাধারণ সাধক অর্থাৎ ''একজন মধ্যম শ্রেণীর লোক যখন তাও-এর কথা শোনে,'' তার কাছে সাধনা করলেও ভালো, সাধনা না করলেও ঠিক আছে। এই ধরনের লোকেরা খুব সম্ভবত সাধনায় ব্যর্থ হবে। কিছু লোক এখানে শুনে ভাবছে যে মাস্টার যা বলছেন সেটা যুক্তিসংগত, কিন্তু তারা যখন সাধারণ মানবসমাজে ফিরে যাবে তখন তারা দেখবে যে এই সব তাৎক্ষণিক লাভ অনেক বেশী কার্যকর এবং বাস্তব। তোমার কাছে এগুলো বাস্তব, যাই হোক তোমার সম্বন্ধে কিছু বলব না, কিন্তু পশ্চিমের অনেক ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, মৃত্যুকালীন অবস্থায় উপলব্ধি করেছে

যে তাদের কাছে কিছুই আর নেই। জন্মের সময়ে বস্তুগত ধন সঙ্গে আনা যায় না, আবার মৃত্যুর সময়ে সঙ্গে নিয়েও যাওয়া যায় না, তারা নিজেদের অন্তরে খুব শূন্যতা অনুভব করেছে। কিন্তু গোংগ এত মূল্যবান কেন? এর কারণ এটা সরাসরি মুখ্য আত্মার শরীরের উপরে থেকে বাহিত হয়, এটা জন্মের সময়ে তোমার সঙ্গে আসে এবং মৃত্যুর সময়ে তোমার সঙ্গেই চলে যায়। আমরা বলেছি যে মুখ্য আত্মার বিনাশ নেই, এটা কোনো অন্ধবিশ্বাস নয়। আমাদের ভৌতিক শরীরের কোষগুলি খসে পড়ার পরে, অন্য বস্তুগত মাত্রাগুলিতে বিদ্যমান আরও ক্ষুদ্রতর আণবিক উপাদানগুলোর বিনাশ হয় না, বাইরের আবরণটাই কেবল খসে পড়ে।

আমি এইমাত্র যেসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো সবই চরিত্রের বিষয়ে। শাক্যমুনি অতীতে একবার এই কথাটা বলেছিলেন, বোধিধর্মও বলেছিলেন: ‘‘প্রাচ্যের চীনদেশের এই অঞ্চলটাতে মহান সদ্‌গুণযুক্ত অনেক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে’’ পুরো ইতিহাসে অনেক ভিক্ষু এবং চীনদেশের অনেক মানুষ এর জন্যে খুবই গর্ব অনুভব করে আসছে। তারা ভেবেছে যে এর অর্থ হচ্ছে, তারা খুব উঁচু স্তরে সাধনা করতে পারবে, সেইজন্যে অনেক লোক আনন্দ বোধ করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করে: ‘‘এটা ঠিকই, আমাদের চীনদেশের অধিবাসীরা মহান, আমাদের এই চীনদেশের ভূমিতে উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং মহান সদ্‌গুণযুক্ত অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন।’’ বস্তুত অনেক মানুষই এর অর্থটা ঠিক ধরতে পারেনি। কেন চীনদেশের এই অঞ্চলটাতে এত মহান সদ্‌গুণযুক্ত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন? এবং কেন এখানকার মানুষদের উচ্চস্তরে গোংগ বিকশিত হতে পারে? অধিকাংশ মানুষই ওই উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের কথার সত্যিকারের অর্থটা বুঝতে পারেনি, তারা ওই উচ্চস্তরের এবং উচ্চলোকের ব্যক্তিদের জগৎ ও মানসিক অবস্থাও বুঝতে পারেনি। অবশ্য আমরা বলেছি যে ওই কথাটার অর্থ কী সেটা আমরা বলব না, বরঞ্চ তোমরা সবাই চিন্তা কর: কেবল সবথেকে জটিল জনসমুদায়ের মধ্যে এবং সবথেকে জটিল পরিবেশের মধ্যে যদি কেউ সাধনা করতে পারে, একমাত্র তাহলেই উচ্চস্তরের গোংগ বিকশিত হতে পারবে, প্রকারান্তরে এটাই বোঝানো হয়েছে।

জন্মগত সংস্কার

একজন ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার নির্ধারিত হয় অন্য মাত্রায় তার শরীরের সদ্‌গুণ পদার্থের পরিমাণের উপরে। যদি সদ্‌গুণ কম থাকে এবং কালো পদার্থ বেশী থাকে, তাহলে তার কর্মের ক্ষেত্র বড়ো হবে, এবং জন্মগত সংস্কার খারাপ হবে। যদি তার সদ্‌গুণ প্রচুর থাকে এবং সাদা পদার্থ বেশী থাকে, তাহলে তার কর্মের ক্ষেত্র ছোট হবে, এবং জন্মগত সংস্কার ভালো হবে। সাদা পদার্থ আর কালো পদার্থ নিজেদের মধ্যে একটা আর একটাতে রূপান্তরিত হতে পারে, তারা কীভাবে রূপান্তরিত হয়? ভালো কাজ করলে সাদা পদার্থ উৎপন্ন হয়, কষ্ট সহ্য করে, দুঃখদুর্দশা ভোগ করে, এবং ভালো কাজ করে সাদা পদার্থ প্রাপ্ত হয়। খারাপ কাজ করলে এবং যা ভালো নয় সেই সমস্ত জিনিস করলে, কালো পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেটাই কর্ম। এখানে এইরকম একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া আছে, একই সাথে এটার বাহিত হয়ে সঙ্গে যাওয়ারও একটা সম্পর্ক আছে। যেহেতু এগুলো সরাসরি মুখ্য আত্মার সঙ্গে যায়, এগুলো একটা জীবনের জিনিস নয়, বহুকাল ধরে সঞ্চিত হয়ে আসছে। সেইজন্যে কর্মের সঞ্চয়ের কথা এবং সদ্‌গুণ-এর সঞ্চয়ের কথা বলা হয়, এছাড়া এগুলো পূর্বপুরুষদের থেকেও প্রাপ্ত হয়ে সঞ্চিত হতে পারে। কখনো কখনো আমি চীনের প্রাচীন কালের লোকেদের এবং বয়স্ক লোকেদের বলা এই কথাগুলো নিয়ে ভাবি: ‘‘পূর্বপুরুষরা সদ্‌গুণ জমিয়ে গেছে,’’ অথবা ‘‘সদ্‌গুণ জমানো’’ বা ‘‘সদ্‌গুণ-এর অভাব,’’ ওইসব কথাগুলো কত সঠিক, সত্যিই ওগুলো পুরোপুরি ঠিক কথা।

ভালো অথবা খারাপ জন্মগত সংস্কারের দ্বারাই নির্ধারিত হয় যে একজন ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো না খারাপ। জন্মগত সংস্কার যার ভালো নয় তার আলোকপ্রাপ্তির গুণ খুব খারাপ হয়। কেন এই রকম? কারণ জন্মগত সংস্কার যার ভালো, তার প্রচুর সাদা পদার্থ থাকে যা আমাদের এই বিশ্বের সঙ্গে এবং বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেখানে কোনো ফাঁক নেই। এইভাবে বিশ্বের প্রকৃতি সরাসরি তোমার শরীরের মধ্যে দিয়ে প্রকটিত হবে এবং সরাসরি তোমার শরীরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। কিন্তু কালো পদার্থ হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত, খারাপ কাজ করেই এটা প্রাপ্ত হয়, এটা বিশ্বের প্রকৃতির বিপরীত দিকে যায়, সেইজন্যে কালো পদার্থ এবং আমাদের

বিশ্বের প্রকৃতির মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি এইরকম কালো পদার্থ প্রচুর হয়ে যায়, তখন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে সেই ব্যক্তির শরীরটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে এবং পরিবেষ্টিত করে ফেলে। ক্ষেত্রটা যত বড়ো হতে থাকে ততই এটা আরও বেশী করে ঘন হতে থাকে এবং আরও পুরু হতে থাকে, যেটা তার আলোকপ্রাপ্তির গুণকে আরও খারাপ করে দেয়। এর কারণ সে এই বিশ্বের প্রকৃতি, সত্য-করুণা-সহনশীলতাকে গ্রহণ করতে পারে না, এর উপরে যেহেতু খারাপ কাজ করেছে সেহেতু সে কালো পদার্থ উৎপন্ন করে। সাধারণত এইরকম ব্যক্তি সাধনাকে আরও অবিশ্বাস করতে থাকে, তার আলোকপ্রাপ্তির গুণ আরও খারাপ হতে থাকে, সে আরও বেশী কর্মের বাধার সম্মুখীন হতে থাকে। সে যত বেশী কষ্ট পেতে থাকে, তত বেশী অবিশ্বাস করতে থাকে, তার পক্ষে সাধনা করা আরও বেশী কঠিন হয়ে যায়।

যে ব্যক্তির সাদা পদার্থ বেশী থাকে তার পক্ষে সাধনা করা সহজ, কারণ তার সাধনার পর্বে, যত সে বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারবে, ততই সে নিজের চরিত্রের উন্নতিসাধন করতে পারবে এবং ততই তার সদ্‌গুণ সরাসরি গোংগ-এ রূপান্তরিত হতে থাকবে। আর যে ব্যক্তির প্রচুর কালো পদার্থ আছে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক যেন কারখানায় একটা দ্রব্য প্রস্তুত করার মতো, যেখানে একটা অতিরিক্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন: অন্য লোকেরা উপাদানটাকে তৈরি অবস্থায় নিয়ে এসেছে যেটাকে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই ব্যক্তি কাঁচা মাল অবস্থায় নিয়ে এসেছে যেটাকে প্রথমে পরিশোধনের জন্যে একটি কার্যপ্রণালীর প্রয়োজন, অতএব এখানে একটা অতিরিক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই যেতে হবে। সুতরাং এই ব্যক্তিকে প্রথমে অবশ্যই কষ্ট সহ্য করতে হবে, যাতে কর্ম দূর হয়ে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত হয়, এই সদ্‌গুণ পদার্থটা তৈরি হলে, একমাত্র তখনই সে উচ্চস্তরের গোংগ-এর বিকাশ ঘটাতে পারবে। কিন্তু সাধারণত এই ধরনের লোকেদের আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো থাকে না, তুমি যদি তাকে আরও কষ্ট সহ্য করার কথা বলো, তাহলে সে আরও অবিশ্বাস করতে থাকবে, তার পক্ষে কষ্ট সহ্য করা আরও কঠিন হয়ে যাবে, অতএব কালো পদার্থ খুব বেশী থাকলে সাধনা করা খুব কঠিন। সেইজন্যে অতীতে তাও মতে এবং একমাত্র শিষ্য সম্বলিত সাধনা পদ্ধতিগুলোতে মাস্টার শিষ্যের জন্যে অনুসন্ধান করতেন, শিষ্য মাস্টারের জন্যে অনুসন্ধান করত না, মাস্টার শিষ্যদের বাছাই করার সময়ে তাদের শরীরে বাহিত হওয়া এইসব জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিতেন।

জন্মগত সংস্কার একজন ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তির গুণ নির্ধারণ করে, কিন্তু এটাও অবধারিত নয়। কোনো কোনো লোকের জন্মগত সংস্কার খুব ভালো নয়, কিন্তু বাড়ির পরিবেশ খুব ভালো, এমনকী পরিবারের অনেকেই চিগোংগ অনুশীলন করে, এছাড়াও কেউ কেউ ধর্মে বিশ্বাসী এবং সাধনার জিনিসগুলোকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। এই ধরনের পরিবেশও সেই ব্যক্তিকে এই সব জিনিসে বিশ্বাস করার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে পারে এবং তার আলোকপ্রাপ্তির গুণের উন্নতি ঘটাতে পারে, অতএব ব্যপারটা নিশ্চিত নয়। আবার কিছু লোকের জন্মগত সংস্কার খুব ভালো, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক সমাজের সামান্য জ্ঞান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, বিশেষত কয়েক বছর পূর্বের কঠোর বিধিনিষেধযুক্ত ছাঁচে ঢালা মতাদর্শগত শিক্ষা ব্যবস্থা, তাদের অত্যন্ত সংকীর্ণমনা করে দিয়েছে, তারা তাদের জ্ঞানের বাইরের কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না, এটাও একজন ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তির গুণকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে।

আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একবার একটা বক্তৃতামালার দ্বিতীয় দিনে দিব্যচক্ষু খোলার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করছিলাম। সেখানে একজন ব্যক্তি ছিল, তার জন্মগত সংস্কার খুব ভালো ছিল, তার দিব্যচক্ষু সঙ্গে সঙ্গে খুব উঁচুস্তরে খুলে গিয়েছিল, সে অনেক অনেক দৃশ্য দেখতে পেরেছিল যা অন্য লোকেরা দেখতে পারেনি। সে লোকেদের বলছিল: ''বাঃ, আমি দেখেছি, ফা শেখানোর সভাকক্ষের পুরো জায়গাটাতে ফালুন যেন তুষার কুচির মতো লোকেদের শরীরের উপরে ঝরে ঝরে পড়ছিল; আমি দেখেছি মাস্টার লি-র সত্যিকারের শরীরটা কীরকম; আমি মাস্টার লি-র জ্যোতির্বলয় দেখেছি, দেখেছি ফালুন কীরকম এবং কতগুলি ফা-শরীর আছে। আমি দেখেছি মাস্টার লি বিভিন্ন স্তরের সব জায়গায় ফা-এর উপরে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং ফালুন কীভাবে শিক্ষার্থীদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করছে। আমি আরও দেখেছি যে যখন মাস্টার লি বক্তৃতা দিচ্ছেন, তখন মাস্টারের গোংগ-শরীর[109] একটার পর একটা স্তরে এবং বিভিন্ন স্তরে সর্বত্র বক্তৃতা দিচ্ছেন, এছাড়াও আমি দেখেছি স্বর্গীয় সুন্দরীরা ফুল ছড়াচ্ছিল, ইত্যাদি।'' সে এত বিস্ময়কর সব জিনিস দেখেছিল, অর্থাৎ তার জন্মগত সংস্কার খুবই ভালো ছিল। সে কথা বলেই যাচ্ছিল, শেষে সে একটা কথা বলল: ''আমি ওইসব জিনিস বিশ্বাস করি না।'' এর মধ্যে কিছু জিনিস ইতিমধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, অনেক জিনিস আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও

[109]গোংগ-শরীর - গোংগ দ্বারা তৈরি শরীর।

ব্যাখ্যা করা যায়, আমরা কিছু জিনিস ব্যাখ্যাও করেছি। এর কারণ চিগোংগ-এর যা জ্ঞান সেটা সত্যিই আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যায়, সেটা নিশ্চিত। অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে যে জন্মগত সংস্কার দিয়েও আলোকপ্রাপ্তির গুণকে পুরোপুরি নির্ধারণ করা যায় না।

আলোকপ্রাপ্তি

‘‘ আলোকপ্রাপ্তি কী?’’ ‘‘ আলোকপ্রাপ্তি’’ শব্দটা ধর্মের থেকে এসেছে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এটা ইঙ্গিত করে একজন সাধকের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে উপলব্ধি, বিচারবুদ্ধির উপরে আলোকপ্রাপ্তি এবং অন্তিম আলোকপ্রাপ্তি, এর অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞা-আলোকপ্রাপ্তি। কিন্তু বর্তমানে এটা ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সেই সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন অমুক ব্যক্তি খুব চতুর, সে জানতে পারে যে তার উপরওয়ালা মনের মধ্যে কী চিন্তা করছে, সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বুঝতে পারে এবং সে জানে যে উপরওয়ালাকে কীভাবে খুশি রাখতে হয়। লোকেরা এটাকে ভালো আলোকপ্রাপ্তির গুণ মনে করে এবং সাধারণত লোকেরা এইভাবেই এটাকে বোঝে। কিন্তু একবার সাধারণ মানুষের স্তর পার হয়ে গেলেই এবং সামান্য একটু উঁচু স্তরে উঠলেই তুমি আবিষ্কার করবে যে, সাধারণ মানুষ এই স্তরে যেগুলোকে সত্য হিসাবে জানে সেগুলো সবই সাধারণত ভুল। আমরা যে আলোকপ্রাপ্তির কথা বলি সেটা মূলত এই আলোকপ্রাপ্তি নয়। পরিবর্তে একজন ধূর্ত ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো হয় না, যেহেতু অত্যন্ত চতুর ওই ব্যক্তি শুধু ওপরে-ওপরে কাজ করে যাতে তার উপরওয়ালা অথবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ প্রশংসা করে। সেক্ষেত্রে আসল কাজটা কি অন্য লোকেরা করছে না? অতএব ওই ব্যক্তি অন্যদের কাছে ঋণী হয়ে যাবে। যেহেতু সে ধূর্ত এবং জানে যে কীভাবে অন্যদের খুশি করা যায়, সেই কারণে সে বেশী সুবিধা লাভ করবে এবং অন্যেরা বেশী অসুবিধা প্রাপ্ত হবে। যেহেতু সে চতুর সেইজন্যে সে কোনো ক্ষতিও স্বীকার করবে না এবং সে সহজে কোনো ক্ষতি হতেও দেবে না, অতএব অন্যদের অবশ্যই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সে যত বেশী নিজের ছোট-খাট ব্যবহারিক লাভের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, ততই সে বেশী করে সংকীর্ণমনা হয়ে উঠবে, এবং ততই সে বেশী করে অনুভব করবে যে সাধারণ মানুষদের বস্তুগত লাভগুলিকে ছেড়ে দেওয়া যায় না, সে তখনও এটাই

মনে করবে যে সে নিজে খুব বাস্তববোধসম্পন্ন এবং সে ক্ষতি সহ্য করবে না।

কিছু মানুষ এমনকী এই ব্যক্তিকে প্রশংসার চোখে দেখে! আমি তোমাদের বলছি: একে প্রশংসার চোখে দেখো না। তোমরা সবাই জান না যে সে কত ক্লান্তিকর জীবনযাপন করে: সে ভালো করে খেতে পারে না, ভালো করে ঘুমাতে পারে না, এমনকী স্বপ্নের মধ্যেও সে ভয় পায় যে এই বুঝি তার স্বার্থের ক্ষতি হয়ে গেল। ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে খুব সামান্য ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ উদ্যম দিয়ে চেষ্টা করে, তুমিই বলো তার বেঁচে থাকাটা কি ক্লান্তিকর নয়, যেহেতু তার গোটা জীবনই এর জন্যে নিবেদিত। আমরা বলব, কোনো একটা মতবিরোধ সামনে এলে, তুমি যদি এক পা পিছিয়ে যাও, তুমি জিনিসগুলো সম্পূর্ণ নতুন আলোকে দেখবে, আমি নিশ্চিত করে বলছি তখন জিনিসগুলো অন্যরকম দেখতে লাগবে। কিন্তু এইধরনের ব্যক্তি কাউকে সুবিধাটা ছাড়বে না, সে সবচেয়ে ক্লান্তিকর জীবন কাটাতে থাকে, তোমরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না। সাধনার জগতে বলা হয়: ‘‘এই ব্যক্তি মায়ার মধ্যে সবথেকে গভীরে হারিয়ে গেছে, বস্তুগতলাভের জন্যে সে সাধারণ মানুষদের মধ্যে পুরোপুরি হারিয়ে গেছে।’’ তাকে সদ্‌গুণ রক্ষা করার জন্যে বলাটা সহজ নয়! তুমি যদি তাকে সাধনা করার কথা বলো, সে বিশ্বাসই করবে না: ‘‘সাধনা? তোমাদের কেউ আঘাত করলে তোমরা অনুশীলনকারী হিসাবে তাকে প্রত্যাঘাত কর না, তোমাদের গালাগালি করে অপমান করলেও তোমরা প্রত্যুত্তর কর না। যখন লোকেরা তোমাদের কঠিন অবস্থায় ফেলে দেয়, তখন তোমরা মনের মধ্যে তাদের প্রতি একই রকম আচরণের ইচ্ছা না রেখে, তার পরিবর্তে এমনকী ধন্যবাদ জানাও। তোমরা সবাই আহঃ কিউ হয়ে গেছ! তোমরা সবাই মানসিকভাবে অসুস্থ!’’ এই ধরনের লোকের পক্ষে সাধনা সম্বন্ধে বোঝার কোনো উপায়ই নেই। সে বলবে: ‘‘তোমাদের সবকিছু অবিশ্বাস্য এবং তোমরা মূর্খ।’’ তুমি কি বলবে না যে তাকে উদ্ধার করা কঠিন?

আমরা এই আলোকপ্রাপ্তির কথা বলি না। বরঞ্চ ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে এই ব্যক্তি যাকে মূর্খ বলেছিল, আমরা সেই আলোকপ্রাপ্তির কথাই আলোচনা করেছি। অবশ্য ওই ব্যক্তি সত্যিই মূর্খ নয়, আমরা কেবল ব্যক্তিগত কায়েমি স্বার্থের বিষয়গুলিকে নিস্পৃহভাবে দেখে থাকি, অথচ অন্য ক্ষেত্রে আমরা খুবই বুদ্ধিমান। যেমন কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা অথবা উপরওয়ালার দ্বারা বন্টন করে দেওয়া নির্দিষ্ট

কাজ সম্পাদন করা অথবা অন্য কোনো কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো খুব পরিষ্কার চিন্তার মাধ্যমে যথেষ্ট ভালোভাবে সম্পন্ন করি। শুধুমাত্র সামান্য ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে অথবা আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধজনিত সংঘাতের ক্ষেত্রে আমরা উদাসীন থাকি। কে তোমাকে মূর্খ বলবে? কেউ তোমাকে মূর্খ বলবে না, এটা নিশ্চয়ই এইরকম।

এবার আমরা বাস্তবিক এক মূর্খ ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করব, কারণ এই নিয়মগুলি উচ্চস্তরে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন মূর্খ ব্যক্তি সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিরাট কোনো ভুল কাজ করে না এবং নিজের স্বার্থের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা সংঘর্ষ করে না, সে খ্যাতির পিছনে ছোটে না, তার সদ্‌গুণ-এর হানি হয় না। কিন্তু অন্যেরা তাকে সদ্‌গুণ প্রদান করে, আঘাত করে এবং গালাগালি দিয়ে, সবাই তাকে সদ্‌গুণ প্রদান করে, আর এই বস্তুটা অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের এই বিশ্বে একটা নিয়ম আছে: ত্যাগ নেই তো লাভ নেই, লাভ করতে হলে ত্যাগ করতে হবে। যখন লোকেরা খুব মূর্খ ব্যক্তিকে দেখে, তারা তাকে অশ্লীল বাক্য বলে: ‘‘তুমি এত মূর্খ!’’ মুখে এই অভদ্র কথা বলার সময়ে একটুকরো সদ্‌গুণ তার দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। যেহেতু তুমি কারোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার উপরে কর্তৃত্ব ফলিয়েছ এবং প্রাপ্তির দিকে আছ, সেইজন্যে তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। যদি কেউ তার কাছে গিয়ে পা দিয়ে লাথি মারে: ‘‘তুমি এত বড়ো মূর্খ।’’ ঠিক আছে, সদ্‌গুণ-এর বড়ো একটা খন্ড আবার তার দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। কেউ যদি তার সঙ্গে জবরদস্তি করে অথবা তাকে লাথি মারে, সে শুধু একটু হাসবে: ‘‘নিয়ে এসো, যাই হোক তুমি আমাকে তোমার সদ্‌গুণ দিচ্ছ, আমি এর সামান্যতম অংশও ঠেলে ফেরত পাঠাব না!’’ অতএব উচ্চস্তরের নীতি অনুযায়ী, তোমরা চিন্তা কর, কে বুদ্ধিমান? সে কি বুদ্ধিমান নয়? সে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, কারণ তার একটুও সদ্‌গুণ হারায়নি। তুমি যখন তার দিকে সদ্‌গুণ ছুঁড়ে দিয়েছ, সে তার কোনো অংশই ঠেলে ফেরত দেয়নি; সে পুরোটাই গ্রহণ করেছে, সে সবটাই হেসে গ্রহণ করেছে। সে এই জীবনে মূর্খ, কিন্তু পরবর্তী জীবনে নয়, তার মুখ্য আত্মা মূর্খ নয়। ধর্মে বলা আছে, সদ্‌গুণ প্রচুর থাকলে পরবর্তী জীবনে সে উচ্চপদমর্যাদার আধিকারিক হবে অথবা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হবে, সবই সেই ব্যক্তির সদ্‌গুণ-এর বিনিময়ে হবে।

আমরা বলেছি, সদ্‌গুণকে সরাসরি গোংগ-এ বিবর্তন করা সম্ভব। তোমার সাধনার স্তর কতটা উঁচু, সেটা কি তোমার সদ্‌গুণ-এর বিবর্তনের

মাধ্যমেই ঘটেনি? এটাকে সরাসরি গোংগ-এ বিবর্তন করা যায়। তোমার স্তর কত উঁচু এবং তোমার গোংগ সামর্থ্য কম না বেশী, সেটা যে গোংগ দ্বারা নির্ধারিত হয়, তা কি ওই পদার্থ থেকেই বিবর্তিত হয়ে আসেনি? তুমিই বলো এটা মূল্যবান নয় কি? এটা জন্মের সাথে সাথে আসে এবং মৃত্যুর সাথে সাথে চলে যায়। বৌদ্ধধর্মে বলা হয় যে সাধনার দ্বারা যে উচ্চতাটা তুমি অর্জন করেছ, সেটাই তোমার সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান। তুমি যতটা ত্যাগ করবে, ততটাই তুমি প্রাপ্ত হবে, এটাই মূল নীতি। ধর্মে বলে যে সদ্গুণ থাকলে তুমি পরবর্তী জীবনে একজন উচ্চপদমর্যাদার আধিকারিক অথবা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হতে পার। আবার সদ্গুণ কম থাকলে এমনকী খাবারের জন্যে ভিক্ষা করলেও কিছু পাবে না, এর কারণ তার কাছে বিনিময় করার জন্যে কোনো সদ্গুণ নেই, ত্যাগ নাহলে প্রাপ্তি নেই! একটুও সদ্গুণ না থাকলে, তার শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হবে, তার সত্যিই মৃত্যু হবে।

অতীতে একজন চিগোংগ মাস্টার ছিল, প্রথমে সে যখন জনসাধারণের মধ্যে এসেছিল, তখন তার স্তর খুব উঁচু ছিল। পরবর্তীকালে ওই চিগোংগ মাস্টার খ্যাতি এবং স্বার্থের মোহে পড়ে গিয়েছিল। ওই ব্যক্তির মাস্টার তখন তার সহ আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিল, যেহেতু সে ছিল সেই ধরনের সাধক যাদের সহ আত্মাই সাধনা করত। তার সহ আত্মা যখন এখানে ছিল, তখন তার সহ আত্মাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, একদিন তার কারখানায় একটা বাড়ি বিলি করা হয়েছিল, তত্ত্বাবধায়ক বলেছিল: ‘‘যাদের বাড়ি নেই, তারা এখানে এসে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে বলো এবং কেন বাড়ির প্রয়োজন সেটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর।’’ প্রত্যেকে নিজের নিজের কারণগুলো বলেছিল, কিন্তু সেই লোকটা কোনো সাড়াশব্দ করেনি। শেষে তত্ত্বাবধায়ক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এই ব্যক্তির অবস্থা অন্যদের তুলনায় কঠিন, সেইজন্যে তাকেই বাড়ি বিলি করা উচিত। অন্য লোকেরা প্রত্যেকে বলেছিল: ‘‘এটা ঠিক নয়, বাড়িটা ওই ব্যক্তিকে দিতে পার না, আমাকে বাড়িটা দেওয়া উচিত, আমার বাড়িটা ভীষণ প্রয়োজন।’’ এই ব্যক্তি তখন বলেছিল: ‘‘তাহলে তুমিই নিয়ে নাও।’’ সাধারণ লোকেদের চোখে এই ব্যক্তি মূর্খ ছিল। কেউ কেউ জানত যে এই ব্যক্তি একজন সাধক, তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘তোমরা সাধকরা কোনো কিছু চাও না, তুমি কী চাও?’’ সে তখন উত্তর দিয়েছিল: ‘‘অন্য লোকেরা যা চায় না, আমি সেটাই নেব।’’ প্রকৃতপক্ষে সে একেবারেই মূর্খ ছিল না, সে বেশ বিচক্ষণ ছিল। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত

কায়েমি স্বার্থের ক্ষেত্রে সে ওই রকম আচরণ করত, সে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলার উপরে বিশ্বাস করত। অন্য লোকেরা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘এখনকার দিনে লোকেরা কী চায় না?’’ সে উত্তর দিয়েছিল: ‘‘মাটিতে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো এখানে ওখানে লাথি খায়, কেউ এগুলোকে নিতে চায় না, সেইজন্যে আমি এই পাথরের টুকরো তুলে নেব।’’ সাধারণ লোকেরা এটাকে অবিশ্বাস্য মনে করে, সাধারণ লোকেরা সাধকদের বুঝতে পারে না, বোঝার কোনো উপায়ও নেই, কারণ মানসিকতা অনুযায়ী সাধারণ লোকেদের থেকে সাধকদের দূরত্ব খুবই বিশাল এবং এদের মধ্যে স্তরের ফারাকটাও খুব বেশী। অবশ্যই এই ব্যক্তি পাথর কুড়োতে যাচ্ছে না, সে যে সত্যটা বলেছিল একজন সাধারণ মানুষের উপলব্ধি সেখানে পৌঁছাতে পারে না: ‘‘আমি সাধারণ মানুষদের কোনো কিছুর পিছনে ছুটব না।’’ এবার এই পাথরের সম্বন্ধে বলব, তোমরা সবাই জান যে বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রে লেখা আছে যে: ‘‘পরমানন্দের স্বর্গে গাছগুলি সব সোনার, মাটি সোনার, পাখিগুলো সোনার, ফুলগুলো সোনার, বাড়িগুলোও সোনার, এমনকী বুদ্ধের শরীরটাও সোনার এবং চকচক করছে।’’ সেখানে গেলে এক টুকরো পাথরও খুঁজে পাবে না, এটা বলা হয় যে ওখানে মুদ্রা হিসাবে পাথর ব্যবহার করা হয়, সে অবশ্য পাথরের টুকরো নিয়ে সেখানে যাবে না, কিন্তু সে এই সত্যটা প্রকাশ করেছিল যা সাধারণ মানুষদের বোধগম্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন সাধক বিশ্বাস করে: ‘‘সাধারণ মানুষদের অন্বেষণ করার জন্যে সাধারণ অভীষ্ট রয়েছে, আমরা তার পিছনে ছুটে বেড়াই না; সাধারণ লোকেদের যা আছে আমরা তাকে মূল্যবান মনে করি না; কিন্তু আমাদের যা আছে সাধারণ লোকেরা সেটা পেতে চাইলেও পাবে না।’’

প্রকৃতপক্ষে আমরা যে আলোকপ্রাপ্তির কথা সবেমাত্র উল্লেখ করেছি সেটা সাধনা পর্বের অন্তর্গত এই ধরনের আলোকপ্রাপ্তিকেই ইঙ্গিত করে, যা সাধারণ মানুষদের আলোকপ্রাপ্তির ঠিক বিপরীত। আমরা সত্যিকারের যে আলোকপ্রাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করি, সেটা হচ্ছে আমাদের অনুশীলনের পর্বে মাস্টারের শেখানো ফা অথবা তাও মাস্টারের শেখানো তাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি কি না এবং গ্রহণ করতে পারছি কি না, অথবা সাধনার পর্বে নিজেরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হলে, আমরা নিজেদের সাধক হিসাবে উপলব্ধি করতে পারছি কি না, অথবা সাধনার পর্বে ফা অনুযায়ী সব কাজ করতে পারছি কি না। কিছু লোকের ক্ষেত্রে তুমি যেভাবেই তাদের ব্যাখ্যা কর না কেন তারা এসব জিনিস একেবারেই বিশ্বাস করবে

না, তারা ভাবে যে সাধারণ মানুষ হওয়া অনেক বেশী বাস্তবসম্মত এবং সুবিধাজনক। তারা তাদের একগুঁয়ে ধারণাগুলোকে ধরে রাখে এবং ছাড়তে পারে না যা তাদের অবিশ্বাসী বানিয়ে দেয়। কিছু মানুষ রোগ সারাতে চায়, আমি এখানে যখনই উল্লেখ করি যে চিগোংগ বস্তুত রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্যে নয়, তারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে যায়, এই জন্যে তার পরে আমি যা কিছু শেখাই না কেন তারা বিশ্বাস করে না।

কিছু লোক যেন তাদের আলোকপ্রাপ্তির গুণের উন্নতিসাধন করতেই পারে না, কেউ কেউ আমার এই বইটাকে নিয়ে ইচ্ছামতো এখানে-সেখানে দাগ দেয়। আমাদের যাদের দিব্যচক্ষু খোলা, তারা দেখতে পায় যে বইটা দেখতে উজ্জ্বল রঙ্গিন এবং সোনালি আলোয় ঝিকমিক করছে, এই বইয়ের প্রতিটি কথা হচ্ছে আমার ফা-শরীরের প্রতিমূর্তি। যদি আমি অসত্য বলি, তাহলে আমি তোমাদের বিভ্রান্ত করছি। তুমি যে দাগটা দিয়েছ সেটা দেখতে খুব কালো লাগছে, ইচ্ছামতো বইটাতে দাগ দেওয়ার সাহস তোমার কীভাবে হল? আমরা এখানে কী করছি, আমরা কি তোমাকে সাধনার উচ্চস্তরে পরিচালিত করছি না? কিছু জিনিস তোমার চিন্তা করা উচিত, এই বইটা তোমাকে সাধনায় পথপ্রদর্শন করতে পারবে, তুমি চিন্তা কর, এটা মূল্যবান নয় কি? তুমি বুদ্ধের উপাসনা করে সত্যিকারের সাধনা করতে পারবে কি? তুমি খুব ধর্মপ্রাণ, তুমি বুদ্ধমূর্তিকে একটু ছুঁতেও সাহস কর না এবং প্রত্যেকদিন এর জন্যে ধূপকাঠি জ্বালাও, কিন্তু তুমি দাফা-কে নষ্ট করতে সাহস করছ যা তোমাকে সত্যি সত্যি সাধনায় পথপ্রদর্শন করতে পারবে।

লোকেদের আলোকপ্রাপ্তির গুণের বিষয়ে যদি বলি তাহলে সেটা ইঙ্গিত করে যে, সাধনার পর্বে বিভিন্ন স্তরে আবির্ভূত হওয়া বিশেষ জিনিস এবং মাস্টারের শেখানো বিশেষ জিনিস অথবা বিশেষ ফা তুমি কতদূর পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ। কিন্তু এটা আমাদের উল্লেখিত মূলগত আলোকপ্রাপ্তি নয়, আমাদের উল্লেখিত মূলগত আলোকপ্রাপ্তির অর্থ হচ্ছে, একজন ব্যক্তি সাধনায় আরম্ভের সময় থেকে তার জীবনের বাকি বছরগুলোতে, নিরন্তর নিজের উন্নতিসাধন করে উপরের দিকে উঠতে থাকবে, নিরন্তর মানবীয় আসক্তিগুলোকে এবং নানান ধরনের আকাঙ্ক্ষাকে দূর করতে থাকবে, নিরন্তর গোংগ উপরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যতক্ষণ না সে সাধনার শেষ ধাপে এসে পৌঁছায়। তার সদ্‌গুণ পদার্থের পুরোটাই গোংগ-এ বিবর্তিত হয়ে যায়, সে মাস্টারের দ্বারা বন্দোবস্ত করা

সাধনা পথের অন্তিমে পৌঁছে যায় এবং সেই মুহূর্তে ‘‘বুম’’ করে সমস্ত তালা একবারে বিস্ফোরিত হয়ে খুলে যায়। তার দিব্যচক্ষু তার স্তরের উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে যায়, সে তার স্তরের প্রত্যেকটা মাত্রার সত্যটা দেখতে পারে, সে বিভিন্ন সময়-মাত্রার বিভিন্ন জীবন সত্তার অস্তিত্বের রূপ দেখতে পারে, সে বিভিন্ন সময়-মাত্রার পদার্থের অস্তিত্বের রূপ দেখতে পারে, সে আমাদের বিশ্বের সত্যটা দেখতে পারে। তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা বিরাটভাবে প্রকটিত হয়, সে বিভিন্ন ধরনের জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে, সে কি একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা নয়? সে কি সাধনার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হওয়া একজন ব্যক্তি নয়? প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করলে সে একজন বুদ্ধ।

আমরা যে আলোকপ্রাপ্তির কথা বলি সেটা একরকম মূলগত আলোকপ্রাপ্তি যা আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তির আকারে হয়। আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সাধনার সময়কার সমস্ত বৎসরগুলিতে তালাবন্ধ থাকে, সে জানতে পারে না যে তার নিজের গোংগ-এর উচ্চতা কত, সে জানতে পারে না যে তার নিজের সাধনার দ্বারা জাত গোংগ-এর আকারটা কেমন, কোনোরকম প্রতিক্রিয়া একেবারেই হয় না, এমনকী তার শরীরের সমস্ত কোষও তালাবন্ধ থাকে, সাধনায় বিকশিত সমস্ত গোংগ তালাবন্ধ থাকে, সে সর্বদা এইভাবে সাধনা করে অন্তিম ধাপে পৌঁছে যায়, একমাত্র তখনই এটা খুলে দেওয়া হয়। একমাত্র উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই এটা করতে পারে, সাধনার পর্বটা অত্যন্ত কষ্টকর হয়। সে একজন ভালো মানুষ হিসাবে শুরু করে, সে সর্বদা নিজের চরিত্রের উন্নতিসাধন করতে থাকে, সে সবসময়েই কষ্ট সহ্য করে যায়, সে সাধনায় সর্বদা উপরের দিকে উঠতে থাকে, সে সর্বদা নিজের চরিত্রের উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু সে নিজের গোংগ দেখতে পায় না। এই ধরনের ব্যক্তির সাধনা সবচেয়ে কঠিন, এই ধরনের ব্যক্তিকে অবশ্যই উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন হতে হবে, সে অনেক বছর ধরে সাধনা করে যায়, যদিও সে কোনো কিছুই জানতে পারে না।

আরও একপ্রকারের আলোকপ্রাপ্তি আছে যাকে বলে পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তি। অনেক লোক আছে যারা একেবারে শুরু থেকেই অনুভব করতে পারে যে ফালুন ঘুরছে, একই সাথে আমি তোমাদের দিব্যচক্ষু খুলে দিয়েছি, কিছু লোক নানা কারণে, এখন জিনিসগুলোকে দেখতে পারছে না কিন্তু ভবিষ্যতে দেখতে পারবে, এখন স্পষ্ট না দেখতে পারার থেকে স্পষ্ট

দেখতে পারার দিকে এগোবে, এখন এটা ব্যবহার করতে না পারার থেকে এটাকে ব্যবহার করতে পারার দিকে এগোবে, তাদের স্তর নিরন্তর উন্নত হতে থাকবে। তোমার চরিত্রের উন্নতির সাথে সাথে এবং বিভিন্ন ধরনের আসক্তি দূর হওয়ার সাথে সাথে, নানান ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বাইরের দিকে বিকশিত হতে থাকবে। তোমার সম্পূর্ণ সাধনা পর্বের বিবর্তন এবং শারীরিক রূপান্তর প্রক্রিয়া এমন পরিস্থিতিতে হবে যে সবই তুমি নিজে দেখতে পারবে অথবা অনুভব করতে পারবে। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে তুমি শেষ ধাপে পৌঁছে যাবে, তখন তুমি বিশ্বের সত্যটা সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবে, তোমার স্তর সাধনার উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে যাবে, যেখানে তোমার পৌঁছান উচিত। মূল শরীরের রূপান্তর এবং অলৌকিক ক্ষমতাগুলির শক্তিবৃদ্ধি একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, এই লক্ষ্যটা ধীরে ধীরে অর্জন করবে। এটাই হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তি। এই পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির সাধনাপদ্ধতিও সহজ নয়, অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, কিছু মানুষ আসক্তিগুলোকে ছাড়তে পারে না, সহজেই জাহির করার চেষ্টা করতে পারে এবং সহজেই খারাপ কাজ করে ফেলতে পারে। এইরকম হলে তোমার গোংগ নীচে নেমে যাবে, তোমার সাধনা ব্যর্থ হবে, শেষে সর্বনাশ হবে। কিছু মানুষ যারা দেখতে পারে, তারা বিভিন্ন স্তরের নানান ধরনের জীবনসত্তাদের প্রকাশ দেখতে পারে, হয়তো এই সত্তারা তোমাকে এটা-সেটা করতে বলতে পারে, তারা হয়তো তোমাকে তাদের জিনিসের সাধনা করতে বলবে, তোমাকে তাদের শিষ্য করতে চাইবে, কিন্তু তারা তোমাকে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে সাহায্য করতে পারবে না, কারণ তারা নিজেরাই সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারেনি।

এছাড়া উচ্চস্তরের মাত্রায় প্রত্যেকেই অমর সত্তা, তারা রূপান্তরিত হয়ে খুব বিশাল হয়ে যেতে পারে, তারা বিরাটভাবে তাদের দিব্যক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে, তোমার মন যদি সৎ না হয়, তাহলে তুমি কি এদের অনুসরণ করবে না? তুমি যখনই এদের অনুসরণ করবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এমনকী তাঁরা যদি সত্যিকারের বুদ্ধ হন, অথবা সত্যিকারের তাও হন, তবুও তোমাকে আবার প্রথম থেকে সাধনা শুরু করতে হবে। যে স্বর্গীয় স্তর থেকেই তাঁরা আসুন না কেন, তাঁরা সবাই অমরসত্তা নয় কি? শুধুমাত্র খুব উচ্চস্তরে সাধনা করে, লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারলে, তাহলেই একেবারে উপরে উঠে যেতে পারবে। একজন সাধারণ মানুষের চোখে একজন অমরসত্তা সত্যি সত্যিই যেমন উঁচু তেমন বিশাল, তার অনেক ক্ষমতাও আছে, কিন্তু সে হয়তো সঠিক ফল

প্রাপ্ত করতে পারেনি। যখন নানান ধরনের বার্তা তোমাকে বাধা দেবে এবং নানান ধরনের দৃশ্য তোমাকে প্রলুব্ধ করবে, তখন তুমি বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবে কি? সেইজন্যে আমরা বলি যে দিব্যচক্ষু খোলা অবস্থায় সাধনা করাও কঠিন এবং চরিত্রকে রক্ষা করা আরও কঠিন। যাই হোক, সৌভাগ্যবশত আমাদের কিছু অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে, অলৌকিক ক্ষমতাগুলি সাধনার মাঝপথে খুলে দেওয়া হবে এবং তারা পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থায় প্রবেশ করবে। প্রত্যেকের দিব্যচক্ষু খুলে দেওয়া হবে, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে প্রকটিত হতে দেওয়া যাবে না, কিন্তু যখন তোমার চরিত্র ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাবে, তোমার মানসিক অবস্থা যখন স্থিতিশীল হবে, তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে, তখন বিস্ফোরণের দ্বারা এগুলো একবারে খুলে দেওয়া হবে। অতএব একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে তোমার মধ্যে পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থাটা আবির্ভূত হবে। সেই সময়ে তোমার পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, নানান ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হবে, তুমি নিজে উপরের দিকে সাধনা চালিয়ে যাবে, একেবারে শেষে তোমার সমস্ত কিছু সম্পূর্ণরূপে খুলে যাবে। তোমার সাধনার মাঝপথে এসব ঘটতে দেওয়া হবে, আমাদের অনেক অনুশীলনকারী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অতএব দেখার জন্যে দুশ্চিন্তা করবে না।

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে বৌদ্ধধর্মের জেন সম্প্রদায় আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তি এবং পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেছে। জেন সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ধর্মাচার্য হুই নাংগ আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতেন এবং জেন সম্প্রদায়ের উত্তরাংশের শেন শিউ[110] পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস করতেন। ইতিহাসগতভাবে বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে এই দুজনের মতবিরোধ দীর্ঘ সময় ধরে বজায় ছিল, লোকেরা তর্ক করেই যাচ্ছিল। আমি বলব এটা অর্থহীন। কেন এইরকম? তাঁরা শুধু সাধনা পর্বের একটা সত্যের উপলব্ধি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছিলেন। এই সত্যটা হচ্ছে কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে, এটার উপলব্ধি একবারে হয়, আবার কোনো কোনো লোকের ধীরে ধীরে আলোকপ্রাপ্তি হয় এবং উপলব্ধি হয়। কীভাবে আলোকপ্রাপ্তি হল তার কোনো গুরুত্ব আছে কি? একবারে উপলব্ধি হলে ভালো, কিন্তু ধীরে ধীরে

[110]শেন শিউ - তাংগ রাজবংশের সময়ে জেন বৌদ্ধধর্মের উত্তরাংশের সংস্থাপক।

আলোকপ্রাপ্তি হলে সেটাও ঠিক আছে। এই দুটোই আলোকপ্রাপ্তি নয় কি? দুটোই আলোকপ্রাপ্তি, অতএব কোনোটাই ভুল নয়।

উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি

‘‘উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি’’ কে? উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং খুব ভালো জন্মগত সংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। একটা খুব লম্বা ঐতিহাসিক সময়কাল পার হলে, একমাত্র তখনই এইরকম একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য এটা প্রথমত অনিবার্য যে একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির খুব বিশাল পরিমাণ সদ্‌গুণ থাকবে এবং এই সাদা পদার্থের বিরাট একটা ক্ষেত্র থাকবে----এটা নিশ্চিত। একই সাথে এই ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারবেন, তাঁর মনের সহনশীলতাও অবশ্যই খুব বেশী, তিনি অবশ্যই ত্যাগ করতে পারবেন, তিনি অবশ্যই সদ্‌গুণ রক্ষা করতে পারবেন এবং তাঁর আলোকপ্রাপ্তির গুণও অবশ্যই ভালো থাকবে, ইত্যাদি।

দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট সহ্য করা কাকে বলে? বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে মানুষ হওয়ার অর্থ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে, তুমি যতক্ষণ মানুষ হিসাবে থাকবে ততক্ষণ অবশ্যই দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে। তারা বিশ্বাস করে যে অন্য সব মাত্রাতে যেসব জীবনসত্তা আছে তাদের কারোরই আমাদের সাধারণ মানুষদের মতো এইরকম শরীর নেই, সেইজন্যে তারা অসুস্থ হয় না, তাদের কাছে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু এই সমস্যাগুলোর অস্তিত্বই নেই, তাদের এই ধরনের কোনো যন্ত্রণাও নেই। অন্য মাত্রার লোকেরা হাওয়ায় ভাসতে পারে, তাদের ওজন নেই, অত্যন্ত বিস্ময়কর। সাধারণ মানুষদের এই দেহ আছে, ঠিক সেই কারণে তাদের এই সমস্যাগুলোও আছে, তারা ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না, গরম সহ্য করতে পারে না, তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না, ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না, ক্লান্তিও সহ্য করতে পারে না, এবং এর উপরে আছে জন্ম, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। যাই হোক তুমি আরামে নেই।

আমি একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে তাংগশান[111] শহরে ভূমিকম্পের সময়ে প্রচুর লোকের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু কিছু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছিল। এই সব লোকেদের একবার সামাজিক স্তরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল: তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মৃত্যুকালীন অবস্থায় কীরকম অনুভূতি হয়েছিল? কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তারা সবাই একটা পরিস্থিতির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল, যেটা সবাই একইরকম বলেছিল, অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তটাতে তারা কোনো আতঙ্ক অনুভব করেনি, বরঞ্চ এর ঠিক বিপরীত, তারা অকস্মাৎ একধরনের স্বস্তি অনুভব করেছিল, একধরনের সুপ্ত উত্তেজনা অনুভব করেছিল। কিছু লোক হঠাৎ অনুভব করেছিল যেন তারা নিজেদের শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, তারা হাল্কা হয়ে শূন্যে উঠে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তারা নিজেদের শরীরও দেখতে পারছিল; কিছু লোক অন্য মাত্রার জীবন সত্তাদের দেখতে পারছিল; কিছু লোক আবার নানান জায়গায় চলে গিয়েছিল। তারা সকলেই বলেছিল যে তারা সেই মুহূর্তে একধরনের স্বস্তি এবং একধরনের সুপ্ত উত্তেজনা অনুভব করেছিল, তারা কোনোরকম যন্ত্রণা অনুভব করেনি। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে আমরা এই ভৌতিক শরীরের জন্যেই কষ্ট সহ্য করি। যেহেতু আমরা সকলেই মায়ের গর্ভ থেকে এইভাবে এসেছি, সেইজন্যে আমরা এই কষ্টটা বুঝতে পারি না।

আমি বলেছি যে মানুষকে অবশ্যই দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে। আমি সেদিন উল্লেখ করেছিলাম যে মানবজাতির সময়-মাত্রার ধারণা, অন্য আরও বৃহত্তর সময়-মাত্রার ধারণার থেকে আলাদা। এখানে আমাদের কাছে এক শিছেন হচ্ছে দুই ঘন্টার সমান, সেটাই অন্য মাত্রার সত্তাদের কাছে এক বৎসরের সমান। যদি বলো, কোনো ব্যক্তি এখানে এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতে সাধনা করছে, তাহলে সেটা সত্যিই বিস্ময়কর; যদি বলো, এই ব্যক্তির মন তাও-এর জন্যে প্রয়াস করছে এবং সে সাধনা করতে চায়, তাহলে সে সত্যিই খুব অসাধারণ। এইরকম কষ্টের মধ্যেও তার আদি প্রকৃতি নষ্ট হয়নি, সে এখনও সাধনা করে আদিতে ফিরে যেতে চাইছে। কেন একজন সাধককে কোনোরকম শর্ত ছাড়াই সাহায্য করা হয়? এটাই তার কারণ। যদি বলো, এই ব্যক্তি সারারাত ধরে সাধারণ লোকেদের এই মাত্রাতে বসে ধ্যান করেছে, তাঁরা এটা দেখলেই, বলবেন যে এই ব্যক্তি সত্যিই মহান, যেহেতু সে এখানে ইতিমধ্যে 'ছ'য়

[111]তাংগশান - হেবেই প্রদেশের একটি শহর।

বছর ধরে বসে আছে। কারণ আমাদের এক শিছেন হচ্ছে সেখানকার এক বৎসরের সমান। আমাদের মানবজাতির এই মাত্রাটা একেবারে অনন্যসাধারণ।

দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট কীভাবে সহ্য করবে? আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলব, একজন ব্যক্তি একদিন কারখানায় কাজে গেছে। তার কারখানা আর্থিকভাবে দুরবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কাজের তুলনায় লোক বেশী, এই অবস্থা চলতে পারে না। সেইজন্যে কারখানায় আর্থিক সংস্কার করা হচ্ছে, ঠিকা শ্রমিক ব্যবহার করা হচ্ছে, উদ্বৃত্ত কর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। আমাদের এই ব্যক্তি তাদের মধ্যে একজন, যার চাকরিটা হঠাৎ চলে গেল। তার কীরকম মানসিক অবস্থা হবে? তার অর্থ উপার্জনের আর কোনো জায়গাই নেই। সে জীবনটা চালাবে কী করে? তার অন্য কোনো কাজের দক্ষতাও নেই। সে মনমরা হয়ে বাড়িতে ফেরে। সে যেই বাড়িতে পৌঁছায়, দেখে যে বাড়িতে তার বৃদ্ধ মা বাবার মধ্যে একজন অসুস্থ হয়েছে এবং অবস্থা খুবই গুরুতর, সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল এবং অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে টাকা ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করল। সে তখন বৃদ্ধ মানুষটির জন্যে কিছু তৈরি করে আনার জন্যে বাড়িতে ফিরল, সে যেই বাড়িতে ফিরেছে, তখনই বিদ্যালয়ের শিক্ষক তার সঙ্গে দেখা করে বলল: ‘‘আপনার ছেলে একজনকে মেরে জখম করেছে, আপনি তাড়াতাড়ি এসে ব্যাপারটা দেখুন।’’ ব্যাপারটা সামলানোর পরে বাড়িতে এসে যেই বসেছে সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন এল: ‘‘আপনার স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে প্রেম করছে।’’ তোমরা অবশ্যই এইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে না। একজন সাধারণ মানুষ এইরকম কষ্ট সহ্য করতে পারে না, সে ভাবে: ‘‘আমি কীসের জন্যে বেঁচে আছি, একটা দড়ি জোগাড় করে গলায় দিয়ে ঝুলে পড়ি, আর বাঁচতে চাই না! সবকিছুর সমাপ্তি হোক!’’ অর্থাৎ আমি এটাই বলছি যে তোমাদের অবশ্যই দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে, অবশ্য এগুলো হয়তো এই প্রকারে ঘটবে না। যাই হোক লোকেদের পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ, চরিত্রগত সংঘাত, ব্যক্তিগত লাভের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা----এই জিনিসগুলোও ওই সমস্যাগুলির থেকে সহজ কিছু নয়। প্রচুর মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে অথবা নিজের মান বাঁচানোর জন্যে জীবনযাপন করে, যখন আর সামলাতে পারে না তখন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে। সেইজন্যে আমরা অবশ্যই এই জটিল

পরিবেশের মধ্যেই সাধনা করব এবং দুঃখকষ্টের মধ্যে আরও দুঃখকষ্ট সহ্য করব, একই সাথে আমরা অবশ্যই প্রচন্ড সহনশীলতার অনুশীলন করব।

‘‘প্রচন্ড সহনশীলতা’’র অর্থ কী? একজন অনুশীলনকারী হিসাবে প্রথমত তোমাকে কেউ আঘাত করলে, তুমি তাকে প্রত্যাঘাত করবে না, তোমাকে কেউ অশ্লীল কথা বলে অপমান করলেও প্রত্যুত্তর করবে না---- তুমি অবশ্যই সহ্য করবে। তা নাহলে তোমাকে কীভাবে অনুশীলনকারী হিসাবে গণ্য করা যাবে? কিছু লোক বলে: ‘‘সহনশীলতা বজায় রাখা খুব কঠিন, আমি বদমেজাজি।’’ তুমি বদমেজাজি হলে স্বভাব পরিবর্তন কর, অনুশীলনকারীকে অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। কিছু লোক এমনকী বাচ্চাকে শিক্ষাদানের সময়েও মেজাজ হারিয়ে ফেলে এবং চেঁচামেচি করে ভীষণ অশান্তি সৃষ্টি করে, বাচ্চাকে শাসন করার সময়ে তোমার সেইরকম করার প্রয়োজন নেই, তুমি নিজে অবশ্যই সত্যি সত্যি ক্রুদ্ধ হবে না, তোমার বাচ্চাকে শিক্ষাদানের সময়ে কিছুটা যুক্তি এবং বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত, একমাত্র তাহলেই বাচ্চাকে সত্যি সত্যি সুশিক্ষা প্রদান করতে পারবে। এমনকী একটা সামান্য ব্যাপারকেও তুমি যদি অতিক্রম করতে না পার এবং মেজাজ হারিয়ে ফেল, তাহলে কী করে আশা কর যে তোমার গোংগ বৃদ্ধি হবে? কেউ কেউ বলে: ‘‘আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, তখন যদি কেউ আমাকে লাথি মারে, তাহলে আমি সহ্য করতে পারব, যেহেতু সেখানে কেউ আমাকে চেনে না।’’ আমি বলব এটা ঠিক যথেষ্ট নয়, ভবিষ্যতে হয়তো এমন একজন ব্যক্তির সামনে তোমার গালে দুটো থাপ্পড় মারা হবে, যার সামনে তুমি অপমানিত হতে সবচেয়ে বেশী ভয় পাও, এটা করা হবে তোমার মান সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার জন্যে, দেখা হবে যে তুমি সমস্যাটা সামলাতে পার কি না এবং তুমি এটা সহ্য করতে পার কি না। হয়তো তুমি এটা সহ্য করতে পারলে, কিন্তু মন থেকে দূর করতে পারছ না, এটাও ঠিক নয়। তোমরা সবাই জান যে, একজন ব্যক্তি যখন অর্হৎ স্তরে পৌঁছে যায়, সে যা কিছুরই সম্মুখীন হোক না কেন মনের মধ্যে অবিচলিত রয়ে যায়, বস্তুত সাধারণ মানুষদের কোনো কিছুই তার মনকে বিচলিত করতে পারে না, সে সর্বদা হাসিখুশি থাকে, তাকে যত ক্ষতিই সহ্য করতে হোক না কেন সে হাসিখুশি থাকে এবং কোনো কিছু মনে করে না। তুমি যদি সত্যিই এটা করতে পার, তাহলে তুমি ইতিমধ্যে প্রারম্ভিক অর্হৎ স্তরের সিদ্ধিলাভজনিত অবস্থান অর্জন করেছ।

কেউ একজন বলেছিল: ‘‘আমরা যদি এতটা সহনশীলতা পালন করি, তাহলে সাধারণ লোকেরা বলবে যে আমরা খুবই কাপুরুষ এবং আমাদের থেকে খুব সহজেই সুযোগ নেওয়া যেতে পারে,’’ আমি এটাকে কাপুরুষতা বলব না। তোমরা এটা চিন্তা কর, এমনকী সাধারণ মানুষদের মধ্যেও বয়স্ক এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মসংযম বজায় রেখে চলে, তারা অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক এড়িয়ে চলে, আর আমরা অনুশীলনকারী নয় কি? তাহলে সেটা কীভাবে কাপুরুষোচিত হবে? আমি বলব এটা তোমার প্রচন্ড সহনশীলতার পরিচয় এবং এটা তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয়। শুধুমাত্র অনুশীলনকারীদেরই থাকে এইরকম প্রচন্ড সহনশীল মানসিকতা। এইরকম একটা কথা প্রচলিত আছে: ‘‘যখন সাধারণ মানুষ অপমানিত হয়, তখন সে তরবারি বের করে লড়াই করার জন্যে।’’ সে সাধারণ মানুষ, সেইজন্যে এটাই স্বাভাবিক----‘‘তুমি আমাকে অপমান করেছ, আমিও তোমাকে অপমান করব; তুমি আমাকে আঘাত করেছ, আমিও তোমাকে আঘাত করব।’’ সে একজন সাধারণ মানুষ, তাকে কি অনুশীলনকারী বলা যাবে? একজন সাধক হিসাবে, তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকলে এবং তুমি নিজেকে সংযত করতে না পারলে, তুমি এটা করতে পারবে না।

তোমরা জান যে অতীতে হান শিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে খুবই পারদর্শী বলা হতো, সম্রাট লিউ বাংগ[112]- এর সময়ে তিনি প্রমুখ সেনাপতি ছিলেন এবং দেশের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এত বড়ো দায়িত্ব তিনি কীভাবে পালন করতে পেরেছিলেন? এটা বলা হয় যে হান শিন অল্প বয়স থেকেই ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর সম্বন্ধে এইরকম একটা গল্প আছে, সেখানে বলা আছে যে হান শিন কোনো এক ব্যক্তির দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার মতো অপমান সহ্য করেছিলেন, হান শিন যুবা অবস্থায় রণক্রীড়া অনুশীলন করতেন, একজন রণক্রীড়াবিদ হিসাবে তিনি সর্বদা সঙ্গে একটা তরবারি বয়ে বেড়াতেন। একদিন হান শিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন একজন স্থানীয় মস্তান কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তার পথ রোধ করে বলল: ‘‘তুমি কাঁধে তরবারি বয়ে বেড়াচ্ছ কীসের জন্যে? তুমি কি মানুষকে হত্যা করতে সাহস কর? যদি মানুষকে হত্যা করার সাহস থাকে তাহলে আমার মাথাটা কেটে

---

[112] লিউ বাংগ - হান রাজবংশের (206 B.C.– 23 A.D.) সম্রাট এবং প্রতিষ্ঠাতা।

ফেল।'' এটা বলেই সে মাথাটা বাড়িয়ে ধরল। হান শিন চিন্তা করলেন, ''আমি কীসের জন্যে তোমার মাথা কাটব?'' সেই সময়েও কোনো ব্যক্তি কারোর মাথা কেটে ফেললে কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই অভিযোগ দায়ের করা হতো, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে নিজের জীবন দিয়ে সেটা শোধ করতে হতো, ইচ্ছামতো কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে কি? যখন মস্তানটা দেখল যে হান শিন তাকে হত্যা করতে সাহস করছে না, তখন সে বলল: ''যেহেতু তুমি আমাকে হত্যা করতে সাহস করছ না, তাহলে তুমি আমার দুই পায়ের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাও।'' তখন হান শিন সত্যিই তার দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়েছিলেন। এর থেকে হান শিনের প্রচন্ড সহনশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু তিনি সাধারণ মানুষের মতন ছিলেন না, সেইজন্যে তিনি বিরাট দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। ''মানুষ নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে অথবা নিজের মান বাঁচানোর জন্যে জীবনযাপন করে''----- এটা সাধারণ মানুষের কথা। তোমরা সবাই চিন্তা কর: ''নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে অথবা নিজের মান বাঁচানোর জন্যে জীবনযাপন করা''----- এইরকম জীবন ক্লান্তিকর নয় কি? এটা যন্ত্রণাদায়ক নয় কি? এর কোনো মূল্য আছে কি? যত যাই হোক হান শিন তো একজন সাধারণ মানুষই ছিলেন, আর আমরা তো সাধক, অতএব আমাদের তাঁর থেকে আরও অনেক ভালো করা উচিত। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের এই স্তর অতিক্রম করে উপরে ওঠা এবং আরও উচ্চস্তরের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। আমরা ওই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো না, কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন সাধককে যে অপমান এবং লজ্জাকর পরিস্থিতি সহ্য করতে হয়, সেটাও সম্ভবত তার থেকে কম কিছু নয়। একজন ব্যক্তির সঙ্গে আর একজন ব্যক্তির চরিত্রজনিত যে মতবিরোধ সেটা আমি বলব যে ওই ঘটনার তুলনায় সহজ কিছু নয়, বরঞ্চ আরও বেশী খারাপ, এবং সামলানোও বেশ কঠিন।

একই সাথে একজন অনুশীলনকারীর ত্যাগ করতে পারা উচিত, সাধারণ মানুষদের বিভিন্ন ধরনের আসক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারা উচিত। এসব একবারে করা যাবে না, আমরা আস্তে আস্তে এগুলো করতে পারব। তুমি যদি ঠিক আজকেই এসব করতে পারতে, তাহলে তুমি আজকেই বুদ্ধ হয়ে যেতে। সাধনায় সময় লাগবেই, কিন্তু তোমার শিথিলমনস্ক হওয়া উচিত নয়। তুমি বলবে: ''মাস্টার বলেছেন, সাধনায় সময় লাগবেই, সেইজন্যে আমি আস্তে আস্তে করব।''

তাহলে সেটা ঠিক হবে না! তুমি অবশ্যই নিজের প্রতি কঠোর হবে, বুদ্ধ ফা-এর সাধনায় তুমি অবশ্যই তেজোদ্দীপ্ত হয়ে দ্রুত সামনে অগ্রসর হবে।

উপরন্তু তুমি অবশ্যই তোমার সদ্‌গুণ রক্ষা করতে সক্ষম হবে, চরিত্র বজায় রাখবে এবং বেপরোয়া হয়ে কোনো কাজ করবে না। তুমি খেয়ালখুশি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই করতে পার না, তুমি অবশ্যই তোমার চরিত্র বজায় রাখতে সক্ষম হবে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে এই কথাটা প্রায়ই শোনা যায়: ‘‘ভালো কাজ করে সদ্‌গুণ সঞ্চয় কর।’’ অনুশীলনকারী সদ্‌গুণ সঞ্চয় করার কথা বলে না, কারণ আমরা সদ্‌গুণ রক্ষা করার ব্যাপারে বিশ্বাস করি। আমরা সদ্‌গুণ রক্ষা করি কেন? কারণ আমরা এরকম পরিস্থিতি দেখেছি: সাধারণ লোকেরা সদ্‌গুণ সঞ্চয় করার কথা বলে এবং সদ্‌গুণ সঞ্চয় করতে চায়, সেইজন্যে তারা ভালো ভালো কাজ করে, যাতে পরের জীবনটা ভালোভাবে কাটাতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে এই বিষয়টা প্রযোজ্য নয়, তুমি যদি সাধনায় সাফল্যলাভ কর তাহলে তাও প্রাপ্ত হবে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনের প্রশ্নটা আর থাকে না। আমাদের এখানে উল্লেখিত সদ্‌গুণ রক্ষা করার আরও এক স্তরের অর্থ হয়, অর্থাৎ আমরা শরীরে যে দুই ধরনের পদার্থ বহন করি সেগুলো কোনো একটা জীবনের সঞ্চয় নয়, সেগুলো বহু প্রাচীন কাল থেকে বংশপরম্পরায় লব্ধ হয়ে আসছে। তুমি সাইকেলে করে পুরো নগরটা ঘুরে এলেও ভালো কাজ করার মতো কোনো কিছুই পাবে না। তুমি এইরকম চেষ্টা প্রতিদিনই চালিয়ে যেতে পার, কিন্তু তবুও তুমি হয়তো সেইরকম সুযোগের মুখোমুখি নাও হতে পার।

এর আরও এক স্তরের অর্থ হয়, যদি তুমি সদ্‌গুণ সঞ্চয় করতে চাও, তুমি দেখছ এই কাজটা ভালো, কিন্তু তুমি যদি সেটা কর, পরে হয়তো দেখবে সেটা একটা খারাপ কাজ; অথবা কোনো একটা কাজকে দেখে মনে হচ্ছে খারাপ এবং তুমি যদি বাধা দাও, তখন হয়তো দেখবে সেটা ভালো ছিল। এরকম কেন? কারণ তুমি কোনো কাজের পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ককে দেখতে পারছ না। আইনের শাসন সাধারণ মানুষের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে, এটা কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু একজন অনুশীলনকারী হওয়া অসাধারণ ব্যাপার, সেইজন্যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে তুমি অবশ্যই উচ্চস্তরের নিয়মাবলি পালন করবে, তুমি সাধারণ মানুষদের নিয়মাবলির সাহায্যে নিজেকে বিচার করতে পার না। তুমি কোনো কাজের পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক না জানলে, সহজেই ভুল কাজ করে ফেলতে পার।

সেইজন্যে আমরা নিষ্ক্রিয়তার কথা বলি, তুমি কোনো কিছু করতে চাইলেই সেটা করতে পার না। কেউ কেউ বলে: ‘‘আমি খারাপ লোকেদের নিয়মানুবর্তী করতে চাই।’’ আমি বলব: তুমি পুলিশে নাম লেখাও। কিন্তু আমরা এটা বলছি না যে তুমি মানুষকে হত্যা করা বা অগ্নিসংযোগ করার সম্মুখীন হলেও তখন কিছু করবে না। আমি তোমাদের এটা বলতে চাই যে, যখন লোকেদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটছে, একজন আর একজন ব্যক্তিকে লাথি মারছে বা ঘুষি মারছে, সেক্ষেত্রে সম্ভবত ইতিপূর্বে সেই ব্যক্তি অপরজনের কাছে কোনো ব্যাপারে ঋণী ছিল এবং এখন তারা হিসাবটা মেটাচ্ছে। তুমি যদি এটা থামিয়ে দাও তাহলে ঋণের হিসাবটা মিটবে না এবং পরবর্তীকালে পুনরায় এটা করার জন্যে তাদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। এর অর্থ তুমি পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কটা দেখতে পারছ না এবং সহজেই ভুল কাজ করে ফেলতে পার, সুতরাং তোমার সদ্‌গুণ-এর হানি হবে।

সাধারণ মানুষের কার্যকলাপে একজন সাধারণ মানুষ হস্তক্ষেপ করলে সেটা ঠিক আছে, যেহেতু সে সাধারণ মানুষের নীতি অনুযায়ী সবকিছু বিচার করবে। কিন্তু তুমি অবশ্যই উচ্চস্তরের নীতির প্রয়োগ করে সবকিছু বিচার করবে, তুমি মানুষকে হত্যা করতে বা অগ্নিসংযোগ করতে দেখেও যদি বাধা না দাও, তাহলে সেটা তোমার চরিত্রের সমস্যা। এছাড়া তুমি আর কীভাবেই বা প্রদর্শন করবে যে তুমি ভালো মানুষ? মানুষকে হত্যা করা বা অগ্নিসংযোগ করার ক্ষেত্রে তুমি যদি বাধা না দাও তাহলে আর কীসে বাধা দেবে? তবে একটা ব্যাপার, এই সব জিনিসের সাথে আমাদের সাধকদের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সম্ভবত তোমার জন্যে এইসব ঘটনার বন্দোবস্ত করা হয়নি, সম্ভবত তুমি এসবের সম্মুখীনও হবে না। আমরা বলেছি যে তুমি সদ্‌গুণ রক্ষা করে চলবে অর্থাৎ খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে, তুমি হয়তো সেটা সামান্যই করলে কিন্তু তাহলেও সেটা খারাপ কাজই করা হবে, সেক্ষেত্রে তোমার সদ্‌গুণ খোয়া যাবে। তোমার সদ্‌গুণ খোয়া গেলে, তোমার স্তরের উন্নতি কীভাবে হবে? তোমার অন্তিম লক্ষ্যটাকে কীভাবে অর্জন করবে? এখানে সমস্যাটা এইরকমই। এছাড়া আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভালো হওয়া আবশ্যক, জন্মগত সংস্কার ভালো থাকলে সেটা সম্ভবত আলোকপ্রাপ্তির গুণকে ভালো করে দিতে পারে, পরিবেশের প্রভাবও একটা কাজ করে।

আমরা আরও বলেছি যে, যদি আমরা প্রত্যেকে নিজের অন্তরের সাধনা করি, যদি আমরা প্রত্যেকে নিজের চরিত্রকে পরীক্ষা করতে থাকি, সেক্ষেত্রে কোথাও ভুল করলে নিজের মধ্যেই যেন কারণগুলোর অনুসন্ধান করি, যাতে পরের বার ভালো করতে পারি এবং কোনো কাজ করার সময়ে প্রথমে যেন অন্যদের কথা বিবেচনা করি। তাহলেই মানবসমাজ পরিবর্তিত হয়ে উন্নত হতে থাকবে, নৈতিকতারও উন্নতি হতে থাকবে, আধ্যাত্মিক সভ্যতারও [113] উন্নতি হতে থাকবে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতিরও উন্নতি ঘটবে, সম্ভবত পুলিশেরও আর দরকার পড়বে না। জনগণকে শাসন করার প্রয়োজনই হবে না, লোকেরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং নিজের মনের মধ্যে অনুসন্ধান করতে থাকবে, তুমিই বলো এটা কত ভালো হবে। তোমরা সবাই জান যে বর্তমানে আইন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে। কিন্তু লোকেরা কেন তাহলে খারাপ কাজ করছে? কেন তারা আইন মেনে চলছে না? এর কারণ হচ্ছে, তুমি তাদের মনকে শাসন করতে পারছ না, যদি কেউ না দেখে তাহলে তারা এখনও খারাপ কাজ করতে থাকবে। লোকেরা প্রত্যেকে যদি নিজের অন্তরের সাধনা করে তাহলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন হবে না।

ফা শুধু এই স্তর পর্যন্তই শেখানো যাবে, আরও উঁচু স্তর অর্জন করা নির্ভর করছে তোমার নিজের সাধনার উপরে, একমাত্র তাহলেই তুমি এগোতে পারবে। কেউ কেউ প্রশ্নগুলি আরও নির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করেছে। তোমার জীবনের সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর যদি আমিই দিয়ে দিই, তাহলে তুমি নিজে আর কীসের সাধনা করবে! তোমাকেই নিজের সাধনা করতে হবে এবং তোমাকেই নিজের আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে হবে, আমি যদি সবকিছু বলে দিই তাহলে তোমার সাধনার জন্যে কোনো কিছুই আর থাকবে না। সৌভাগ্যবশত দাফা ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে, অতএব তুমি দাফা-র উপরে ভিত্তি করেই সবকিছু করতে পারবে।

---

[113]আধ্যাত্মিক সভ্যতা - এটি চীন দেশে প্রচলিত খুবই জনপ্রিয় একটি শব্দ যার অর্থ হল জনসাধারণের মানসিকতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের উন্নতি। চীন দেশে এই শব্দটার অর্থ বস্তুগত সভ্যতার বিপরীত।

*　　　　　　*　　　　　　*

আমার মনে হয় আমার ফা শেখানোর সময়সীমা মূলত অন্তিমে পৌঁছে গেছে, সেইজন্যে আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে সত্যিকারের জিনিসগুলি রেখে যেতে চাই, যার ফলে আজকের পর থেকে তোমরা যখনই সাধনা করবে, ফা তোমাদের পথপ্রদর্শন করে যাবে। আমি সামগ্রিকভাবে এই ফা শেখানোর পর্বে, তোমাদের প্রতি এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ছিলাম, প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নীতি মেনেই কাজ করেছি, আমরা ভালো করেছি না মন্দ করেছি সে সম্বন্ধে আমি কোনো মন্তব্য করব না, জনসাধারণই এর বিচার করবে। আমার ইচ্ছা ছিল দাফা-কে জনগণের মধ্যে প্রচার করা, যাতে আমাদের অধিকাংশ লোক এর থেকে উপকার প্রাপ্ত হতে পারে এবং সত্যিকারের সাধনা করতে ইচ্ছুক লোকেরা ফা অনুসরণ করে উচ্চস্তরে সাধনা করতে পারে। ফা-এর প্রচার পর্বে, আমরা একই সাথে ভালো মানুষ হওয়ার নীতিগুলিও ব্যাখ্যা করেছি। আমি আশা করব যে এই বক্তৃতামালা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, যদি তুমি দাফা অনুযায়ী সাধনা নাও করতে পার, তাহলেও তুমি অন্ততপক্ষে একজন ভালো মানুষ তো হতে পারবে, এইভাবেও আমাদের সমাজের উপকার হবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি ইতিমধ্যে জেনে গেছ যে ভালো মানুষ কীভাবে হওয়া যায়, অতএব এই ক্লাসের পরে তুমিও একজন ভালো মানুষ হতে পারবে।

ফা শেখানোর পর্বে কিছু জিনিস মসৃণভাবে ঘটেনি, নানান দিক দিয়ে খুব বড়ো বড়ো বাধাও এসেছিল। কিন্তু সংগঠনকারীদের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্ণধারদের উৎসাহপূর্ণ সহযোগীতা এবং আমাদের কর্মচারীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের ক্লাসগুলি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বক্তৃতাগুলোতে যেসব জিনিস শিখিয়েছি, সেগুলো তোমাদের উচ্চস্তরের সাধনায় পথপ্রদর্শন করবে, অতীতে যাঁরা ফা শিখিয়েছেন তাঁরা কখনোই এইসব জিনিসের শিক্ষা প্রদান করেননি। আমরা জিনিসগুলো খুব স্পষ্টভাষায় শিখিয়েছি, যার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান এবং বর্তমানের মানব শরীরের বিজ্ঞানকে সম্মিলিত করেছি, এছাড়া জিনিসগুলোকে খুব উঁচুস্তরে ব্যাখ্যা করেছি। আমরা এসব প্রধানত তোমাদের জন্যেই করেছি যাতে তোমরা ভবিষ্যতে সত্যি সত্যি ফা অর্জন করতে পার, এবং সাধনার মাধ্যমে উপরে উঠতে পার----এটাই আমার উদ্দেশ্য। ফা এবং শারীরিক

ক্রিয়া শেখানোর পর্বে অনেক মানুষ দেখেছে যে ফা খুব ভালো, কিন্তু এটা কার্যকর করা খুবই কঠিন। আসলে আমার মনে হয় এটা কঠিন অথবা কঠিন নয় সেটা যে সাধনা করবে তার উপরে নির্ভর করে। সাধারণভাবে একজন গড়পড়তা ধরনের মানুষ সাধনা করতে চায় না, সে ভাবে যে সাধনা করা সত্যিই খুব কঠিন, এটা অকল্পনীয় এবং সাধনা করে সে সফল হবে না। যেহেতু সে একজন সাধারণ মানুষ এবং সাধনা করতে চায় না, সেইজন্যে সে দেখে যে এটা খুবই কঠিন। লাও জি বলেছিলেন: ''যখন উচ্চতম শ্রেণীর ব্যক্তি তাও-এর কথা শোনে, সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে; যখন মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তি তাও-এর কথা শোনে, সে কখনো অনুশীলন করে, কখনো করে না; যখন নিম্নতম শ্রেণীর ব্যক্তি তাও-এর কথা শোনে, সে জোরে হাসতে থাকবে, যদি সে না হাসে তাহলে এটা তাও নয়।'' সত্যিকারের সাধকদের ক্ষেত্রে, আমি বলব যে এটা খুব সহজ এবং এটা সেইরকম উঁচু জিনিস নয় যে অর্জন করা যাবে না। বস্তুত আমাদের পুরানো শিক্ষার্থীদের অনেকেই যারা এখানে বসে আছ অথবা উপস্থিত নেই, তারা সাধনায় ইতিমধ্যে খুব উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছ। আমি তোমাদের এসব বলিনি কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, তোমাদের এসবে আসক্তি উৎপন্ন হতে পারে অথবা আত্মতুষ্টি আসতে পারে ইত্যাদি, এসব তোমাদের গোংগ সামর্থ্যের বিকাশকেও প্রভাবিত করতে পারে। একজন সত্যিকারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধক হিসাবে, তুমি সমস্ত কিছু সহ্য করতে পারবে, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত লাভের সামনে আসক্তিগুলোকে ছাড়তে পারবে এবং সেগুলোকে খুব নির্লিপ্ত ভাবে দেখতে পারবে, যতক্ষণ তুমি এইরকম করে যেতে পারবে ততক্ষণ এটাকে কঠিন মনে হবে না। যেসব লোকেরা এটাকে কঠিন বলছে, তারা ওই জিনিসগুলোকে ছাড়তে পারে না। সাধনার শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলন স্বয়ং কঠিন কিছু নয় এবং তোমার স্তরের উন্নতিসাধনও স্বয়ং কঠিন কিছু নয়। যেহেতু লোকেরা তাদের মানবীয় আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে পারে না, একমাত্র এই কারণেই তারা এটাকে কঠিন বলে। এর কারণ ব্যবহারিক লাভের সামনে ওইসব জিনিসগুলোকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন, সুবিধাগুলি ঠিক এখানেই রয়েছে, তুমিই বলো এই আসক্তি কীভাবে ছাড়বে? তারা এটাকেই কঠিন মনে করে, আসলে এটাই কঠিন হওয়ার কারণ। আমাদের পারস্পরিক মতবিরোধের সময় তুমি যদি সহনশীল হয়ে ক্রোধ সংবরণ করতে না পার এবং এমনকী এটাকে সামলানোর সময়ে তুমি যদি নিজে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে আচরণ না কর, আমি বলব এটা ঠিক নয়। অতীতে আমি যখন সাধনা করতাম সেই সময়ে অনেক মহান ব্যক্তি

আমাকে এই কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন: ‘‘এটা সহ্য করা কঠিন, কিন্তু তুমি সহ্য করতে পারবে; এটা করা কঠিন, কিন্তু তুমি করতে পারবে।’’ প্রকৃতপক্ষে এটা এইরকমই, তুমি বাড়িতে ফিরে গেলে, হয়তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। তুমি যখন সত্যি সত্যি একটা সাংঘাতিক দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাবে অথবা কোনো বাধা অতিক্রম করবে, তখন তুমি একটা চেষ্টা করবে, যখন মনে হবে এটা সহ্য করা কঠিন, তখন সহ্য করতে চেষ্টা করবে; যখন দেখে মনে হবে এটা করা অসম্ভব, এবং এটা করা বেশ কঠিন, তখন তুমি চেষ্টা করবে, দেখবে যে শেষে এটা করতে পারছ কি পারছ না। তুমি যদি সত্যিই এটা করে ফেলতে পার, তখন ঠিক যেন সেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত পথিকের মতো তুমি সত্যিই দেখতে পারবে: ‘‘ঘন উইলো গাছের সারি, ফুটে থাকা ফুল, সামনে আছে নতুন এক গ্রাম!’’

যেহেতু আমি এত বেশী বলেছি, তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আমার বলা সবকিছু মনে রাখা খুবই কঠিন। আমি প্রধানত কয়েকটা আবশ্যকতার কথা বলব: আমি আশা করব তোমরা প্রত্যেকে আজকের পর থেকে সাধনার সময়ে, নিজেকে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে দেখবে এবং সত্যিকারের সাধনা চালিয়ে যাবে। আমি আশা করব নতুন ও পুরানো সব শিক্ষার্থীরা দাফা-র মধ্যেই সাধনা করতে পারবে এবং সবাই পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারবে! আমি আশা করব তোমরা প্রত্যেকে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরে সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সত্যিকারের সাধনা করবে।

....

উপর থেকে **জুআন ফালুন** (চীনা ভাষায় জুআন শব্দের অর্থ ঘূর্ণায়মান) ভাষাগতভাবে খুব মার্জিত নয়, এমনকী আধুনিক ব্যাকরণের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যদি আমি আধুনিক ব্যাকরণ প্রয়োগ করে দাফা-র এই বই প্রস্তুত করতাম তাহলে গম্ভীর সমস্যার সৃষ্টি হতো, সেক্ষেত্রে যদিও বই-এর ভাষার গাঁথুনি যথাযথ এবং আকর্ষণীয় হতো, কিন্তু আরও গভীর ও আরও উচ্চস্তরের দাফা-র বিষয়বস্তুকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেত না। এর কারণ আধুনিক মানের উপযোগী শব্দভান্ডারের প্রয়োগ কোনোভাবেই আরও উচ্চতর ও ভিন্ন ভিন্ন স্তরে, দাফা-র পথনির্দেশ প্রকাশ করতে পারত না, এবং প্রতিটি স্তরে ফা-এর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে পারত না; একইভাবে এটা শিক্ষার্থীদের মূল শরীরের এবং গোংগ-এর রূপান্তর, অথবা এই ধরনের মূলগত পরিবর্তনগুলোও ঘটাতে পারত না।

....

লি হোংগ জি

জানুয়ারি 5, 1996

Volunteer contacts for further information:

Kolkata	9143066856 , 9821381501
Mumbai	9619749428
Bangalore	9886500273, 9341255561
New Delhi	9871679992, 9971513911
Nagpur	9822569386
Pune	9423215580
Gurgaon	9999218967
Hyderabad	9885476390, 9848591947
Jamshedpur	9939500428
Pondicherry	9944025970
Varanasi	9935529619
Chennai	9840125536
Kochi	9895036331

Websites: www.falundafa.org

www. clearwisdom.net

www.falundafaindia.org